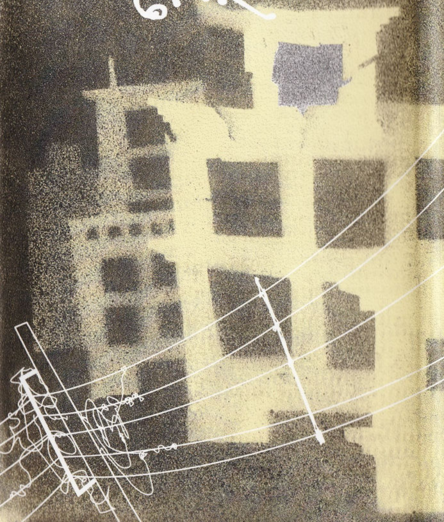
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

চিলেকোঠার সেপাই



আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

চিলেকোঠার সেপাই

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

১

'তোমার রঞ্জু পড়ি রইলো কোন বিদেশ বিভুঁয়ে, একবার চোখের দ্যাখাটাও দেখতি পাল্লে না গো!'

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে ওসমান একটার পর একটা লেবুপাতা ছেঁড়ে আর মায়ের বিলাপ শোনে। ৩টে আঙুলে লেবুপাতা চটকাতে চটকাতে উঠানের দিকে এগিয়ে গেলে কে যেন তাকে দেখে ফেলে, 'ওরে! রঞ্জুকে এট্টু কাঁধ দিতি দে!' লোকটা কে? সেই লোকটাই ফের আফসোস করে, 'আহা হাজার হলেও বড়ো ছেলে, জ্যেষ্ঠ সন্তান! কুথায় পড়ি রইলো সে, বাপের মুখি এক ফোঁটা পানি দিতি পাল্লো না! আহারে, বাপ হয়ে ছেলের হাতের এক মুঠি মাটি পেলো না গো!'

ওসমানের সামনেই কথাবার্তা চলে। ভুলটা কারো চোখে পড়ে না। বাপের লাশ-বিছানো খাটিয়ার একদিকে কাঁধ দিয়ে সে-ও পশ্চিমপাড়ার দিকে চলে। পশ্চিমপাড়ায় জুমার ঘর, জুমার ঘরের পেছনে কাজীদের জোড়শিমুলতলা, তারপর ছোটো ছোটো ঝোপঝাড় ও খেজুর কাঁটায় ভরা উঁচুনিচু গোরস্থান। গোলাপপাশ থেকে শবযাত্রীদের ওপর গোলাপজল ছিটিয়ে দিলে মনে হয় শিমুলগাছ থেকে টুপটাপ শিশির ঝরে পড়ছে। ওসমানের পায়ে কয়েক ফোঁটা পড়লে তার ঘুম ভেঙে যায়। পায়ের ওপর চাদর অনেকটা ভিজে গেছে, ওদিকের জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে।

ওসমানকে উঠে বসতে হলো। শিকের ফাঁকে থুথু ফেলে জানলাটা বন্ধ করে ফের শুয়ে পড়লো। কিন্তু পাশের জানলা খোলাই রইলো। ঐ জানলা দিয়ে পানির ছাঁট এসে পড়ছে চেয়ারে। চেয়ারে কিংস্টর্কের প্যাকেট, দেশলাই, চাবি ও কয়েকদিন আগেকার 'পাকিস্তান অবজার্ভার'। প্রথম পৃষ্ঠায় ৪ কলাম জুড়ে এই বছরের বিশ্বসুন্দরীর ছবি। রাতে ব্যবহার করবে বলে আনোয়ারের বাড়ি থেকে কাল দুপুরবেলা নিয়ে এসেছে। শালার শওকত ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে রাতে বাঙলার মাত্রাটা বেশি হয়ে গিয়েছিলো, এসে কখন যে প্যান্টট্যান্টসুদ্ধ শুয়ে পড়েছে খেয়াল নাই। সিসিলিরূপসীর পুরুষ্টু উরুতে শীতল বৃষ্টিপাত ঘটছে। ঐটা সামনে রেখে কম্বলের নিচে নিজের উরুসন্ধি থেকে দিব্যি ঘন প্রস্রবণ বইয়ে দেওয়া চলে। কিন্তু হয় না। প্যান্টের বোতাম খুলতে খুলতে বোঝা যায় যে, বাপের লাশের স্পর্শে তার সারা শরীর একদম ঠাণ্ডা মেরে গেছে। ভোরবেলার স্বপ্ন নাকি ঠিক ঠিক ফলে, বাপ তার সত্যি সত্যি মরে গেলো কিনা কে জানে? একটু আগে দ্যাখ্যা স্বপ্ন, সহজে কি

ছাড়তে চায়? শীতের দিনেও ঘামের মতো সেঁটে থাকে। তবে স্বপ্নে নিজের কাউকে মরতে দেখলে অন্য লোক মরে। নাঃ! আব্বা নিশ্চয়ই ভালো আছে। বাপের বেঁচে থাকা সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ত হলে বাপের ওপর ওসমানের রাগ হয়। একবার বাস করবে বলে পাকিস্তানে এলো তো আবার ফিরে গেলো কেন? এখানে বাড়িঘর কিছুই করলো না। বছর ছয়েক চাকরি করে একবার ছুটি নিয়ে সেই যে দেশে গেলো, ফেরার নামও করলো না আর। গ্রামে না থাকলে মোড়লগিরিটা ফলাবে কোথায়!

বাপের ওপর রাগ ভালো করে জমে ওঠবার আগে দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজে ওসমান দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে এক লাফে মেঝেতে নামলো, আব্বা কি এসেই পড়লো নাকি? প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে হাতের এক ধাক্কায় মিস ইউনিভার্সের ছবি মেঝেতে ফেলে দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে 'কে' বলে দরজার ছিটকিনি খুললো। দূর! আব্বা আসবে কোত্থেকে? ইন্ডিয়া থেকে আসা কি চাট্টিখানি কথা?

দরজা খুললেই নিচে নামবার খাড়া ঝাপশা সিঁড়ি। সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে ১৪/১৫ বছরের একটি ছেলে। ওসমানের ঘরের খোলা জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ছেলেটির শরীরের ওপরের ভাগে। গায়ে নীল রঙের হাফ হাতা হাওয়াই শার্ট, ফ্ল্যাপের নিচে দুটো বুকপকেট, ডান পকেটের ওপর ঘন খয়েরি সুতার এমব্রয়ডারি করা প্যাগোডার মাথা।

দরজার চৌকাঠে চোখ রেখে ছেলেটি বলে, 'আপনে একটু নিচে আসেন।'

ওসমান ছেলেটির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায়, 'কি ব্যাপার?'

নিচু গলায় ছেলেটি জবাব দেয়, 'আমরা দোতলায় থাকি।'

'আমি কি করবো?' ওসমান একটু হাসে।

ছেলেটি হাসে না, বিরক্ত হয় না। পাশে সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে বিড়বিড় করে, 'আপনে একটু আসেন। আমার ভাই মারা গেছে।' একটু থেমে সে হঠাৎ জোরে বলে ওঠে, 'কাল পুলিসের গুলি খাইয়া মারা গেছে।'

গুলি কোথায় লেগেছিলো? এই প্রশ্ন না করলেও ওসমান চট করে মাথাটা একটু নিচু করে সঙ্গে সঙ্গে ফের সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করে, 'কোথায়?'

'আমাদের বাসায় আসেন। বাড়িআলা সবাইরে ডাকতে বললো।'

'চলো।'

ছেলেটির পেছন পেছন কয়েকটা ধাপ নেমে ওসমান হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরের জানলা-দিয়ে-আসা আলো এখন ছেলেটির এলোমেলো চুলে বিলি কেটে গড়িয়ে পড়েছে তার ঘাড় পর্যন্ত। ওসমানের পায়ের আওয়াজ থেমে যাওয়ায় ছেলেটি দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে তাকালো। এখন তার চিবুক পর্যন্ত আলো। তার চোখের লাল চিকন রেখাগুলো ছটফট করছে। প্রায় ৭/৮ ধাপ ওপর থেকে ওসমানের দিকে তাকালে আলো-পড়া লাল চোখ জোড়া অনেক বড়ো মনে হয়।

ওসমান বলে, 'তুমি যাও। আমি একটু পরে আসছি।'

ছেলেটি একটু দাঁড়ায়, জানলার আলো এখন তার ঘাড়ের ওপর, শার্টের কলারে। এবার পেছনে না তাকিয়ে সে নিচে নেমে গেলো। ওসমান ভেবেছিলো যে, ছেলেটির দুঃখী চোখজোড়া আরেকবার দ্যাখা যাবে।

টুথব্রাশে অনেকখানি পেস্ট লাগিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ছাদের এক কোণে গিয়ে ওসমান পেচ্ছাব করে। ঘরে এসে কলসি থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ছাদের আরেক দিকে বসে সে মুখ ধোয়। মুখ ধোয়ার কাজটা তাকে একটু ধীরে সুস্থে করতে হয়, তাড়াতাড়ি কুলকুচো করতে গেলে বমি হওয়ার চান্স থাকে। পেচ্ছাব করা ও মুখ ধোয়াটা ওসমান ছাদেই সেরে নেয়। কোনোটাতেই বাড়িওয়ালার সম্মতি নাই। গোসল করতে হলে অবশ্য নিচে নামতেই হয়। নিচতলায় বাড়িওয়ালার 'গওসল আজম সু ফ্যাক্টরি'। কারখানায় প্রায় ৮/১০ জন লোক। সারি বাঁধা খাটা পায়খানার ৩টে প্রায় তাদের দখলেই থাকে। ওসমান তাই অফিসে কি সিনেমা হলে কি মসজিদে পায়খানা করে। গোসলের জন্য পাকা স্যাতসেঁতে উঠানের একদিক জুড়ে মস্ত বড়ো চৌবাচ্চা, এটাকে বলা হয় হাউস। কিন্তু ওটার দিকে চোখ পড়লেই তার শীতশীত করে, গোসল করাটা প্রায় হয়েই ওঠে না।

এই ঘরে গনির বসবাস প্রায় আড়াই বছর। বাড়িটা হোপলেস! সামনে খোলা জায়গা নাই, ড্রেনের পরেই বাড়ি শুরু হয়ে গেলো। রাস্তার ওপরে চাওড়া দরজা, দরজাটা একটু নিচু। বাড়ির বাসিন্দারা, এমনকি বেঁটে লোকজনও মাথা একটু নিচু করে ঐ দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকে। যারা ওপরে যাবার তারা বাঁদিকে এক পা গিয়ে সিঁড়িতে ওঠে, আর একতলার গওসল আজম স্যু ফ্যাক্টরির কর্মচারী বা কর্মিগণ সরু প্যাসেজ পার হয়ে স্যাতসেঁতে উঠান অতিক্রম করে। রাস্তার ওপরে এই একটিমাত্র দরজা বন্ধ করে দিলে এই বিশাল ও বেঢপ দালানে ঢোকা অসম্ভব। দোতলা ও তিনতলার সামনে বারান্দায় বাঙালিদের পেট সমান উঁচু লোহার রেলিঙ। ঘরগুলো ছোটো, এর মধ্যে হার্ডবোর্ড, কাঠের পার্টিশন ও বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘরের সংখ্যা আরো বাড়ানো হয়েছে। ঘরের মূল দেওয়াল খুব পুরু, থামগুলো মোটা। বাড়ি তৈরির সময় মনে হয় শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে একটি প্রবলরকম ইচ্ছা খুব তৎপর ছিলো। সেই শত্রু কে? কোনো শত্রু না থাকলে বাড়িটাকে এরকম না-দুর্গ না-বাড়ি বানাবার মানে কি? মানে যারা জানতো সেই সাহা কি বসাক কি পোদ্দার মশাইরা ১৯৫০ সালে রহমতউল্লার কাছে বাড়ি বেচে ইন্ডিয়া চলে গেছে। ইপিআইডিসিতে কাজ পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর আগের অফিসের এক সহকর্মীর কল্যাণে ওসমান এই ঘরের খোঁজ পায়।

ঘর মানে বাড়ির চিলেকোঠা। ছাদের ওপর একটিমাত্র ঘর, রান্নাঘর নাই, বাথরুম নাই, পায়খানা কি গোসল করতে হলে দাঁড়াতে হয় একতলার কিউতে। তবে ওসমানের ঘরে আলো বাতাস খুব। দরজা ২টো, সিঁড়ির মুখে ১টা, আরেকটা ছাদের দিকে। ছাদটা বেশ বড়ো, চারদিকে রেলিঙ, সামনের রেলিঙ একটু উঁচু। একদিকে এসে দাঁড়ালে সামনের রাস্তা চমৎকার দ্যাখা যায়। রাস্তার ঠিক ওপারে ১টা দোতলা বাড়ি, বেশ বড়ো এবং একই রকম বেঢপ। ঐ বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া মসজিদ, মসজিদের বারান্দায় একটি সাইনবোর্ডে বাঙলা ও আরবি হরফে হক্কেনূর মক্তবের নাম লেখা। মাঝে মাঝে ওসমান ছাদে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই চারদিকের ঘিঞ্জি সব বাড়িঘরের মাঝখানে পায়ের নিচের ছাদটাকে বড়ো ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে, সুড়ুৎ করে তখন ঢুকে পড়ে নিজের ঘরে। আজ অবশ্য ফাঁকা ফাঁকা ভাবটার জন্যে অপেক্ষা করতে হলো না। নিচে রাস্তার ওপর পুলিসের জিপ।

নিচে নামবার সময় দোতলার ডানদিকে মহিলা কণ্ঠের ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নার আওয়াজে বোঝা যায় যে, এই ঘরেরই কেউ নিহত হয়েছে। মৃত মানুষের বাড়িতে যেমন হাউমাউ

কান্নাকাটি থাকে, এখানে কিন্তু তেমন কিছু নাই। কান্নার ধ্বনি ঘরের চাপা কোলাহল থেকে বাইরে আসছে, ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ওসমান নিচে নামে।

জিপের পেছনে আরেকটি গাড়ি-পিক-আপ, এটাও পুলিসের গাড়ি। রাস্তার ওপর থেকে রহমতউল্লার সঙ্গে ৭/৮ জন লোক রাস্তা ক্রস করছে। তাদের ৪ জনই পুলিস। বাড়িওয়ালার মাথায় কালো জিন্না টুপি। গভর্নর গতবার এখানকার কম্যুনিটি সেন্টার উদ্বোধন করতে এলে মহল্লার একজন শ্রেষ্ঠ মৌলিক গণতন্ত্রী হিসাবে রহমতউল্লা টুপিটি উপহার পায়। তবে সবসময় সে সাদা কিস্তি টুপিই পরে। কেবল নিজের দাপট দ্যাখাবার দরকার হলে জিন্না টুপিটাকে সে ব্যবহার করে মুকুটের মতো।

না, টুপির জন্যে নয়, বাড়িওয়ালাকে দেখে ওসমান গনির ঠোঁটে আপনা-আপনি একটি হাসিহাসি ভঙ্গি ফোটে। জবাবে গম্ভীর ও কোঁচকানো চোখমুখ করে বাড়িওয়ালা বলে, 'আমার বাসায় যাইতেছিলেন? লন, উপরে যাই।'

রহমতউল্লার অনুমান ঠিক নয়। ওসমান যাচ্ছিলো ইসলামিয়া রেস্টুরেন্টের দিকে। ভোরবেলা হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গেলো, ঠাণ্ডাটা বেশ জমছে, নানরুটি পায়াতে রবিবারের সকালবেলাটা চমৎকার জমতো। এ্যাবাউট টার্ন করে বাড়িওয়ালার পেছনে হাঁটতে হাঁটতে সে জিগ্যেস করে, 'ব্যাপারটা কি? কিভাবে হলো?'

'আপনে আছিলেন কৈ? নিচের তলার পড়শি মরে গুলি খাইয়া, আপনে জানেন না?' ওসমান চুপচাপ তার সঙ্গে হাঁটে। জবাব দেওয়াটা রিস্কি, কিছু জিগ্যেস করলেই তার অজ্ঞতা আরো স্পষ্ট হবে। রহমতউল্লা কথা বলে একাই, 'রাইত ভইরা থানা-হাসপাতাল, হাসপাতাল-থানা না করলে লাশ পাইতাম?' সিঁড়ির গোড়ায় এসে দারোগাকে দেখিয়ে বলে, 'সামাদ সাহেব না থাকলে লাশ অহন কৈ পইড়া থাকতো!'

দোতলায় ও তিনতলার সরু বারান্দায় রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে লোকজন ওদের দেখছে। দোতলায় উঠে ডানদিকে বারান্দার পাশে দরজার সামনে এসে সবাই দাঁড়ালো। ২টো ঘরের জন্যে পাশাপাশি দুটো দরজা। ১টি পরিবার এই ঘর ২টো ও সামনের বারান্দা ব্যবহারের অধিকারী। বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলে হার্ডবোর্ডের পার্টিশন। এখান থেকে অন্য ১টি পরিবারের সীমানা শুরু হল্যে। ফের পাশাপাশি ২টো দরজা, শেষ দরজার পর একই রকম পার্টিশন, তবে এটা ক্যানভাসের। ক্যানভাসের সঙ্গে লাগানো দরজা বন্ধ। খাকি ক্যানভাসে সাদা চকখড়িতে আঁকা ১টি ল্যান্ডস্কেপ। রোগা ১টি নদীর তীরে লম্বা তালগাছের মাথায় সূর্য। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত যে কোনো দৃশ্য হতে পারে। সূর্যের অনেকটা ওপর দিয়ে ৫/৬টা সাহসী পাখির ঝাঁক। দুঃসাহসী পাখিদের ওপর এবং নদীর নিচে চুন ও কালির দাগ এবং কয়েকটা বাঙলা ও ইংরেজি অক্ষর। স্পষ্ট ও গোটাগোটা ইংরেজি হরফে লেখা একটি নাম ওসমানের মাথায় খচখচ করে বেঁধে, নামটি এবং খচখচ ভাবটি তার মাথায় দানা বাঁধে, তার চুল একটু খাড়া হয় এবং সে পড়ে, 'রঞ্জু।' এটা ওসমানের নিজেরই ডাকনাম। অস্পষ্ট একটি উদ্বেগ তার গলায় আটকে থাকে। তবে বেশিক্ষণ নয়। কারণ নতুন ঝামেলা মাথায় খামচাতে শুরু করে: যে লোক বাড়ির সামনে এতো বড়ো করে নিজের নাম লিখে রাখে সেই কিনা নিহত হয় পুলিসের হাতে!

বাড়িওয়ালা ডাকে, 'রঞ্জু।' ওসমানের বুকে এই ডাক ভুতুড়ে প্রতিধ্বনি তোলে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে সকালবেলার সেই ছেলেটি। ওর চোখের লাল চিকন রেখাগুলো সব

একাকার হয়ে গেছে। নাকের ডগা তার ভিজে ভিজে এবং ঠোঁটজোড়া শুকনা ও বেগুনী। তাহলে রঞ্জু ও নিহত ব্যক্তি এক নয়, নিহত ব্যক্তির ছোট ভাই হলো রঞ্জু এবং রঞ্জু এখনো জীবিত—এটা বুঝতে পেরে ওসমান আরাম পায়। এখন রঞ্জুর ভালো নাম জানতে ইচ্ছা করে। ও কোন স্কুলে কোন ক্লাসে পড়ে? কি খেলতে ভালোবাসে? কিন্তু এখন এসব জানবার উপায় নাই। তাই সে সোজা ঘরের ভেতর দেখতে শুরু করলো।

ঘরে কি?—দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ২জন পুলিস। দারোগাকে দেখে তারা হাত তুলে স্যালুট করে। বড্ডো আঁটোসাঁটো ঘর, স্যালুট করতে গিয়ে ১জনের হাতের কনুই দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খায়, বেচারার স্যালুটরত হাতের পাতা একটু একটু কাঁপে। ঘরে আর কি?—তক্তপোষ এলোমেলো বিছানা। ২জন লোক সেখানে বসে ছিলো। এবার উঠে দাঁড়ালো। এদের ১জন, বয়স ৫০ এর ওপর, ৫৫ বোধ হয় হয়নি, তার পরনে সবুজ চেক লুঙি, তার খয়েরি এণ্ডির চাদরের নিচে কোথাও কোথাও সাদা পাঞ্জাবির আভাস। এক পা তুলে ফের মেঝেতে রেখে সে বলে, 'স্লামালেকুম। ওসি সায়েব ভালো আছেন?'

দারোগার মুখ থেকে বিড়বিড় ধ্বনি যা বেরোয় তা থেকে নানা ধরনের বাক্য গঠিত হতে পারে, যেমন,'আর ভাই থাকা!' অথবা 'আমাদের আবার ভালো!' অথবা 'আল্লা রেখেছে ভাই!'

রহমতউল্লা লোকটিকে জিগ্যেস করে, 'রিয়াজউদ্দিন সায়েব, সব হইছে?' রিয়াজউদ্দিনের জবাবের জন্যে কিছুমাত্র অপেক্ষা না করে রঞ্জুর ডান হাত ধরে রহমতউল্লা ভেতরের ঘরে ঢোকে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এই ঘরে ফিরে এসে বলে, 'দারোগা সায়েব, আসতে পারেন। আসেন।'

'কমপ্লিট? মুর্দাকে গোসল করানো হয়েছে?' দারোগার প্রশ্নের জবাব দিয়ে রিয়াজউদ্দিন ফিসফিস করে মাত্র কয়েকটি শব্দ বলে। তারপর কন্যাকর্তার বিনয় ও আতিথ্য গলায় তুলে নিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে, 'আসেন, আপনেরা আসেন!'

এই ঘরটি আবার বাঁশের বেড়া দিয়ে বিভক্ত। ঘরের এপারে মেঝেতে একটি মাদুরে কয়েকজন মেয়েমানুষ। নেকাব পর্যন্ত ঝোলানো বোরখাপরা ১ মহিলা কাঁদো কাঁদো গলায় কোরান শরীফ পড়ছে। জড়সড় হয়ে শুয়ে রয়েছে ১ মহিলা; ১ তরুণী তালপাতার পাখা এবং ১ প্রৌঢ়া গামছা দিয়ে তার মাথায় হাওয়া করছে। শুয়ে থাকা মহিলার গলা থেকে একটানা আওয়াজ বেরোয়। কখনো কখনো তার স্বর অস্পষ্ট হয়ে এলে অনেক দূরে এবড়োখেবড়ো মাঠে গোরুর গাড়ি চলার রেশ আসে। আরেকজন কিশোরীকে জড়িয়ে ধরে ১৬/১৭ বছরের ১টি মেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। লোকজন ঢুকলে তার ফোঁপানি মৃদু হয়ে আসে। মাদুরের প্রান্তে ১ বছরের ১শিশু অঘোরে ঘুমায়। তার পরনের জাঙ্গিয়া পেচ্ছাবে ভিজে গেছে। শিশুর হাতের মুঠোয় ধরে রাখা ১টি চাবি। তার মুখের কাছে দুটো মাছি ওড়ে। শিশুটির পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে হলুদ, সাদা ও খয়েরি ছোপ-লাগা বিবর্ণ সবুজ পর্দা।

দারোগার নেতৃত্বে সমবেত জনতা পর্দা অতিক্রম করে। এটাই ফাইনাল জায়গা, এরপর নিরেট দেওয়াল। গুলিবিদ্ধ নিহত যুবক ঠিক এখানেই অবস্থান করে। ওসমানের শরীরের রক্তপ্রবাহ তার করোটির ছাদে উদ্বন্ধন তোলে। তার চোখের ঘন খয়েরি রঙের মণি ও ভেতরকার রেটিনাসমূহ এখন খুব তৎপর। এমনি জিনিসপত্র দ্যাখার জন্যে চোখের এই বাড়াবাড়ি রকম তৎপরতার দরকার হয় না। একনিষ্ঠ মনোযোগী হলে ওসমান দ্যাখে যে,

ছাদের ঠিক নিচেই গুলিবিদ্ধ ১টি যুবক দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা। যুবক অল্পবয়েসী, শরীরের চামড়া কাঁচা ও টাটকা। ·৩০৩ রাইফেলের একটি গুলি তার বুককে গেঁথে রেখেছে দেওয়ালের সঙ্গে। মাথাটা বাঁ দিকে ঝুলছে। বুকের নিচে তার দীর্ঘ শরীর রেলিঙে মেলে দেওয়া শাড়ির মতো আস্তে আস্তে কাঁপে। শীতেও কাঁপতে পারে, বাতাসেও কাঁপতে পারে। যুবকের মুখ হাঁ করা, মনে হয় প্রচণ্ড ১টি চিৎকার সেখানে জমে রয়েছে; বলা যায় না, যে কোনো-সময় এই পুরনো দালান ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। কোটর থেকে ছিটকে-পড়া কালো মণিজোড়া বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে রয়েছে, তারা যেন গোগ্রাসে সব দেখছে! তার কালো ২টো হাত ডানদিকে ও বামদিকে শক্ত ১জোড়া রডের মতো ঝোলানো। সেই ২ হাতের প্রতিটির সঙ্গে গুলি দিয়ে গাঁথা আরো ২জন যুবক। যুবক ২জন যমজ, ২জনেই অল্পবয়েসী, ২জনেরই চামড়া কাঁচা ও টাটকা। এদেরও একেক জোড়া চোখ বেরিয়ে এসেছে কোটরের ভেতর থেকে, বেরিয়ে-আসা মণিগুলো যেন পরিচিত ও অপরিচিত যাবতীয় দৃশ্য দ্যাখার জন্য অস্থির। ২জনেরই হাঁ করা মুখে সুপ্ত চিৎকার যে কোনো সময় বেরিয়ে ছাদ ফাটিয়ে ফেলতে পারে। তাদের ২জনের লোহার রডের মতো ২জোড়া হাত নিচের দিকে বাড়ানো। আবার দ্যাখো, রডের মতো সেই ২জোড়া হাতের সঙ্গে ·৩০৩ রাইফেলের গুলি গাঁথা আরো ৪ জন যুবকের লাশ। কে বলবে এরা আলাদা লোক? অবিকল একরকম দেখতে ৪ জন যুবকের কোমর থেকে নিচের দিক শীতে কি বাতাসে একটু একটু কাঁপে। গোগ্রাসে সব কিছু দেখে নেওয়ার জন্য কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ৪ জনের ৪জোড়া চোখের ৮টা মণি। একই রকম দেখতে ৪টে মুখে স্থগিত রয়েছে ৪টে দারুণ চিৎকার। এই ৪ জন আর আগের ৩ জন—মোট ৭ জনের চিৎকারে ঘরবাড়ি দালানকোঠা রাস্তাঘাট ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে না? এখানেই শেষ নয়। এই শেষ ৪ জনের লোহার রডের মতো হাতে গাঁথা রয়েছে গুলিবিদ্ধ আরো ৮ জনের মৃতদেহ। ঘরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় এরা মেঝে ফুঁড়ে নিচে নেমেছে। নিচে-নেমে-যাওয়া গুলিবিদ্ধ মানুষের দীর্ঘ সিঁড়ির শেষ দেখবে বলে নিচের দিকে তাকালে ওসমানের চোখে পড়ে সাদা ও খয়েরি চুন-সুরকির মেঝেতে কালচে-নীল কালিতে ছড়ানো মানচিত্র, ছোপ ছোপ কালো দাগ, দেশলাইয়ের পোড়াকাঠি, দাঁত দিয়ে কামড়ানো পেন্সিলের টুকরা এবং ১ পাটি স্যান্ডেল ও ১ পাটি জুতো। বুলেট-সাঁটা মৃতদেহের সিঁড়ি দ্যাখার ভয় ও উদ্বেগ এক মুহূর্তে উবে যাওয়ায় ওসমানের শরীর একেবারে এলিয়ে পড়তে চায়। তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছা করে। ভাবে, যাই নিজের ঘরে গিয়ে আধ ঘণ্টা একটু শুয়ে থাকি। কিন্তু ঘর ভরা মানুষ। এদের এড়িয়ে ঘরে ফিরে যাওয়ার জো নাই; না, ফিরে কাজ নাই। সকাল বেলার দৈনন্দিন এ্যাসিডিটি বা বুলেট-বেঁধা মানুষ দ্যাখার জন্যে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া যে-কোনো কারণে তার পেটের বাঁদিকটা ব্যথায় চিনচিন করে ওঠে। ব্যথায় একটুখানি নুয়ে পড়লে চোখে পড়ে সামনের তক্তপোষে ঢেউ খেলানো উঁচু-নিচু চাদর। তক্তপোষের চারদিকে সবাই দাঁড়াচ্ছে। একটু নেতৃস্থানীয়েরা দাঁড়ায় শিয়রের দিকে। এই রকম সবাই নিজ নিজ পজিশন ঠিক করছে, এমন সময় ঘরে ঢোকে আলাউদ্দিন। ৩০-এর ওপর বয়স, লোকটাকে ওসমান ভালো করে চেনে, বাড়িওয়ালা রহমতউল্লার ভাগ্নে সে, একবার ওসমানের কাছে এসেছিলো মামার হয়ে বাড়ি ভাড়া নিতে। এরপর এসেছে 'মিথ্যা আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের সহায়তাকারী নাগরিক কমিটি'র চাঁদা নিতে। আলাউদ্দিনের পেছনে ঢুকলো হাড্ডি খিজির। আলাউদ্দিনের কয়েকটি রিকশা

ও ২টি স্কুটারের দ্যাখাশোনা করার ভার খিজিরের ওপরে। এই লোকটি খুব লম্বা, তবে তার নামের আগে উপাধিটি অর্জন করেছে তার অস্থিসর্বস্ব দেহের জন্য। তার হাতে সবসময় স্ক্রু ড্রাইভার ও প্লায়ার থাকে। কিন্তু এখন ১ হাতে আগরবাতি ও অন্য হাতে ১টি ঠোঙা। সবাইকে ওভারটেক করে খিজির সামনে আসে এবং তক্তপোষের ৪দিকে এ-ফাঁকে ও-ফোকরে কয়েকটি করে আগরবাতির কাঠি গুঁজে দেয়। 'বেটা আগে জ্বালাইয়া লইবি তো!' বলে আলাউদ্দিন দেশলাই ঠুকে আগরবাতিগুলো ধরিয়ে দিলে হাল্কা ছাই রঙের ধোঁয়া ও গন্ধে ঘরের শূন্যতা এবং প্রাণী ও অপ্রাণিবাচক সমস্ত বস্তু মৃতের প্রতি নিবেদিতচিত্ত হয়। দারোগার ইঙ্গিতে রহমতউল্লা ঢেউ খেলানো চাদর তুলে ধরলো। চাদরের নিচে সাদা কাফনে জড়ানো মৃতদেহের মুখের কাপড়টিও আস্তে করে ওঠানো হয়।

২

শ্যামবর্ণের রোগা ভাঙা গালওয়ালা এই লোকটিকে ওসমান অনেকবার দেখেছে। কোথায়? এই বাড়ির সিঁড়িতে? তাই হবে। আরো অনেক জায়গায় এর সঙ্গে দ্যাখা হয়েছে। কোথায়? স্টেডিয়ামে? হতে পারে। গুলিস্তানের সামনে সিনেমার পোস্টার দেখতে দেখতে? হতে পারে। পল্টন ময়দানের মিটিঙে? হতে পারে। ভিক্টোরিয়া পার্কে? আর্মানিটোলা মাঠের ধারে? ঠাঁটারি বাজারের রাস্তার ধারে বসে শিককাবাব খেতে খেতে? হতে পারে। বলাকা সিনেমায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে করতে? হতে পারে। নবাবপুরে অনেক রাতে ঠেলাগাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হালিম খেতে খেতে? আমজাদিয়ায় পাশের টেবিলে তর্ক করতে করতে? হতে পারে। মুখটা তার অনেকদিনের চেনা। নাকের ২পাশে ব্রণের দাগ, ২টো দাগ বেশ গভীর, এগুলো কি বসন্তের? বন্ধ-করা চোখের পাতার প্রান্তে বড়ো ঘন কালো পল্লব। নাকের ডগায় ও পাতলা ঠোঁটে কালচে ছাপ। এলোমেলো চুলের এদিকে ছোটো কপালে ১টি ভাঁজও নাই। খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখলে বোঝা যায় এগুলো বেশ নরম। বয়স বোধ হয় ২০/২১-এর বেশি নয়, লোকটার পূর্ণ যৌবনকাল চলছিলো। তার চেয়ে ৫/৬ বছর ছোটো, একেবারে গড়পরতা চেহারা বলেই হয়তো এতো চেনা চেনা ঠেকে,—আর সে কিনা গুলিবিদ্ধ হয়ে মরার মর্যাদা পায়! ওসমান একটু কুঁকড়ে বাইরে তাকায়। বাইরে বৃষ্টি নাই, বৃষ্টিধোয়া আকাশে রোদ ঝকঝক করে। অথচ তার বাইরে যাবার উপায় নাই। দারোগা বলে, 'আপনেরা ঐ ঘরে একটু বসেন। আধঘণ্টার ভেতর আপনাদের ছেড়ে দেবো।'

ছেড়ে দেবে মানে? তারা কি তবে বন্দি? পাশের ঘরে এসে রিয়াজউদ্দিন হাতলভাঙা চেয়ারে বসে বাইরের দিকে তাকায়। অন্য চেয়ারটিতে চশমা পরা একজন বেঁটে লোক। তক্তপোষে ওসমান এবং আরেকজন। লাল স্ট্রাইপের হাল্কা গোলাপি শার্ট ও পাজামা পরা এই যুবক হলো পারভেজ, তিনতলার ডানদিকে থাকে, মুখের গঠন ও বাঙলা বলার সময়

যত্ন থেকে বোঝা যায় যে, তার মাতৃভাষা বাঙলা নয়। 'রিয়াজউদ্দিন সাহাব, এইতো পর্সু দুপুরবেলা আমি দেখলাম কে জুম্মার পর ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে ঘোড়ার গাড়িতেই স্ট্রাইকের এ্যানাউন্সমেন্ট চলছে আর তালেব বহুত গওর করে শুনছে। আমাকে দেখে বললো কে, পারভেজ ভাই, মওলানা ভাসানী স্ট্রাইক কল করেছে, কাল কি আর অফিস উফিস চলবে?'

'কি যে শুরু হইলো, ডেলি ডেলি হরতাল, ডেলি ডেলি ইস্ট্রাইক!' রিয়াজউদ্দিনের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য শেষ না হতেই পারভেজ বলে, 'কালকেই তো, আমি দোকানে যাচ্ছি, দেখি আলি নেওয়াজের সেলুনে বসে তালেব ফিলিম ফেয়ার পড়ছে। তো বললো কি, আজ কৈ যান? আজ না স্ট্রাইক!'

'স্ট্রাইক তো সাকসেসফুল! কিছু দালাল বাদ দিলে কাল অফিস ব্যাকটি বন্ধই আছিলো।' আলাউদ্দিন এবার এঘরে এসে তক্তপোষে বসে রিয়াজউদ্দিনকে লক্ষ করে একটু খোঁটা দেয়, 'পাবলিকরে এইবার ঠেকা দেওয়া কাউরো কাম না।'

পারভেজ বলে, 'জী। রাত্রে আমার ভাই বললো কে নীলখেতে গুলি হয়েছে, আমার সিস্টারের হাজব্যান্ড এসে বললো, হাতিরপুলের পাওয়ার স্টেশনের এক এমপ্লয়ি তো ডেথ হয়ে গেল। আমি ইম্যাজিন করতে পারলাম না কে আমাদের তালেব—।' বাক্যের শেষদিকে তার গলা নোনা পানিতে ছলছল করে। তারপর প্রায় মিনিটখানেকের নীরবতা, পাশের কামরার দারোগা ও রহমতউল্লার নিচু স্বরের সংলাপে কিংবা মেয়েদের বিলাপে সেই নীরবতায় একটি টিলও পড়ে না। রিয়াজউদ্দিন হঠাৎ খসখসে গলায় ডাকে, 'আল্লা, আল্লাহু গনি!' তার ডাকার ভঙ্গি দেখে মনে হয় যে, সম্বোধিত আল্লা বোধ হয় বারান্দায় কি পাশের কামরায় তার হুকুমের জন্যে প্রতীক্ষা করছে, আরেকবার হাঁক দিলেই মুখের বিড়িটা কানে গুঁজে এই ঘরে ছুটে আসবে। কিন্তু এবার ঘরে ঢোকে হাড্ডি খিজির, লোকটা আস্তে কথা বলতে পারে না, 'কাল গুলিতে মনে লয় সাত আষ্টজনের কম মরে নাই!' তার এই কথায় সারা ঘর গমগম করে ওঠে। চশমাওয়ালা বেঁটে লোকটি বলে, 'মরে কারা? এই মিছিল কন, মিটিং কন, ব্রিটিশ আমল থেকেই তো দেখছি। মরে কারা?' সকলের দিকে সে প্রশ্নবোধক চোখে তাকায়, কিন্তু জবাবও দেয় সে নিজেই, 'ভালো নিরীহ মানুষগুলো মরে। কৈ কোনো লিডার তো কখনো গুলিতে মরে না! মরতে হয়—।'

'তালেব বেচারা খুব সিম্পল টাইপের ছিলো। আমি তো চার বছর থেকে দেখছি।'

'অরে আমি চিনি ঐ পোলায় তখন ন্যাংটা থাকে।' রিয়াজউদ্দিনের খসখসে গলা এবার আত্মবিশ্বাসে বেশ মসৃণ হয়েছে, 'ইসলামপুরে আমার কাটা কাপড়ের দোকান। আমার দোকানের লগেই গল্লি, পান্নুসর্দার লেন, ঐ গল্লির চাইরটা, না একটা দুইটা তিনটা বাড়ি পার হইলেই মতিহাজীর বাড়ি, ঐ বাড়ির দোতালায় অরা ভাড়া থাকতো! তালেবের বাপে আমার দোকানে কতো আইছে!' তালেব, এমন কি তার বাবাকেও চেনবার ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা পারভেজের চেয়ে পুরনো—এই তথ্যটি ঘোষণা করে রিয়াজউদ্দিন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেয়। চশমাওয়ালা বেঁটে নতুন ভাড়াটে, এখন পর্যন্ত কারো সঙ্গে তার তেমন আলাপও হয়নি। সুতরাং তালেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রচারের প্রতিযোগিতায় নামা তার পক্ষে অসম্ভব। লোকটি হরতাল ও মিছিল সম্বন্ধে তার মতামত নতুন করে ব্যাখ্যা করে, 'খালি হরতাল, খালি মিছিল। দোকানপাট বন্ধ, অফিস বন্ধ, দেশের ডেভেলপমেন্ট হবে কি করে?'

'বুঝলাম তো!' আলাউদ্দিন তক্তপোষে ভালো করে বসতে বসতে উত্তেজিত গলায় জবাব দেয়, স্ট্রাইক করা মানুষের সিভিল রাইট। কিন্তু স্ট্রাইক করলে গুলি কইরা মানুষ মারতে হইবো—এই জংলি এ্যাকশন কোন দ্যাশে দেখছেন?' গলা একটু নিচু করে বলে, 'এদের এ্যাকটিভিটি হইল একটাই, মানুষরে যেমনে পারো জুলুম করো!'

'কিন্তু পাবলিক রাউডি হয়ে উঠলে—।' চশমাওয়ালাকে প্রায় ধমক দিয়ে আলাউদ্দিন বলে ওঠে, 'কি বাজে কথা কন! দেখতাছেন না, আমাগো ব্যাকটিরে কেমুন কায়দা কইরা আটকাইয়া রাখলো! কতোক্ষণ? ইস্টুডেনরা ছাড়বো? গুলি কইরা মানুষ মারে, ইস্টুডেনরা আইয়া পড়বো না?'

'ক্যামনে আহে?' খিজিরের চড়া গলায় সবাই উসখুস করে, কিন্তু তার বাক্য অব্যাহত থাকে, 'ক্যামনে আইবো? ঘরের মইদ্যে পুলিস, রাস্তার উপরে পুলিস! বিচরাইয়া দ্যাহেন, ছাদের উপরে ভি হালার পুলিস? ইস্টুডেনে আইলে এই হালাগো ইস্ক্রু টাইট করতে পারতো!'

পারভেজ বলে, 'পুলিস যেখানে সেখানেই বহুত হুজ্জত!'

'আপনার আবার ডর কিয়ের? হালারা সইজ্য করবার পারে না খালি বাঙালিগো!' আলাউদ্দিনের এই অভিযোগে পারভেজ একটু জড়সড় হয়। ওসমানের রাগ হয় পুলিসের ওপর। তার ইচ্ছা করে, বারান্দা থেকে রাস্তার মানুষকে ডাক দেয়, 'গতকাল হরতালের দিন পুলিসের গুলিবর্ষণে নিহত তালেবের লাশ এখানে। সবাই আসুক। স্বৈরাচারী সরকারের গুলিতে নিহত শহীদ তালেবের— ।' বাসনাটি তার মনেই থেকে যায়। রহমতউল্লা এই ঘরে এসে খিজিরের ওপর চড় মারার ভঙ্গিতে হাত তোলে, 'খামোশ মাইরা থাক। তুই বেটা কি বোঝস?' হাড্ডি খিজির চুপ করে থাকে। সে অবশ্য বেশ লম্বা, একটি টুলে না দাঁড়ালে তার গালে চড় মারা বাড়িওয়ালার পক্ষে অসম্ভব। বাড়িওয়ালার চ্যাঁচামেচিতে ওসমানের অস্বস্তি ঠেকে। ইসলামিয়ায় এখন পায়া বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে, ওদিকে সেন্ট্রাল হোটেলের পায়াটা ভালো, এখন রওয়ানা হলে অবশ্য ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে পায়া আর না-ও থাকতে পারে। তা হোক, নিগারে পরোটা-কলেজি মেরে আমজাদিয়ায় গিয়ে চমৎকার আড্ডা জমাতে পারতো। গতকাল গুলি চলেছে; নবাবপুর, গুলিস্তান, স্টেডিয়াম আজ নিশ্চয়ই খুব সরগরম। রবিবারের সকালটা পুলিসের হাতে মাঠে মারা গেলো।

হঠাৎ করে ১৮/১৯ বছরের ২ জন যুবক এই ঘরে ঢোকে। এদের ১ জনের সঙ্গে ওসমানের আলাপ আছে। এর নাম শাহাদত হোসেন ঝন্টু। ইউনিভারসিটিতে ইকনমিক্স পড়ে। শাহাদত হোসেন ঝন্টু ও তার সঙ্গীর উত্তেজিত ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যে, ব্যাপারটাকে এরা সহজে ছাড়বে না। পুলিসকে এড়িয়ে কিংবা পুলিসকে রাজি করিয়ে এরা এখানে যখন এসে পড়েছে তখন শালার হেস্তনেস্ত একটা না করে আর যাচ্ছে না। ওসমান বেশ চাঙা বোধ করে, কিন্তু ঝামেলা একটা হলে তাকেও ফের জড়িয়ে পড়তে না হয়!

'তোমাগো আওনের টাইম হইলো অহন!' বলতে বলতে আলাউদ্দিন পাশের ঘরের দিকে আঙুল দ্যাখায়।

'বটতলায় মিটিঙ। মিটিঙ এখানে চলছে।' বলে শাহাদত হোসেন ঝন্টু ও তার সঙ্গী পর্দা তুলে ভেতরে চলে যায়। ওসমান তাদের কারো নজরে পড়ে না। তাদের জন্য তৈরি মুখের বিশেষ ভঙ্গি শিথিল করে ওসমান পরবর্তী ঘটনার প্রতীক্ষা করে। ভয়ে বা ভক্তিতে বা এমনি

নিয়ম পালনের খাতিরে রিয়াজউদ্দিন জোরে জোরে বলে, 'আল্লা! আল্লাহু গনি!' এই ধ্বনিসমষ্টি দরজা দিয়ে বাইরে উধাও হয়। ঘরের সবাই এখন তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। রিয়াজউদ্দিনের ভাঙা ভাঙা মোটা গলার আওয়াজ বারান্দায় দাঁড়ানো লোকজন, পুলিস ও পার্টিশনের ক্যানভাসে আঁকা নদী, তালগাছ, সূর্য ও সাহসী পাখিদের কাঁপিয়ে ধাবিত হয় শূন্যতার দিকে। সেখানে রোদ ঝকঝক করে। পাশের ঘরে ছাত্র-নেতাদের একজন বলছে, 'বায়তুল মোকাররমে জানাজার পর দাফন হবে।'

জবাবে রহমতউল্লার স্বর ঠাণ্ডা ও শান্ত, 'আরে বাবারা, চ্যাতেন ক্যান? গোসল টোসল কমপিলিট। গোরস্থানে খবর গেছে, কবর খোঁড়ার কাম চলতাছে। জানাজা হইবো ওহানেই। এর মইদ্যে পলিটিক্স ঢোকাইতে চান ক্যান?'

'পলিটিক্সের কি দেখলেন? আমরা অলরেডি এ্যানাউন্স করে দিয়েছি, জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররমে জানাজা, জানাজার পর আজিমপুর গোরস্থানে দাফন হবে।' শাহাদতের এসব কথা বেশ গুছিয়ে-বলা। দারোগার স্বরও বেশ শান্ত, 'ছেলেমানুষি করছেন কেন? আপনারা এডুকেটেড লোক, হাইয়েস্ট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের ছাত্র। জানেন না মুর্দাকে ইজ্জত করতে হয়? মুর্দার সামনে হৈচৈ করলে গোর আজাবের চেয়েও মুর্দা বেশি তকলিফ পায়।'

এ ঘরে আলাউদ্দিন উত্তেজনায় কাঁপে, 'দারোগা সায়েব অহন দেহি মৌলবি ভি হইবার চায়! কেমুন ফতোয়া দিতাছে দ্যাহেন!'

ও ঘরে বাড়িওয়ালা হঠাৎ বলে, 'চলেন, এই ঘর ছাইড়া যাই। বেচারা পোলাটারে এট্টু আরামে থাকতে দেন।' মৃত তালেবের স্বস্তির জন্য সবাইকে নিয়ে সে ঐ ঘর ছেড়ে চলে আসে।

শাহাদত হোসেন ঝন্টু এবার ওসমানকে দেখেছে। কিন্তু দারোগার সঙ্গে কথা বলতেই সে ব্যস্ত। দারোগা কিছুতেই ওদের হাতে লাশ দেবে না, 'ডেডবডি দিতে পারবো না ভাই। অর্ডার না থাকলে আমরা কি করবো?' এদিক ওদিক তাকিয়ে সে বাড়িওয়ালার দিকে তাকায়, 'মুর্দার গার্জেনের রিকোয়েস্টে আমরা হেল্প করতে এসেছি।'

এবার বাড়িওয়ালার গলা হঠাৎ একটু নিচে নামে, 'আমার ভাইস্তার লাশ আমরা জোহরের আগেই দাফন করতে চাই।'

'আপনি কি ওর চাচা?' শাহাদত এবার রহমতউল্লাকে বোঝাবার উদ্যোগ নেয়, 'তাহলে আপনি বুঝবেন। বায়তুল মোকাররম নামাজের পর কতো লোকে তার জানাজা পড়বে। শহীদের লাশ দাফন হবে কাউকে না জানিয়ে এটা কি ঠিক হবে?'

'আমাগো উপরে আর জুলুম কইরেন না!' রহমতউল্লার চোখজোড়া ছল ছল করে, 'বহুত গজব পড়তাছে, দ্যাখেন না কই আছে পোলার বাপ, আর পোলায় মরে গুলি খাইয়া!' নোনাপানিতে তার গলা ভেজে, 'অর বাপের বয়স হইতাছে। তামামটা জিন্দেগি কাটলো পরের দোকানে গোলামি কইরা, টাঙাইল থাইকা আইয়া দেখবো—!' এবার সে একেবারে কেঁদেই ফেললো। রহমতউল্লার কান্না ভেতর-ঘরের মেয়েদের চাপাকান্নায় ইন্ধন জোগায়, তারা জোরে জোরে কাঁদার সাহস পায়। তালেবের বাবা এসে কি দৃশ্য দেখবে ভেবে ওসমানের কান্না পাওয়ার দশা ঘটে। তবে তার চোখে নোনা ভাপ ওঠার আগেই আলাউদ্দিন ঠাণ্ডা ও নোনামুক্ত স্বরে বলে, 'এর বাপে তো আউজকাই আইয়া পড়বো। বাপেরে একবার দ্যাখাইবেন না?'

'কি একটা কথা যে কইলা?' রহমতউল্লা ভাগ্নের ওপর বিরক্ত হয়েছে, এর মধ্যেই তার গলা থেকে বিলাপ লুপ্ত হয়ে গেছে, 'তার বাপে গেছে টাঙাইল। মাহাজনের লাইগা কাপড় কিনবো;— বাজিতপুর, বল্লা, কালিহাতি, পোড়াবাড়ি,—চাইরটা পাঁচটা হাট সারবো, কাপড় লইবো, কাপড়ের গাইট করবো, গাইট আবার তুলবো টেরাকের উপর। আরো দুই চাইর দিনের কম না। লাশ পইড়া থাকবো?'

শাহাদতের সঙ্গী ছেলেটি প্রায় মিনতি করে, 'আমরা দুদিন তিনদিন চাই না। এই ঘণ্টা দুই আড়াইয়ের মধ্যে জোহারের নামাজ, নামাজের পর জানাজা। কতোক্ষণ লাগবে? এতোগুলো লোক অপেক্ষা করবে।'

বাড়িওয়ালার গলা ফের চড়ে যায়, তার হাত এখন বেশ শক্ত, 'তার বাপে থাকলে আপনেরা কইয়া দেখতে পারতেন। আর মায়ে কি কইবো, কন? আমি কি আর লাশ লইয়া মিছিল করবার দিবার পারি?'

ওসমান গনি তখন ভেতরে তাকাবার চেষ্টা করে। রঞ্জুকে ডেকে একবার বললে হতো না? তার ভাইকে যারা হত্যা করে তাকে দাফন করার ভারও তাদেরই হাতে থাকবে? কিন্তু রঞ্জু কোথায়? ভেতরকার কান্নাকাটিতে রঞ্জুর গলা আলাদা করে ঠাহর করা মুশকিল। আহা, ভাইয়ের জন্য কেঁদে কেঁদে বেচারার চোখজোড়া একেবারে লাল হয়ে গেছে! ওর লাল চোখ এবং নীলচে ঠোঁট নিয়ে রঞ্জু কি একবার আসতে পারে না? এলিফ্যান্ট রোড তো এখান থেকে মেলা দূরে! সেই রাস্তা ধরে গেলে হাতিরপুল পাওয়ার স্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভাইয়ের কথা ভেবে রঞ্জুর মনটা খারাপ হয়ে যাবে। ১০/১১ বছর আগে ওসমান কিছুদিন সেন্ট্রাল রোডে ছিলো। পুরনো এলিফ্যান্ট রোড তখন ফাঁকা ফাঁকা, দুইদিকে কোথাও কোথাও বাড়িঘর তৈরি সবেমাত্র শুরু হয়েছে। রাস্তার ২দিকে বেশির ভাগই নিচু জায়গা, ধানক্ষেত, মাঝে মাঝে পানিতে মুখ পর্যন্ত ডুবিয়ে শুয়ে থাকতো কালো কালো মোষ। সন্ধ্যাবেলা নিউমার্কেট থেকে একা একা ঘরে ফেরার সময় ওসমান দেখতো পাওয়ার স্টেশনের চিমনির মাথায় ১টি লাল আলো কোনো গ্রহের মতো স্থির হয়ে জ্বলছে। ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে রঞ্জুর খুব মন খারাপ করতো। ওখানে চাকরি করতো ওর ভাই তালেব, কথা নাই বার্তা নাই ওখান থেকে বেরিয়ে মিছিলে ঢোকার অপরাধে নীলক্ষেতে তাকে গুলি করা হয়েছে। রঞ্জুর এই মন-খারাপে ওসমানের সারা শরীর ও মাথা শিরশির করে ওঠে। নিহত যুবকের লাশ নিয়ে ২ পক্ষের তর্ক তার কানের পাশ দিয়ে আলোর মতো গড়িয়ে যায়, সে কিছুই শুনতে পারে না।

শাহাদত হোসেন ঝন্টু তাকে জিগ্যেস করে, 'আপনি এখানে থাকেন?' ওসমান তখন ১০/১১ বছর আগে এলিফ্যান্ট রোড ধরে ভ্রাতৃশোকগ্রস্ত রঞ্জুর চলাচল দ্যাখ্যা থেকে ফিরে আসে, বলে, 'জ্বি।' শাহাদত ফের বলে, 'তিনটায় বায়তুল মোকাররমে প্রতিবাদ সভা, আসবেন। এখন যাই।' 'দেখি।' 'গোরস্থানে আসছি। একটু পরে আসবো।'

'তোমরা যাও, জুরাইনে আমি খবর পাঠাইতাছি, গোরস্থানেই জানাজা হইবো, পোস্তগোলা, ফরিদাবাদ, মিলব্যারাক থাইকা মানুষ যাইবো।' আলাউদ্দিনের এই সব কথা দারোগা বা রহমতউল্লার কানে যায় না, সে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছে। কিন্তু শাহাদতও ভালো করে বুঝলো বলে মনে হয় না। সঙ্গীকে নিয়ে শাহাদত বেরিয়ে গেলে দারোগা বলে, 'এবার লাশ বের করার ব্যবস্থা করতে হয়।' রহমতউল্লার পেছনে পেছনে আলাউদ্দিন ও হাড়ি

খিজির ভেতরে চলে যায়। দারোগা এবার সিগ্রেট ধরিয়ে বারান্দা ও ঘরের মাঝখানের চৌকাঠে ১টা পা রেখে বলে, 'মুর্দার সঙ্গে আপনাদের যাওয়ার দরকার নেই। আপনারা অনেক কষ্ট করলেন, এবার বাড়ি গিয়ে আরাম করেন।' ছাত্র ২টোকে সামলাতে পারার সাফল্যে দারোগা সিগ্রেটে কষে টান দেয়, ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'সারাটা রাত ঘুমাতে পারিনি। হাসপাতালে এই লাশ গেছে আসরের নামাজের আগে। রাত যখন বারোটা তখনও পোস্ট মর্টেম কমপ্লিট হয়নি। কেন? ডাক্তার নেই। ডোমও পেলেন ডাক্তারও পেলেন তো কারেন্ট নেই। এদিকে ডিআইজি সাহেব বারবার বলে পাঠাচ্ছেন ভোর হবার আগে হাসপাতাল থেকে ডেডবডি বের করতে না পারলে ছাত্ররা একটা চান্স পেয়ে যাবে।' রিয়াজউদ্দিন তার কিস্তিটুপিওয়ালা মাথা নাড়িয়ে দারোগাকে সমর্থন করে। দারোগার কথা শেষ হলেও তার মাথা নাড়ানো আর থামে না। তারপর সে শুরু করে জিভ নাড়াতে, 'কাম পাইবেন কৈ? কৈ পাইবেন? ডাক্তারগুলির কথা কি কই? কয়দিন আগে ডাক্তাররা ইস্ট্রাইক করলো না? শুনছেন? —কুনো দ্যাশের ডাক্তারে ইস্ট্রাইক করছে শুনছেন?'

'এদের কথা আর বলবেন না।' দারোগা তার অসমাপ্ত বক্তৃতা সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেয়, 'আমার এসপি সাহেব বলে, হাসপাতাল থেকে লাশ সরান ! লাশ সরান ! সকাল হলে এই ডাক্তাররাই ছাত্রদের ইনফর্ম করবে।' চশমাওয়ালা বেঁটেও তার সায় জানায়, 'এরা লাশ নিয়ে পলিটিক্স করে, মুর্দার ইজ্জত করতে জানে না, এদের দিয়ে কি হবে, বলেন!'

দারোগা হয়তো আরো কথা বলতো, কিন্তু ভেতর থেকে কান্নার প্রবল রকম একটি দমক ওঠায় সবইকে চুপ করতে হয়।

লাশের খাটিয়া কাঁধে তুলে নেয় রহমতউল্লা, রিয়াজউদ্দিন, আলাউদ্দিন ও ওসমান।

'সইরা দাঁড়ান, সইরা দাঁড়ান'!' বাড়িওয়ালার এই নির্দেশে সমবেত কান্নার ধ্বনি সমগ্র বাড়ি উপচে বাইরে গড়ায়।

কৈ যাও? ও আব্বাজান, বাবা আমার! বাবারে লইয়া আপনেরা কৈ মেলা করলেন?' নিহত যুবকের মায়ের বিলাপে খাটিয়া ভারি হয়ে উঠেছে। হাড্ডি খিজির সামনে যেতে যেতে 'আস্তে', 'ডাইনে', 'এট্টু বামে যান' প্রভৃতি নির্দেশ দিচ্ছে। ওসমানের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে পারভেজ। ওর খুব ইচ্ছা তালেবের শরীরটা একবার একটু বহন করে। আলাউদ্দিনের দিকে সে আড়চোখে দেখছে। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলতে বলতে রহমতউল্লা খিজিরের কাঁধে খাটিয়ার ১টি অংশ চড়িয়ে দেয়। খাটিয়ার পেছনে ২জন পুলিস। ১জন পুলিস ওসমানের কাছ থেকে খাটিয়ার ১টি অংশ নিজের ঘাড়ে নেয়, আর ১জন পুলিস নেয় আলাউদ্দিনের ঘাড় থেকে। ওসমান এবার সবচেয়ে পেছনে। না, তারও পেছনে আসছে রঞ্জু, রঞ্জুর ঘাড়ে হাত দিয়ে রেখেছে পারভেজ। সিঁড়ির অন্ধকার মোড়ে এলে পারভেজকে নজরে পড়ে না। রঞ্জু নিজের দুই হাত কচলাচ্ছে। কেন? ছাইগাদায় লেবুগাছের সামনে রঞ্জু কি লেবু পাতা চটকাচ্ছে? খাটিয়া নিচে নামে। ওসমান ভয়ানক রকম বিচলিত হয়ে ভোররাতের স্বপ্ন ও সকালবেলার দৃশ্যের অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে। বলা যায় না, সে হয়তো এই অবস্থায় নিচেও পড়ে যেতে পারতো কিন্তু তার আগেই 'শহীদের রক্ত—বৃথা যেতে দেবো না।' —এই সমবেত ধ্বনি তাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেয়।

১৭/১৮ জন যুবক ও প্রায় ২৫/৩০ জন পিচ্চি দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। সামনে শাহাদাত হোসেন ঝন্টুর সেই সঙ্গী। দারোগার চোখে কি চালাকি খেলে, খাটিয়া চটপট উঠে পড়ে

রাস্তায় দাঁড়ানো পুলিসের ভ্যানে। ভ্যানে এক এক করে ওঠে রহমতউল্লা, রিয়াজউদ্দিন ও রঞ্জু। আলাউদ্দিন যুবকদের সঙ্গে কি বলছিলো, দারোগা তার পিঠে বেশ সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে হাত রেখে বলে, 'আপনে আমার সঙ্গে আসেন, ওখানে চাপাচাপি হবে।' তাকে প্রায় ঠেলে দিয়ে জিপে ওঠানো হলো। পারভেজ নাক ঝাড়ার জন্য উবু হয়েছিলো। ওসমান ভাবছিলো উঠবো কি উঠবো না, উঠলে কোন গাড়িতে এবং কোন দিক দিয়ে উঠবো। —এরই মধ্যে 'শহীদের রক্ত—বৃথা যেতে দেবো না', 'আইয়ুব শাহী জুলুম শাহী—ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক'—এইসব শ্লোগানের ধাক্কায় পুলিসের ভ্যান ও পুলিসের জিপ বাঁদিকে মোড় নিয়ে হেমেন্দ্র দাস রোড ধরে দ্রুতবেগে চলে যায় লোহার পুলের দিকে। চলন্ত ভ্যানে টাল সামলাতে সামলাতে উঠে পড়েছে হাড্ডি খিজির।

৩

সুভাষ বোস এ্যাভেন্যু ও হেমেন্দ্র দাস রোডে দোকানপাট সব বন্ধ। উল্টোদিকের মসজিদের বারান্দায় মক্তবে ছেলেমেয়ে নাই। একজন বুড়োমানুষ বারান্দায় একা একা রাকাতের পর রাকাত নামাজ পড়ে চলেছে। রাস্তা যানবাহনহীন, লোক চলাচল কিন্তু কম নয়। ছাদের সামনের দিককার উঁচু দেওয়ালের ওপার এইসব দেখতে দেখতে ওসমানের একটু উঁচু-করে-রাখা পায়ের পাতা ধরে আসে। ঠাকুর দাস লেনের মাথায় তোতামিয়া ডেকোরেটার্সের গা ঘেঁষে লোহার পোস্টে অজস্র ইলেকট্রিক তারের এলোমেলো ও জটিল সমাহার। ঐখানে একবার পড়ে গেলে তারগুলো সব জ্যান্ত হয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরবে যে, জীবনে আর বেরিয়ে আসা যাবে না। ওসমানের সারা শরীর শিরশির করে। নাঃ! তাড়াতাড়ি অফিস রওয়ানা হওয়া দরকার।

সিঁড়িতে রঞ্জুর সঙ্গে দ্যাখা। সঙ্গে ওর বোন, রঞ্জুর চেহারার সঙ্গে খুব মিল। তবে মেয়েটার গায়ের রং আরেকটু চাপা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের হলে ভালো হতো। সপ্তাহ দেড়েক আগে একদিন সন্ধ্যায় ওদের ঘরে মেয়েটিকে ওসমান ভালো করে দেখেছে। তখন কিন্তু রঙটঙ নিয়ে এসব কথা মনে হয়নি। সেদিন তালেবের কুলখানি হবে শুনে ওসমান আগেভাগেই বেরিয়ে যাচ্ছিলো। তালেবের বাবা ওপরের বারান্দা থেকে ডাকতে ডাকতে একেবারে রাস্তায় এসে ধরলো। 'আমার একটু দরকার ছিলো'—ওসমানের মুখ থেকে এই কথা বেরোতে না বেরোতে মকবুল হোসেন তার হাত ধরে ফেলে, 'আমার এ্যাবসেন্সে আপনারা এত করলেন, আজ একটু কষ্ট করেন। বাদ আসর মিলাদ, মিলাদের পরে এফতার দিয়া বিদায়। কোরান খতম করাইতেছি, মৌলবিগো লগে আপনেরা কয়জন থাকবেন। সামান্য আয়োজন করছি।'

এফতারের পর বেশির ভাগ লোক চলে গেলে মৌলবিদের সঙ্গে কয়েকজনের জন্য খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে ওসমানও চান্স পায়। এদিন রঞ্জুর মা ছাড়া ওদের আর সবাইকে তার দ্যাখার সুযোগ ঘটে।

রঞ্জুর সবচেয়ে বড়ো বোনটি বেশ ফর্সা এবং বোবা। তার বাচাল স্বামীর সঙ্গে আগের দিন সে নরসিংদি থেকে এসেছে। তবে তার স্বামীটা সেদিন সবাইকে কম সার্ভিস দেয়নি। তার অবিরাম কথাবার্তার জন্যেই নিহত তালেবের রুহের মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে আয়োজিত মিলাদ সেদিন ভার হয়ে কারো বুকে চেপে বসেনি। মেঝেতে শতরঞ্চির ওপর সবুজ চাদর পেতে খাওয়ার সময় ওরা ২ বোনই ভেতর থেকে ভাতের গামলা, গোশতের বাটি, বেগুন ভাজার হাফ-প্লেট, গ্লাস, মগ—এগিয়ে দিচ্ছিল ঘরের দরজা পর্যন্ত। বোবা মেয়েটি কিন্তু কাঁদছিলো না, বড়ো বড়ো একটু কটা চোখ কুঁচকে একেকজনের দিকে সে এমনভাবে তাকাচ্ছিলো যে, দ্বিতীয়বার তার দিকে চোখ ফেরানো খুব কঠিন। তার স্বামী নরসিংদি ইপিআরটিসি বাস টার্মিনালের ফোরম্যান। তালেব যেদিন মারা যায় সেদিনই, বলতে গেলে প্রায় একই সময় বেতকার কাছে গ্রামের লোকজন ১টি স্টেটবাস আটকায়। হরতালের দিন, স্টেটবাস চলতে দেওয়ার কোনো কারণও ছিলো না। লোকজন বাসের কাঁচ ভেঙে ফেলে, যন্ত্রপাতিও জখম করে। নরসিংদি ডিপো থেকে পরদিন এই ফোরম্যানকে পাঠানো হয়। যন্ত্রপাতি ঠিক করে বাস পাঠিয়ে ফোরম্যান বসে গেলো তাড়ি টানতে। খবর পেতে পেতে ২দিন কেটে যায়। ফোরম্যানের নাড়ি নক্ষত্রের খবর রাখে কে?— আলাউদ্দিন। নরসিংদির বাস ডিপোতে কি সব গোলমাল চলছে, আলাউদ্দিনের দলের কর্মীরা এই নিয়ে কালকেও ঢাকায় এসেছিলো। কাল বিকালবেলা ওসমান নিজেই ফোরম্যানকে সস্ত্রীক আসতে দেখেছে। মেয়েটা ওপরে উঠেই বারান্দায় বাড়িওয়ালাকে দেখতে পায় এবং তার চোখ তাক করে ছুঁড়ে মারে নিজের হাতের চুড়ি। মেয়েটার হাতের সই ততো সুবিধার নয়। সোনার চুড়ি রেলিঙে লেগে পড়ে গেলো রাস্তায়, নালার ধার ঘেঁষে। শ্যালক-শোকে মুহ্যমান ফোরম্যান কান্নাকাটিতে বিরতি দিয়ে চুড়ি কুড়াতে নিচে দৌড়ে গেলে বোবা মেয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে-থাকা মায়ের বুকে নিজের ফর্সা ও গোলগাল মুখ ঠেসে চেপে ধরে। তার পর ওসমান তাকে দ্যাখে রাত্রে ওদের ঘরে খেতে বসে। তখনও তার রাগ পড়েনি, সকলের ওপর সমানে চক্ষুবর্ষণ করে চলেছে।

রঞ্জুর এই কালো বোনটি বরং নিরাপদ। কুলখানির সন্ধ্যায় এর চাপা ঠোঁটে বেগুনি রঙই ছিলো প্রধান। রঞ্জুর সঙ্গে সেদিন ওর ঠোঁটের পার্থক্য বোঝাই যায়নি। মিলাদ ও কোরান খতমের পর আলাউদ্দিন পুলিসের গুলিবর্ষণের উত্তেজিত বর্ণনা দিচ্ছিলো, কয়েকটা প্লেট হাতে এই মেয়েটি তখন ঠিক দরজায় এসে পড়েছে, আলাউদ্দিনের কথা শোনার জন্যে থমকে দাঁড়ায়। ওসমান আড়চোখে তাকে দেখছিলো, ঘরের ঝুলন্ত ডিসি লাইনের ৪০ পাওয়ার বাল্বের ঘোলাটে আলোতে মেয়েটির ঠোঁটে বেগুনি রঙ গাঢ় হয়, আলাউদ্দিনের খসখসে গলায় হড়হড় করে কথা বলার তোড়ে মেয়েটির শ্যামবর্ণের গাল তিরতির করে কাঁপছিলো। এমন হতে পারে যে, তার মুখের ভেতর কোনো বাক্য তৈরি হচ্ছিলো। কিন্তু সেই বাক্য প্রকাশের আগেই মকবুল হোসেন ডাকে, 'রানু প্লেট দে।'

আজকে রানুর মুখ কিন্তু মোটেই থমথমে নয়। রঞ্জু জিগ্যেস করে, 'স্ট্রাইকের দিন অফিস যান?' ওসমান জবাব দেয়, 'দেখি, বাইরের অবস্থাটা দেখি। তোমরা কোথায় যাচ্ছো?'

'এইতো বানিয়ানগর। এর বন্ধুর বিয়া।'

'বিয়া না।' রানু সংশোধন করে, 'গায়ে হলুদ। খালি দ্যাখা কইরা চইলা আসবো।'

রাস্তায় একটা সাইকেল পর্যন্ত নাই। ২দিকের ভাঙাচোরা ও অনিয়মিত ফুটপাথে লক্ষীবাজারের নিয়মিত জনপ্রবাহটি বন্ধ, পথচারীরা হাঁটছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে। কায়েদে আজম কলেজের প্রবেশপথের গলির মুখে চওড়া জায়গায় ইট দিয়ে উইকেট সাজিয়ে পাড়ার ছোটো ছেলেরা টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছে। খেলায় সবারই বেশ মনোযোগ, কিন্তু এদিক ওদিক কোনো রিকশা কি সাইকেলের খবর পেলেই হলো,—সঙ্গে সঙ্গে অবধারিত বলের সামনে থেকে ব্যাট সরিয়ে দৌড়ে গিয়ে চাকার হাওয়া ছেড়ে দিচ্ছে। এদের খবর দেওয়ার দায়িত্ব রাস্তার বেওয়ারিশ পিচ্চিদের। পিচ্চিরা এমনি ঘুরে বেড়ায়, কোথাও ৭/৮ জনের এক একটি গ্রুপ, কোথাও ৫/৬ জন ছাত্রের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের মিছিল। মিছিলে শ্লোগান দিচ্ছে, 'আইয়ুব শাহী, মোনেম শাহী'—'ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক'; 'আইয়ুব মোনেম ভাই ভাই'—'এক দড়িতে ফাঁসি চাই'; 'জ্বালো জ্বালো'—'আগুন জ্বালো'। আবার মাঝে মাঝে শ্লোগান ভুলভাল হয়ে যায়। যেমন, 'আইয়ুব শাহী, জালেমশাহী'—এর জবাবে বলছে, 'বৃথা যেতে দেবো না।' কিংবা 'শহীদের রক্ত'—এর জবাবে বলছে, 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো।'

আশেপাশে কেউ দোকান খুললে এদের এককেটি ছোটো ছোটো দল দৌড়ে এসে খবর দিচ্ছে, 'লম্বু সালামের জিলাপির দুকান আছে না, অর বগলে সাইকেলের পাটসের দুকান আছে না, আছে না, ঐ বল্টু হালায় দুকান খুলছে।'

আরেকজন বলে 'দুকান খুলছে!'

'আমরা দুকান বন্ধ করবার কইছি তো, বন্ধ করবার কইছি তো, বন্ধ করবার—।' উত্তেজনায় বাড়ি-বাড়ি-কাজ-করা মাতারির পোলা বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারে না। আরেক পিচ্চি তাকে উদ্ধার করে, 'ঐ বল্টু হালায় কয়, কিয়ের ইস্টাইক? ইস্টাইকের মায়েরে চুদি!' শুনে বয়সে ও বাপেদের-পরিচয়ে-বড়ো ছেলেরা ব্যাট হাতে ছুটে যাচ্ছে দোকান বন্ধ করতে। এর মধ্যে গোবিন্দ দত্ত লেনের ভেতর থেকে ১টি খোলা জিপ এসে পড়ে। ঘন ঘাস রঙের হেলমেটের সঙ্গে ফিট-করা পাঞ্জাবি, বালুচ ও বাঙালি সৈন্যদের কয়েকজন জিপের রেলিঙে মেশিনগান রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রিগারে আঙুল বসানো, টিপলে এক মুহূর্তে কালো নোঙরা এই পিচ্চিদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে। তবে পিচ্চিরা ও ক্রিকেট খেলোয়াড়রা নিমেষে হাওয়া হয়ে যায় নন্দলাল দত্ত লেনের ভেতর। আরো ভেতরে পাঁচভাইঘাট লেন। এই ২ গলির মোহনায় খেলার জন্য চওড়া জায়গা, আবার সেখান থেকে নারিন্দার পুল পর্যন্ত খানিকটা জায়গার ওপর নজর রাখাও চলবে।

ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশে পৌঁছে ওসমান দ্যাখে পার্কের রেলিঙের বাইরে ফুটপাথে ও ভেতরে ইপিআরের জওয়ানেরা। পার্কের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো লরি থেকে লাফিয়ে নামছে হেলমেটসাঁটা লোকজন। নামতে নামতেই পজিশন ঠিক করে নিচ্ছে। কী হেভি প্রিপারেশন! শালাদের প্রত্যেকটার মুখে ১টা লাথি মারার জন্য ওসমানের পাজোড়া নিসপিস করে। তার পায়ের কদম সোজা হয় না। টলমল করে। কিন্তু ১০০ বছরেরও আগে বিদ্রোহী সিপাহিদের ফাঁসি দেওয়ার জন্যে নবাব আবদুল গনিকে দিয়ে পোঁতানো পামগাছ বা সেইসব পামগাছের বাচ্চারা মানুষের শ্লোগানে ভালোভাবে ঘুমাতে পারেনি বলে আস্তে আস্তে হাই তোলে। ওসমানের

রাগ বা ইচ্ছা তাদের ধুলোপড়া পাতায় এতোটুকু চিড় ধরাতে পারে না। ডানদিকে মোড় নিয়ে একটু এগিয়ে আজাদ সিনেমার সামনে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ইপিআরের কয়েকটি হেলমেটধারীর ধাতব ও শীতল মুখের সঙ্গে ওসমানের চোখাচোখি হয়। তাড়াতাড়ি করে সে চোখ নামিয়ে নিল। কী ভয়ানক ঠাণ্ডা সব মুখ! এরা কী না করতে পারে! হিমের চোখ মুখ গাল ঠোঁট, এমন কি কান থেকেও রাগ ও ক্ষোভের সব চিহ্ন মুছে ফেলে নিবিষ্টচিত্তে সে হাঁটতে থাকে। তাড়াতাড়ি অফিস যাওয়া দরকার। স্ট্রাইক ছিলো বলে কালকেও যাওয়া হয়নি। এভাবে এক নাগাড়ে কতদিন চলবে? বসের সঙ্গে ওসমানের সম্পর্ক ভালোই। কিন্তু বসের বস লোকটি ল', অর্ডার ও ডিসিপ্লিনের ১জন নিষ্ঠাবান উপাসক। ওদিকে কারো সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হলেই ফিসফিস করে, 'পাঞ্জাবিরা একেবারে শেষ করে ফেললো। বাসটার্ড রেস, কারো জন্যে মিনিমাম কনসিডারেশন নেই।' কিন্তু বিশৃঙ্খলা সহ্য করার লোক তিনি নন, পলিটিশিয়ানদের কথায় নেচে লাভ কি? এরা পাওয়ারে ছিলো না? বাঙালি মিনিস্টারের কোটা কোনদিন খালি ছিলো? নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী, সোহরোওয়ার্দি,—এরা প্রাইম মিনিস্টার হয়নি?—রেজাল্ট?—এভরিবডি নোজ।' এরপর সিগ্রেটে গোটা দুয়েক টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে গভীর দীর্ঘশ্বাস এবং সমস্যার সমাধান ছাড়ে, 'উই নীড প্রপার প্রেস ইন দ্য পলিসি মেকিং। অফিসাররা ছাড়া এসব করবে কে? ঐসব ডেমাগগ পলিটিসিয়ান্স?' ওসমানের বস এইসব শুনে আসে তার বসের কাছে এবং নিজের কামরায় এসে ঝাড়ে ওসমানের কানে। ওসমানের বসটি এমনিতে খুব বাঙালিঅন্ত প্রাণ। মেয়েকে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ালেও ছায়ানটে রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখায়। আবার বাঙালি পলিটিসিয়ানদের ওপর লোকটি অতোটা চটা নয়, বরং তাদের সঙ্গে তার অনেক আগেকার পরিচয়ের প্রসঙ্গ সুযোগ পেলেই জানায়। তবে ল' এ্যান্ড অর্ডারভক্ত বসের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্যে অনুপস্থিত কর্মচারীদের নামে শো-কজ পাঠাতে পারে। যানবাহনশূন্য নবাবপুরের পথচারীদের অনেকেই অফিসে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এককেটি গাড়ি 'রেডক্রস' বা 'প্রেস'-এর জোরে এদিক ওদিক করছে। বাঁদিকে বংশালের রাস্তায় ছোটোখাটো ভিড়, মানসী সিনেমার সামনে ছাত্রদের কেউ বক্তৃতা করছে। রোজার মাস, লোকজন বড়ডো থুতু ফেলে। যানবাহন নাই বলে সমস্ত রাস্তা জুড়ে বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটার মতো থুতু ছড়ানো। আলু বাজারের মাথায় সিগ্রেটের ছেঁড়া প্যাকেট দিয়ে তৈরি তাস বাজি রেখে পিচ্চিরা ডাংগুলি খেলছে, ছোটে ছোটো মিছিল দেখলেই স্লোগান দিতে দিতে মিছিলে ভিড়ে যাচ্ছে। ডানদিকে বামাচরণ চক্রবর্তী রোডের মাথায় পানের দোকানটা একটু খোলা। বুড়ো পানওয়ালা পাতলা ঠোঁটজোড়া চেপে ধরে পানে চুন লাগায়, খয়ের লাগায়, একটু জরদা ঝাড়ে। রোজার মাস বলে সামনে ১টা চট ঝোলানো। রাস্তা জুড়ে থুতু দেখে ওসমানের একটু গা ঘিনঘিন করছিলো, ভাবলো, ঠাঁঠারি বাজারের পর্দা ঝোলানো কোনো রেস্টুরেন্টে এক কাপ চা মেরে বুড়োর হাতে মশলা-দেওয়া পান মুখে দিলে ভালো লাগবে। কিন্তু ডানদিকে পা দিতে না দিতে হড়হড় আওয়াজ করে বুড়ো দোকানের শাটার টেনে দিলো। কি হলো?—বনগ্রামের দিক থেকে মিছিল আসছে। একটু দাঁড়ালে মিছিলটা ধরা যায়, কিন্তু অফিসে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

নবাবপুর শেষ হলে রাস্তার ছবি পাল্টায়। রাস্তা হঠাৎ নদীর মোহনার মতো অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক চেহারায় প্রসারিত হয়। ইপিআরটিসি বাস টার্মিনালের সামনে ট্র্যাফিক আইল্যান্ড ঘেঁষে ধিকিধিকি জ্বলছে ১টি সরকারী বাস। এখানে বেশ ভিড়, আবার এখানে অনেকে তাড়াতাড়ি হাঁটে, যে কোনো সময় ইপিআর এসে গুলিবর্ষণ শুরু করতে পারে।

অফিসে কিন্তু অনেক লোক। গতকালও কি সবাই এসেছিলো? লিফট বন্ধ। সিঁড়ি ঠেঙিয়ে পাঁচতলায় উঠে ডানদিকে বড়ো ঘরে একেকটি নীরব টাইপরাইটারের সামনে নিজনিজ চেয়ারে বসে সবাই গল্প করছে। কেউ কেউ হেঁটে এসেছে অনেক দূর থেকে, কিন্তু যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে রাস্তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে তাতে মনে হয় না যে, কারো কোনো কষ্ট হয়েছে। এই বড়ো ঘরের ভেতর দিয়ে মাঝারি ও ছোটো ধরনের সায়েবরা চলে যাচ্ছে নিজেদের কামরায়। এদের পা টেনে টেনে হাঁটা দেখে বা কল্পনা করে কেরানীকুল কখনো পুলক, কখনো মায়া অনুভব করে। তবে বড়ো সায়েবের জন্য সকলের প্রাণে আজ বড়ো হাহাকার: বড়ো সায়েব আজ স্যুট পর্যন্ত পরেনি। তার ফুল হাতা সাদা শার্ট এই শীতেও ঘামে না হলেও ভাপে ঘোলাটে ঘোলাটে লাগছে। তার কপাল ও গাল তেলতেলে। মুখের সেই মহানির্লিপ্ত ভাঁটখানিতে চিড় ধরেছে। বড়ো সাহেব থাকে ধানমণ্ডির একেবারে ভেতর দিকে, এতোটা রাস্তা হেঁটে এলো, আহা! একটা কঠিন অসুখে না পড়ে!

সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে যেতে বড়ো সায়েবকে ১০/১১ পা হাঁটতে হলো। এতোটা সময় জুড়ে তাকে দ্যাখার সুযোগ মেজো ও ছোট সায়েবরা ছাড়তে চায় না। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে সবাই প্রায় কোরাসে 'স্লামালেকুম স্যর' বলে।

মাঝারি গোছের এক সায়েব বড়ো ঘরে এসে বলে, 'ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ি কেউ আসেনি? একটু চা টা খাওয়া যাবে না?'

'কেউ আসেনি স্যর। এই সেকশনে কেউ আসেনি।'

মাঝারি গোছের সায়েব নিজের কামরায় চলে গেলে ছোকরা এক কেরানি বলে, 'পায়জামা ঢিলা!' শুনে সবাই অনেকক্ষণ ধরে হাসে। একজন কেবল বিরক্ত হয়েছে, 'এই শালারা বেশি বাইড়া গেছে!'

'কারা?'

'আবার কারা? লিফট বন্ধ, আবার চাবি লইয়া ভাগছে! পিওন চাপরাশিগো এতোটা বাড়াবাড়ি ভালো না!'

এই ১টি মন্তব্যই তাদের গল্পের বিষয়বস্তু বদলাবার জন্যে যথেষ্ট। একজন বলে, 'খালি পিওনদের বলছেন কেন? রিকশাওয়ালা, বাস কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, কুলি—এদের তেজটা দেখছেন? আরে আইয়ুব খান গেলে তোদের লাভটা কি? তোরা মিনিস্টার হবি? নাকি অফিসে এসে চেয়ার টেবিলে বসবি?'

'আরে শোনেন। ৪/৫ দিন আগে এক শালা রিকশাওয়ালা, নবাবপুর রেলগেট থেকে সদর-ঘাট যাবো, তো কতো হাঁকালো জানেন? —এক টাকার কম যাবে না। ভাড়া তো আট আনাও হয় না, না হয় দশ আনা নে, বারো আনাই চা; না, পুরো টাকাটা দিতে হবে!'

'রেলগেট থেকে সদরঘাটের ভাড়া ছয় আনার বেশি হইতে পারে না।' সহকর্মীর সমর্থন পেয়ে রিকশাওয়ালার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ লোকটির উৎসাহ বাড়ে, 'সীটে বসে, হ্যান্ডেলে পা রেখে নবাবের বাচ্চা বলে, এক টাকার কমে হবে না। দিনকাল খারাপ, নইলে শালার পাছায় কষে একটা লাথি বসিয়ে দিতাম!'

বসের কামরায় টেবিলের এক পাশে বসে হার্ডবোর্ড ও কাঁচের পার্টিশনের ওপর থেকে কেরানীদের রিকশাওয়ালা পেটাবার সখের কথা শোনা যাচ্ছে।

ওসমানের বসের পাতলা গোঁফে অল্প অল্প ঘাম লনে-ছাঁটা ঘাসের শিশিরবিন্দুর মতো চকচক করে। বস বলে, 'এদের ফল ইনএভিটেবল!' কেরানিকুল না রিকশাওয়ালা—কাদের পতন অনিবার্য ওসমান এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার আগেই বস বলে, 'পাবলিক কি রকম স্পনটেনিয়াসলি রি-এ্যাক্ট করছে, দেখছেন?'

বসের মন্তব্যে ওসমান খুশি হয়। বসের কথাকে আরো জোরদার করার জন্যে সে বলে, 'একজ্যাক্টলি স্যর! তবে মানুষ ঠিক রি-এ্যাক্ট করছে না। মানুষ এবার এ্যাকশনে নেমেছে, রি-এ্যাক্ট করছে বরং গভমেন্ট, রাদার কাওয়ার্ডলি!' এই বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ছাড়তে পারায় ওসমানের ভাল লাগে। কথাটা অবশ্য আনোয়ারের। আনোয়ারের পলিটিকাল এ্যানালিসিস খুব ভাল। বস কিন্তু নিজের কথার সূত্র ধরেই এগোয়, 'আইয়ুব খানকে এবার ঈল্ড করতেই হবে। থিংস আর আউট অফ দেয়ার গ্রিপ। এখন আমার ভয় একটাই। আর্মি নামিয়ে ব্যাটারা একটা ম্যাসাকার না করে! ক্যাবিনেটে কয়েকটা হক্স আছে এ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ট্রিগার-হ্যাপি আর্মি।'

সেনাবাহিনী নামিয়ে নির্যাতন করার আশংকার কথায় ওসমানের গা শিরশির করে। আনোয়ারের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়েও ছেলেটা মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলতে পারে। এ্যানালিসিস এতো কনভিন্সিং! 'তবে একটা ব্যাপার কি, এবার ওয়েস্ট পাকিস্তানও ইনভলভড। কিছু করলে ওখানেও করতে হবে! নিজেদের ভাইবোনের ওপর কি রিপ্রেশন চালাতে পারবে?' বলতে বলতে বসের স্বর নিচু হচ্ছিলো, বোধ হয় রাষ্ট্রীয় কোনো গোপন খবর জানাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে।

রিসিভার তুলে বস বলে, 'জী স্যর। স্লামালেকুম স্যর। অপারেটররা তাহলে স্যর এসেছে? গুড! আসছি স্যর, জাস্ট এ মিনিট স্যর!'

বসের ঘরের পাশেই ওসমানদের ঘর। ৪জন ছোটখাটো অফিসার এখানে বসে। এদের মধ্যে খলিলুর রহমান সিনিয়র। কেরানি থেকে এই পর্যন্ত আসতে আসতে বেচারার পেনশনের সময় হয়ে এলো। ঘরের টেলিফোন সেটটা তার টেবিলেই থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওসমান রিসিভার তুলে নেয়। নাঃ, কোনো সাড়া নাই, অপারেটররা এসেই বোধ হয় গুলতানি শুরু করলো। বিরক্ত হয়ে ওসমান প্রায় ছেড়ে দেবে এমন সময় মহিলা কণ্ঠে শোনা যায়, 'নাম্বার প্লীজ!' কিন্তু আনোয়ারের নম্বর আর মনে পড়ে না। খলিলুর রহমানের টেবিলে কাঁচের নিচে মেলা ভিজিটিং কার্ড, পূর্ব পাকিস্তানের ১টা ম্যাপ, ম্যাপে ওদের ইপিআইডিসির বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জায়গাগুলো চিহ্নিত করা রয়েছে, অফিসের পিবিএক্স টেলিফোনের এক্সটেনশন নম্বর। এখানে আনোয়ারের টেলিফোন নম্বর খুঁজে লাভ কি? কী আশ্চর্য! আনোয়ারকে প্রায় প্রত্যেক দিনই একবার ফোন করা হয়, আর দ্যাখো আজ একি ঝামেলা হলো? ওদিকে সরু গলার তাগাদা আসে, 'হ্যালো!' কিন্তু কিছু মনে পড়ে না। কয়েকদিন আগে অফিসের কাজে সেক্রেটারিয়েটে কথা বলতে হবে, নম্বর ওর সামনেই লেখা ছিলো, অথচ ওসমান কিনা বলে বসলো ওদের বাড়ির নম্বর, 'তেইস বাই দুই।' অপারেটর মেয়েটি হেসে ফেললে ওর চৈতন্য হয় এবং তখন টেলিফোন নম্বরটি বলে উদ্ধার পায়। কিন্তু আজ সংখ্যাবাচক কিছুই তার মনের ত্রিসীমানায় আসে না। অপারেটরকে আর প্রতীক্ষায় না রেখে ওসমান রিসিভার রেখে দিলো। টেলিফোনে টং করে একটি আওয়াজ

হয় এবং ওসমান হঠাৎ খুব ভয় পায়: আইয়ুব খান একটা ক্র্যাক-ডাউন না করে! আনোয়ারের সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি। কি যে হবে! খলিলুর রহমান থাকলে তাদের গ্রামের খবর শোনা যেতো। তো গ্রামের কিসব খবর পেয়েই নাকি খলিলুর রহমান বাড়ি গেছে! হ্যাঁ, জামালপুরের ১টা বড়ো এলাকা জুড়ে দারুণ গোলমাল চলছে। খলিলুর রহমানের বাড়ির অবস্থা ভালো; জমিজমা, গোরুবাছুর, জনকিষাণ নিয়ে সচ্ছল গেরস্থ পরিবারের লোক। যা শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হয় ওরাও ঝামেলায় পড়তে পারে। আবার পাশের টেবিলের মমতাজউদ্দিনের সঙ্গে কথা বললেও কাজ হতো, সে ব্যাটা আজ অফিসে আসেনি। বাকি রইলো কামাল। তা কামাল তো মহাব্যস্ত; খুব ঝুঁকে বসে চিঠি লিখছে। ওসমান তবু তাকে বলে, 'কি কামাল সায়েব, আজ চিঠি লেখার দরকার কি? নিজেই চলে যান না! অফিস কি আর হবে?'

১টি বাক্য সম্পূর্ণ লিখে কামাল তার সোনালি রঙের কলম চমৎকারভাবে কামানো নীলচে গালে ঠেকিয়ে বলে, 'আমারো ঐ রকম প্ল্যান ছিলো। কিন্তু ওদের এরিয়াটা ইজ নো গুড। এইসব ট্রাবল্ড স্পট এ্যাভয়েড করাই ভালো।'

ধানমণ্ডিতে আবার ট্রাবল কি?'

কামাল ততোক্ষণে ওর চিঠি ফের পড়তে শুরু করেছে। ১টি জায়গায় ১টি শব্দ কেটে ফেললো, তীরচিহ্ন দিয়ে ওপরে কি লিখলো, তারপর মুখ না তুলেই বললো, 'মালীবাগে।'

ওসমান অবাক হয়, 'আপনার ইয়ে ধানমণ্ডি থাকে না?'

' না ওটা কোল্যাপস করেছে।'

'মানে?'

'ওটা আর কন্টিনিউ করছে না। এটা অন্য। এদের বাসা মালীবাগ। মালীবাগ মোড় পার হয়ে এগুলে একটি চওড়া রাস্তা গেছে খিলগাঁয়ের দিকে, ঐ রাস্তার ওপরে। নিজেদের বাড়ি, অল মোজায়েক। ওখানে একটা কলেজ আছে, কলেজের ছেলেরা প্রতিদিন একটা না একটা ট্রাবল ক্রিয়েট করে। জায়গাটা রিস্কি।'

কামালের তা হলে এটা নতুন পিক-আপ। প্রেম ছাড়া ছোকরা থাকতে পারে না। প্রথমদিকের প্রেম এমনি এমনি ঝরে পড়েছে। ভালো প্রস্পেক্টের ছেলে পেয়ে কোনো মেয়ে কেটে পড়েছে, কারো বিয়ে হয়ে গেছে। আবার কামালও আরো পছন্দসই মেয়ে পেয়ে ১টাকে ঝেড়ে ফেলেছে। তবে এখন সমস্যাটা ঠিক হৃদয়ের নয়, ফুসফুসের। কামালের একটু হাঁপানি আছে, শীতকালটায় ফুসফুস মন্থর হয়ে পড়লে হাওয়া চলাচল স্বচ্ছন্দ হয় না বলে বেচারা বেশ কষ্ট পায়। সাম্প্রতিক প্রেমিকারা তাই শীতকাল এলে সুড়সুড় করে সরে পড়ে। তবে কামাল বেশ ঘ্যানঘ্যান করে চিঠি লিখতে পারে, হাতের লেখা ভালো। ঠেসে চাইনিজ খাওয়ায়। তাই তার গ্যাপ বেশিদিন থাকে না। তবে এবার মালীবাগের মেয়ে বাছাই করার আগে তার চিন্তা করা উচিত ছিলো।

'জায়গাটা রিস্কি।' ওসমান কামালের ভয়কে অনুমোদন করে, 'খিলগাঁও মালীবাগ, শান্তিনগর—এই বেল্টটাই খুব সেন্সিটিভ। প্রায় প্রতিদিন গুলি চলেছে।'

'স্পেশালি স্লাম এরিয়া। ব্যাটাদের কাজকাম নেই তো, রোজ প্রসেশন বার করে। পুলিসের গাড়ি দেখলেই ঢিল ছোঁড়ে। ঢিল দিয়ে অটোমেটিক উইপন্‌স ঠেকাবে? স্টুপিড!'

পার্টিশনের ওপার থেকে ওসমান গনির বস ডাকে, 'ওসমান গনি সায়েব!' বোঝা যায় যে, বস তার সায়েবের ঘর থেকে চার্জড হয়ে এসেছে।

'আরে বসেন! আজ আবার কাজ কি? বসেন।' বসের বস নিশ্চয়ই এভাবেই তাকে অভ্যর্থনা করেছে।

'একটা খবর জানেন?'

'কি?' উৎসাহ বোধ করার জন্যে ওসমান যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সেনাবাহিনীর আক্রমণের ভয়টা হঠাৎ মাথা চাড়া দেয়, 'আর্মি কি ক্র্যাক ডাউন করবে স্যর?'

'আরে না! কি পাগলের মতো কথা বলেন!' বস এবার সুস্থ লোকের মতো নড়েচড়ে বসে, 'আইয়ুব খান ন্যাশনাল গভমেন্ট ফর্ম করতে চায় আফটার অল ট্যালেন্টেড লোক। সিচ্যুয়েশন এ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে।'

'ন্যাশনাল গভমেন্ট? কে বললো?' জিনিসটা কি তাও ওসমানের ধারণার বাইরে। যারা ক্ষমতায় আছে তারা কি বিজাতীয়? না মালটি-ন্যাশনাল?

'শুনলাম।' এই মহাগোপন খবরের উৎস বস ফাঁস করবে না, 'ন্যাশনাল গভমেন্ট ইজ এ মাস্ট। ইভ্ন্'—বস এদিক ওদিক তাকায়, তারপর ফিস ফিস করে বলে, 'ইভ্ন্ শেখ মুজিব ইজ লাইকলি টু বি ইনক্লুডেড। শেখ না হলে এই সব এ্যানার্কি স্টপ করবে কে? মওলানা ভাসানীর প্রভোকেশনে পিপল কি রকম রাউডি হয়ে উঠছে, দেখছেন না?' টেলিফোনের সংক্ষিপ্ত বাজনায় তাকে থামতে হয়। বস তার বৌয়ের সঙ্গে কথা শুরু করলে ওসমান নিজের ঘরে ঢোকে।

কেরানীরা নিজেদের সুপারিনটেন্ডেন্টদের টেবিলে ভিড় জমায়। একটু ভীতু টাইপেরগুলো প্যানপ্যান করে, 'যাই স্যর, আবার কখন কি হয়!' সবারই সমস্যার অন্ত নাই।

'আমার বাসা স্যর পুরা হাসপাতাল। ওয়াইফের গলা ফুলছে, মেয়েটার ব্লাড ডিসেন্ট্রি।'

'যাই স্যর। বায়তুল মোকাররমে আজ বড়ো গ্যাদারিং, স্টুডেন্ট লিডাররা বলবে। মিটিং না শুনলে প্যাটের ভাত হজম হয় না স্যর।' সুপারিনটেন্ডেন্টরা যায় যার যার অফিসারের কামরায়।

'কেউ অফিস করতে চায় না স্যর। কি করি?'

'অফিস করি কি করে স্যর? পিওনরা প্র্যাকটিক্যালি সবাই এ্যাবসেন্ট।'

'এইগুলিরে লইয়া স্যর বহুত বিপদ! আরে তগো চিন্তা কি? গুলি খাইয়া মরলে আইজ বাদে কাইল তগো বৌপোলাপানে দ্যাশে যাইবো, ধান বানবো, খ্যাতে কামলা খাটবো। তগো চিন্তা কি?'

'প্রব্লেম স্যর আমাদের। মিডল ক্লাসের আসতেও কাটে, যেতেও কাটে।'

'যাই স্যর। আমাদের এরিয়ায় কতগুলি খচ্চইরা পোলাপান আছে। পুলিস দেখলেই চাক্কা মারবো। ইপিআর পুলিস ঢুইকা পড়লে মহল্লায় ঢোকাই মুশকিল হইবো। যাই স্যর।'

'অফিসারদের সমস্যাও বড়ো জটিল। তাদের বসদের ঘরে নিজেদের কষ্টের কথা বলতে বলতে একেকজন নুয়ে নুয়ে পড়ে।

'আমার সিস্টার-ইন-ল লন্ডন যাচ্ছে, টুয়েন্টি থার্ডে ফ্লাইট। এখনো ফর্মালিটিজ ইনকমপ্লিট। টেলিফোনে কাউকে পাওয়া যায়!'

'আমার থার্ড ছেলেটা, হি হ্যাজ বিকাম এ প্রব্লেম চাইল্ড। আমি ঘরে না থাকলেই বেরিয়ে পড়বে। এইচ এস সি-তে স্টার মার্কস পেয়েছে, ফিজিক্সে এ্যাডমিশন নিলো, ইউনিভার্সিটি তো—'

আরেকজনের সমস্যা তার স্ত্রীর সঙ্গীত-প্রতিভা, 'গায়িকাকে বিয়ে করে আমার হয়েছে প্রব্লেম। এতো সেন্সেটিভ, নয়েজ হলেই রি-এ্যাক্ট করে, নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়।'

বসেরা তাদের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে এবং ওপরওয়ালারা অফিসের এক নম্বরের কামরায় বিশাল টেবিলের চারদিক আলো করে বসে দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

'ক্যাওস কনফিউশন কন্টিনিউ করলে ফিউচার ইজ ভেরি ব্লিক। পলিটিক্স যাই থাক, নাথিং সাকসিডস উইদাউট ডিসিপ্লিন।'

'রিমোট কর্নারে ক্যাওস আরো বেশি।'

'এভরিবডি মাস্ট বি রিজনেবল। এ্যানার্কি শুড নেভার বি এ্যালাউড টু কন্টিনিউ ফর ইনডেফিনিট পিরিওড।'

'এখন গভমেন্টের দ্যাখা দরকার এই আনরিজনেবল পিপলকে কন্ট্রোল করতে পারে কে? হি এ্যান্ড হি শুড বি টেকন ইনটু কনফিডেন্স।'

সায়েবরা নিজেদের কামরায় ফিরে গিয়ে টেবিলের নিচে পা নাচায়। ছোটো অফিসারদের ডেকে নিচের দিকে খবর পাঠায়, কাউকে চাপ দেওয়ার দরকার নাই। তবে সবাই যেন হাজিরা খাতায় সই করে যায়। এই অলিখিত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌছবার আগেই অফিস প্রায় খালি হয়ে গেছে। তবে বেরিয়ে যাবার আগে অফিসের হাজিরা খাতায় নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছে সবাই।

৪

আনোয়ার সেদিন বাড়ি ছিলো না। ওর ভাইয়া মহাবিরক্ত, 'পাবনা না নোয়াখালি কোথায় গেছে ভালো করে বলেও যায় নি। বিপ্লবের অবজেকটিভ কন্ডিশনস নাকি কোথায় কোথায় তৈরি হয়ে আছে, ঐ সব এক্সপ্লোর করতে গেছে।' ভাইয়া নিজেও এককালে পলিটিক্স করতো, ভাষা আন্দোলনে জেল-খাটা মানুষ। ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে আজকাল বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় বলে ওদিকে সময় দিতে পারে না। তবে পুরনো রাজনৈতিক বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগটা মোটামুটি আছে। গান বাজনার দিকে খুব ঝোঁক, পার্টির সাংস্কৃতিক তৎপরতার সঙ্গে এখনো জড়িত। ওসমানকে বসিয়ে চা খাওয়ালো, চা খেতে খেতে বলে, 'ওদের পার্টি তো প্রায়ই ভাঙছে। এখন ও যে কোন গ্রুপে বিলঙ করে, সেই গ্রুপের বেস কোথায়,— নোয়াখালি না পাবনা না যশোর না চিটাগাং—এসব অঙ্ক মেলাতে পারলে ওর হোয়্যার

এ্যাবাউটস জানতে পারবে।' ওসমানকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'খোঁজ পেলে একটু জানাবে তো! টাকা পয়সাও নিয়ে যায়নি, কোথায় কিভাবে আছে, কে জানে?'

আনোয়ারের সঙ্গে ওসমানের দ্যাখা হলো আরো কয়েকদিন পর। আমজাদিয়ায় সেদিন জমজমাট। ঢুকতে না ঢুকতে ভিড়ের মধ্যে শোনা যায়, 'ওসমান।'

বাইরে থেকে ঢুকেছে, ওসমানের চোখে সব ঝাপসা ঠেকে। কে ডাকলো? কোণের দিকে ওদের টেবিলে যেতে যেতে ওসমান ফের শুনলো, 'ওসমান।' আস্তে আস্তে সব স্পষ্ট হচ্ছে। মোটা চুরুটের ধোঁয়ায় আঁকাবাঁকা পর্দার পেছনে শওকতের ব্রণের দাগখচিত লম্বা ও রোগা মুখ। শওকতের পাশের চেয়ারে চিত্ত আর ফরিদ বসেছে ভাগাভাগি করে। এদের পাশের চেয়ারে আলতাফ। আলতাফের মুখোমুখি ইফতিখার। পাশের টেবিলে বসলেও প্রায় আড়াইটা টেবিল জুড়ে রাজত্ব করে আনোয়ার। ওসমানের দিকে একবার খুশি খুশি চোখ করে তাকিয়ে নিয়ে আনোয়ার তার কথা অব্যাহত রাখে, 'এর আগে পিপল যেসব মুভমেন্টে এ্যাকটিভলি পার্টিসিপেট করেছে সেগুলো হয়েছে এক একটি এলাকা জুড়ে। ধরো তেভাগা, ধরো হাজং কিংবা সাঁওতালদের বিদ্রোহ—এগুলো বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিলো, তাই না? কিন্তু এরকম সমস্ত প্রভিন্স জুড়ে—।'

প্রভিন্স কেন? এবার কান্ট্রিওয়াইড মুভমেন্ট চলছে, ওয়েস্ট পাকিস্তানী পিপল আর অলসো পার্টিসিপেটিং ভেরি স্পনটেনিয়াসলি!' ইফতিখারের এই মন্তব্য আনোয়ার ঘাড় নেড়ে অনুমোদন করতে করতে বলে, 'এই ব্যাপক আন্দোলন কি কেবল এ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ আর পার্লামেন্টারি ফর্ম আর অটোনমির জন্যে? আর কিছু না?'

আলতাফের পাশে সিকানদারের চেয়ারে ভাগাভাগি করে বসতে বসতে ওসমান বলে, 'বায়তুল মোকাররমে পুলিস সাংঘাতিক লাঠিচার্জ করেছে!'

কিন্তু তার দিকে না তাকিয়ে আলতাফ জবাব দেয় আনোয়ারকে, 'ভোটের রাইট চাই আগে। ক্ষমতায় আসতে না পারলে বাঙালি কিচ্ছু করতে পারবে না।' আলতাফ অবিরাম কথা বলেই চলে। কিন্তু ওসমান কারো কথাই ভালোভাবে শুনতে পারে না। সে তখনো একটু একটু হাঁপাচ্ছে। পুলিসের লাঠির বাড়ি থেকে একটুখানির জন্যে বেঁচে গেছে!

শুক্রবারের অফিস বেলা ১২টায় ছুটি হয়ে গেলে কিছু খাবে বলে সে স্টেডিয়ামের বারান্দায় ধীরে সুস্থে হাঁটছিলো। একবার ভাবছিলো প্রভিন্সিয়ালে ভাত খেয়ে নেবে। কিন্তু সাড়ে বারোটায় ভাত খেলে বিকালবেলা শুধু চায়ে কুলায় না। এদিকে রোজার জন্যে রাস্তাঘাটে খোলাখুলি খাওয়া বন্ধ। আড়ালে আবডালে সবাই ঠিকই খাচ্ছে, শুধু মানুষের ঝামেলা বাড়ানো! ঘুঘনি কি পেঁপেকাটা কি সেদ্ধডিমের আশায় সে এদিক ওদিক দেখছে, এমন সময় চোখে পড়ে স্টেডিয়ামের মেইন গেট ২টোতে উঁচু উঁচু ঘোড়ার ওপর বসে রয়েছে তাগড়া সব পুলিস, পাশে রাইফেল হাতে দাঁড়ানো পুলিসবাহিনী। ১টি ঘটনার প্রত্যাশায় ওসমান খাবার কথা ভুলে তাড়াতাড়ি হাঁটে। কিন্তু ঠিক জায়গায় পৌঁছতে না পৌঁছতে জানাজা শেষ হলো। গত কয়েকদিনে সারা পাকিস্তান জুড়ে পুলিস ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত শহীদদের জানাজা। লম্বা কাতারগুলো ভেঙে যাচ্ছে, এদিক ওদিক লোকজনের ছোটো ছোটো জটলা। ছাত্রদের পরবর্তী কর্মসূচী জানবার জন্য ওসমান একবার এ-জটলা একবার ও-জটলার সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু মাইকের পোঁ পোঁ ধ্বনি ছাড়া কিছুই বোঝা যায় না। মাইকের এই ভোঁতা সঙ্গীত ছাপিয়ে ওঠে শ্লোগান, 'শহীদের রক্ত — বৃথা যেতে দেবো না',

'পুলিসী জুলুম পুলিসী জুলুম'—'বন্ধ করো বন্ধ করো।' গেটে দাঁড়ানো উঁচালম্বা সাদা ও ধূসর ঘোড়াদের পা কাঁপে। 'দিকে দিকে আগুন জ্বালো,'—'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো।' ওসমানের বুক দারুণভাবে ওঠানামা করে। শ্লোগানগুলো একটি একটানা আওয়াজে মিলিত হয়ে তার করোটির দেওয়াল তপ্ত করে তোলে: শুওরের বাচ্চা আইয়ুব খান মোনেম খানের চাকরবাকরের দল, দ্যাখ! ভালো করে দেখে নে। তোদের সামনে খালি হাতে কেবল বুকসর্বস্ব করে তোদের বাপ আইয়ুব খানকে চ্যালেঞ্জ করতে এসেছে এরা! ভরা গলায় ওসমান শ্লোগানের জবাব দেয়, 'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।' খুচরা জটলাগুলো শ্লোগানে শ্লোগানে গাঁথা হয়, প্রসারিত হতে থাকে একটি অখণ্ড সমাবেশে। স্টেডিয়ামের গেট থেকে পুলিসবাহিনী এপাশ ওপাশ জুড়ে ছড়িয়ে ১পা ১পা করে পেছনে যায়। কয়েক পা এমনি করে হটে গিয়ে হঠাৎ তারা দাঁড়িয়ে পড়লো। জিপিও-র সামনে লরি থেকে লাফিয়ে নামলো বেতের ঢাল ও লাঠিধারী ১পাল পুলিস। তারপর সব এলোমেলো। প্রথম কয়েক মিনিট কেবল লাঠির সপাসপ আওয়াজ এবং পুলিসের নাক ও মুখ থেকে বেরোনো সশব্দ নিশ্বাস ছাড়া কিছুই নাই। মানুষ এখন যায় কোন দিকে? স্টেডিয়ামের জোড়াগেট জুড়ে উঁচালম্বা ঘোড়া, দক্ষিণে এ-ফুটপাথ থেকে ও-ফুটপাথ জুড়ে পুলিসের দেওয়াল, জিপিও-র সামনে পুলিসের ট্রাক। সবচেয়ে মুশকিল হয় শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের। দিনমান সিয়াম অন্তে এফতারে বিসমিল্লা বলে ভালোমন্দ কিছু মুখে দেবে বলে তারা আপেল কি আঙুর কি খেজুর কি কলা কিংবা ক্যাপিটাল বা লাইটের কেক-প্যাস্ট্রি কিনতে এসেছিলো। এই ফ্যাসাদে পড়ে কেউ কেউ মসজিদে ঢুকে নফল নামাজ পড়তে শুরু করলো, বেশ কয়েকজন বায়তুল মোকাররমের এ-প্যাসেজ ও-প্যাসেজ দিয়ে চলে গেলো পুরানা পল্টনের দিকে। ভদ্রলোক ও ছাত্রদের বেশির ভাগই, বলতে গেলে প্রায় সবাই একটা আধটা লাঠির বাড়ি খেয়ে কিংবা মার এড়িয়ে কেটে পড়েছে। এখন রইলো বাকি ২। —১. নোঙরা কাপড় পরা লোকজন এবং ২. অগুনতি পিচ্চি। পুলিসের মার এখন চমৎকার জমে উঠেছে।

পল্টনের দিকে পুলিস নাই। সেদিক দিয়ে চলে গেলেই হতো। কিন্তু পুলিসবিহীন রাস্তা দেখে একটু দিশাহারা মতো হয়ে ওসমান আবার এসে পড়ে জিপিও-র সামনেই। এখানে রোডের সামনে পুলিসের গাড়ি। বুদ্ধি করে ওসমান পায়ের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। স্টেডিয়ামের উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে সে এমনভাবে হাঁটে যে, মনে হয় এই সব গোলমালের কিছুই তার জানা নাই। ততোক্ষণে গুলিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে পুলিস। মানুষের ছোটাছুটি চলছে ইপিআরটিসি টার্মিনাল পর্যন্ত। পশ্চিম দিকের বড়ো বড়ো দালানের ছাদ থেকে পিচ্চিরা ঢিল ছুঁড়ছে পুলিসের ওপর। স্টেডিয়ামের পাশে ১টা ক্লাবের এলাকা থেকে কয়েকটা খালি বোতল এসে পড়ে। রাস্তার মাঝখানে লম্বা আইল্যান্ড। না! আর কতোক্ষণ? পুলিস শালারা এবার এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি হাঁটাটা বড়ো রিস্কি। এদিককার ফুটপাথ তখন সম্পূর্ণ পুলিসের দখলে। একটু জোরে পা চালালেই ব্যাটারা বুঝে ফেলবে যে, সে জানাজা থেকেই আসছে। চোখে মুখে ওসমান একটা বিরক্তি ফোটাবার জন্য একাগ্রচিত্ত হয়; শহরে ১৪৪ ধারা, সমাবেশ কি মিছিল পুলিস সহ্য করবে কেন? —এই ভাবটা তার মুখের আদলে এঁকে ফেলা দরকার। বেশিক্ষণ অবশ্য কষ্ট করতে হয় না, রেলগেটের ওপারে পুলিসের চিহ্নমাত্র নেই, এমনকি স্টেশন রোডের শুরুতে ট্রাফিক আইল্যান্ডেও পুলিস নাই। পুলিসের ভয় কেটে গেলে ওসমানের পেটের দিকটা চিন

চিন করে। কিন্তু আমজাদিয়ায় ঢোকার পর আড্ডায় জমে থাকায় কথাটা একেবারে ভুলে যায়।

টেবিল এখন আলতাফের দখলে, সবার নীরব অনুমোদন পেয়ে তার আত্মবিশ্বাস বাড়ে, '১৯৫৮-৫৯ সালের পর পাকিস্তানে পার ক্যাপিটা ইনকাম বেড়েছে ১৮০ টাকা। সেখানে ইস্ট পাকিস্তানের ইনক্রিজ কতো জানো?' সকলের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে সে জানায়, '২২ টাকা। টুয়েন্টি টু। এই শোষণ চললে আমাদের পরিণতি কি?'

এরপর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের ওপর সে ১টার পর ১টা তথ্য দিয়ে চলে। শুনতে শুনতে ওসমানের জিভ নিসপিস করে, আলতাফের পক্ষে কথা বলার জন্যে সে অস্থির। প্রতিটি জায়গায় শালার ডিসপ্যারিটি। সোনার দাম এখানে এক রকম, ওখানে আরেক রকম। কাগজ তৈরি হয় আমাদের এখানে, ওদের চেয়ে বেশি দাম দিয়ে সেই কাগজ কিনি আমরাই। আমরা গায়ের রক্ত পানি করে পাট ফলাই, সেই পাট বেচে ফেঁপে ওঠে লাহোর করাচি ইসলামাবাদ। ওপরের দিকে একটা বাঙালি অফিসার নাই। আর্মিতে বাঙালি নাই। সত্যি সত্যি এক দেশ হলে এরকম হতো না। —কিন্তু কথাটা কিভাবে বলবে ওসমান তাই ভাবতে ভাবতে সিকানদারের কনুইয়ের ধাক্কা খায়। সিকানদার আস্তে করে বলে, 'আজকাল ইউনিভারসিটির মেয়েরা কি রকম ফ্রি হইছে দেখছো? ছেলেদের সাথে কেমন ঘুরতাছে, দ্যাখো!'

কয়েকটা টেবিল পর ৪/৫ জন ছেলের সঙ্গে ২জন মেয়ে। ওসমান এতোক্ষণে খেয়ালই করেনি। এইসব রেস্টুরেন্টে মেয়েরা সাধারণত আসেই না, এলেও হার্ডবোর্ড ও পর্দায় ঘেরা কেবিনে বসে। এরকম খোলাখুলি বসেছে, একটু ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। ১ জনের প্রোফাইল দ্যাখা যায়, ফর্সা নাকের মাথায় ঘামের বিন্দু। আরেকজনের পেছনটা চোখে পড়ছে একটু, ঘামে-ভেজা জলপাই রঙ ব্লাউজের ওপর মোটা বেণী। এরাও নিশ্চয়ই বায়তুল মোকাররম গিয়েছিলো, লাঠিচার্জের আগেই চলে এসেছে।

সিকানদার ফের বলে, 'আমাদের সময়ে ছেলেরা মেয়েদের সাথে কথা কইলেই ফাইন হইতো, প্রক্টর দেখতে পারলে হয়!—সোজা রিপোর্ট পাঠাইয়া দিতো। আহা, যদি কয়টা বছর পরে জন্ম নিতাম!'

সিকানদার ওদের কয়েক বছরের সিনিয়র, তাছাড়া ওসমান ইউনিভারসিটিতে পড়েওনি, ওর এই আক্ষেপে সাড়া দেওয়া ওসমানের পক্ষে মুশকিল। সিকানদারের চাপাস্বরের আফসোসের অনেক ওপরে চলছে আলতাফের চড়া গলা, 'আমাদের একমাত্র প্রব্লেম, অন্তত এখন প্রথম ও প্রধান সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ।'

চুরুটের ধোঁয়ার পেছন থেকে সিকানদারের কথার জবাব দেয় শওকত, 'আরে আপনারা তো সেদিনকার ছেলে! আমাদের সময় ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বললে তার রেপ্‌ড হওয়ার ফিলিং হতো।' সবাই জোরে হেসে ফেলে। আলতাফের বিক্ষোভের মাঝখানে এই হাসি তাকে বিব্রত করে। দাঁতে চুরুট চেপে শওকত তার সহপাঠিনীদের নরভীতির বর্ণনা সম্পূর্ণ করে, 'ছেলেদের কথা শুনে আবার কনসিভ না করে—এই ভয়ে মেয়েরা তখন কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করতো।' এবার সবাই এতো জোরে হাসে যে, অন্য কয়েকটা টেবিল থেকেও লোকজন তাদের দিকে ফিরে তাকায়। হাসি হাসি মুখ করলেও আলতাফ একটু দমে যায়। আনোয়ার এই সুযোগটা নেয়, 'তোমার এইসব

কথা চ্যালেঞ্জ করছে কে? ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলিতে মিনিস্টাররা পর্যন্ত ডিসপ্যারিটির ডাটা সাপ্লাই করে। কনস্টিটিউশনে ডিসপ্যারিটির কথা আছে। কিন্তু—।'

'তাহলে দ্যাখো', আলতাফের বিব্রত ভাব কেটে গেছে, বেশ জোর দিয়ে বলে, 'কোন পর্যায়ে গেলে ডিসপ্যারিটির কথা কনস্টিটিউশনেও বলা হয়? আমাদের ভাষা, কালচার থেকে শুরু করে অর্থনীতি সব আজ পাঞ্জাবিদের এক্সপ্লয়টেশনের শিকার। এসব বাদ দিয়ে তোমরা জোতদার মারো আর ঘরবাড়ি জ্বালাও!'

কোণঠাসা হয়ে আনোয়ার ফের শুরু করার উদ্যোগ নেয়, 'তুমি ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছো আলতাফ। ওয়েস্ট পাকিস্তানের একটা সেকশনের এক্সপ্লয়টেশনের কথা অস্বীকার করে কে? এসব কথা আমরা যখন প্রথম বলি তোমাদের নেতারা তখন আমাদের গালাগালি করতো।'

'এর মানে এ নয় যে, আমরা বললে তোমরা আবার আমাদের গালাগালি করবে!'

'তা নয়। আমার কথা হলো এই যে, মানুষের এই আপসার্জ কি খালি বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটাবার জন্য? বাঙালি ভদ্রলোকের চাকরির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে?'

ইফতিখার মিনমিন করে বলে, 'কিন্তু ওয়েস্ট পাকিস্তানের কমন পিপল কি হ্যাপি?'

'না।' আলতাফ ফের জোর দিয়ে বলে, 'কিন্তু সেটা আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। পৃথিবীর যেখানে যতো দুঃখী ও শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষ আছে সবাইকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমাদের কে দিলো? পশ্চিম পাকিস্তানের যেটুকু আমরা জানি তা হলো আমাদের শোষণ করার জন্যে অদম্য স্পৃহা।' উর্দুভাষী ইফতিখারের যে কোনো কথার জবাব দেওয়ার সময় আলতাফ একটু কঠিন বাঙলা ব্যবহার করে। গত কয়েক মাস থেকে এই প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠছে। সিকানদার উত্তেজিত হয়ে বলে, 'ঐগুলি ছাড়েন। বাখোয়াজি বহুত শুনছি। স্বাধীনতার কথা বলেন। স্বাধীনতা! মাউরাগো হাত থাইকা বাঁচার উপায় ঐ একটাই!'

স্বাধীনতা! স্বাধীনতার কথায় ওসমানের তপ্ত করোটিতে শীতল হাওয়া খেলে। সাড়ে ১০টার দিকে অফিসে নোভালজিন খেয়েছিলো, তার এফেক্ট পাওয়া যায়। মেয়ে ২টোকে ভালো করে দ্যাখার জন্য ঘুরে তাকালো, ঐ টেবিলে এখন অন্য সব লোক। বাইরে থেকে গুঞ্জন ভেসে আসছে। জিন্না এ্যাভেন্যুতে গোলমাল কি নতুন করে শুরু হলো?

সিকানদার অনুপ্রাণিত উক্তিকে আমল না দিয়ে আনোয়ার আলতাফের দিকেই তাকায়, বলে, 'ভাষা, কালচার, চাকরি-বাকরিতে সমান অধিকার, আর্মিতে মেজর জেনারেলের পদ পাওয়া—এসব ভদ্রলোকের প্রব্লেম। এই ইস্যুতে ভোটের রাইট পাওয়ার জন্যে মানুষের এতো বড়ো আপসার্জ হতে পারে?

'পারে। মানুষ গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করতে পারে।'

'ভোটের রাইট পাবার জন্য মানুষ প্রাণ দেবে?'

'দেবে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের জন্য মানুষ যুগে যুগে প্রাণ দিয়ে এসেছে।'

'ভোট দিলেই কি সব মানুষের জন্য গণতন্ত্র আসে?'

'আসে। ভোট দেওয়ার অধিকার গণতন্ত্রের একটা বড়ো শর্ত। তোমরা ভোট নিয়ে তোমাদের প্রোগ্রাম অনুসারে কাজ করতে পারবে।'

ফরিদ খুব চুপচাপ সিগ্রেট টানছিলো। আলতাফের সমর্থনে সিগ্রেট টানায় সে একটু বিরতি দেয়, 'ইনেক্টেড হতে না পারলে আপনি বুঝবেন কি করে যে, আপনার পক্ষে মানুষ আছে? আপনি কার হয়ে কথা বলবেন?'

বাইরের গুঞ্জন ক্রমে পরিণত হচ্ছে গর্জনে। রাস্তার মিছিল কাছাকাছি চলে এসেছে। সিকানদার উঠে দরজার দিকে চলে যায়। টেবিলে টেবিলে এখন ভাত, চাপাতি, নানরুটি, তরকারি, সালাদ, ডাল ও ফিরনি। তর্ক জমে উঠেছে, বাইরে থেকে আসছে মিছিলের গর্জন, তাই এতো খাবার ও খাবারের গন্ধেও ওসমানের পেটের ব্যথা পাত্তা পায় না।

আনোয়ার বলে, 'ভোটে মিড্‌ল ক্লাসের লোক আসবে। দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রব্লেম তারা বুঝবে কি করে?'

'বেশ তো, আমরা না হয় মিড্‌ল ক্লাসের সমস্যাই সমাধান করার চেষ্টা করলাম।' ফরিদ এই কথা বললে আলতাফ তাড়াতাড়ি যোগ করে, 'সব দেশে মধ্যবিত্তই তো নেতৃত্ব দেয়। রেভুলিউশনের লিডারশিপ মধ্যবিত্তের হাতে থাকে না? লেনিন কি প্রলেতারিয়েত? তোমাদের চৌ-এন-লাই?'

'কিন্তু আমাদের এখানে সাধারণ মানুষের সমস্যা তো তোমাদের লিডারশিপের কনসার্ন নয়। তোমাদের প্রোগ্রামে তার কোনো রিফ্লেকশন নেই।' আনোয়ারের কথা শেষ করতে না দিয়ে ফরিদ বলে, 'বেশ তো, মিড্‌ল ক্লাস যে পর্যন্ত পারে করুক।'

তারা তর্ক করে। বাইরের শ্লোগানের ধ্বনি ক্রমে শব্দ এবং অর্থপূর্ণ শব্দ হয়ে তাদের কানে আসে। আনোয়ার একটু জোরে বলে, 'কিন্তু পিপলের স্পনটেনিয়াস আপসার্জকে ভদ্রলোকের সখ মেটাবার জন্যে ইউজ করার রাইট তোমাদের কে দিলো?

'আপসার্জ তো আকাশ থেকে পড়েনি! এর জন্যে প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। এই প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ করেছে কোন অর্গানিজেশন, বলো? দিনের পর দিন মিটিং করে, জেল খেটে—।'

'জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো।' মিছিল এবার আমজাদিয়ার সামনে এগিয়ে আসছে।

মিছিলের কয়েকজন ছেলেকে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দেখে প্রায় সবাই উঠে দাঁড়ায়, কেউ বসে থাকলেও খাবার সামনে রেখে ওদের দ্যাখে। পাঞ্জাবি-প্যান্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি, চাপা প্যান্ট-সোয়েটার, চাপা প্যান্ট-পুলওভার নানা পোশাকের কয়েকটা ছাত্র ঢুকেই বলে, 'পানি খাবো।'

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার বিকট জোরে চ্যাঁচায়, 'পানি দে!'

কাঁধে পুলওভার ঝোলানো ১টি ছেলে বলে, 'চা খেয়ে নিই, এ্যাঁ?' ম্যানেজার অনাবশ্যক জোরে হাঁক ছাড়ে, 'চা দে!'

এর মধ্যে আরো লোকজন ঢুকে পড়েছে। এখন লুঙি-পরা লোক ও রাস্তার পিচ্চিই বেশি। পিচ্চিদের ১জন বলে ওঠে, 'হালায় আইয়ুব খান!' দরজার বেশ খানিকটা ওপরে বড়ো ফ্রেমে কাঁচে বাঁধানো ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান, হেলালে জুরত, হেলালে পাকিস্তানের আবক্ষ প্রতিকৃতি। প্রেসিডেন্টের ভরাট গোলাপি মুখ জুড়ে ছড়ানো তার লাল ঠোঁটের চাপা হাসি। সামনের উত্তেজিত লোকদের প্রতি কৌতুক ও তুচ্ছতায় তার ছোটো চোখজোড়া একটু কোঁচকানো। একটি ছাত্র বলে, 'শালা দালালের দোকান।'

'দালালের দোকান!'

সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান ওঠে, 'আইয়ুবের দালালি, আইয়ুবের দালালি'—'চলবে না, চলবে না।' 'ভাঙো হালা চুতমারানির ছবি ভাইঙা ফালাও। কুত্তার বাচ্চারে লাথি মাইরা ভাঙ!' বলতে বলতে ১০/১১ বছরের ১টি পিচ্চি তার রঙজ্বলা সবুজ লুঙ্গির কোঁচড় থেকে ১টি ইটের টুকরা ছুড়ে দেয় ছবির দিকে। ইটের টুকরা দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে ১টি টেবিলে রাখা মাটন রেজালার বাটিতে। কাঁচের বাসন ভাঙার শব্দে ম্যানেজার লাফিয়ে এসে পিচ্চির হাত ধরে ফেলে। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার মিনতি করে, 'আপনারা থামেন। আমি নামাইয়া দেই!' এর মধ্যে ১টি টেবিল চলে এসেছে দরজার কাছে। ঘন নীল রঙের প্যান্ট ও খয়েরি সোয়েটার পরা এলোমেলো চুলের রোগা ১টি ছেলে উঠে পড়ে সেই টেবিলের উপর। ছবি তার নাগালের বাইরে। ১টি চেয়ার উঠিয়ে দেওয়া হয় টেবিলের ওপর, চেয়ারে দাঁড়াতে ছেলেটা ইতস্তত করলে কয়েকজন ছেলে চেয়ারের পায়াগুলো শক্ত করে ধরে। ফ্রেমের ভেতর থেকে প্রেসিডেন্ট অপরিবর্তিত চেহারায় কৌতুক ও তাচ্ছিল্যের হাসি ছাড়ে। লোকজন প্রেসিডেন্টের পতন দ্যাখার জন্য উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে, টেবিলের ওপরকার চেয়ারে দাঁড়ানো তরুণটি ছবির পেছনে পেরেক-বাঁধা দড়ি হাতড়াচ্ছে, দড়ির গেরো বোধ হয় সে খুঁজে পাচ্ছে না, হাতড়িয়েই চলে। এমন সময় ঠিক নিচে থেকে পিতলের ১টি এ্যাশট্রে এসে পড়ে ছবির ফ্রেমের ওপরকার কাঠে। এরপর আরেকটি এ্যাশট্রে। এবার ছবির মাঝামাঝি এ্যাশট্রে লেগে কাঁচ ভেঙে যায়। ফের ১টি ছোটো ইটের টুকরা লাগার সঙ্গে বিশাল ফ্রেম তার একমাত্র অধিবাসীকে নিয়ে প্রথমে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেয়ারে, সেখান থেকে টেবিলের ১টা ধার একটুখানি ছুঁয়ে ছিটকে পড়ে মোজাইক করা তেল চিটচিটে ময়লা মেঝের ওপর। প্রথম এ্যাশট্রেটা গিয়েছিলো নীল প্যান্ট পরা তরুণের কান ঘেঁষে, চেয়ারে উঠবার সময় তার পা যে রকম কাঁপছিলো সেই দ্বিধা ভাগ্যিস ভুলে গিয়ে ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে কায়দা করে চমৎকার লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। তবে এ্যাশট্রের ছাই চোখে লাগায় চেয়ারের পায়া ধরে-রাখা ছেলেদের ২জনকে বেসিনে চোখ ধুতে হয়।

দুটো এ্যাশট্রে এবং ইটের টুকরা ছুড়ে-মারা ১০/১১ বছরের পিচ্চির লুঙ্গির কোঁচড়ে এখনো কয়েকটা পাথর ও ইটের টুকরা। কনুই দিয়ে তার নাকের গোড়া থেকে ঝুলন্ত সিকনি মুছতে মুছতে সে এগিয়ে আসে। আইয়ুব খানকে প্রথমবার ইট লাগাতে পারেনি বলে তার যে গ্লানি হয়েছিলো পরবর্তী সাফল্যে তা একেবারে মুছে গেছে। এই সাফল্যে তার চেহারা ও গলায় পরিণত ও অভিজ্ঞ মানুষের ভার অর্পণ করে, 'দিছি! খানকির বাচ্চারে এক্কেরে নামাইয়া দিছি!' রাস্তার ধুলামাটি ও কফথুতু মাখা পায়ে চিৎপটাং রাষ্ট্রপতির কপালে ও মাথায় সে কয়েকটা লাথি মারে। ভাঙা কাঁচে তার পা কেটে যায়, ভাঙা কাঁচের নিচে ধুলাবালিরক্তকফথুতু লেগে রাষ্ট্রপতির চেহারা ঘোলাটে হয়; ফলে ছোটো চোখ জোড়ায় কোঁচকানো অভিব্যক্তি মুছে যায়।

মিছিলের অনেকে রাস্তা থেকেই চিৎকার করে, 'দালালের দোকান জ্বালাইয়া দাও!' ছাত্রদের সবাই ক্লান্ত। এই উত্তেজনায় সাড়া না দিয়ে তাদের কেউ কেউ চেয়ারে বসে পড়েছে। সকাল থেকে মিটিং করে, জানাজা করে, মিছিলে হেঁটে ও শ্লোগান দিয়ে ক্লান্ত ছেলেদের কেউ বসে বা কেউ দাঁড়িয়ে টেবিলের রেজালা বা ডাল-গোশত বা স্টু বা চাপ অথবা ফিরনি গিলতে থাকে। ম্যানেজারের ইঙ্গিত ছিলো কি-না কে জানে, বেয়ারাদের প্রায় সবাই এই সব টেবিলে খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখে। ১টি রোজদার ছেলেও ফিরনি খেয়ে ফেলেছিলো, হঠাৎ মনে

পড়ায় সে লাফিয়ে ওঠে, 'দূর! রোজাটা নষ্ট হলো!' কিছুক্ষণ পরে ছেলেরা সব বেরিয়ে যায়। পিচ্চির দল জুলজুল করে এদিক ওদিক দ্যাখে। ১টা পিচ্চি এগিয়ে এসে টেবিলে রাখা গ্লাস হাতে নিয়ে ঢকঢক করে পানি খায়। ম্যানেজারের মুখ ঘামে স্যাঁতসেঁতে। খসখসে গলায় সে হঠাৎ খেঁকিয়ে ওঠে, 'এই শালা ফকুরনির পুত, গ্লাস ধরছস কারে কইয়া?' অন্য কোনো পিচ্চি এরপর আর কোনো গ্লাস স্পর্শ করে না বটে, তবে এদের ১জন বলে, 'এতো গরম দ্যাহান ক্যান? পানিই তো খাইছে, আর কি?' দরজার দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার কিছুই বলে না। মিছিলের স্লোগানে সাড়া দিয়ে পিচ্চির দল বাইরে চলে যায়।

রাস্তায় নামবার পরও ওসমানের উত্তেজনা কমে না, 'এই শালা দালালের রেস্টুরেন্ট জ্বালিয়ে দিলে ভালো হতো।'

সিকানদার বিরক্ত হয়, 'আপনারা বাড়াবাড়ি করেন! ম্যানেজার আইবি-র লোক হইতে পারে।'

মিছিলে লোক তেমন নাই। মনে হতে পারে শো ভাঙার পরে সিনেমা হল থেকে লোক ঘরে ফিরে যাচ্ছে। ফরিদ বলে, 'সামনে চলো। সামনে মালঝাল।' 'আর ন্নাহ্!' শওকত হতাশ হতাশ ভঙিতে বলে, 'মেয়ে পাবেন কোথায়? ছাত্রই তো কম। সব লেবার আর স্ট্রিট আর্চিনস!'

আলতাফ সায় দেয়, 'হ্যাঁ। আন-অর্গানাইজড প্রসেশন। মিছিলের প্রোগ্রাম ছিলো না।' 'তোমাদের কোন কাজটা প্রোগ্রাম অনুসারে হচ্ছে?' আনোয়ার ঠাট্টা করে, 'একেকটা ঘটনা ঘটে যায় আর লিডাররা সবই তাদের প্রোগ্রামে ইনক্লুড করে।' আলতাফ জবাব না দিলে শওকত হেসে ফেলে, 'লিডারদের কাজ হলো এডিটিং। কোন কাজটা তারা করেনি আর কোন কাজটা তাদের নেতৃত্বে হলো তাই ডিসাইড করা। এ্যাকশন উইথ রেট্রোস্পেক্টিভ এফেক্ট!' এবার সবাই, এমনকি আলতাফও খুব হাসে। অবশ্য ওসমান গনি বাদে। কারণ সে চলে গেছে একটু সামনে। এদের মধ্যে স্লোগানের জবাব দিচ্ছে সে একাই। কিছুক্ষণ যাবার পর দ্যাখে ডানদিকে বংশাল থেকে বেরিয়ে লাল রঙের বন্ধ ১টি গাড়ি নবাবপুর দিয়ে রায়সাহেবের বাজারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা দেখতে অনেকটা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির মতো, আবার অনেকটা এ্যাম্বুলেন্সের মতো। বেশ বড়ো গাড়ি, তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু হর্ন টর্ন দেওয়ার বালাই নাই। বুলেট প্রুফ নীলচে কালো কাঁচের আড়ালে কাউকে দ্যাখা যায় না। হঠাৎ মনে হয় গাড়িটার ভেতরে বোধ হয় কোনো মানুষ নাই। —ওসমানের বুকের ভেতর ছমছম করে, সে আরো তাড়াতাড়ি হাঁটে। এমনিতেও তাড়াতাড়ি না হেঁটে উপায় নাই, এই লেবার ধরনের লোকদের ধ্যাবড়া পায়ের সঙ্গে তাল মেলানো বড়ো শক্ত।

'এই ওসমান! ওসমান!' আনোয়ার ডাকলে সে পেছনে ফিরে তাকায়। আনোয়ার বলে, 'দাঁড়াও! ওদিকে ফায়ারিং হচ্ছে।'

'কোন্‌দিকে?' ওসমান জিগ্যেস করতে না করতে রায়সায়েবের বাজারের দিক থেকে বহু লোককে দৌড়ে এদিকে আসতে দ্যাখা যায়। পুরুষ্টু হয়ে মিছিল এবার বইছে উল্টোদিকে। ফের একটা গুলির আওয়াজ হলো। ওসমানের হাত ধরে আনোয়ার রাস্তা ক্রস করতে করতে বলে, 'এবার টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লো। ঐ শালা রায়ট কার দেখেই আমি ভয় পাচ্ছিলাম শালারা একটা কিছু করবে!' দৌড়ে পালাচ্ছে মানুষ, তাদের ভেতর দিয়ে রাস্তা ক্রস করা মুশকিল। তাজ হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো চিনাবাদাম, চালভাজা ও ছোলাভাজার ঠেলাগাড়ি, হুট করে গোলক পাল লেনের ভেতর ঢুকে পড়ে। ওসমানের ইচ্ছা করছিলো পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে

মাখানো চালভাজা ছোলাভাজা খাবে। হলো না। আনোয়ার তার হাত ধরে টানতে টানতে বলে, 'তাড়াতাড়ি এসো না!'

৫

যেখানে জোড়পুল লেনের শুরু তার উল্টোদিকে শাহীন রেস্টুরেন্ট এ্যান্ড সুইটমিটের দরজার টুটাফাটা নোঙরা পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে নওশাদের সুরে আশা ভোঁসলে শোনা গেলো। শোনবার লোক কম, খাবার লোক আরো কম। খয়েরি সর-পড়া চায়ে চুমুক দিয়ে আনোয়ার একটা কিংস্টর্ক ধরায়, ধোঁয়া সম্পূর্ণ বের করে দিয়ে জিগ্যেস করে, 'অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে?'

অবস্থা জানাবার জন্য ওসমানই তো ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখন ওসমানের খুব বমি বমি লাগছে, পেটে সলিড কিছু পড়া দরকার। এখানে এখন গাজরের হালুয়া আর বোঁদে আর লাড্ডু ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না। মুখে মিষ্টি দেওয়া এখন অসম্ভব। আনোয়ার নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দেয়, 'এদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, পাগলা কুকুরের মতো দশা!'

আনোয়ারের কথায় ওসমান একটু আরাম পায়, আরো আরাম পাবার আশায় জিগ্যেস করে, 'তুমি তো ঘুরে টুরে এলে। বাইরে অবস্থা কি?'

'বললাম তো! দেয়ার ডেজ আর নাম্বারড। এখন ভয় অপোজিশনের রুই-কাতলাদের নিয়ে।'

'কেন?'

'দ্যাখো না মানুষ কতো এগিয়ে গেছে। গ্রামে গভমেন্ট ফেল করছে, লোকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করবে। যেসব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকদের ওপর ভরসা করে গভমেন্ট চলে পিপল তাদের পাত্তা দিচ্ছে না। সেখানে লিডাররা কি চায় বলো? শেখ সাহেব বেরিয়ে এলে এক এ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ ছাড়া আওয়ামী লীগের চাইবার কি থাকবে?'

'শেখ সাহেবকে ছাড়বে?' ওসমান একেবারে সোজা হয়ে বসে এবং সাঙ্ঘাতিক এ্যাসিডিটি বোধ করা সত্ত্বেও একটা সিগ্রেট ধরায়। পেটের বাঁ দিকটা চিনচিন করছে। গলার কাছে দলাপাকানো বমি। পেট খালি বলে বমিটা ওখানে আটকে রয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির সম্ভাবনা শুনে যেটুকু চাঙা হয়ে উঠেছিলো তা মিইয়ে যায়, বলে, 'কিন্তু আগরতলা কি উইথড্র করতে পারবে?' শওকতের ব্যাখ্যা মনে পড়ে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা আইয়ুব খানের পক্ষে অসম্ভব। সত্যি হোক মিথ্যা হোক, একবার মামলা যখন শুরু করেছে, আর্মির সম্মান, এমনকি অস্তিত্ব নির্ভর করে এর উপর। শাসকদল বলো আর বিরোধীদল বলো, —আর্মি ছাড়া গোটা পাকিস্তানে এরকম সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন আর কি আছে? আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করলে কি সেনাবাহিনী হাস্যকররকম তুচ্ছ বলে প্রমাণিত হয় না? —আনোয়ারের সঙ্গে এসব কথা বলে তর্ক করা যায়, কিন্তু

ওসমানের কথা বলতে ভালো লাগছে না। এ ছাড়া শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেলে সে খুব খুশি হয়, আনোয়ার তার মুক্তির সম্ভাবনাই ব্যাখ্যা করছে, ওসমান তাই চুপ করে থাকে। 'এবার যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে আমাদের বেস বেশ ভালো। মানুষ কি রকম কনশাস আর মিলিট্যান্ট হয়ে উঠেছে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গ্রামের যারা মাথা, কয়েক জেনারেশন ধরে যারা ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে আসছে, কর্নার্ড হতে হতে তাদের অবস্থা এরকম দাঁড়িয়েছে যে, ঘোরতর মুসলিম লীগাররা পর্যন্ত শেখ মুজিবের রিলিজ চায়। না হলে ওদের সেভ করবে কে?'

নিজের মতবাদ সম্বন্ধে যতোই কথা বলুক, তার রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে আনোয়ার একেবারে চুপচাপ থাকে। এই নিয়ে ওসমানের একটু অভিমান মতোও আছে? এবার এটুকু যখন বললো তখন আনোয়ার আরো বলবে ভেবে ওসমান উদগ্রীব হয়ে থাকে। কিন্তু আনোয়ার প্রসঙ্গ একটু পাল্টায়, 'এবার আমাকে যেতে বলছে আমাদের গ্রামে। আমাদের ওদিকটায় আমাদের লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে, 'খানিকটা দূরে চর এলাকায় যা-ও আছে তারাও অন্য গ্রুপের।' একটু থেমে আনোয়ার বলে, 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

ওসমান প্রথমে একটু ভয় পায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেতেও খুব ইচ্ছা করে। আনোয়ার ফের বলে, 'চলো না দোস্ত! আমাদের গ্রামের বাড়িতে এক চাচা থাকেন, আমাদের থাকার জায়গা মেলা। যাবে? তুমি তো গ্রাম দ্যাখোইনি! চলো।' ওসমান একটু একটু হাসে, 'তুমি গ্রামে কোনোদিন বাস করোনি, আর পাকিস্তানে চলে আসার আগে পর্যন্ত আমি গ্রামেই ছিলাম।'

'আরে রাখো!' আনোয়ার থামিয়ে দেয়, 'কতো ছোটবেলায় চলে এসেছো, গ্রামের কথা তোমার মনে আছে?'

ওসমানের বেশ হাল্কা হাল্কা ঠেকে। চায়ের পেয়ালায় অনেকক্ষণ চুমুক দেওয়া হয়নি। খয়েরি রঙের চায়ের ওপর শীতকালের পশ্চিমপাড়ার পুকুরের ওপরকার পরতের মতো গাঢ় খয়েরি সর ভাঙা ভাঙা ছড়ানো রয়েছে। সন্ধ্যাবেলা পশ্চিমপাড়ার বাঁকাসিধা তালগাছগুলো পুকুরের সর-পড়া পানিতে কাঁয়ায় ছায়ায় তিরতির করে কাঁপে। —ওসমান নয়ন ভরে চায়ের পেয়ালা দ্যাখে।

'যাবে?' আনোয়ার প্রায় তাড়া দেয়, 'কয়েকদিনের ছুটি ম্যানেজ করতে পারবে না!'

ওসমান কাঙালের মতো বলে, 'যাবো! কবে যাবে?'

আনোয়ার জবাব দেওয়ার আগেই শোনা যায়, 'স্লামালেকুম!' পাশের টেবিলের সামনে উপুড় হয়ে লুঙির পানি-ভেজানো প্রান্ত দিয়ে চোখ মোছে খিজির, চেয়ারে বসার পরও তার চোখ মোছা ও কথা বলা অব্যাহত থাকে, 'ত্যাজ কি! মনে লয় পাইপ দিয়া পিয়াঁজের রস ঢাইলা দিছে!' এরপর কথা বলে তার সঙ্গী, ভিজে রুমালে চোখ মুছতে মুছতে লোকটি ওসমানের দিকে তাকায়, 'হেভি টিয়ার গ্যাস মেরেছে। এতো পানি দিলাম, এখনো জ্বলছে!' চোখ থেকে রুমাল তুললে তাকে চেনা যায়। ওসমান জিগ্যেস করে, 'আপনারা কোথায় ছিলেন পারভেজ?'

প্রসেশন দেখে আমি ভিড়ে গেলাম। কোর্টের ওখানে দেখলাম কি খিজির বহুত চার্জড হয়ে ইটা মারছে! এদিকে গোলি চলে আর ও ইটা মারে!'

'কেউ মারা গেছে?'

'ডেফিনিটলি!' পারভেজ জোর গলায় হাঁকে, 'চায়ে দো!' ফের গলা নামায়, 'এ্যাট লিস্ট থ্রি, হাঁ তিনজন তো হবেই।'

'কয়জন কইলেন?' হাড্ডি খিজির জোরে প্রতিবাদ জানায়, 'তিনজন? আরে দশজন এগারোজনের কম হইবে না। কয়টা লাশ তো আমরাই টেরাকে উঠাইতে দেখলাম।'

'ওদের বেশির ভাগই জখম, ইনজ্যুরড!' পারভেজ উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'আরে ভাই, এরা হায়ওয়ানসে ভি বেরহম! পহলে টিয়ার গ্যাস মারলে পাবলিক ডিসপার্স হয়ে যেতো। না, এই জানোয়ারগুলি পরথমেই গুলি করলো! গুলি করলি আগে আর টিয়ার গ্যাস মারলি পরে! এটা কি হলো?'

আনোয়ার শান্তভাবে মন্তব্য করে, 'ডেডবডি সরাবার জন্য টিয়ার গ্যাস মারলো।' মৃতদেহের পরিণতির কথা ভেবে ওসমান ভয় পায়, 'লাশগুলো কি করলো?'

আমি নিজের চোখে দেখছি কয়টারে টাইনা তুলতাছে', উত্তেজনা ও রাগে খিজিরের কালো মুখ আরো কালো দ্যাখায়। হাতের প্লায়ার একবার তার ডান হাতে, একবার বাম হাতে, কখনো টেবিলে রাখে, কখনো তার ময়লা শাদা লুঙির কোঁচড়ে রেখে তার ওপর কালো কালো শক্ত রডের মতো আঙুল বুলায়, 'পরথমটা তো এক গুলিতেই খতম। ব্যাটারে টাইনা তুললো, দেহি হাত দুইখান ল্যাতপ্যাত ল্যাতপ্যাত করে। আরেকটার জান কবচ হইছে টেরাকে উঠানের বাদে।' এবার আনোয়ার তাকে কি জিগ্যেস করে এবং সে-ও লাশ গায়েব করার ব্যাপারে পুলিসের তৎপরতার একটি বিস্তারিত বিবরণ ছাড়ে। কিন্তু ওসমান কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। পেটের চিনচিন ব্যথা তার মাথায় উঠেছে। চোখের সামনে তার গোল গোল হলদে রঙের আলোর বিন্দু। আলোর বিন্দুর বিন্যাস এরকম দাঁড়ায় যে, মনে হয় রক্তাক্ত ১টি মৃতদেহ টেনে ট্রাকে তোলা হচ্ছে। মৃতদেহ ট্রাকের বাইরে রেলিঙে ঠেকে ঝুলছে। ৪/৫ জন প্রমাণ সাইজের পুলিস ১সঙ্গে টেনেও তাকে রেলিঙের ভেতর নিতে পাচ্ছে না। মৃতদেহের চোখ বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অফিসের ছাদ থেকে, আজাদ সিনেমার ওপর থেকে, ওদিকে রায়সায়েবের বাজারের উঁচুনিচু টিনের ছাদ থেকে পাবলিক ইটপাটকেল ছুঁড়ছে। ·৩০৩ রাইফেলের বুলেট ও টিয়ার গ্যাসের শেল ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ছুটে আসছে ভাঙাচোরা বোতল। —এইসব গোগ্রাসে দেখছে মৃতদেহের কোটরছোটা চোখজোড়া। তার ২ হাত নেমে গেছে নিচের দিকে, লোহার পাতের মতো এককেটি হাতে ঝোলে এককেজন গুলিবিদ্ধ মানুষ। তাদের জোড়া জোড়া ৪টে চোখ পেটুকের মতো দেখে নিতে চায় ইট-পাটকেল-বোতল-ছোঁড়া পাবলিককে। ওসমান নিজের চোখে হাত রেখে দৃশ্যটি নিভিয়ে দিতে চাইলে তা ঠাঁই নেয় তার নয়নের মাঝখানে। তখন কপালে হাত রেখে সে এদিক ওদিকে দ্যাখে।

'কি হলো ওসমান? শরীর খারাপ? আনইজি ফিল করছো?' আনোয়ারের ডাকে ওসমান ফের ঠিকঠাক হয়ে বসে। নাঃ! আমজাদিয়ায় দুটো এ্যান্টাসিড ট্যাবলেট খেয়ে বেরোনো উচিত ছিলো। মনে হয় রোদে পিঠ দিয়ে বসে উঠানে ছড়ানো ধান খুঁটে-খাওয়া শালিক পাখি দেখতে দেখতে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে দুটো গরম ভাত খেতে পারলে সব ঠিক হয়। মাগুর মাছের ঝোলে মাখা ভাতের অনুপস্থিত স্বাদে মুখ লালায় ভরে ওঠে। কিন্তু এ শালা টকতেতো লালা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দরজার নোঙরা পর্দা তুলে সে থুতু ফেলে। গলা হঠাৎ শুকনা ঠেকে এবং বিশ্রীরকম কাশি শুরু হয়। কাশির সঙ্গে গমক দিয়ে বমি আসে। গলা দিয়ে মুখ দিয়ে বেদম আওয়াজ বেরোয়, কিন্তু যতো গর্জায় ততো বর্ষে না। সিগ্রেটের স্বাদে মাখামাখি হয়ে টক তেতো লালাই গড়িয়ে পড়ে ঠোঁট থেকে। ততোক্ষণে

পারভেজ পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাতের নরম চাপড় দিচ্ছে। এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিচ্ছে খিজির।

রাস্তায় খিজির তার গা ঘেঁষে চলে, গলা নামিয়ে বলে, 'আমাগো আলাউদ্দিন সাব আপনার লগে কি কথাবার্তা কইতে চায়। চান্দার টিকেটের দুইটা বই দিবো আপনারে, কইলো নিজে গিয়া দিবো।' ওসমান এখন সম্পূর্ণ সামলে উঠেছে, এখন তার চিন্তা হয়, 'আগরতলা মিথ্যা মামলায় অভিযুক্তদের সহায়ক কমিটি'র চাঁদার রিসিট বই নিয়ে সে করবেটা কি? কার কাছে সে চাঁদা চাইবে?

আনোয়ার ডাকে, 'ওসমান আমার সঙ্গে চলো। খেয়ে রেস্ট নিয়ে বাসায় যেও।'

ওসমান কিন্তু এখন যেতে চায় তার নিজের ঘরে। মাগুর মাছের ঝোল এখন তার না হলেও চলে। সবচেয়ে দরকার দুটো এ্যান্টাসিড ট্যাবলেট। তারপর কানা আবুলের হোটেল থেকে ভাত রুটি যা হয় খেয়ে ঘরে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা শুয়ে থাকবে। সন্ধ্যার দিকে রঞ্জু যদি খাতা নিয়ে এসে বলে, 'অঙ্কটা একটু দ্যাখেন তো!' তো ফ্রেশ শরীরে রঞ্জুর মাথার কাছে মাথা নিয়ে রাত পর্যন্ত অঙ্ক করানো যায়। কিন্তু আনোয়ার নাছোড়বান্দা, 'চলো। এখন রিকশা পাবে না, লক্ষ্মীবাজার পর্যন্ত হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। চলো।'

আনোয়ারের ঘরে এখন রোদ নাই, কিন্তু সকালবেলার রোদের তাপ একেবারে মুছে যায়নি। আনোয়ারের টেবিল বড়ো এলোমেলো, একদিকে গাদা করে রাখা লিফলেটের তাড়া, পাশে বই, পত্রিকা, কাগজপত্র, এ্যাশট্রে এবং এ্যাশট্রে হিসাবে ব্যবহৃত সিগ্রেটের খালি প্যাকেট। এমন কি ১টা নোঙরা গেঞ্জি ও আধ খাওয়া ১টি কমলালেবু। আনোয়ারের বিছানা কিন্তু পরিপাটি, —পুরু গদির ওপর তোষক, তার ওপর চাদর ও বালিশ; গুলটেক্সের পুরু বেড-কভার দিয়ে গোটা বিছানা আবৃত। ঘরের মেঝেও পরিষ্কার। মনে হয় টেবিলে আনোয়ার কাউকে হাত দিতে দেয় না।

আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'গোসল করবে?'

'না। তুমি করে এসো।'

'তুমি তাহলে বরং একটু শুয়ে থাকো। আমার পাঁচ মিনিট লাগবে।'

কি ভেবে আনোয়ার টেবিলে কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করে। আস্তে আস্তে বলে, 'তোমাকে একটা চিঠি দ্যাখাবো। আমার এক আত্মীয়', বইপত্র ওলট-পালট করা অব্যাহত রেখে আনোয়ার বলে, 'গতবছর বাড়ি গেলে উনার সঙ্গে খুব জমেছিলো, আব্বার কি রকম কাজিনের হাজব্যান্ড, আমাদের গ্রামেই বাড়ি, তার একটা চিঠি পেয়েছি, খুব ইন্টারেস্টিং।'

'মানে তোমার ফুপা? কি লিখেছেন?' কৌতূহল দ্যাখানো খুব দরকার। কিন্তু ওসমান এখন শুতে পারলে বাঁচে। চিঠি খুঁজতে খুঁজতে আনোয়ারের হঠাৎ মনে পড়ে, 'ওহো! চিঠিটা ভাইয়াকে পড়তে দিয়েছিলাম। ভাইয়ারা তো হারমোনিয়াম পার্টি করে সমাজতন্ত্র করতে চায়, তাই বললাম, দ্যাখো, গ্রামে মানুষ কি রকম মিলিট্যান্ট হয়ে উঠছে, পড়লেই বুঝবে।' আনোয়ার বোধ হয় ভাইয়ার ঘরের দিকে চলে গেলো।

এদিকে পায়ে পায়ে ঘঁষে স্যান্ডেল স্যু খুলে ওসমান যে কখন শুয়ে পড়েছে নিজেও সে ভালো করে খেয়াল করেনি। শোবার পর একটু শীতশীত করে। এতো সাজানো গোছানো বিছানা, বেড-কভার তুলে গায়ে দিতে তার বাধো বাধো ঠেকে। তার চিলেকোঠার ঘরে শেষ বিকালে শুয়ে থাকলে কখনো কখনো চারদিকের পুরু দেওয়ালের অনেক ভেতরকার ঠাণ্ডা

শাঁস থেকে বাতাস বেরিয়ে এসে চোখে, কপালে ও কানের গোড়ায় আস্তে আস্তে ফুঁ দেয়। তখন উঠে বরং বাইরে দাঁড়ালে ভালো হয়। বাইরে দ্যাখা যায় যে, বাড়ির উল্টোদিকে মসজিদের সামনে পুলিসের গাড়িতে ১টি গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ তোলা হচ্ছে। কোনোরকম নড়াচড়া ছাড়া ট্রাক চলে যায় জনসন রোডে। তার নিজের দাঁড়াবার জায়গাটা খুঁজে পাওয়া যায় না। নিচে সাপের খোলস ছাড়াবার মতো করে পুলিসের লরি তার বডি পাল্টায়। লরির জায়গায় এখন বিরাট বাক্সের মতো দেখতে লাল রঙের ১টা গাড়ি। তার গাঢ় কালচে নীল কাঁচে ১টার পরে ১টা বুলেট লেগে ফিরে যাচ্ছে। ১টি বুলেটও কি কাঁচ ভেদ করতে পারে না? আরো চেষ্টা করা চাই। তো রাইফেল ছোঁড়ে কে। আজাদ সিনেমার ছাদে রেলিঙে রাইফেলের নল রেখে এক নাগাড়ে গুলি ছুঁড়ে চলেছে রঞ্জু! রঞ্জু! রঞ্জু কি পাগলামি করছে! নিচে থেকে পুলিসের ১টি মাত্র গুলি এসে ওর মাথাটিকে একেবারে চুরমার করে দেবে। রঞ্জুর মাথায় গুলি ঠেকাবার জন্য ওসমান দুই হাত দিয়ে তার কপাল ও মুখ জড়িয়ে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়, 'ঘুমিয়ে পড়লে?'

নিজের কপাল ও মুখ থেকে দুই হাত সরিয়ে ওসমান আনোয়ারের দিকে তাকায়।

'এই যে, এই চিঠিটা! ভাবী খুঁজতে খুঁজতে দেরি করে ফেললো। পড়ো, এ্যাঁ? আমার গোসল করতে পাঁচ মিনিট।'

ঘুমঘুম চোখে পিঁপড়ের সারির মতো ছোটো ছোটো বাঙলা অক্ষর প্রথম প্রথম ঝাপশা হয়ে আসে। তবে দেখতে দেখতে সেগুলো স্পষ্ট হয়, তখন অনায়াসে পড়া চলে।

'এতদঞ্চলে গরু চোরের উপদ্রব ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার হইতেছে না। পক্ষকাল পূর্বে হাওড়াখালির নাদু পরামাণিক গরু অপহরণের অভিযোগ লইয়া থানায় যায়, কিন্তু দারোগা এজাহার লয় নাই। উপরন্তু পরদিন বুধবার দিবাগত রাত্রে নাদু পদুমশহর হাট হইতে প্রত্যাবর্তনকালে কে বা কাহারা পান্টি (গবাদি পশু শাসন করিবার যষ্টিবিশেষ) দ্বারা উহাকে প্রহার করে। তিনদিন পর অর্থাৎ শনিবার দিন দ্বিপ্রহরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বর্তমানে ২নং ওয়ার্ডের মেম্বর খয়বার গাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র আফসার গাজী একটি কিষানের মাথায় আধ মণ মরিচের বস্তা লইয়া মূলবাড়ি ঘাটে যাইবার কালে ভুলু খন্দকারের খানকার নিকট পঁহুছিলে নাদুর পুত্র চেংটু তাহাকে কুকুর ধরাইয়া দিতে উদ্যত হয়। আফসার গাজী দৌড়াইয়া ভুলু খন্দকারের গোয়াল-ঘরে আশ্রয় লয়। চেংটু বলিয়া বেড়াইতেছে যে, খয়বার গাজীর ইশারায় দারোগা উহাদের গরু অপহরণের এজাহার লয় নাই। ক্রুদ্ধস্বভাব খয়বার গাজী ইহার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবে না। নাদু পরামাণিক বংশপরম্পরায় তোমাদের বাড়িতে বছর-কামলা হিসাবে কাজ করিতেছে। দরিদ্র ও নীচু বংশীয় হইলেও লোকটি অত্যন্ত অনুগত ও সৎ। কিন্তু উহার পুত্রটি বড় বেয়াদব, উহার উদ্ধত স্বভাব উহার পরিবারটির জন্য সর্বনাশ ডাকিয়া আনিবে।' চিঠি পড়তে পড়তে ওসমানের ঘুম সম্পূর্ণ কাটে।

'আমাদের এলাকার মানুষের ধর্মজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, সম্ভমবোধ একরূপ নাই বলিলেই চলে। ভদ্রলোকের পক্ষে গ্রামাঞ্চলে বসবাস করা ক্রমেই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। তুমি দীর্ঘকাল বাড়ী আস নাই। সময় করিয়া একবার আসিলে নিজেই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিবা। এখানে খোদা চাহে সকলের কুশল। তোমার ফুফুর অবস্থা পূর্ববৎ। বাম চক্ষুর ছানি কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে, ঐ চোক্ষে প্রায় কিছুই দেখিতে পারে না। একবার ঢাকায় লওয়া দরকার।'

শেষ বাক্যটি পড়তে পড়তে ওসমানের ঠোঁটজোড়া একটু বাঁকা হয়, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে লোকটা আনোয়ারের কিছু পয়সা হাতাবে। তবে কোনো মহিলার ছানি-পড়া চোখের সামনে উপচে পড়ে দুপুর বেলার রোদ। কালো ও ঢ্যাঙা ১টি তরুণ চাষী পাটকিলে রঙের একটি কুকুর নিয়ে রাস্তায় হাঁটছে। —এই দৃশ্যটি অস্বস্তিকর। আনোয়ারের সঙ্গে ওসমানও তো ঐ গ্রামে যাচ্ছে, এরকম চলতে থাকলে তাকে আবার কেউ কুকুর লেলিয়ে না দেয়!

৬

রঞ্জুদের ঘর থেকে ওসমান বেশি হাশিখুশি হয়ে বেরোচ্ছে, সিঁড়িতে হাড়ডি খিজিরকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। এই শীতের সকালে নিচতলায় শ্যাওলাপড়া চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে তার ওপর পরশু দুপুরে আলতাফের ফেলে-যাওয়া শাল চড়িয়ে ওসমান চুল আঁচড়াচ্ছিলো, রঞ্জু এসে একরকম জোর করে ওদের ঘরে নিয়ে গেলো। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সেখানে চললো সেমাই খাওয়া। জর্দা-সেমাইটা জড়িয়ে দলা দলা হয়ে গিয়েছিলো, দুধ-সেমাইতে মিষ্টি কম। পর্দার ওপারে নিচু ও মিহি সুরে রঞ্জুর মায়ের বিরতিহীন বিলাপ। তালেব হত্যার পর এই প্রথম ঈদ, ওর মায়ের বিলাপে তালেবের ঈদ উদ্‌যাপনের নানারকম স্মৃতিচারণ। এতে ঘরদোর একটু ভারি ভারি ঠেকলেও রানু ও রঞ্জুর ক্রমাগত পীড়াপীড়িতে সেমাই খেতে খেতে ২৫/৩০ মিনিট বেশ মিষ্টি রোদের মতো পিঠের ওপর পড়ে রইলো। এখন একটু আনোয়ারদের ওখানে যাবে, খিজির ঘরে ঢুকলে কি সহজে বেরোবে?

খিজিরের হাতে ট্রে। সবুজ ও লাল সুতায় নিষ্কণ্টক ডাল পাতা ও গোলাপ ফুল সেলাই করা হলুদ রুমালে ঢাকা। খিজির একটু দাঁড়ায়, 'কৈ যান? মাহাজনে নাশ্‌তা পাঠাইয়া দিছে, খাইয়া একেবারে বারান!' বাঁয়ে ঘুরে রঞ্জুদের ঘরে যেতে যেতে বলে, 'আপনে উপরে গিয়া কামরায় বহেন। ব্যাকটি ভাড়াইটারে দিয়া আমি আইতাছি।'

ওসমানের ঘরের দরজার চাবি রঞ্জুদের ঘরে। রানুর নতুন বিবাহিতা বন্ধু তার স্বামীকে নিয়ে বেড়াতে এলে ওরা সবাই মিলে ছাদে উঠে ছবি তুলবে। ওসমান রঞ্জুদের দরজায় টোকা দিয়ে চাবি নিলো।

ট্রে থেকে সেমাই ও মোরগ পোলাওয়ের ডিশ তুলে নিতে নিতে ওসমান বলে, 'আমার তো প্লেট মোটে একটা। এতোসব রাখি কোথায়?'

'রাখেন প্যাটের মইদ্যে। আমি এট্টু বহি, আপনে খান!' এদিক ওদিক তাকিয়ে খিজির ছাদের দিকের দরজায় চৌকাঠে বসে পড়ে।

'আরে আরে ওখানে বসছো কেন? বিছানায় বসো, বিছানায় বসো।' ওসমানের ব্যস্ততাকে আমল না দিয়ে খিজির হাঁটু ভেঙে গুছিয়ে বসে।

মোরগ পোলাওয়ের স্বচ্ছ ও পাতলা ধোঁয়ার সুবাসে আত্মসমর্পণ করতে করতে ওসমান বলে, 'এতো! রঞ্জুদের ওখানে হেভি হয়ে গেছে।'

'আরে ঈদের দিন ভি মাইপা খাইবেন? ঈদ উদ মনে লয় মানেন না, না? নমাজ ভি পড়েন নাই?'

'ভোরবেলা ঠিকমতো ঘুম ভাঙলো না,' ওসমান আমতা আমতা করে।

'নাহাইছেন মালুম হয়।'

'হ্যাঁ। চৌবাচ্চার পানি যা ঠাণ্ডা!'

'ভালো করছেন। ঈদের দিন উইঠা নাহাইয়া উহাইয়া সাফসুতরা হইয়া নমাজ পড়তে যাইবেন। রিশতাগো লগে মিলবেন, পড়শিগো লগে মিলবেন! তয় না মোসলমানের পোলা!'

ঈদের দিন খিজির আলি মুসলমানের সন্তান হওয়ার জন্যে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালায়। আজ খুব ভোরে রাত থাকতে উঠে রাস্তার কলে ৫৭০ সাবান দিয়ে গা কচলে গোসল করেছে। গায়ে চড়িয়েছে আলাউদ্দিন মিয়ার দেওয়া বুকে সাদা সুতার মিহি কাজ করা আদ্দির কল্লিদার পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ডান হাতে কব্জির কাছে একটু ছেঁড়া। তা হোক। হাতটা গুটিয়ে নিলেই হলো।

খিজিরের গেঞ্জিটা বড়ো ময়লা, ধোয়া হয়নি বলে ওটা পরেনি, পরলে পাঞ্জাবিও ময়লা দ্যাখায়। গেঞ্জির অভাবে তাঁর অস্থিসর্বস্ব বুক প্রতিটি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তার নামকরণের সার্থকতা ঘোষণা করছে। সাদা লুঙিটা রাত্রিবেলা সে নিজেই ধুয়ে দিয়েছিলো, এখনো স্যাঁতসেঁতে রয়েছে। তাই কিছুক্ষণ পর পর তাকে খসখস করে উরু চুলকাতে হচ্ছে। সেই অতো ভোরবেলা মোড়ের পানির কল থেকে ঘরে ফিরে দ্যাখে জুম্মনের মা চলে গেছে মহাজনের বাড়ি, ঈদের দিন সকাল হবার আগেই না গেলে কাজ সামলানো যাবে না। বৌয়ের নারকেল তেল খুঁজে নিয়ে খিজির মাথায় মেখেছে, তা ছটাকখানেকের কম নয়, তার কপালে ও জুলফিতে তেল গড়িয়ে পড়ছে। গায়ে তার আতরের গন্ধ ভুরভুর করছে, কানে গোঁজা আতর মাখা তুলার টুকরা। আতরটাও আলাউদ্দিন মিয়ার কল্যাণে। তবে চোখে সুর্মা মাখার জন্যে তাকে একটু ছ্যাঁচরামো করতে হয়েছে। মামার সঙ্গে নামাজ পড়তে যাবে বলে মহাজনের বাড়িতে আলাউদ্দিন মিয়া সতরঞ্চি, জায়নামাজ, চাদর এসব খোঁজাখুঁজি করছে, সেই ফাঁকে বাইরের ঘরে টেবিলে রাখা সুর্মাদান থেকে সরু সুর্মা কাঠি দিয়ে খিজির দুই চোখে ইচ্ছামতো সুর্মা মেখে নিয়েছে। আলাউদ্দিন মিয়া নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে। তা টের পেলেই বা কি? কাজের লোকের এই সব হাতটান দেখে চোখ ময়লা করার বান্দা তার সায়েব নয়। ঈদে-বকরিদে, মহরমে, শবে-বরাতে, বিয়ে-শাদিতে, খতনা-আকিকায় চাকরবাকরদের সে বরং একটু সুযোগ দেয়। আজ সকালবেলা মামাকে গ্যারেজে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করে রিকশাওয়ালাদের রিকশা ভাড়া দেওয়ার দায়িত্বটা খিজিরকে জুটিয়ে দিলো, তাই বা কম কি?

বাড়ির চেয়ে রিকশার সংখ্যা বাড়িওয়ালার বেশি। রিকশার জন্যে রহমতউল্লার মায়া-মোহাব্বতও বাড়ির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। ফজরের নামাজ পড়ে প্রত্যেকদিন তসবি হাতে সে সরাসরি চলে আসে বাড়ির পেছনে রিকশার গ্যারেজে। অনেকের গ্যারেজ অবশ্য এর আগেই খোলা হয়, কিন্তু নামাজের আগে দিন শুরু করা তার ধাতে সয় না। তার গ্যারেজে পৌঁছবার আগেই রিকশাওয়ালাদের ভিড় জমে যায়। গম্ভীর মুখে কারো দিকে না তাকিয়ে রহমতউল্লা গ্যারেজে ঢোকে, ঢোকার পরপরই নরম গলায় প্রথম বাক্যটা ছাড়ে, 'নবাবসাবরা তশরিফ লইছেন?' তারপর মিনিটখানেক পরে শুরু হয় একটানা বিলাপ, 'হায়রে, তিনটা গাড়ি একেরে জখম কইরা ছাড়ছে, এ্যাঁ?' প্রত্যেকটি রিকশার নম্বর তার

মুখস্থ, 'আহারে, এই চাইরশ পাঁচচল্লিশটার হ্যান্ডেলখান ছেইচা ভাতের চামিচ বানাইয়া দিছে! খানকির বাচ্চা! ইস! দুইশ আটপঞ্চাশের মাডগাড আমান রাখে নাই! খানকির পুতে মাডগাডের উপরে খাড়াইয়া হোগা মারা দিছিলি তর কোন বাপেরে? কইলি না?'

সারি সারি সাজানো ১৮টা রিকশার প্রত্যেকের হুডে, মাডগাডে, সিটে, সামনের সাইকেলে, রডে, এমনকি স্পোক বা চেসিসে হাত বুলাতে বুলাতে তার বাক্যবর্ষণে এক মুহূর্তের জন্য বিরতি দেয় না। এরই ফাঁকে ফাঁকে একেকজন ড্রাইভারকে রিকশা দেওয়া হয়। ১টি ও ২টি, ১টি ও ২টি—৩টে করে চাকা রাস্তায় গড়ায়। শেষ রিকশাটির প্যাডেল ঘুরতে শুরু করলে তসবিতে আল্লাকে গুণতে গুণতে রহমতউল্লা নাশতা করতে যায় ডানদিকের তেহারির দোকানে।

ঈদের দিন রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়ার নিয়ম নাই। তবে কোনো ঈদেই সবগুলো রিকশা সে ছাড়ে না। রিকশাওয়ালা যারা আসে সবাইকে ঠেসে খাওয়ায়, কিন্তু রিকশা দেয় মাত্র কয়েকজনকে। এমনিতে যাবতীয় রিকশাওয়ালার ওপর রহমতউল্লা খুব চটা, 'খানকির বাচ্চা না হইলে রিকশা চালাইবার কাম কেউ লয় না। মাহাজনরে ক্যামনে ঠকাইবো হালারা থাকে খালি হেই তালে।' এদের মধ্যে একটু কম খানকির বাচ্চা কে, কে একটু কম ঠকায়,—এসব যাচাই করে নিতে খানিকটা সময় নেয়। আবার কারো কারো কাছে অনেকদিনের পাওনা টাকা-পয়সা আদায় করা যায় এই দিনেই, 'আব্বে জব্বইরা, মালীবাগের মোচড়ের মইদ্যে টেরাকের লগে রঙবাজি করবার গিয়া দুইশ বারোটারে উল্টাইয়া দিছিলি না? আমারে কতোটি পয়সা জরিমানা করাইলি খবর রাখস?' জব্বারকে চুপ করে থাকতে দেখে তার মেজাজ চড়ে যায়, 'একটা পয়সা দিছিলি?'

'টায়ার টিউব জখম হইছিলো মাহাজন।' জব্বারের এ কৈফিয়তে রহমতউল্লা হুঙ্কার ছাড়ে, 'টায়ারের মায়েরে বাপ! ইস্পোকগুলার দাম দিবো তর কুন বাপে?' নিয়ম অনুসারে স্পোক ছাড়া অন্য কিছু নষ্ট হলে মেরামতের দায়িত্ব মহাজনের। মালীবাগের মোড়ে জব্বার একটা রিকশা ওভারটেক করতে গিয়েছিলো, পেছনের ট্রাকের ধাক্কায় ২১২ নম্বর রিকশা একেবারে উল্টে যায়। চাকা ও মাডগার্ড সব পাল্টাতে হয়েছিলো মহাজনের সেই রাগ এখন পর্যন্ত যায়নি। কিন্তু নষ্ট ও বাতিল চাকার সবগুলো স্পোকের দাম দিতে হবে শুনে জব্বার একেবারে মিইয়ে যায়। লোকটা একবার শেষ চেষ্টা করে, 'মাহাজন, তহন তো কিছু কইলেন না!'

'তহন কইলে এতোগুলি পয়সা দিবার পারতি? তহন তরে ম্যাহেরবানি করছি। যা, তর পসা লইয়া আমার কাম নাই, ফকুরনির বাচ্চা, চোপা মারস, না? তর চোপার মায়েরে বাপ!' এদিকে ঈদের জামাতের সময় হয়ে এসেছে, মহাজনের হাতে পায়ে ধরে সবগুলো স্পোকের দাম যা হয় তার একটা ভাগ দিয়ে জব্বার রিকশা পায়। মালপানিওয়ালা প্যাসেঞ্জার ধরে বায়তুল মোকাররমে ট্রিপ দিতে পারলে এর দ্বিগুণ রোজগার। তাই রহমতউল্লাই বা ছাড়বে কেন? ঈদের দিন তার খরচ কি কম? পয়সা আসবে কোত্থেকে? তার এক ডিগচি সেমাই তো সাবাড় করবে এই ফকুরনির বাচ্চার দলই। ঈদের দিন সকালবেলাটা তাই রহমতউল্লাকে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকতে হয়।

কিন্তু আজ ভোর হতে না হতে সরু গলিটা পার হয়ে মহাজনের বাড়ি এসে ঘাপলা বাধালো আলাউদ্দিন মিয়া, 'মামু, আউজকার দিনটা গ্যারেজে না গেলেন! কেউগারে পাঠায়া দেন, গাড়িগুলি ডেরাইভারগো দিয়া আইবো।'

রহমতউল্লা রাজি না হলেও আলাউদ্দিন ছাড়ে না, 'আউজকা তো ভাড়াউড়ার কারবার নাই। কেউরে পাঠাইলেই হইলো। লন, জলদি নাহাইয়া লন, বায়তুল মোকাররম যামু। বহুত বড়ো জামাত, বহুত মানুষের লগে মিলবার পারুম!' এতেও রহমতউল্লার সায় নাই, 'না মিয়া, ঐগুলি ছাড়ো। আমাগো পুলের উপরের মসজিদ কি আইয়ুব খানের মিলিটারি কব্জা করছে, না চৌচল্লিশ ধারা দিয়া মুসল্লিগো আটকাইয়া রাখছে? বাপ দাদা ময় মুরুব্বি চোদ্দ পুরুষ নামাজ পড়ছে পুলের উপরের মসজিদে, আউজকা তুমি নয়া জায়গা বিচরাও?' পুরনো প্রথার প্রতি মামার আনুগত্য আলাউদ্দিন মেনে নেয়। কিন্তু মামার গ্যারেজে যাবার ব্যাপারে তার আপত্তিতে সে একেবারে অটল। সে ১টি নতুন কৌশল প্রয়োগ করে, 'ঠিক আছে, কেউরে পাঠাইয়া কাম নাই। আমি যাইতেছি। আমারে বিশ্বাস করেন তো?' আলাউদ্দিন মিয়া প্রায় চেঁচিয়ে কথা বলে। মামার জন্যে তার এই মাথাব্যথা যেন সকলের কানে লাগে। অন্তত মামার বৌটার কানে কথাগুলো পৌঁছানো দরকার। ঈদের দিন ভোরবেলা উঠেই রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে মুখ খারাপ করাটা তার মামীর পছন্দ নয়। হাজার হলেও মামী তার বেগমবাজারের খানদানি ঘরের আওরাত। তিন পুরুষ আগেই তাদের অবস্থা পড়ে গেলে কি হয়, —কথায় বার্তায়, চাকরবাকরদের ধরে এই মারধোর করায়, আবার এই গাদা গাদা খাবার দেওয়ায়, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে নাকউঁচু দ্যাখানোতে তার খানদানি ভাবটা সব সময় ঘ্যানঘ্যান করে। মামীকে পটানো আলাউদ্দিন মিয়ার খুব দরকার। মামীর মেয়েটার আবার বাপের চেয়ে মায়ের দিকেই ঝোঁকটা বেশি। কিছুদিন থেকে মামীর ভাইয়ের আইএ ফেল ছেলেটা এই বাড়িতে আসা যাওয়া করছে। নাঃ! মামীকে ভজাতে না পারলে কাজ হবে না। মামার গ্যারেজে যাওয়ার বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে পরম ধৈর্য ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে সে বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতির নানারকম প্রকাশ দ্যাখাতে থাকে। লেগে থাকলে কি না করা যায়? শেষ পর্যন্ত মামী ও মামীর মেয়ে আলাউদ্দিনের সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং মহাজনের রিকশার গ্যারেজে যাওয়ার দায়িত্ব পায় খিজির।

মামাভাগ্নের গ্যারেজ ২টো পাশাপাশি। ঈদের দিন আলাউদ্দিন মিয়া অবশ্য সবগুলো গাড়িই বের করে। বেবি ট্যাকসি আজ তার নিজেরই কাজে লাগবে, রিকশাগুলো বাইরে গড়িয়ে দিয়ে খিজির ঢোকে মহাজনের গ্যারেজে।

খিজিরকে দেখে রিকশাওয়ালারা ইচ্ছামতো রিকশায় হাত দিয়েই টানাটানি শুরু করে। সুর্মামাখা চোখ কুঁচকে খিজির ওদের কাণ্ড দ্যাখে আর চ্যাচায়, 'আরে এইটা কি খানকিপট্টি পাইলি?' গলায় রহমতউল্লার ঘর্ঘর টোনটি আনার চেষ্টা করে, 'আরে এইটা কি তোরা কান্দুপট্টি পাইলি? মনে লয় খানকিগো মাজা ধইরা সিনা ধইরা টান মারবার লাগছস!' মহাজন না আসায় রিকশাওয়ালাদের তেজ বেড়ে গেছে, রিকশাগুলো যেন শালাদের বাঁধা খানকি! একেকজনের বুক-চিতানো কথা শোনো, 'ঈদের দিন আবার পসা কিয়ের বে?'

'বাকি পসার খবর তুই রাখবি ক্যামতে?'

'যা যা, বাড়ি গিয়া মাহাজনরে দিয়া ল্যাখাইয়া লইয়া আয়।'

'তাহলে মহাজনে আহুক!' খিজিরের এই প্রস্তাবে রিকশাওয়ালাদের তেজ নিভে যায়। মহাজন আসা মানে প্রথম থেকে গ্যাঞ্জাম। তার মানে নামাজের খ্যাপ ১টাও পাওয়া যাবে না। তখন প্রত্যেকের কোমর থেকে ১ টাকার নোট, আধুলি, সিকি বের হতে থাকে। কয়েকজন শেষের ২/১টা টান বাকি রেখে বিড়িটা তুলে দেয় খিজিরের হাতে এবং এই বিড়ি

দেওয়ার ক্ষোভ মেটায় এই বলে, 'কি বে, হাড্ডির বাচ্চা, মাহাজনের গতর উতর অহনও বানাইয়া দেস? না, মাহাজন অহন তরে ছাড়ান দিয়া আর কেউগ্যারে ধরছে?' এসব কথার জবাব দেওয়ার সময় কৈ খিজিরের? ১টা ১টা করে ৩টে বাদে সবগুলো রিকশা রাস্তায় নামে।

নামাজের সময় প্রায় হয়ে গেলো। রহমতউল্লা ও আলাউদ্দিনের বাড়ির সতরঞ্চি, চাদর ও জায়নামাজ মসজিদ পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব খিজিরের ওপর। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। ক্রিং! ক্রিং! —রিকশার ঘণ্টার আওয়াজ, গ্যারেজের ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে।—কোন হালা পোংটা পোলা গ্যারেজের মইদ্যে ঢুকছে! —বিরক্ত হয়ে খিজির ভেতরে ভালো করে দ্যাখে। না, কেউ না। বোধ হয় রাস্তায় রিকশার ঘণ্টা। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে বাঁশের মোটা বাতায় তৈরি দরজা চেনের সঙ্গে তালা লাগিয়ে বন্ধ করছে, এমন সময় ফের শোনা যায়, 'ক্রিং! ক্রিং! ক্রিং!' খিজির দরজা খুলে আবার গ্যারেজে ঢোকে, সব চুপচাপ। তবে গ্যারেজে কেউ না কেউ আছে। খিজিরের গা ছমছম করে, এই গ্যারেজে ছেলেবেলায় বহু রাত্রি কেটেছে, মাঝে মাঝে নন্দলাল দত্ত লেনের গলা-কাটা মাহাক্কালটা এসে রিকশার বেল বাজাতো! সেই ব্যাটা কি আজ আবার এসে হাজির? গা ছমছম ভাবটা মুহূর্তে কেটে যায়, শালা বদ জিনটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার জন্য সে গ্যারেজের এ-মাথা ও-মাথা ঘোরাঘুরি শুরু করে।

ইট সুরকির ১৫ ইঞ্চি দেওয়াল আসলে রহমতউল্লার বাড়ির সীমানা। একদিকে সেই দেওয়াল, সামনে ও ২ পাশে টিন ও বাঁশের মোটা বেড়া দিয়ে মাহাজন এই গ্যারেজ শুরু করে প্রায় ১৯/২০ বছর আগে। তখন ২টো রিকশা রাখার মতো একটুখানি জায়গা ছিলো, সবটাই বেড়ায় ঘেরা। পরে এই বাড়ির মালিক হবার পর মাহাজন দেওয়াল ঘেঁষে গ্যারেজ বানায়। দিন যায়। গ্যারেজ এগিয়ে চলে সামনের দিকে। রাস্তার ড্রেন পেরিয়ে গ্যারেজ এগোয় রাস্তায়। এরপর বাড়াতে হয় পাশে। এখন ওদিককার ল্যাম্পোস্ট পার হয়ে গেছে, ফলে গ্যারেজের একটা সাইডে বাল্ব লাগাতে হয় না। পুরু দেওয়ালের ১দিকে দরজা কেটে বাড়ির ভেতরের সঙ্গে যোগাযোগের পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। কিন্তু ছোটলোকের বাচ্চাগুলো যখন তখন ভেতরে ঢুকে চুরি চামারি করবে, অন্দরে পর্দা থাকবে না—কয়েকটা ইট সরাবার পর এই নিয়ে বিবিসায়েব হাউকাউ করায় দরজা ফোটাবার কাজ বন্ধ থাকে। আলগা ইটগুলো কোথায় ছিটকে পড়েছে, সেখানে বিরাট ১টি ফাঁক। এছাড়াও এখানে ওখানে ইট খসে পড়ায় কিংবা ইট খসিয়ে নিয়ে এটা ওটা রাখবার জায়গা করা হয়েছে। খিজির যখন এখানে থাকতো, এগুলো কি এভাবেই ছিলো? অনেকগুলো মার্বেলের ঠোকাঠুকির আওয়াজে সে চমকে ওঠে, তার মার্বেল লুকিয়ে রাখতো একটা খোপে, সেটা কোনটা? সেই আওয়াজ অনুসরণ করে সে এদিক ওদিক হাতড়ায়। না, কোথায় মার্বেল? ১টা খোপে সাইকেলের অচল চেন। আরেকটা খোপে তেলের ছোটো একটা টিন। আচ্ছা, সন্ধ্যার পর রায়সায়েবের বাজারের পাশে চোরাবাজারে গ্যারেজের ১টা স্ক্রু ড্রাইভার বেচতে গিয়েছিলো; হঠাৎ কারেন্ট চলে গেলে অন্ধকারে হাতিয়ে নিয়েছিলো ১টা বল বেয়ারিং। ঘরে এসে দ্যাখে একেবারে নতুন, এতো সুন্দর চকচক করতো। এই দেওয়ালের কোন ফোকরে লুকিয়ে রেখেছিলো। বিক্রি করতে ইচ্ছা করতো না। তারপর বিক্রি করার ইচ্ছা ও সুযোগ যখন হলো তখন কিন্তু সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোন ফোকরে রেখেছিলো? নাঃ! কোথাও নাই। সিগ্রেটের প্যাকেট-ছেঁড়া তাসের তাড়া কোথায় রাখতো? ১টা খোপে হাত

দিলে খসখস করে, কিন্তু না, সেখানে ব্যবহৃত শিরিষ কাগজের টুকরা। আরেকটাতে স্ক্রু-ড্রাইভার, ১টিতে সাইকেলের চেন। নাঃ! তার বল-বেয়ারিং কি মার্বেল কি তাসের তাড়া পাওয়া যায় না। ওদিকে ঘরের ভেতর কানের পাশে রিকশার ঘণ্টা বিরতি দিয়ে দিয়ে বেজে চলে, খিজিরের হাতের তালে তালে সেই ঘণ্টা-বাজানো নিয়মিত বাজনায় রূপ নেয়। নাঃ! তাকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। হতাশ হয়ে খিজির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে।

গলি দিয়ে নোঙরা বাঁচিয়ে চলেছে ধোয়া পাজামা পাঞ্জাবি লুঙি পরা লোকজন। তাদের প্রত্যেকের মাথায় টুপি, অনেকের আঙুলে শিশুর হাত। কাউকে ভালো করে দ্যাখা যায় না, আস্তে আস্তে রাস্তা জনশূন্য হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে রাস্তাও চোখের সামনে থেকে হাওয়া হয়ে যায়। খিজির ওর মাথা বারবার ঝাঁকালেও কোনো ফল হয় না। আজ চুলে এতোটা তেল দেওয়ায় কি তার মাথার ভেতরটা জমে বরফ হয়ে গেলো? চুল বেয়ে তেল চুঁয়ে চুঁয়ে তার করোটির ভেতর গড়িয়ে মগজের এ-চাকায় ও-চাকায় জট পাকিয়ে রেখেছে। কোনো চুতমারানি ট্রাফিক পুলিসের সাধ্য কি যে সেই জট খুলে? তার মগজে কি শুরু থেকেই এরকম জাম লেগেই থাকতো? তার মায়ের অবশ্য ধারণা ছিলো যে, খিজিরের করোটি একেবারে খাঁ খাঁ করে, সেখানে 'এক কাচ্চা মগজ যুদিল থাকে! তরে লইয়া আমি কি করি? তর কপাল তুই দেখবি, আমার কি?' মা একবার বকতে শুরু করলে থামতে পারতো না, 'তরে কতোবার কইছি মিস্ত্রীর সামনে তুই পড়বি না। তরে দেখলে মিস্ত্রী এক্কেরে খাট্টা হইয়া উঠে, আর তুই বেলাহাজ বেশরম খাট্টাশের পয়দা একখান, তামামটা দিন ঘুইরা ফিইরা খালি তার সামনেই পড়বি!'

কিন্তু খিজির কি আর ইচ্ছা করে মিস্ত্রীর সামনে পড়তো? মিস্ত্রী শালা জোয়ান একখান মরদ, সে কি-না বৌয়ের পোলার রোজগার খাবার লোভে দিনের মধ্যে ২ বার ৩ বার এসে হাজির হতো লোহার পুলের গোড়ায়। কতোই বা রোজগার ছিলো? তখন ওর কাজ রিকশা ঠেলে ঠেলে লোহার পুলে উঠিয়ে দেওয়া। একবার সূত্রাপুরের ঢাল থেকে ওপরে উঠিয়ে দাও, তারপর ফিরে এসো একা একা। তারপর আরো সব পিচ্চিদের সঙ্গে আবার রিকশার পেছনে ছোটে, 'ধাক্কা দেই?'—'দে।' আবার ঠেলো, আবার নেমে এসো। ২ পয়সা করে জমতে জমতে ২ আনা ৩ আনা না হওয়া পর্যন্ত একটানা ওঠানামা। তারপর চিনাবাদাম খাও, কি সোনপাপড়ি, কি ছোলার ঘুঘনি। অথবা পুলের ওপর এক ধারে নুলো বুড়ির কাছে বসে আধ-পচা আম কি পাখি-ঠোকরানো নোনাফল কি আধখানা কাটা মিষ্টি আলু। কিন্তু কি বলবো, ৩/৪ ঘণ্টা যেতে না যেতে ফরাসগঞ্জের আটার কলের কাজে বিরতি দিয়ে ফালু মিস্ত্রী শালা ঠিক হাজির, 'দেহি, কতো পাইছস?' পয়সার পরিমাণ তার মনমতো না হলেই ঘাড়ে পিঠে সমানে কিলচড়, 'হারামির বাচ্চা, প্যাটখান বানাইছস কলতাবাজারের পানির টাঙ্কি, যহনই দেহি চুতমারানির মুখ চলতাছে।' মিস্ত্রীর আড়ালে থাকার জন্যে চেষ্টা তো কম করতো না। একদিন পুলের ওপর ১টা সিকি কুড়িয়ে পায়, সেটা নিয়ে মইজার মায়ের পোলা মইজার সঙ্গে তার একচোট হাতাহাতিও হয়, সিকিটা নাকি মইজা আগে দেখেছিলো। শেষ পর্যন্ত রফা হয় এই শর্তে যে, ২জনেই সূত্রাপুরের ঢালে ১টা হোটেলে গরুর গোশত খাবে। ব্যাপারটা ফালু মিস্ত্রী টের পেয়ে গিয়েছিল, মনে হয় মইজা হালায় পুরো পয়সাটা না পাওয়ার ক্ষোভে তার কানে লাগায়। পুলের ঢালে ট্রাফিক পুলিস বক্সের পেছনে ফালু সেদিন তার

গলা ধরে এমন চাপ দিয়েছিলো যে, গোশতের টুকরাগুলোর স্বাদ সে জিভে আরেকবার অনুভব করে। এদিক দিয়ে ধরলে ফালু মিস্ত্রী বরং তার উপকারই করেছিলো, তারই বেদম মারের চোটে ২ আনার গোশতের স্বাদ ১ ঘণ্টার মধ্যে ২ বার ভোগ করলো!

ফালু মিস্ত্রী লোক কিন্তু এমনিতে খুব খারাপ ছিলো না। অন্তত খিজিরের মায়ের গায়ে সহজে হাত তুলতো না, এটা ঠিক। খিজিরের মা, এমনকি খিজির পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকার সময় সবচেয়ে বেশি আরাম ভোগ করেছে। ফালুর বসবাস ফরাসগঞ্জের একটা বড়ো বাড়ির ঘোড়ার আস্তাবলে। বাড়ির মালিক তার দুই পুরুষের মনিব, ফালুর বাপ মনিবের ঘোড়ার গাড়ি চালাতো, ঘোড়ার গাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার পর আস্তাবলটাই সাফ সুতরো করে নিয়ে ফালু সেখানে বাস করতো। মনিবের আটার কলে সে মেশিন চালায় আর তার বৌ যেই হোক না ঐ বাড়িতে কাজ করতে হতো তাকে। ফালু এমনি হাসিখুশি মানুষ, কখন যে তার মেজাজ খিচড়ে যাবে কে বুঝবে? দ্যাখো না, মায়া সিনেমায় 'মোলাকাত' দেখে ছবির কাহিনী বলার জন্যে বৌকে নিয়ে বসেছে,—এমনকি ঘুমিয়ে-পড়া খিজিরের মাথাটা বালিশে ঠিক করে বসিয়ে দিলো—কাহিনী বর্ণনার মাঝে হঠাৎ কি হলো, ঘুমন্ত বালকের পিঠে দমাদম শুরু করলো কিল মারতে। হাতের সঙ্গে সমানে চললো তার মুখ, 'এই জাউরাটারে কব্বর দিয়া খেজুর কাঁটা পুঁইতা ঘরে আইলে আমার দিলটা ঠাণ্ডা হয়। বুইরা হারামজাদা, তর ইসে কাইটা দিমু, এক্কেরে পোতাপুতা লইয়া কাটুম, জিন্দেগির মইদ্যে বিছনার মইদ্যে তর প্যাশাপ করা বারাইবো দেহিস।'

বিছানায় পেচ্ছাব করার ব্যাপারে খিজিরের কি করার ছিলো? ২/১ রাত পর পর ঘুমের ভেতর কারো উস্কানিতে সে সোজা চলে যেতো ফরিদাবাদ পেরিয়ে মিল ব্যারাকের পর আইজি গেটে। এই জায়গাটা তার এমনিতে চেনা, ফালুর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য মাঝে মাঝে এসে ডাংগুলি খেলতো। মাঠের এক কিনারে পেচ্ছাব করতে কি যে ভালো লাগতো! কিছুদিন পর রহমতউল্লার গ্যারেজে তোতামিয়া ওকে ন্যাংটা করে খুব জাপ্টাজাপ্টি করছিলো, তখন তার নুনু অনেকটা সেইভাবে শিউরে ওঠে। সে তো অনেক পরেকার কথা। বিছানায় পেচ্ছাব বন্ধ করার জন্যে মা তার কম চেষ্টা করেনি। কতো তাবিজ, কতো পানি পড়া! শেষ পর্যন্ত সারলো রহমতউল্লার বাড়ির ঠিকা-ঝি মজির মায়ের জোগাড়-করা ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মৌলবি সায়েবের পানি-পড়া খেয়ে। কিন্তু এতেও ফালু মিস্ত্রীর মারধোর কমে না। খিজির অনেকদিন থেকেই ঐ বাড়ি থেকে কেটে পড়ার তালে ছিলো। কিন্তু ওর মাও যে সরে পড়বে এটা কিন্তু খিজির কখনো কল্পনা করেনি। ফালুর ঐ প্রায়-পাকা আস্তাবল ঘর, ঘরের সামনে পাকা উঠানে সারা রাত ধরে ১০০ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে, সেই আলোতে রাত্রে নিশ্চিন্তে কাঁটা বেছে ফলি মাছ দিয়ে ভাত খাওয়া চলে। একদিকে চাকরবাকরদের জন্য সারি সারি খাটা পায়খানা, পায়খানার সারির পাশে চৌবাচ্চায় দিনরাত পানি।—সব ছেড়ে আহাম্মুকের মতো মা চলে এলো। তেমন কিছু আনতেও পারলো না। লুকিয়ে গোটা দুয়েক শাড়ি, সের চারেক চাল আর ১টা বিছানার চাদর পাঠিয়ে দিয়েছিলো খিজিরকে দিয়ে। কিন্তু মনিবের ভালো শাড়িটা সরাতে গিয়ে পারলো না। নতুন মাতারি মাগীটা তক্কে তক্কে ছিলো, ঠিক সময়ে ধরে ফেলে। শাড়ি লুকিয়ে নেওয়ার কথা শুনে ফালুর লাফালাফি কী! 'কাপড় দিয়া তুই করবি কি। খানকি মাগী গতরখান কাঁপাইলে তর ভাত কাপড়ের অভাব?'

কথাটা মিস্ত্রী খুব ভুল বলেনি। কালোকিষ্টি মা মাতারির গতরখান না থাকলে মায়ে পোয়ে তারা কোথায় ভেসে যেতো!—তা সেই বারো ভাতারি মা মাগীটা কি এতোকাল পরও তাকে রেহাই দেবে না? কিসের জিন, কিসের মাহাক্কাল, খানকি মাগী মা-ই আজ এসে তার ঈদের নামাজ পড়তে দিলো না। দেওয়াল থেকে বলকানো মাথাটা তুলে খিজির দ্যাখে রাস্তায় লোকজন নাই। তার শরীর একেবারে এলিয়ে পড়ে। তবে এই সময় সুভাষ বোস এ্যাভেনু বা হৃষিকেশ দাস রোড কি নন্দলাল দত্ত লেনের মুখে কোনো ট্রাকের অসহিষ্ণু হর্নের আওয়াজে খিজিরের কান চোখ গাল ঠোঁট সব ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সমস্ত গতরটা আপনা-আপনি গোছগাছ হলে খিজির সোজা উঠে দাঁড়াতে পারে।

মহাজনের বাড়ি গেলে মহাজন রহমতউল্লা বা সায়েব আলাউদ্দিন প্রায় কিছুই বকাবকি করে না। আলাউদ্দিনের কথায় বরং একটু প্রশ্রয়, 'বছরকার একটা দিন, বলদটা! গ্যারেজের মইদ্যে কাটাইয়া দিলি? নামাজটা ভি পড়লি না?'

'আরে রাখো!' রহমতউল্লা সোজাসুজি কাজের কথায় আসে, 'এ্যাগো আবার নামাজ কালাম!—গাড়ি দিলে কয়টা? বাকি পসা পাইছস?'

রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে আদায়-করা বাকি পয়সা গুণে নিতে নিতে রহমতউল্লা তার ক্ষোভ প্রকাশ করে, 'এ্যাগো আবার নামাজ! ঈমান নাই, এ্যাগো আল্লা-রসুলের ডর আছে?' এবার কিন্তু খিজিরের সত্যি ভয় হয়। আল্লা-রসুলকে সরাসরি ভয় করার সাধ্য তার নাই। কিন্তু তার ঈমানের অভাবের কথা বলতে বলতে মহাজন যেভাবে তার দিকে তাকাচ্ছিলো তাতে সে বড়ো বিচলিত হয়। এর ওপর মহাজন তাকে ৫টা টাকা বকশিস দিলে খিজিরের গলা শুকিয়ে আসে। আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরে রহমতউল্লার কাছে গিয়ে বলে, 'মাহাজন! এই পাঁচ সিকা পসা দিবার কথা মনে আছিলো না। দেলোয়ার ইস্পোকের দাম দিয়া গেছে!'

মহাজনের মাধ্যমে গেঁথে-যাওয়া ঈমানের ভয় তবু তার কাটে না। রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে আদায় করা পয়সা এখনও তার কাছে রয়ে গেছে, ১টা আস্ত টাকার নোট, ১টা আধুলি, ১টা সিকি। ভাড়াইটাদের ঘরে ঘরে বাড়িওয়ালার পাঠানো খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেরিয়ে রাস্তায় দ্যাখা প্রথম ভিখারির থালায় আস্ত আধুলিটা ফেলে দিলো। সকালবেলা রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে পাওয়া পয়সা থেকে হাতানো ৩টে টাকার বেশির ভাগই হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় খিজিরের মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

৭

খাওয়া শেষ করতে করতে ওসমান জিগ্যেস করে, 'খিজির তো এখানে অনেকদিন থেকে আছো, না?'

সে তো বটেই। রহমতউল্লা মহাজনের বাড়ি, রিকশার গ্যারেজ, আলাউদ্দিনের গ্যারেজ, এই বস্তি, কিছুদিন একনাগাড়ে রিকশা চালানো, আলাউদ্দিনের গ্যারেজে ঢোকার পর রিকশার পর স্কুটার চালানো, রিকশা ও স্কুটারের যন্ত্রপাতি ঠিক করা, এই যে স্ক্রু আর প্লায়ার আর নাট বল্টু, এই যে চেসিস আর ব্রেক আর টায়ার, এই যে এখানে স্ক্রু বসানো, স্ক্রুতে স্ক্রু-ড্রাইভার ঘোরানো—এই তো চলছে কতোদিন থেকে। কতোদিন থেকে! কতোদিন থেকে! কতোদিন থেকে!—খিজিরের মুণ্ডুটা তার গতরের ওপর একটা স্ক্রুর মতো উল্টোদিকে খুলে যেতে থাকে।

খিজির সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'বহুত দিন!'

আউজকার কেস?—ফালু মিস্ত্রীর সঙ্গে থাকতে থাকতেই খিজিরের মা মহাজনের ওখানে ঠিকা কাজের ব্যবস্থা করে নেয়। দুপুরবেলা এসে বাসন মেজে দিয়ে যেতো, ফালু মিস্ত্রির সায় ছিলো, তার মনিবের বৌ ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারেনি। খিজিরের মায়ের এই কাজ যোগাড় করে দেয় রহমতউল্লার বাড়ির বাঁধা মাতারি, এই মাতারির নিয়ে-আসা মৌলবির পানি-পড়াতেই খিজিরের বিছানায়-পেচ্ছাব-করা বন্ধ হয়। বলতে গেলে রহমতউল্লার ভরসা পেয়েই খিজিরের মা ফালু মিস্ত্রীকে ছেড়ে চলে আসে। ফলে ঐ মাতারির চাকরিটা খোয়া গেলো। তখন থেকে তাদের খাওয়া-পরা, হাগা-মোতা সব এখানেই। মায়ে-পোয়ে সিঁড়ির নিচে গুটিসুটি হয়ে ঘুমাতো, তা হাত পা ছড়াবার অতো দরকারই বা কি? কিন্তু কোনো কোনো রাত্রে ঐটুকু জায়গা থেকে সে গড়িয়ে চলে আসতো বারান্দার দিকে। কখনো কখনো ঘুমের ভেতর কি নিমঘুমে তার পায়ে কি হাতে খিজির অন্য কোনো শরীরের ছোঁয়া বুঝতে পেরেছে। ঘুমের ঘোরে একদিন সে মায়ের পিঠ ছুঁতে গিয়েছিলো। কিন্তু তার হাত ঠেকে মোটাসোটা ১টা পিঠে। আরেকদিন তার চিবুকে লেগে গিয়েছিলো শক্ত সমর্থ সেই হাত। ভয়ে সে 'মা' বলে ডেকে ওঠে। ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি এই ডাক ঠিক স্পষ্ট হয়নি। বারান্দার দিকে সরে পাশ ফিরে জোড়াহাঁটুর মাঝখানে হাতজোড়া রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

এর একদিন পর একবার আড়ালে ডেকে মা বলে, 'মাহাজনের রিকশার গ্রাজ আছে না?'

'আছে না? আমি কতো গেছি! এই তো এই বাড়ির পাঁচিল পার হইলেই গ্রাজ!'

রহমতউল্লার রিকশার গ্যারেজের বর্ণনা দেওয়ার জন্য খিজিরের উৎসাহের আর শেষ নাই।

'গ্রাজ বলে রাইতে খালি থাকে?'

'নাঃ! রাইতে তোতামিয়া থাকে। তোতায় কয় গ্রাজের মইদ্যে মাহাজনেরে কইয়া মিলাদ পড়াইতে হইবো। জিনে বহুত জ্বালায়!'

ঐগুলি কোনো কথা না', এবার খিজিরের মা আসল কথা পাড়ে, 'তুই মাহাজনের গ্রাজের মইদ্যে থাকবি, রাইতে থাকবি। মাহাজনের অনেকগুলি গাড়ি, কেউরে বিশ্বাস করবার পারে না!'

এইবার খিজিরের একটু ভয় করে, 'একলা থাকুম?'

'একলা থাকবি ক্যালায়? তোতামিয়া আছে না?' মায়ের এই কথাতেই খিজির চুপ করে যায়। পরপর কয়েকটা রাত্রি গ্যারেজে কাটলো, খিজির রান্নাঘরে এসে মায়ের সঙ্গে খেয়ে যায়, তেমন করে কথা বলে না। ছেলের সঙ্গে কথা বলতে খিজিরের মায়ের কেমন বাধো বাধো ঠেকে। একদিন বিবিসায়েবের চোখ এড়িয়ে সরিয়ে-রাখা মুরগির একটা রান ছেলের পাতে দিয়ে জিগ্যেস করে, 'রাইতে ডরাস?'

'না ডর কিয়ের?' মুরগির রানে খিজিরের তখন অখণ্ড মনোযোগ। পারে তো হাড়ের গুঁড়ো সব গিলে ফেলে।

এসব কবেকার ঘটনা, কতোদিন আগে ঘটলো? দিন তারিখ খিজিরের মনে থাকে না, কিন্তু সেইসব ঘটনা দেখতে দেখতে তার লাল রেখা-উপরেখা কবলিত চোখজোড়া খচখচ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মায়ের রক্তে-ভাসা শরীরের ছায়া পড়ায় চোখজোড়া লাল টকটকে হয়ে ওঠে। খিজিরের চোখেই যেন তার মায়ের সব রক্ত মোছা হয়ে যাচ্ছে।

মায়ের রক্তপাত ঘটেছিলো শেষরাত্রে। খুব ভোরবেলা, প্রায় রাত থাকতে থাকতেই বিবিসায়েবের তলব পেয়ে ঘুম-জড়ানো চোখে খিজির গ্যারেজ থেকে এসে দ্যাখে যে, তার মায়ের কাপড়চোপড় সব কালো রক্তে মাখা। সকাল ৮টার মধ্যেই মহাজন তার দাফনের সব ব্যবস্থা করে ফেলে। মহাজনের অনেক পয়সা বেরিয়ে গিয়েছিলো। মাকে ধোয়াবার জন্য নতুন একটা বাঙলা সাবান কেনা হয়। কতো কর্পূর, কতো আতর, গোলাপজল, আগরবাতি! তখন মহাজনের ঘরে বংশালের বিবি। মহাজনের প্রথম বৌ। দিনরাত নামাজ রোজা অজিফার মধ্যে থেকে বিবিসায়েবের বয়স বেড়ে গিয়েছিলো অনেক, এর ওপর ১৩/১৪ বছরের একমাত্র ছেলে আওলাদ হোসেন মারা যাওয়ার পর পরপর দুটো মরা বাচ্চা হলো, এরপর শুরু হয় তার ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক। দিনের মধ্যে ৩ বার ৪ বার গোসল করা, ২৫ বার অজু করা আর ৫০ বার হাতমুখ ধোয়া। ওদিকে মহাজনের দ্বিতীয় বিবি বেগমবাজারের খানদানি ঘরের আওরত,—সেও সতীনের ঘর করবে না। রহমতউল্লা তো বড়ো বৌয়ের কথা লুকিয়ে তাকে বিয়ে করেনি। তাহলে? অবশ্য এরকম একটা আভাস দিয়েছিলো যে, বড়ো বৌকে আলাদা বাড়িতে রাখবে। কিন্তু তাই কি হয়? ছেলেপুলে না-ই বা দিতে পারলো, সে হলো তার প্রথম স্ত্রী। তার বাপের পরামর্শ ও পয়সা দিয়েই রহমতউল্লা প্রথম রিকশা কেনে। এই বিয়ের পরই তার টাকা পয়সা আসতে শুরু করে, নামডাক হয়। বড়ো পয়মন্ত বিবি। তাঁর ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক সহ্য না করে রহমতউল্লার উপায় কি? বড়ো বৌয়ের বাঁকা বাঁকা কথাতেও মহাজন কখনো রা করতো না। খিজিরের মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে বড়ো বিবি বলে, 'মায়ের লগে লগে থাকবার পারস নাই? তুই লগে থাকলে তর মায়ে এমুন কইরা তরে ছাইড়া যায় গিয়া?' খিজিরের কিন্তু খুব অস্বস্তি ঠেকছিলো, বিবিসাবরে আউজকা না হউক ৫০ বার নাহাইতে হইবো! —কিন্তু ৫০ বার গোসল করুক আর ১০০ বার অজু করুক, সেদিন রাত্রে বিবিসায়েব নিজের ঘরের মেঝেতে শুতে দিয়েছিলো খিজিরকে। তার সামনেই বিবিসায়েব মহাজনকে বকে, 'হাবিয়া দোজখের মইদ্যেও তোমার জায়গা হইবো না আওলাদের বাপ! কি খাওইয়া দিছিলা, কও তো? তোমার আখেরাত নাই? গোর-আজাবের ডর নাই?' মনে হয় পরকালে স্বামীর গতি নিয়ে বিবিসায়েব বড়ো উদ্বিগ্ন। বৌকে কাঁদতে দেখে রহমতউল্লা একটু বিব্রত হয়, 'আরে আওলাদের মাও, তুমি এইগুলি কি কও? মইরা গেছে, কইতে নাই, আবার হাছা কথা না কইয়াও থাকতে পারি না,' গলা নামিয়ে বলে, 'খারাপ মাইয়া মানুষ, কার লগে আকাম উকাম কইরা প্যাট বাধাইয়া বসছে, অহন প্যাট খসাইবার গেছিলো, গিয়া এই মুসিবত। খাড়াও না, চাকরবাকর, রিকশার ডেরাইভার উরাইভার ব্যাকটিরে আমি ধরুম!'

'থাউক!' বিবিসায়েব চোখ মুছে বলে, 'পোলারে এইগুলি হুনাইয়া ফায়দা কি?'

'পোলায় কি ফেরেশতা? মায়ের কারবার পোলায় জানে না, না? এ্যারে জিগাও তো, বাপের নাম কইবার পারবো? জিগাও না!'

বিবিসায়েব জিগ্যেস করে না। মায়ের মৃত্যুর দোষে ও মায়ের মৃত্যুর শোকে খিজির এমনি নুয়ে পড়েছিলো, এর উপর বাপের নাম না জানার অপরাধ যোগ হওয়ায় সে একেবারে নেতিয়ে পড়ে। সে কি আজকের কথা? তবু দ্যাখো, জুরাইন গোরস্তানের কবরের ভেতর মাটিতে মাখামাখি কালো রক্তে ডুবসাঁতার দিতে দিতে ভুস করে ভেসে উঠে মা তার দিকে তাকায়। বেলাহাজ বেশরম মাগীটার শরম হায়া যুদিল এট্টু থাকে! মওতের পরেও কি মানুষের খাসলত বদলায় না?—সেই কতোকাল আগে এসব কাণ্ড ঘটেছে, এর পর মহাজনের পয়লা বিবি এক শীতের রাতে আড়াই ঘণ্টা ধরে গোসল করে নিউমোনিয়ায় ভুগে মরে গেলো। এর মাস ছয়েক আগে থেকেই অবশ্য বেগমবাজারের খানদানি ঘরের আওরাত মেয়েকে নিয়ে মহাজনের ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। তা পয়া এই বিবিরও কম নয় এর আমলে মহাজন নবদ্বীপ বসাক লেনে সরকারী পায়খানা ও পানির পাম্পের পেছনে মস্ত বড়ো বস্তির মালিক হলো। খিজিরের মা মাগী আজও সেই বস্তিতে খিজিরের ভাড়াটে ঘরে আসে ছিনালীপনা করতে। বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, এখনো মাঝে মাঝে অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে নিমঘুম নিমজাগরণে খিজির বুঝতে পারে যে, মোটাসোটা একটি হাত তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে বুকে চাপ দিচ্ছে। 'মা'—এই সম্বোধন করার জন্যে তার শ্লেষ্মা-জমা ও সিগ্রেটের ধোঁয়ায় কালি-মাখা গলায় ঝাপশা ধ্বনিপুঞ্জ জমা হয় এবং মাথার ওপরকার কেরোসিন টিনের ছাদকে তখন সে ধরে নেয় সিঁড়ির উল্টাপিঠ বলে। তবে এই হাল বেশিক্ষণ থাকে না। জুম্মনের মায়ের সশব্দে পাশ ফেরার আওয়াজে মা এবং অন্যজন হাওয়া হয়ে যায়। বাঁশের বেড়া ও ভাঙাচোরা টিনের ফাঁক দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পোস্টের আলো এসে পড়ে জুম্মনের মায়ের মুখের বাঁদিকে। বৌয়ের গোলগাল কালো মুখে বসন্তের কয়েকটি দাগে লুকিয়ে থাকে ঘোলা আলো। খিজির তখন ঘর্ঘর-করা গলায় 'মা' বলে বৌকে জড়িয়ে ধরে।

আজ জুম্মনের মায়ের সঙ্গে থাকতে পারলে ছিনাল মায়ের দাপটটা সামলানো যায়। বেলা তিনটে সাড়ে তিনটের দিকে জুম্মনের মা রোজ একবার ঘরে আসে, প্রায় ঘণ্টাখানেক থাকে। আজ কি তার আসবার সময় হবে না? এখন মহাজনের বাড়ি গেলে হতো। তাহলে জুম্মনের মায়ের সঙ্গে কি একবার দ্যাখা হয়!

খিজির বোধহয় সিঁড়ির সবগুলো ধাপও নামে নি, এরই মধ্যে ওপর দিককার ধাপগুলোতে কোলাহল শোনা যায় এবং এক মিনিটের মধ্যে ওসমানের ঘরে ঢোকে রঞ্জু।

'আপনে না বাইরে গেলেন! কখন আসলেন?'

'যেতে পারলাম না। নিচে নামছি, খিজির এসে হাজির। এখন যাচ্ছি।' রঞ্জুর পেছনে রানু ও ফরিদা। ওরাই কথা বলছিলো বেশি। ওসমানকে দেখে দুজনে হঠাৎ থামে। ওসমানকে একবার দেখেই রানু চোখ রাখে আরেকটা দরজা পেরিয়ে ছাদে, সেখানে ছাদ-ভাসানো রোদ। ওসমান বলে, 'তোমরা ছবি তোলো। চমৎকার রোদ আছে।'

ফরিদার পেছনে কচি কচি মার্কা চেহারা লম্বা একটি তরুণ। তার খয়েরি রঙের চাপা প্যান্ট, চেন-খোলা জ্যাকেট, গলায় বেগুনী-হলুদ সিল্কের স্পার্ফ। তার ঘাড় থেকে ঝোলানো ক্যামেরা, সারা শরীর থেকে সেন্টে ঝাঁঝালো গন্ধ বেরুচ্ছে। ছোকরা ওসমানের দিকে হাত বাড়ায়, 'আশিকুর রহমান বাদল, পাকিস্তান টোব্যাকোতে সেলসে কাজ করি।' করমর্দন

করতে করতে ওসমান নিজের নাম বলে এবং শুধু রঞ্জুর কাছ থেকে বিদায় চায়, 'তাহলে চলি।'

রঞ্জুর হঠাৎ কি মনে হয়, বলে, 'না না যাবেন কেন। আপনেও থাকেন না!' ওসমান ইতস্তত করে, সে থাকবে কেন? ইয়ং হাজব্যান্ডও আহ্বান জানায়, 'আপনি থাকেন না! মোস্ট ওয়েলকাম।'

রঞ্জুর উৎসাহ এতে বাড়ে, 'আপনে থাকেন। দুলাভাই আমাদের ছবি তুলবে, কিন্তু দুলাভাইয়ের ছবি তুলবে কে?'

কিন্তু ক্যামেরা জিনিসটা চালানো সম্বন্ধে ওসমানের কিছুমাত্র ধারণা নাই। সে তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার একটু কাজ ছিলো!'

রঞ্জু বলে, 'ঈদের দিন আবার কাজ কিসের?'

ফরিদার দিকে তাকিয়ে রানু আস্তে করে বলে, 'তোরে দেইখা ভয় পাইছে।' লালচে হয়ে যাওয়া মুখ সত্ত্বেও ফরিদা হাসে, 'ভয় টয় পাইলে তোরেই পাইতে পারে। আমরা উনার আর কি করতে পারি?'

ফরিদার কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে রানু ওসমানকে অনুরোধ করে, 'আপনি থাকেন। এই দুইজনে একসঙ্গে ছবি তুলবে বইলাই তো আসছে। আসল তো এই দুইজন, আমরা ফাউ। আসল ছবি তুলবে কে?' বলতে বলতে রানু হেসেই অস্থির।

ওসমান এবার কথায় বেশিরকম জোর দেয়, 'না, না। আমার একটা কাজ আছে।'

নিচে নামতে নামতে ওসমান ফের প্রব্লেমে পড়ে, এবার অন্যভাবে : এভাবে হুট করে চলে আসাটা ঠিক হলো না। রানুর শ্যামবর্ণ মুখের নীলচে ঠোঁটজোড়ার সব কৌতুক এতোক্ষণে নিশ্চয়ই নিভে গেছে। রঞ্জুটাও মন খারাপ করবে। ক্যামেরা চালাতে না পারাটা কি অপমানজনক অযোগ্যতা? এ নিয়ে এতো জড়সড় হওয়ার কি আছে? শওকত সাইকেল চালাতে পারে না, কিন্তু তাই নিয়ে শওকত নিজেই কতো মজার মজার গল্প করে! অফিসের খলিলুর রহমান বেশ তোতলা, তা নিয়ে লোকটার সঙ্কোচ তো নাইই, বরং এই নিয়ে নিজেই কতো হাসিঠাট্টা করে! তো ওসমান এরকম পারে না কেন? —দ্যাখো তো, রানুর এতো মিনতি ঠেলে সে চলে এলো। তালেব যেদিন মারা গেলো রঞ্জুর ঠোঁট কি সেদিনকার মতো বেগুনি হয়ে গেছে? —আসলে এইসব ছবি তোলা, হৈ চৈ করা—কয়েক সপ্তাহ আগে নিহত ভাইয়ের শোক ভোলার জন্যেই তো এসবের আয়োজন। ঘরে তাদের মায়ের বিরতিহীন বিলাপ। বাপটা ঈদের নামাজ পড়ে এসে সেই যে বিছানায় শুয়েছে এখন পর্যন্ত কারো সঙ্গে ভালো করে দুটো কথাও বলেনি। ফরিদা আজ স্বামীকে নিয়ে এসেছে কেন? বন্ধুর শোকটাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটু চাপা দিয়ে রাখার জন্যেই তো, তাই না? রানু তার সঙ্গ চেয়েছিলো, এখন সঙ্গ মানে বেদনার একটু ভাগ নেওয়া। তার ছোট্ট এই আবদারে ওসমান সাড়া দিতে পারলো না, ওসমানের এই প্রত্যাখ্যানে ভাইবোনের শোক ভুলে থাকার সমস্ত আয়োজনটাই পণ্ড হয়ে গেলো।—সিঁড়ির রেলিঙ ধরে ওসমান দাঁড়িয়ে থাকে। এখন যদি ও ছাদে যায় তো ওদের ছাইচাপা উৎসব আবার জ্বলে উঠতে পারে।

ঠাণ্ডা ও অন্ধকার সিঁড়িতে ওসমান বড়োজোর মিনিট তিনেক ছিলো। তিন মিনিট পরে রোদ-ভাসানো ছাদে উঠে ওর চোখে ধাঁধা লাগে, প্রথম কয়েক সেকেন্ড ভালো করে তাকাতেই পারে না। তারপর সব স্পষ্ট হলে দেখলো যে, এই কয়েক মিনিটে ওদের ছবি

তোলার আয়োজন কী বিপুল পর্যায়ে উঠেছে! ফরিদার বর ঐ ছোকরা এমন কায়দা করে ক্যামেরা ধরেছে যে, মনে হয়, ব্যাটা সত্যজিৎ রায় হবার জন্য স্টেজ রিহার্সেল দিচ্ছে। সত্যজিৎ রায়ের নাম জানিস নাকি ব্যাটা? দেখিস তো ওয়াহেদ মুরাদ-জেবা আর সুচন্দা-রাজ্জাকের ছবি! ওসমানও অবশ্য এসবই দ্যাখে। তবে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' দেখেছে, টিকেট পায়নি বলে 'মহানগরী' দ্যাখা হয়নি। ঐ ক্যামেরাম্যান শালা এসব ছবির নাম জানে? ওর পোজপাজে মেয়ে দুটো একেবারে মুগ্ধ। তারা একবার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়, একবার হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। এতো হাসির ছটা আর থামে না!

ওসমানকে ফিরে আসতে দেখেও এদের হাসির কারণ কি থাকতে পারে? ওসমান এখন কি করবে? 'রঞ্জু' বলে ডেকে ওদের দিকে এগিয়ে চলে। তার তো বলার কিছুই নাই। চুপচাপ আরেকটু এগুতেই রঞ্জু বলে, 'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, ক্যামেরার সামনে আইসা পড়েন ক্যান? দ্যাখেন না বাদল ভাই ছবি তুলতাছে।' ওসমানকে শেষ পর্যন্ত বলতে হয়, 'রঞ্জু, মনে করে দরজাটা বন্ধ করে দিও কিন্তু।'

ক্যামেরার লেন্স বোধ হয় ফরিদা, রানু, রঞ্জু এমনকি ছাদের রেলিঙ পর্যন্ত শুষে নিচ্ছে। এখান থেকে রানুর প্রোফাইলটা দ্যাখা যায়। শ্যামবর্ণের গালে রোদের ঝাপটা লেগে চামড়ার ওপর পাথরের এফেক্ট দিচ্ছে! ওর ঠোঁটে রোদের চিকন একটি আভা। উত্তেজনা, লজ্জা ও খুশিতে রানুর ঠোঁটজোড়া কাঁপছে। কি রোদ! রোদ মনে হয় কাঁচের পার্টিশনের মতো ওদের সবাইকে ওসমানের স্পর্শের বাইরে রেখে দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওসমান এবার তাড়াতাড়ি নামে। সত্যজিৎ রায়ের ক্যারিকেচার এই ছোকরার ক্যামেরার ক্যারদানিতে ওদের যে ভক্তি দ্যাখা যাচ্ছে তাতে ভয় হয় যে, যাবার সময় দরজা বন্ধ করার কথা খেয়াল থাকবে না। রঞ্জুকে আরেকবার তালা লাগাবার কথা বলে গেলে ভালো হতো। এখন ওসমানের সাধ্য কি ঐ উৎসবে ঢোকে? তালা টালা না লাগিয়ে চলে গেলে ওসমানের ঘরে যদি চুরি হয় তো রঞ্জু ও রানু বেশ অপরাধী হয়ে থাকে। তখন তাদের ক্ষমা করার একটা সুযোগ হয় ওসমানের। কিন্তু ওসমানের ভাগ্যে কি সেই সুযোগ আসবে?

৮

বস্তিতে ঢোকার মুখে একটুর জন্যে গুয়ের ওপর খিজিরের পা পড়েনি। তার রাগ হয়, 'এইগুলি জানোয়ারের পয়দা না কিয়ের বাচ্চা বুঝি না! এতো বড়ো একখান নর্দমা পইড়া রইছে, পোলাপানের হাত ধরাইয়া বহাইয়া দিলে কি হয়?'

বস্তির প্রথম ঘরের দরজায় চার বছরের ন্যাংটা ছেলের পাছা ধুয়ে দিচ্ছিলো বজলুর বৌ। সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করা হলো বজলুর পেশা, ঈদের দিন স্বামীর মোটা রোজগারের সম্ভাবনায় বজলুর বৌয়ের আজ দাপটই আলাদা, সে সঙ্গে কিচকিচ করে ওঠে, 'আটকুইড়া

হিজড়া মরদ, পোলাপানের তকলিফ বুজবো ক্যামনে? নর্দমার মইদ্যে পোলায় পইড়া গেলে তুলবো ক্যাঠায়?'

জবাব না দিয়ে ঘরে ঢোকার জন্যে খিজির মাথা নিচু করেছে, এমন সময় ভেতর থেকে বাইরে উঁকি দিলো জুম্মনের মা। এক পলকের জন্যে বৌয়ের মুখ টাটকা দ্যাখায়, মনে হয় কষে সাবান ঘষে মুখ ধুয়ে স্নো পাউডার মেখেছে। তার ভাঙা গালের নকশাই পাল্টে গেছে, তার কালো রঙের ওপর পাতলা ছাই রঙের আভা, কিন্তু জুম্মনের মায়ের তীক্ষ্ণ ও ছুঁচলো কণ্ঠস্বরে এই মুগ্ধতা আড়ালে পড়ে যায়, 'চোট্টার খানকিটার চাপার খাউজানি মনে লয় বাড়ছে। বাড়বো না? বাড়বো না ক্যালায়?' তারপর ফজলুর বৌয়ের বাকস্পৃহা বৃদ্ধির কারণ নির্ণয় করে সে নিজেই, 'চোট্টাগুলির আউজকা বেলাক করনের দিন! চান্দে চান্দে পুলিসের চোদন না খাইলে চোট্টাগো গতরের মইদ্যে ফোসকা পড়বো না? হাজত না চোদাইয়া বৌ পোলাপানের ভাত দিবার পারে না,—হেই চোট্টা মরদের মুখের মইদ্যে আমি প্যাসাব করি।'

তার ইজ্জত রাখার জন্যেই বৌ রুখে দাঁড়িয়েছে, বৌয়ের প্রতি খিজির তাই একটু গদগদ হয়, তকপোষে এলোমেলো করে পাতা কাঁথার ওপর একটু একটু করে শুয়ে পড়ে। পাশে বসতে বসতে জুম্মনের মা বলে, 'আঃ! সইরা শোও।' খিজির একটি হাত রাখে বৌয়ের কোমরে। জুম্মনের মাকে নিয়ে ম্যাটিনিতে আজ সিনেমা দেখলে কেমন হয়? খিজির এতো সিনেমা দ্যাখে, জুম্মনের মাকে কোনোদিন সঙ্গে নেয়নি। স্টারে 'হীরা আওর পাথ্‌থর' খেলে মোহাম্মদ আলী-জেবার ছবি, চাল্লি হলো নিরালা। বৌকে এখন কথাটা বলে কি করে? এতো সিনেমা দেখেও কায়দা করে কথা বলাটা খিজির এ পর্যন্ত রপ্ত করতে পারলো না। তার শক্ত ও লম্বা আঙুলগুলো আনাড়ি বাদকের মতো বৌয়ের পিঠে বারবার ওঠানামা করে, ছেমরিটাকে যদি এভাবেই বাজিয়ে তোলা যায়। কিন্তু এর আগেই ঝনঝন করে ওঠে বজলুর বৌয়ের গলা, 'চোট্টাও হইতে পারে, বেলাক ভি করবার পারে। মগর ভাতার আমাগো একটাই! একখান ভাউরারে গলার মইদ্যে সাইনবোর্ড বাইন্দা আমরা দুনিয়া ভইরা মানুষরে মারা দিয়া বেড়াই না।' বজলুর বৌ কাজে যাচ্ছে, বিকালবেলা ২টো বাড়িতে তাকে বাসন মাজতে হয়, একটা বাড়িতে পানি দেয়। ছেলেটা এখন তার কোলে, খিজির তাকে জানোয়ারের বাচ্চা বলায় আজ মায়ের কোলে উঠতে পারলো।

বেড়ার সঙ্গে লটকানো ছোটো আয়নার সামনে জুম্মনের মায়ের কেশবিন্যাস অব্যাহত থাকে, ঠোঁটে চেপে ধরা রঙ-জ্বলা ফিতা হাতে নিতে নিতে সে বজলুর বৌয়ের শেষ বাক্যটি শোনে, 'আমরা আর মাইনষের বাড়ি কাম করি না, না? কৈ আমরা ইসনো পাউডার মাইখা খানকিটা হইয়া মাহাজনের বাড়ি যাই?'

খিজিরের কান কুঁকড়ে আসে: আবার হালার মাহাজন! রহমতউল্লা মহাজনের বাড়ির কাজ থেকে জুম্মনের মাকে ছাড়িয়ে আনাটা খুব জরুরি। বজলুর বৌয়ের এই সব কথা শুনতে শুনতে তার একেকবার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে,—কিন্তু কি ইচ্ছা করে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু ভাবতে পারে না। শুয়ে শুয়েই শক্ত হাতে তার বাহুমূল ধরলে জুম্মনের মা বলে, 'ছাড়ো!' কিন্তু হাতটা সে ছাড়িয়ে নেয় না। শুধু বলে, 'জোয়ান মরদটা দুপুরবেলা ঘরের মইদ্যে হুইয়া থাকো, শরম করে না?'

এবার তার কথা একটু নরম। খিজির আরেকটু কাছে ঘেঁষে, 'তরে হুইতে মানা করছে ক্যাঠায়?'

'আল্লাদ! কাম আছে না? কতোগুলি মানুষ আউজকা খাইতাছে! আল্লারে আল্লা! মাহাজনের বাড়ি কতো মেহমান আহে!' মহাজনের বাড়িতে অতিথি সমাগমের একটি দীর্ঘ তালিকা দিতে দিতে জুম্মনের মা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বেশির ভাগই শরীফ লোক, তসতরির সেমাই ছোঁয় কি ছোঁয় না, প্লেটের পোলাও আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়াই করে, জিভ পর্যন্ত তোলে না। কিন্তু বাসন তো মাজতে হয়। ঈদের দিন দামী দামী সব বাসন বার করা হয়েছে, জুম্মনের মা ছাড়া সেসব মাজবে কে? বিবিসায়েব ভরসা করবে আর কার ওপর? কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজার কথা বলতে বলতে জুম্মনের মায়ের বুক ফুলে ওঠে, 'না যাই গিয়া।'

বৌয়ের ফুলে-ওঠা সিনা দেখে খিজিরের চোখে ঘোর লাগে, একটু জড়িয়ে ধরে, 'আউজকা সায়েবে আমারে ছুটি দিছে। সায়েবের থন বেবি ট্যাক্সি লইয়া বারামু, যাইবি? এক্কেরে নিউ মার্কেট, শাহবাগ, রমনার মাঠ ঘুরাইয়া আনুম, যাইবি? এয়ারপোর্ট ভি যাইবার পারি। ক্যামনে পেলেন উঠে দেখবি? যাইবি?' আলাউদ্দিন মিয়া অবশ্য স্কুটার দেবে না, তবে রিকশা একটা পাওয়া যাবে। বৌকে বেবি ট্যাকসির কথাই বলা ভালো। 'যাইবি?'

ঢ্যাঙা রোগা স্বামীর এই আহ্লাদি বচনে জুম্মনের মায়ের শরীর একটু শিরশির করে বৈ কি! সে চুপ করে থাকে। এমনকি কাপড় জামা ভেদ করে খিজিরের একটি হাত তার স্তন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করলে সে বরং একটু এলিয়েই পড়ে। কিন্তু নাঃ। মহাজনকে চটানো ঠিক হবে না। মহাজনের ভারি হাতের চাপে তার দমবন্ধ হবার জোগাড় হলে কি হয়, জুম্মনকে তো তার কাছে এনে দিতে পারে মহাজনই। ছেলে তখন তার কাছে থাকবে; মহাজনের বাড়িতে, গ্যারেজে কতো কাজ, ঢুকিয়ে দেবে কোথাও। তারপর? তারপর, বড়ো হলে মহাজন একটা রিকশা কিনে দেবে।—রিকশার ভাড়া দিতে হবে না, এমনকি লাইসেন্সের পয়সাও দেবে মহাজন।—গতকাল চাঁদের রাতে মহাজন নিজে তাকে কথা দিলো, হাজার হলেও নামী দামী মানী লোক, সে কি ফালতু কথা বলবে?

রাত তখন অনেক। রাত পোহালেই ঈদ। জোগাড়যন্ত্র করতে করতে জুম্মনের মায়ের বলে হাঁসফাঁস উঠে গেছে। ঠিকা ঝি আবুলের মা ছেলের এ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে চলে গেছে রাত ১০টার আগেই। আস্ত একটা খাসির নানারকম তরকারি, দশ সের গরুর গোশ্‌তের ভুনা, কাবাবের কিমা, কয়েকটা মুরগি!—মশলা বাটা চলছে তো চলছেই। সকালবেলার জন্যে সেমাই ভাজছে জুম্মনের মা, নামাজে যাবার আগেই সবাই সেমাই খাবে।—এটা সেটা করতে করতে রাত্রি হলো ১টা কি দেড়টা। বসার ঘরের দরজার কোণে টেলিভিশন দেখতে দেখতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আবদুল, একটু রাত হয়ে গেলে জুম্মনের মাকে এগিয়ে দিয়ে আসে সে-ই। সব গুছিয়ে আবদুলকে ডাকতে জুম্মনের মা বসার ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সিঁড়ির গোড়া পার হবার সময় মহাজন ডাকলো, 'যাস?'

তার কণ্ঠ শুকনা ও কাঁপাকাঁপা। রহমতউল্লা ফের বলে, 'যাস গিয়া?' তারপর গায়ের শালের নিচে থেকে কাগজের একটা প্যাকেট তার দিকে এগিয়ে ধরে, 'ল।' মহাজন তার একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে, হঠাৎ তার ঘাড়ে হাত রেখে বলে, 'বহুত মেহনত হইছে, না?' তার গলা এত কাঁপছিলো যে, এই কথায় কোনো দরদ ফোটে না। ফের বলে, 'ল। তরে দিলাম। সেতারার মায়ে জানলে হাউকাউ লাগাইয়া দিবো।' ব্রেসিয়ারের প্যাকেট হাতে নিতে নিতেই জুম্মনের মা টের পায় জিনিসটা কি? সেতারা তাকে একবার একটা দিয়েছিলো;

সেতারার ব্যবহৃত, তবে তেমন পুরনো হয়নি। কিন্তু এইসব ছেমরি রঙচঙ যতোই করুক, এদের সিনা দেখলে মনে হয় পুরুষ মানুষের সিনাও এদের চেয়ে উঁচু। আজ মহাজন তাকে ঐ জিনিস দিলো একেবারে নতুন। লোকটা তার পিঠে হাত দিয়ে নিজের শরীর ঘেঁষে টেনে নেয়, ঘাড়ের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে বলে, 'কাউলকা তর পোলারে একবার দেখবি না? খিজিররে কইস নিমতলা না কৈ থাকে কামরুদ্দিন, খিজিরে গিয়া অর ঘর থাইকা লইয়া আইবো!' মহাজনের ভারি হাতের তলায় তার ঘাড়ের ভেঙে পড়ার দশা ঘটে। সেই ঘাড়ে মহাজন একটা চুমু খায়, তার বুকে হাত রেখে বলে, 'সিনা তর ফাস্ট কেলাশ। ঐটা পিন্দলে দেখবি কেমুন লাগে!' তারপর ফের জুম্মনের প্রসঙ্গ তোলে, নিচু গলায় ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজে মহাজন জুম্মনকে কোনো একটা কাজে লাগিয়ে দেওয়ার জবান দেয়। একটু বড়ো হলে তাকে রিকশা কিনে দেবে, ঘর দেবে।—মহাজনের নিশ্বাসের ভাপ লেগে তার গাল গরম হয়ে ওঠে। সে সিটকা মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, নিশ্বাস ছাড়তে জুম্মনের মায়ের অসুবিধা হয় না, কিন্তু নাক দিয়ে বাতাস টেনে নেওয়ার কাজটা যেন কতো কঠিন! এর মধ্যে একবার ভয় হয় দোতলা থেকে বিবিসায়েব যদি হঠাৎ এসে পড়ে! এখান থেকে দ্যাখা যাচ্ছে আবদুলকে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে ব্যাটা মহাসুখে ঘুমায়, তার মুখ ফাঁক হয়ে রয়েছে, আবার মহাজনের কাণ্ডকারখানায় চোখজোড়া ফাঁক না হয়! এই সময় রান্নাঘরের ভেতর থেকে বিড়ালের আওয়াজ পাওয়া যায়, 'ম্যাঁও!' মহাজন হঠাৎ করে তাকে ছেড়ে একটু পিছিয়ে বসে এবং বিকট হাঁক ছাড়ে, 'আবদুল! আবদুল! ওঠ! এ্যারে ঘরে দিয়া গ্যারেজে যা গিয়া! গ্যারেজ খালি পইড়া রইছে!'

মহাজনের সেই হাঁকে জুম্মনের মা যে দারুণ রকম চমকে উঠেছিলো আজ এই এখন পর্যন্ত তার রেশ যায়নি। খিজিরের দিকে একবার তাকিয়েই সে মাথা নিচু করে বলে, 'আউজকা তুমি জুম্মনরে একবার আনতে পারবা?'

'জুম্মনরে!' জুম্মনের কথা ওঠায় বৌকে নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণের উৎসাহ খিজিরের প্রায় নিভে যায়। মাগীটা তার ছেলের কথা একেবারে ভুলতে পারে না। ছ্যামরা এসে তো খিজিরের ঘাড়েই পড়বে, ওটাকে সামলাবে কে? ছেলের জন্যে অতোই টান তো ঐ কামরুদ্দিনের ঘর করলেই তো পারতো! আবার ৭/৮ বছরের এই পিচ্চির ওপর রাগ পুষে রাখতেও নিজেকে কেমন চোর চোর মনে হয়। গলায় একটু ঝাঁঝ এনে জিগ্যেস করে, 'জুম্মনে মালীবাগ থাকে না?'

'না! নিমতলীর কাছে রেল লাইনের লগে বস্তি আছে না? ঐ বস্তির মইদ্যে থাকে।'

'ওস্তাগরে না মালীবাগে ঘর লইছিলো?' ওস্তাগর বলে কামরুদ্দিন সম্বন্ধে খিজির একটু টিটকিরি করলো। কামরুদ্দিন আসলে জোগানদার, কিন্তু কথাবার্তা বলে শালা ওস্তাগরের স্টাইলে। দাদা পরদাদা নাকি কলতাবাজারের সেরা ওস্তাগর ছিলো, সেই দাপটে কামরুদ্দিন যখন তখন বৌ পেটাতো। মালীবাগ খিলগাঁয়ের দিকে আজকাল খুব দালান তৈরি হচ্ছে, তার নাকি কাজের শেষ নাই, ঐদিকে ঘর ভাড়া না নিয়ে তার উপায় কি? ব্যাটা আবার নিমতলী গেলো কবে?

আগের স্বামীর প্রতি বর্তমান স্বামীর এই শ্লেষ গায়ে না মেখে জুম্মনের মা বলে, 'কাম করতে করতে ভারা থাইকা পইড়া গিয়া অহন জোগানদারি করবার পারে না, একখান পাও বলে ভাইঙ্গা গেছে।'

'পাও ভাঙছে!' কথার ভঙ্গিতে ঠাট্টা অব্যাহত রাখলেও খিজিরের খারাপ লাগে। কামরুদ্দিন কিন্তু তার সঙ্গে কোনোদিন তেমন খারাপ ব্যবহার করেনি।

'অহন কি করে?'

'কায়েতটুলির মইদ্যে হুনি ডাইলপুরি ভাইজা বেচে।' জুম্মনের মা একটু হেসে বলে, 'যাইবা? জুম্মনেরে লইয়া একবার আমারে দ্যাখাইতে পারো? বছরকার একটা দিন, কি খাইবো, ক্যাঠায় দেখবো?' বৌয়ের এই ভিজে ভিজে কণ্ঠস্বর খিজিরের ঠিক পরিচিত নয়, এতে সাড়া দেওয়ার নিয়মকানুনও তার অজানা। ছোটো চোখজোড়া যতোটা সম্ভব বড়ো করে জুম্মনের মা ফের বলে, 'পোলাটারে বাপে যা জুলুমটা করে! তুমি একবার আনবা? মাহাজনে কইছে অরে কামে লাগাইয়া দিবো। গ্যারেজের মইদ্যে থাকবো, ডাঙর হইলে একখান গাড়ি কিন্যা দিবো। ভাড়া উড়া লাগবো না, যা কামাইবো অরই থাকবো।'

মহাজনের কথা ওঠায় খিজির একেবারে উঠে বসলো। জুম্মনের ওপর ঠিকমতো রাগ করতে বাধো বাধো ঠেকেছিলো, মহজনের ওপর সেই রাগ দিব্যি দশ গুণ উস্কে ওঠে, 'আবার মাহাজনে আহে ক্যামনে? মাহাজনের কথা কইতে না পারলে খোমাখান খাউজায়, না?' খিজিরের এই আক্রমণের পরও জুম্মনের মা আধ মিনিট চুপচাপ ছিলো। কিন্তু ছেলের দরদে বুঁদ হয়ে বসে থাকাটা তার পোষায় না, একটু সামলে নিয়ে সে ক্যাটক্যাট করে ওঠে, 'এইগুলি কি কও? তোমার মুরাদ হইবো? আমার পোলারে কাছে রাখবার মুরাদ হইবো তোমার? গোলামি করস মানুষের, চোপাখান বানাইছস নবাবের বাচ্চার!'

'মাগী কি কইলি? আবার ক! খানকি মাগী সাইজা গুইজা মাহাজনের লগে রঙ করতে যাস, না? কিয়ের জোরে রোয়াবি মারস?' কিন্তু জবাব না দিয়ে মাগী দুপদাপ করে বেরিয়ে যায়।

যতোই রাগ হোক, বৌকে খিজির মহাজনের বাড়ি থেকে ছাড়িয়ে আনে কি করে? কতোদিন আগে তার মা খিজিরকে নিয়ে এই বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিলো। না হলে ফালু মিস্ত্রির কিল চড় খেতে খেতে এ্যাদ্দিন কোথায় ভেসে যেতো কে জানে? তারপর ধরো, জুম্মনের মায়ের সঙ্গে তার বিয়েটা দিলো কে? জুম্মনের মা এ বাড়িতে আসে কাজ করতেই, তাতে কামরুদ্দিনের সায় ছিলো ষোলো আনা। যতোই রোয়াবি করুক, রাজমিস্ত্রির সঙ্গে জোগানদারের কাজ করে বাঙলা মদ টানা আর কান্দুপট্টি মারা, তারপর বৌপোলা সামলানো অতো সোজা নয়। তবে জুম্মনের মা প্রথম প্রথম সারাদিন কাজ করে ঘরে ফিরে যেতো, কামরুদ্দিন তখন কলতাবাজারে নিজেদের পৈতৃক বাড়ির ১টা অংশেই বাস করে। বড়োলোকের বাড়ি কাজ করে মাস তিনেকের মধ্যে জুম্মনের মায়ের গায়ে গোশত লাগে, এর মধ্যে তার ২টো শাড়ি জুটেছে, সেতারার স্নো পাউডার মাখে একটু সুযোগ পেলেই। তখন রাত্রে কান্দুপট্টি-ফেরত কামরুদ্দিনের হাতে মার খেতে তার আর ভালো লাগতো না। রুগ্ন বিবিসায়েবের খেদমত করার কথা বলে বিবিসায়েবের ঘরের মেঝেতে সে রাত কাটাতে শুরু করলো। একদিন সন্ধ্যার পর কামরুদ্দিন টলোমলো পায়ে মহাজনের বাড়ি এসে রান্নাঘর থেকে বৌয়ের চুল ধরে ছ্যাঁচরাতে ছ্যাঁচরাতে রাস্তায় নামায়। জুম্মনের মায়ের চ্যাঁচামেচিতে রাস্তায় ভিড় জমে যায় এবং বিবিসায়েব পর্যন্ত তার হাঁপানি ভুলে 'কেয়া হইস রে? কেয়া হইস রে?' বলতে বলতে নিচে নামে এবং তার প্রেরণা ও প্ররোচনায় বজলু, খিজির, আবদুল—এরা একজোট হয়ে কামরুদ্দিনকে বেশ ভালোরকম প্যাঁদানি দেয়।

এরপর লোকটা অনেকদিন আর এমুখো হয়নি। পৈতৃক বাড়ির ভাগ কোন চাচাতো না মামাতো ভাইয়ের কাছে বেচে দিয়ে মহাসুখে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ায়।

বেশ কিছুদিন পর এক বর্ষার রাতে, অনেক রাত্রি, মহাজনের গ্যারেজে এসে কামরুদ্দিন খিজিরকে ডেকে তোলে। খিজির সেদিন একা, তার একটু ভয় ভয় করছিলো, লোকটা সেদিনকার বদলা না নেয়। কিন্তু নাঃ! জুম্মনের মাকে একটা খবর দেওয়ার জন্যে সে খিজিরকে নির্দেশ দেয়। কি খবর?—না, কামরুদ্দিন গত রাতে যে মেয়েকে বিয়ে করেছে জুম্মনের মা তার বাঁদি হওয়ারও যোগ্য নয়। এই খবর দিয়ে সে চলেই যাচ্ছিল, ফের ঘুরে এসে বলে, 'তর মাহাজনেরে কইস আমি আইছিলাম। আমার নাম কামরুদ্দিন ওস্তাগর, আমার বাপের নাম হাসমত আলি ওস্তাগর, দাদার নাম লাল মোহাম্মদ ওস্তাগর, পরদাদার নাম নান্নু ওস্তাগর। নবাব বাড়ির গম্বুজটা বানাইছিলো নান্নু ওস্তাগরে, বুঝলি? তর মাহাজনে খুব বড়ো লোক হইছে, না! অর দাদার নাম জিগাইস তো, কইতে পারবো না!'

জুম্মনের মাকে পাঠানো খবরটা খিজির যথারীতি পৌঁছে দেয়। কিন্তু রহমতউল্লাকে দাদার নাম আর জিগ্যেস করতে পারেনি। খিজির নিজের বাপের নাম জানে না, সে জিগ্যেস করবে মহাজনের দাদার নাম? তবে কামরুদ্দিনের এই সব কথাবার্তা মহাজনের কানে ঠিকই পৌঁছে যায়। শুনে রহমতউল্লা প্রথম প্রথম খুব হাম্বিতাম্বি করছিলো, ইচ্ছা করলেই কামরুদ্দিনকে সে জেলের ভাত খাওয়াতে পারে। এক বৌ থাকতে জোগানদার হালা আবার সাদী করে কোন সাহসে? আইয়ুব খান নতুন নিয়ম করেছে, দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্যে প্রথম বৌয়ের অনুমতি দরকার। রহমতউল্লা হলো আইয়ুব খানের বিডি মেম্বর, সে নিজে যদি এসব বিষয়ে লক্ষ না করে তবে দেশের লোকের আইন অমান্য করার প্রবণতা তো বেড়েই যাবে। কিন্তু সমস্যা বাধায় মহাজনের বিবি! জুম্মনের মাকে রাখাটা তার দরকার, খিজিরের সঙ্গে জুম্মনের মায়ের বিয়ের উদ্যোগ নেয় বিবিসায়েব।

খানদানি ঘরের মেয়ে এই বিবিসায়েব বারো মাসের রোগী। সতীনের সঙ্গে ঘর করবে না বলে বিয়ের ২বছর পর ৬ মাসের মেয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলো বাপের বাড়ি, সতীন মরার আগে আগে স্বামীর ঘরে আসে। সঙ্গে ৪০ ভরি সোনা, ১মাত্র মেয়ে এবং হাঁপানি। রোগে ও দুঃখে সে প্রায় সব সময় হাঁপায় এবং হাঁপানির সংক্ষিপ্ত বিরতিকালে সশব্দ নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গতে তার বেগমবাজারের খানদানি বাপের বাড়ির মোরগপোলাও এবং নবাব বাড়ির কুবলির সাদৃশ্য, তার বাপের বাড়ির খাস্তা ও লাজিজ মোরগ কাবাবের সঙ্গে তার ননদের হাতের রাঁধা দড়ির মতো শক্ত চিকেন টিক্কার তুলনা, হঠাৎ-বড়োলোকদের জাফরানের বদল রঙ দিয়ে জরদা রান্না করার ছোটোলোকামি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজস্ব মতামতসমৃদ্ধ আলোচনা করে এবং নিজের রোগ ও ভাগ্য নিয়ে তীব্র অসন্তোষ জানায়। ক্লাস নাইনে ২বার ফেল করার পর সেতারা পড়াশোনা চালিয়ে যাবার অসারতা বেশ বুঝে ফেলেছে। সকাল বিকাল প্রসাধন এবং যখন তখন রেডিও সিলোন ও বিবিধভারতী শোনা ও উদ্বৃত্ত সময়ে মন ভার করে থাকার পর সে কোন কাজটা করার সময় পায়? জুম্মনের মাকে ছাড়া মা-মেয়ের একদণ্ড চলে না। বুকটা একটু বেশিরকম উঁচু হলেও এবং যখন তখন তার বুকের কাপড় পড়ে গেলেও বিবিসায়েব তাই তাকে সহ্য করে। মাতারিটা এমনি খুব কাজের, একটা কাজের কথা একদিন বলে দিলেই চলে। আবার এমনিতে বেশ সাফসুতরো। খিজিরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার সময় বিবিসায়েব মহাজনকে দিয়ে খরচও করালো, গ্যারেজের কর্মচারী ও

রিকশাওয়ালাদের বাকেরখানি ও অমৃতি খাইয়ে দিলো। বিবিসায়েবের জন্যে এসব কিছু না। তাদের বেগমবাজারের বাড়িতে এককালে বিড়ালের বিয়ে দিতেও তার বাপ ৫০০০ টাকা খরচ করেছে।

এতো খরচ করে তার বিয়ে দিলো, বড়োলোকের মতি, ১০টা দিনও যায়নি, গ্যারেজে রিকশাওয়ালাদের সামনে মহাজন খিজিরকে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসলো। কি ব্যাপার? 'চুতমারানি, আমারই খাইবি আমারই পরবি, আমি ঘর না দিলে জায়গা নাই, আর আমার লগে নিমকহারামি করস?'

কিভাবে? মহাজন তাকে জিগ্যেস করে, 'মহল্লার মইদ্যে দেওয়ালে পোস্টার লাগাইছে ক্যাঠায়? খুব বাইড়া গেছস, না?'

পোস্টার লাগাতে দিয়েছিলো তাকে আলাউদ্দিন মিয়া। সঙ্গে দুজন ছাত্র ছিলো, আলাউদ্দিন খুব সাবধান করে দিয়েছিলো, পুলিস যেন না দেখে। খিজিরের ইচ্ছা ছিলো লক্ষীবাজার এলাকায় সবগুলো দেওয়ালে পোস্টার সেঁটে ভিক্টোরিয়া পার্কের নতুন শহীদ মিনারের উঁচু গম্বুজে উঠে চারদিকে বেশ সাজিয়ে বাকি পোস্টার সব লাগাবে। কিন্তু ছাত্র ২জনের তাতে আপত্তি, অতো উঁচুতে তাকিয়ে পোস্টার পড়বে কে? এদিকে মোসলেম হাই স্কুলের দেওয়াল পর্যন্ত আসতেই পার্কের ওপারে কয়েকজন পুলিস দ্যাখা গেলো, ওরা সঙ্গে সঙ্গে চম্পট। বাকি পোস্টারগুলো খিজির রেখে দিয়েছে গ্যারেজের ভেতর, রিকশার বাতিল গদির নিচে, সুযোগমতো পুরনো কাগজওয়ালার কাছে বেচবে। মহাজন এতো চেতবে—এটা কিন্তু খিজির ধারণা করতে পারেনি। মহাজন বলে, 'তরে অক্ষণ ধরাইয়া দেই তো কয় বছরের জেল খাটতে হইবো, জানস?' পুলিসের অভাবে মহাজন নিজেই এই সব তৎপরতার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়ে, 'মানষে বোঝে না। এইগুলি ইন্ডিয়ার মতলব! ওয়ারে ডিফিট খাইয়া ইন্ডিয়া অহন এই ট্যাকটিস ধরছে। ছয় দফার পোস্টার মারস, আরে ছয় দফা হইলে পাকিস্তান থাকবো? আমরা পাকিস্তানের লাইগা ফাইট করছি, পাকিস্তান হইছে, মোসলমানের ইজ্জত হইছে! আবার দ্যাহো, কতো মানুষ চাকরি পাইলো, ব্যবসা বাণিজ্য তেজারতি কইরা কতো মালপানি বানাইলো! পাকিস্তান না আইলে ফকুরনির বাচ্চাগুলি হিন্দুগো গোলামী করতো! আমরা মালপানি বানাইবার পারি নাই, ক্যান?' সে সমবেত রিকশাওয়ালাদের প্রশ্ন করে, 'পারলাম না ক্যান?' উত্তরদাতাও সে নিজেই, 'মিয়ারা, ব্যাক দিবার পারি, মগর ঈমানটা?' এবারও সে নিজেই উত্তর দেয়, 'না, এইটা দিবার পারুম না! এইটা আমার! ধন দৌলত বড়ো কথা না, বুঝলা? ট্যাহাপসা প্যাসাবের ফ্যানা, এই আছে এই নাই।' নানারকম অপ্রাসঙ্গিক কথার পর সে নিজের বক্তব্য সংক্ষেপে জানায়, 'বহুত লিডার দেখছি! মালপানি কেউগায় কম কামায় নাই! অহন লাগছে পাকিস্তানটারে মিসমার করনের তালে। ইন্ডিয়ায় মাল ছাড়ে, আর এইগুলি গাদ্দারের পয়দা খালি ফাল পাড়ে।'

মহাজনের এই চাপাবাজির সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যে আলাউদ্দিনের বাড়ি সার্চ করে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গেলো। তখন তার গ্যারেজের দায়িত্ব নিলো রহমতউল্লা। রহমতউল্লার হুকুমে আলাউদ্দিনের গ্যারেজ দ্যাখাশোনা করতে হলো খিজিরকেই। ৭ মাস পর ফুলের মালা গলায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে আলাউদ্দিন খিজিরকে আর ছাড়ে না, তার অনুপস্থিতিতে লোকটা চমৎকার ম্যানেজ করেছে। রহমতউল্লার অনুমতি নিয়ে খিজিরকে সে নিজের গ্যারেজে নিযুক্ত করে, মামার বস্তিতে তার জন্য একটা ঘর ভাড়ারও ব্যবস্থা করে

দেয়। কিন্তু জুম্মনের মাকে মহাজন ছাড়বে না। জুম্মনের মা না হলে তার বিবিসায়েবের ঘর সংসার চালানো কঠিন। এর মধ্যে কতো কি ঘটলো, আলাউদ্দিন মিয়া স্কুটার কিনলো, তিন মাসের মধ্যে তার দুটো স্কুটার হলো। খিজির কখনো রিকশা চালায়, কখনো স্কুটার। তা খিজিরেরও উন্নতি হয়েছে বৈ কি! রিকশা বা স্কুটার চালাবার ফাঁকে ফাঁকে আলাউদ্দিন মিয়ার গ্যারেজের সামগ্রিক দ্যাখাশোনাটা তার দায়িত্বে। কিন্তু জুম্মনের মা মহাজনের বাড়ির কাজ আর ছাড়তে পারে না। খালি খালি মহাজনকে দোষ দিয়ে লাভ কি? ঘরের বৌ—সে কি-না তড়পায় খালি মহাজনের বাড়ি যাবার জন্যে। ঈদের দিন স্বামী কি খাবে না খাবে সেদিকে তার কোনো নজর আছে?—বৌয়ের ওপর রাগে খিজির বিছানায় উঠে বসে, তখন তার চোখ পড়ে ঘরের কোণে রাখা গামছায় জড়ানো গামলার দিকে। থালার নিচে গামলায় পোলাও ও মুরগির ১টা আস্ত রান। মাগী রানটা সরালো কিভাবে?—রান খেতে খেতেও বৌয়ের ওপর খিজিরের রাগ কমে না। আরে সে তো স্বামী, নিজের পেটের ছেলের দিকেও কি মাগীর কোনো খেয়াল আছে? ছেলে পড়ে আছে কোথায়, আজ তার জন্যে বার দুয়েক ফ্যাচফ্যাচ করে কেঁদে মা তার ডিউটি শেষ করলো। জুম্মনটা থাকলেও কাজ হতো, মহাজনের কব্জা থেকে বৌকে বার করে আনার জন্যে ছ্যামরাটাকে লাগিয়ে দিলে হয়।

হাপুশ হুপুশ করে খাওয়া শেষ করে খিজির গেলো আলাউদ্দিন মিয়ার বাড়ি। সায়েব তখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে একপাল ছেলে। খিজিরকে দেখে সায়েব ধমক দেয়, 'তুই থাকস কই? ২৪ নম্বরে তাজুদ্দিন সাবে আইছে, আমারে খবর দিছে, আমার ফিরতে দেরি হইতে পারে। বড়ো আপা পোলাপান লইয়া আইছে, মামুগো বাড়ি থাইকা অগো সাত রওজা পৌছাইয়া দিস, নয়া বেবিটা বাইর করবি!'

সায়েবের বোনকে বাড়ি পৌছে দিয়ে নাজিমুদ্দিন রোডের মাথায় রেলগেটের কাছে স্কুটার রেখে খিজির জুম্মনের খোঁজে বস্তিতে ঢুকলো। কোথায় জুম্মন? এই বস্তিতে কামরুদ্দিনকে কেউ চেনে না।

'আলিমুদ্দিন আছে একজন, আলিমুদ্দিনের কথা কন না তো?'

'আলিমুদ্দিনে তো তরকারি বেচে, সিগন্যালের লগে ঘর তুলছে।'

এই সব কথোপকথন চলে, কিন্তু জুম্মনের খবর পাওয়া যায় না। রেললাইনের ২দিকে লম্বা বস্তি, লাইনের মাঝে মাঝে ৩/৪ জন করে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও আগুন জ্বলছে, কোথাও কয়লা ভরা কড়াইয়ের আগুনের সামনে বসে হাত সেঁকে কয়েকটি মেয়ে। কোনো কোনো ঘর থেকে ধোঁয়া ওঠে; ধোঁয়ায়, কুয়াশায় ও অন্ধকারে মোড়ানো সারিসারি বেড়ার ঘর, ঘরের ওপর ইট-চাপা ভাঙাচোরা টিনের কিংবা বাঁশের চাল। ধোঁয়ার সঙ্গে কুয়াশার সঙ্গে স্থায়ী একটি দুর্গন্ধ বস্তির সীমানা নির্দেশ করে। খিজির এর মধ্যে হাঁটে এবং প্রায় সবাইকে কামরুদ্দিনের কথা জিগ্যেস করে। লোকজন তার সামনে আসে, এমনকি নাজিমুদ্দিন রোডের আলোকিত রাস্তা ভুলে শিশুরা রেল লাইনে দাঁড়িয়ে খিজিরকে দ্যাখে।

'না, কামরুদ্দিনরে না অইলেও চলে। অর বৌ, বাড়ি বাড়ি কাম করে।'

লোকজনের উৎসাহ থাকে না। বাড়ি বাড়ি কাজ করার মাতারির অতিথি এসেছে, তাকে অতো খাতির না দ্যাখালেও চলে। তাদের নিজেদের বৌরাই তো এই কাজ করে। ঘুরতে ঘুরতে রাত্রি বাড়ে, খিজিরের পায়ের নিচে কখনো রেলের কাঠের স্লিপার, কখনো পাথর।

আকাশে চাঁদ নাই, রেললাইনের ধারে ল্যাম্পোস্ট নাই। বড়ো রাস্তার একদিকের ল্যাম্পোস্ট থেকে আলো আসে, আলোর তলানি, তাতে বস্তির জবুথবু ঘরগুলোকে ট্রাকে ওল্টানো রিকশা বলে ভুল হতে পারে। শহরের মাঝখানে ঘোলা আলোর ভেতর, পথহীন ও যানবাহনশূন্য এরকম ১টি জায়গায় ২রেলের মাঝখানে কাঠের স্লিপার বা পাথর-মেশানো মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে খিজির আলি প্রতিটি ঝুপড়ির দিকে তীব্র চোখে তাকায়, জুম্মনকে দেখতে পেলেই ছোঁ মেরে তুলে নেবে। বস্তির এ-মাথা ও-মাথা করতে করতে সে ঘোরের মধ্যে পড়ে এবং এরকম কতোক্ষণ যে তাকে ঘুরতে হতো কে জানে? কিন্তু লুঙি-পরা, ঈদের দিনেও দাড়ি-না-কামানো, ভাঙাগাল ১টি লোক তাকে জিগ্যেস করে, 'লাগবো সাব?'

খিজিরের ঘোর কেটে যায়, ভয়ও কাটে। লোকটি ফের বলে, 'খালি খালি ঘুরাঘুরি করতাছেন। আমার লগে আসেন। গেরস্থ ভালো মাল আছে!' লোকটি তাকে ভদ্রলোকের মর্যাদা দেওয়ায় খিজির খুশি হয়, অবাকও হয়, বিচলিত হয় আরো বেশি। গৃহস্থ ঘরের এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে শোবে কি-না খিজির এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই লোকটি ভালো করে তার চেহারা দেখে কেটে পড়ে।

৯

নাজিমুদ্দিন রোডের মাথায় পৌঁছে খিজির দ্যাখে তার স্কুটারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ১টি তরুণ দম্পতি। মেয়েটির মুখে ল্যাম্পোস্টের আলো এসে পড়েছে, একবার দেখেই চোখ নামিয়ে খিজির বেবি ট্যাকসির ভেতরে বসতে যাচ্ছে, পুরুষটি বললো, 'ইন্দিরা রোড যাবে?'

'না।'

'চলো' পুরুষটি বেশ ডাঁটের। দামী পাজামা পাঞ্জাবির ওপর কারুকাজ করা ছাইরঙ শাল। চোখে পাতলা ফ্রেমের চশমা। এই চেহারার মানুষের হুকুম অমান্য করা কঠিন। মেয়েটার ধবধবে ফর্সা গায়েও লাল শাল। মিহি ও আদুরে গলায় সে বলে, 'চলো না ভাই!' স্টার্ট দিতে গিয়েও খিজির থামে, একটু আগে ঐ ভাউরা শালা যে গেরস্থ ঘরের মেয়ের কথা বলছিলো সে কি দেখতে এরকম হতো? 'চলেন।'

মহিলার পর লোকটি উঠতে উঠতে বলে, 'মিটার ঠিক নেই?'

'আজকার দিনেও মিটার লাগবে? ঈদের দিন বেশি দিয়েন সাব।'

'মিটার চালাও। মিটারটা কি শো?' লোকটির এই গম্ভীর আদেশ শুনে মহিলা মন্তব্য করে, 'ডেকোরেশন, অর্নামেন্ট!' এই ২টো ইংরেজি শব্দে স্বামী-স্ত্রী হেসেই গড়িয়ে পড়ে। সারা পথ জুড়ে এমনি হলো। লোকটি কি বলে আর মেয়েটি হাসতে হাসতে একেবারে কাত হয়ে পড়ে। আবার মেয়েটি কি বলে আর লোকটি হেসে লুটোপুটি খায়। ভদ্দরলোকেরা যে কতো ছুতোনাতায় হাসে! কিন্তু যতোই হাসুক আর যতোই কথা বলুক, তাদের এই হাসি ও কথা

খিজিরের কানে ধ্বনির অতিরিক্ত কিছু তৈরি করতে পারে না। স্কুটারের পটপট আওয়াজ ও নরনারীর হাসিকথার মিলিত ধ্বনি ১টি অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহ হয়ে বেজে চলে খিজিরের একটানা ভাবনার পেছনে; জুম্মনকে পাওয়া গেলে এখন গাড়িতে থাকতো সে-ই। গাড়িতে উঠিয়ে কয়েক গজ যাওয়ার পরই খিজির তাকে লজেন্স কি বিস্কিট কিনে দিতো। ভদ্রলোকদের ছেলেমেয়েরা আজকাল খুব কাঠি-লজেন্স খায়। জুম্মন একটা চুষতে চুষতেই গাড়ি ওদের বাড়ির সামনে চলে আসতো। বস্তির কাছে বেবি ট্যাকসি রেখে লাফিয়ে নামতো খিজির। কয়েক পা হেঁটে বস্তিতে ঢুকেই হাঁকডাক শুরু করতো, 'জুম্মনের মাও, দেইখা যা, কারে ধইরা লইয়া আইছি, দ্যাখ!' জুম্মনের মায়ের জবাবটাও তার জানাই আছে, 'কোন মরারে লইয়া আইছ কব্বর দিবার লাইগা?' এসব শুনেও খিজির একটুও রাগ করতো না। সে তো জুম্মনকে ভেতরে ঠেলে দিলেই এই কবর দেওয়ার কথা বলার জন্য জুম্মনের মায়ের খুব খারাপ লাগতো। খিজির দাঁড়িয়েই থাকতো, বৌয়ের প্রতিক্রিয়াটা সে দেখবে। জুম্মনের মায়ের চোখে পানি টলটল করে, সে তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছে—এরকমভাবে বৌকে সে কোনোদিন দ্যাখেনি। চোখে টলমল পানি নিয়ে ছেলেকে ধরে সে গড়িয়ে পড়তো স্বামীর বুকে, 'এ্যারে তুমি কৈ পাইলা? ক্যামনে আনলা?' খিজির চোখ ভরে সেই ছবি দেখতো। এই ছবি দেখতে দেখতে সে রাস্তা বেয়ে চলে। ইউনিভারসিটি এলাকায় লোকজন নাই। পাবলিক লাইব্রেরী পার হলো, ডানদিকে পাতলা কুয়াশা-টাঙানো রেসকোর্স। মাথায় ও চোখে অভিভূত জুম্মনের মা। —একবার আরোহী ভদ্রলোকের ধমকে সে পেছনে তাকায়, 'সাইড দাও না কেন? হর্ন শুনতে পারো না?' তারপর পাশে তরুণীকে বলে, 'ঈদের দিন বোতল টেনে চুর হয়ে আছে!' মেয়েটি খিলখিল করে হাসে। ভদ্রলোকের বৌঝিরা এতোও হাসতে পারে! পেছনের গাড়ির অসহিষ্ণু হর্ন এবং আরোহীদের ধমক, ঠাট্টা ও হাসি, কিন্তু খিজিরের গতিশীল বেবি ট্যাকসির সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা ও কান্নায় ভেঙে-পড়া জুম্মনের মাকে একটুও টলাতে পারেনি। কিন্তু একটু সাইড পেয়ে সাদা জিপ তাদের ঠিক সামনে এসে ব্রেক কষতেই জুম্মনের মা ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। হয়তো তার ছবি জিপের ওপরেও প্রতিফলিত হতো, তার আগেই শাদা জিপ থেকে লাফিয়ে নামে তিনজন যুবক। জায়গাটা ঠিক কোথায়?—আর্ট কলেজ পার হয়ে বাঁ দিকে খালি জায়গা, এখানে বহু পুরনো একটা ঘর, ঘরের পাশে অনেকদিনের পরিচিত পচা ও মিষ্টি একটা গন্ধ, নিজের নাভিতে আঙুল ঘুরিয়ে আঙুল শুঁকলে খিজির এই গন্ধ পায়। সেই গন্ধ, দাঁড়িয়ে থাকা সাদা জিপ এবং নিয়নের তরল-সাদা আলোতে পাতলা কুয়াশা খিজিরকে সম্পূর্ণ চিত্রশূন্য করে ফেলে। একটি যুবকের পরনে ধূসর রঙের চাপা প্যান্ট ও কালো জ্যাকেট। হাতের রিভলভার সামনে তুলে শক্ত গলায় সে হুকুম দেয়, 'রাখো!' ল্যাম্পোস্টের আলো পাতলা কুয়াশায় রাস্তার শিশির-ভেজা পিঠে পড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চিন্তে শুয়ে থাকে। সেই আলোতে রিভলভারওয়ালার মুখ বেশ স্পষ্ট: তার ফর্সা টিকলো নাকের নিচে এক জোড়া পাতলা মেয়েলি ঠোঁট। তার পেছনে আরো দুজন যুবক, এদের পরনে যথাক্রমে নেভি-ব্লু প্যান্ট ও লাল পুলওভার এবং প্যান্ট ও কালো কোট। শেষ যুবকটির চোখে চিকন ফ্রেমের চশমা এবং তাতে ড্যাগার। সে এসে দাঁড়ায় খিজিরের পেছনে, তরুণ আরোহীকে জিগ্যেস করে, 'এতো রাত্রে মেয়েছেলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

ইঞ্জিন থামা শালা! শুওরের বাচ্চা কেটে পড়ার তালে আছে, না?'—রিভলভারওয়ালার এই হুকুমে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। ইঞ্জিনও কি তার বশ? কখন কিভাবে যে ইঞ্জিন বন্ধ হলো

সে কথায় আমল না দিয়ে আনোয়ার বলে, 'তাহলে ছয় দফাই তোমাদের ফাইনাল? ছয় দফা দিয়ে সাধারণ মানুষের লাভ কি হবে?'

আলতাফ জবাব দেয়, 'আমাদের সমস্ত দুর্ভোগের কারণ হলো পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ। ছয় দফায় রাষ্ট্রীয় কাঠামো এমন করার ব্যবস্থা রয়েছে যাতে একটি অঞ্চল আরেকটি অঞ্চলকে শোষণ করতে না পারে। আমরা যা উপার্জন করবো খরচ করবো আমরাই। আমাদের টাকা পাচার হয়ে যেতে পারবে না। ট্যাক্স বসাতে পারবো আমরা। বাইরের দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবো আমরা। প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে বাঙালি ব্যবসা করেনি?'

বলতে বলতে আলতাফের গলা থেকে রাগ কিংবা বিরক্তি ঝরে পড়ে। সে খুব অভিভূত, আবেগে তার গলা জড়িয়ে আসে, 'বাঙালি এককালে জাভা, বালি, সুমাত্রায় যেতো মশলা কিনতে, নিজেরা কাপড় নিয়ে যেতো বিক্রি করতে। বাঙালি তাঁতীর তৈরি কাপড় ইউরোপে বেস্ট কোয়ালিটি কাপড় বলে দাম পেয়েছে। সেই দক্ষতা আমরা আবার দ্যাখাবো। ওয়েস্ট পাকিস্তান আর্মির পেছনে বাঙালির রক্ত-পানি-করা টাকার অপচয় ঘটবে না। আমরা আলাদা আর্মির কথাও বলেছি।'

আনোয়ার বলে, 'হ্যাঁ, বাঙালি আর্মির পেছনে পিপলের টাকা খরচ হবে, তাতে মানুষের লাভ কি?'

'সেটা নির্ভর করবে আমাদের ওপর। বাঙালি আর্মি আমাদের লোক, আমাদের মানুষের সেনাবাহিনী। আমাদের সেনাবাহিনী আমাদের নির্যাতন করবে কেন?'

'শোষণ কি কেবল আঞ্চলিক?'

'এখানে প্রধানত এবং প্রথমত তাই।'

'তাহলে কোটি কোটি বাঙালি যে হাজার হাজার বছর ধরে এক্সপ্লয়টেড হয়ে আসছে সে কার হাতে? দেশের ভেতরেই এক্সপ্লয়টার থাকে, বিদেশীর কোলাবোরেটার থাকে। গ্রামে গ্রামে থাকে। জমিতে থাকে, মিল ফ্যাক্টরি হলে সেখানেও থাকবে। ট্যাক্স বসাবার রাইট চাও? কে বসাবে?—কার ওপর?—এই দুই বাঙালি কি একই ধরনের? শোনো, যারা কাপড় বুনেছে, তারা বাইরে গিয়ে কাপড়ের ব্যবসা করেনি। তারা কাপড় পরতেও পারতো না ঠিকমতো। বাঙালি সেনাবাহিনী হলেই বাঙালির উদ্ধার হবে? বাঙালি আর্মি তখন চেপে বসবে বাঙালির ওপরেই, বাঙালি ছাড়া আর কার ওপর দাপট দ্যাখাবার ক্ষমতা হবে তার? পাঞ্জাবি সোলজারের উর্দু গালাগালি শুনতে খারাপ লাগে, বাঙালি কর্নেল সায়েব বাঙলা ভাষায় "শুওরের বাচ্চা" বললে কি তার পা জড়িয়ে ধরে বলবো, "আ মরি বাঙলা ভাষা!" তোমরা ওয়েস্ট পাকিস্তানের হাত থেকে ইম্যানসিপেশনের কথা বলছো, কিন্তু কাদের জন্যে?'

'ইস্ট পাকিস্তানের পিপলের জন্য।'

'না। ট্যাক্স বসাবার রাইট পিপল পায় না, পিপলের রাইট শুধু ট্যাক্স দেওয়ার। বাঙালির হাতে পাওয়ার চাও তো? মানে বাঙালিদের এক্সপ্লয়েট করার লাইসেন্স চাও?'

'ক্ষমতা মানেই শোষণ নয়। ক্ষমতা যদি তোমার লক্ষ্য না থাকে তবে এই সব আন্দোলন করার উদ্দেশ্য কি?'

ড্যাগারধারী বলে, 'তাহলে তো আরো ভাল। ভাবীর সংগে একটু প্লেজার ট্রিপ মেরে আসবো। আপনি ওয়েট করেন, ম্যাটার অফ এ্যান আওয়ার!'

এই শীতল বাক্য সুদর্শন আরোহীর কানে ঢুকেছে কি-না বোঝা গেলো না। নীলডাউন হওয়ার ভঙ্গিতে বসে সে হাত জোড় করে, 'আপনাদের পায়ে পড়ি ভাই। আমি একজন সেকশন অফিসার। বিশ্বাস করেন। ভাই শোনেন—।'

'আপনার ভাই আবার কে? পা ছেড়ে দিন বলছি।'

'প্লীজ স্যার! প্লীজ বি কাইন্ড এ্যান্ড মার্সিফুল স্যার। আমি একজন সেকশন অফিসার স্যার, মিনিস্ট্রি অফ হোম, গভর্নমেন্ট অফ ইস্ট পাকিস্তান। আপনারা কাল সেক্রেটারিয়েটে আসেন, কাল তো ছুটি, বুধবার আসেন, আমি গেটে পাস পাঠিয়ে দেবো, ডবল প্রোটেকটেড এরিয়ার গোলাপি রঙের পাস স্যার। আপনাদের কোনো সার্ভিসে আসতে পারলে স্যার—।'

তার কথা শেষ হতে না হতে ছুরিধারী বলে, 'আপনি সেকশন অফিসার? আমি আপনার মিনিস্ট্রির জয়েন্ট সেক্রেটারি।' আর ২জনকে দেখিয়ে সে বলে, 'ঐ যে আপনার সেক্রেটারি, আর উনি আপনার চীফ সেক্রেটারি।' নীলডাউন অবস্থাতেই সেকশন অফিসার ৩ জনের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ৩বার 'স্লামালেকুম স্যার' বলে।

ড্যাগারধারী বলে, 'জাস্ট এ সেকশন অফিসার! প্রমোশন পাওয়ার জন্যে বৌকে বসের বেডরুমে পাস করবি না? এখন থেকে প্রাকটিস কর!' রিভলভারধারী তাদের আস্তে করে ধমক দেয়, 'মিসবিহেভ করো কেন? গো এ্যাহেড!' তারপর সেকশন অফিসারকে আশ্বাস দেয়, 'নাথিং টু ওরি এ্যাবাউট। আমাদের ম্যাক্সিমাম এক ঘণ্টা। কুইক মেরে দেবো।'

মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে ৩ জনের এই তরুণসমাজ উল্টোদিকের ফুটপাথে চলে যায়। ফুটপাথ ধরে একটু এগিয়ে রেসকোর্সের কাঠের রেলিঙ ডিঙিয়ে ফের সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করে। কুয়াশায় তাদের আর দ্যাখা যায় না।

তরুণ আরোহীর সেই নীলডাউন অবস্থা তখনো কাটেনি। খিজির বলে, 'চলেন স্যার, থানায় যাই গিয়া। নীলখেত ফাঁড়ি তো কাছেই।'

লোকটি ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। খিজির ফের বলে, 'চলেন, যাই!'

লোকটি তখন রাস্তায় ধপাস করে বসে পড়ে। দুই হাতে মুখ ঢেকে সে কাঁদতে শুরু করলো। তার কানের কাছে মুখ রেখে যতোটা সম্ভব নরম করে খিজির বলে, 'চলেন যাই। অখনও টাইম আছে। থানায় চলেন! চলেন!'

কান্নায় সাময়িক বিরতি দিয়ে লোকটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দেয়, 'এদের চেনো? এরা সব এনএসএফের গুণ্ডা। আইয়ুব খানের বাস্টার্ড মোনেম খান, মোনেম খানের বাস্টার্ড এরা!'

খিজির তাড়া দেয়, 'লন যাই! ইউনিভারসিটির এতোগুলি হল এহানে! পোলাপানেরে খবর দিই। চলেন সাব!'

লোকটির ফোঁপানো কণ্ঠস্বর ফের গুমরে ওঠে, 'না। তা হয় না। আরো বিপদ হবে। ওরা এক ঘণ্টা ওয়েট করতে বললো না? এসে আমাকে না পেলে ফায়ার হয়ে যাবে! চাকরি বাকরির কথা সব বলে ফেললাম, শুওরের বাচ্চারা আমার ক্যারিয়ার নষ্ট করে দেবে!' লোকটি ফের হাতে মুখ গুঁজে ফোঁপায়, 'এরা ডেঞ্জারাস, মোস্ট পাওয়ারফুল!' ফের নতুন উদ্যমে কাঁদবার প্রস্তুতি নিলে নিজের স্কুটারে ফিরে আসা ছাড়া খিজিরের কোনো কাজ থাকে

না। 'তুমি আমাকে একা রেখে চলে যেও না ভাই!' —লোকটির এই মিনতির জবাবে সে বলে, 'অরা আপনাগো গাড়ি কইরা পৌছাইয়া দিবো!' ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে এক্সিলেটর থেকে হাত উঠিয়ে খিজির ফের রাস্তায় নামে, 'সায়েব, ভাড়াটা?'

'ভাড়া?' তরুণ রাজকর্মচারী হাত থেকে মুখ তুলে অশ্রুসজল চোখে তার দিকে তাকায়।

'মিটার দেইখা ভাড়াটা দিয়া ফালান?'

প্রচণ্ডরকম বিস্ময় ও মর্মাঘাতে লোকটির মুখের খুচরা-খাচরা পার্টস ওলট-পালট হওয়ার উপক্রম ঘটে। পকেট থেকে টাকা বের করে ভিজে গলায় সে বলে, 'তোমরা মানুষ না! মানুষ হলে এ সময় কেউ—।'

স্কুটার রাস্তায় গড়িয়ে দিলে খিজির তার উক্তিকে স্বীকার করে চিৎকার করে, 'না। আমরা কুত্তার বাচ্চা, মানুষ হইলেন আপনেরা!'

খিজিরকে দেখে আলাউদ্দিন মিয়া বলে, 'কৈ গেছিলি তুই? আপারে ফোন করছি নয়টার সময়। কয় ওরে তো ছাইরা দিছি বহুত আগে। পাসিঞ্জার লইয়া যাইবি তো আমারে কইলি না ক্যান? গ্যারেজ বন্ধ কইরা আমার বাসা হইয়া যাইস! কাম আছে!' আলাউদ্দিন মিয়ার বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পেছন থেকে ডাক শুনলো খিজির, 'কি মিয়া, ঈদের দিন খুব খ্যাপ মারতাছেন? বহুত কামাইলেন, না?' রাস্তার ওপার থেকে ডাকছে কামরুদ্দিন। রাস্তা ক্রস করে সামনে এসে কামরুদ্দিন বলে, 'কৈ গেছিলেন?' এর আগে সে খিজিরকে 'তুমি' এবং রেগে গেলে 'তুই' বলতো, ওর বৌকে বিয়ে করার পর তাকে মর্যাদা দিতে শুরু করেছে। বলে, 'জুম্মনেরে রাইখা গেলাম। মাহাজনে একটা ছ্যামরারে পাঠাইছিলো, মাহাজনে আমারে আইতে কইছিলো।'

'কে পাঠাইছিলো? আপনে থাকেন কৈ?'

'আমি তো মালীবাগ থাকি। জুম্মন থাকে অর ফুফুর সাথে, নিমতলীর লগে। তে মাহাজনে কয় জুম্মনের মায়ে পোলার লাইগা বলে ভাত পানি ছাড়ছে। অর মায়ে কয়দিন অরে রাখতে চায়। আমি কই থাউক। আমি হালায় কৈ যাই, কৈ থাকি! কোন জাগায় কহন কাম পড়ে, থাউক কয়টা দিন!' বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর বিশেষ ব্যবহারে সিগ্রেটের গোড়া ছুঁড়ে ফেলে সে আরেকটা সিগ্রেট ধরায়, খিজিরের দিকে কিংস্টর্কের প্যাকেট এগিয়ে ধরে। সিগ্রেট কষে একটা টান দিয়ে বলে, 'আমার বইন তো ছাড়তে চায় না, পোলায় আবার ফুফুর কাছে থাকবার চায় না! কি মুসিবতে পড়ছি আমি!'

খিজির স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জুম্মনকে তো নিয়ে আসার কথা তার। দ্যাখো, ঐ বস্তিতেই জুম্মন থাকে, অথচ সে কি-না মিছেমিছি ঘুরে মরলো। আর এই সুযোগে ছেলের জন্যে ওর বৌয়ের সত্যিকার ও বানানো কান্নাকাটি সব দখল করে নিলো শালার মহাজন।

কিন্তু এই নিয়ে দিওয়ানা হবার সময় কি আর খিজির আলির হবে? তাকে যেতে হয় আলাউদ্দিনের ঘরে। আলাউদ্দিন মিয়া জানায় যে, ওসমানকে একটু খবর দেওয়া দরকার,

কাল ভোরবেলাতেই ওসমান যেন আলাউদ্দিনের সঙ্গে দ্যাখা করে। পরশু মহল্লায় জনসভা, কয়েকজন বড়ো নেতা আসবে, সব আয়োজন করতে হবে আলাউদ্দিন মিয়াকে। তার বক্তৃতা ঠিক করার জন্য ওসমানকে চাই। খিজির ভাবে, ওসমান এসব ব্যাপারে এগিয়ে এলেই তো পারে। লোকটা মিছিলে যায়, মিটিং শোনে, স্লোগান দেয়,—আলাউদ্দিন মিয়ার সঙ্গে কাজ করতে তার আপত্তি হবে কেন? এসব লোককে সঙ্গে পেলে আলাউদ্দিন মিয়া এই শালা রহমতউল্লাকে চিরকালের জন্য ধসিয়ে দিতে পারে।

সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে একটু আগুনের বিন্দু দেখে খিজির চমকে ওঠে, 'কে?'

'কে?' ভয় পেয়ে দুজনেই পরস্পরের পরিচয় জানতে চায় তারপর খিজির বলে, সিঁড়ির উপরে একলা বইয়া রইছেন?'

ওসমান উঠে দাঁড়ায়, সিগ্রেটের শেষ অংশ ফেলে দিয়ে বলে, 'তুমি এতো রাত্রে?'

'লন, ঘরে চলেন। কথা আছে। আলাউদ্দিন মিয়া পাঠাইয়া দিলো।'

'হঠাৎ?'

'সায়েব নিজে আপনার কাছে আইছিলো, আপনে ঘরে আছিলেন না। কাউলকা ভোরে থাইকেন, সায়েবে আইবো।'

'কি ব্যাপার?'

'মহল্লার মইদ্যে জনসভা হইবো। মিটিং লইয়া আপনার সাথে বাতচিত করবো।'

'আচ্ছা।'

'তে আপনে ঘরে যাইবেন না? চলেন, ঘরে গিয়া বহি।'

ওসমান একটা সিগ্রেট ধরায়, সিগ্রেটে টান দিয়ে বলে, 'একটু মুশকিল হয়েছে।'

'কি?'

'রঞ্জুকে চাবি দিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা ছাদে ছবি তুলছিলো। তা এখন বোধ হয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চাবিটা না পেলে—।'

'তামামটা রাইত আপনে সিঁড়ির উপরে বইয়া থাকবেন?'

'না, না', ওসমান একটু হাসে, 'ভাবছিলাম একটু ওয়েট করে দেখি। এর মধ্যে ওরা জেগেও উঠতে পারে। নইলে ওয়ারিতে এক বন্ধুর বাড়িতে যাবো।'

'রাখেন! আপনে কেমুন মানুষ?' ওসমানের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিয়ে খিজির বলে, 'নিজের ঘরের চাবি পরের কাছে রাইখা সিঁড়ির উপরে বইয়া থাকেন! লন, রঞ্জুর ডাইকা তুলি।'

'না, না থাক!'

কিন্তু খিজির 'দূর!' বলে নিচে নামতে শুরু করলে তাকে অনুসরণ করতে হয়। খিজির যাতে রঞ্জুদের দরজায় জোরে কড়া নাড়তে না পারে ওসমান সেজন্য আগে ভাগে দরজায় আস্তে করে দুটো টোকা দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চাবি হাতে বেরিয়ে আসে রানু। ওসমান একটু নুয়ে বলে, 'তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলে?'

রানু বলে, 'না। আমি তো ঘুমাই নাই।'

'রঞ্জু?'

'রঞ্জু ঘুমাইছে কখন! সাড়ে নয়টা দশটার দিকে।'

খিজির বলে, 'হায় হায়! আপনে জাগনা? আর এই সাবে সিঁড়ির উপর বইয়া দুই হাতে মশা থাবড়ায়!'

খিজিরের কথায় ওসমান বিব্রত হয়, তাড়াতাড়ি বলে, 'তুমি এতো রাত্রি পর্যন্ত জেগে আছো?'

ক্লান্ত চোখে রানু ম্লান হাসে, 'চাবি আমার কাছে, কখন আসেন ঠিক নাই। ঘুমাই কিভাবে?

খিজির হাসে, ওসমানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনার চাবি পাহারা দিতাছে। চাবি রাইখা যাইতেন ইনার কাছে, তা না, আপনে রাখছেন রঞ্জুর কাছে!'

ঘরে ঢুকে খিজির মেঝেতে বসে পড়ে। বলে, 'আউজকা একটা কারবার হইছে, বুঝলেন? রেসকোর্সের কাছে—।'

ওসমান বাধা দেয়, 'খিজির অনেক রাত্রি হয়েছে। ঘরে যাও, তোমার বৌ চিন্তা করবে!'

নাঃ! তার জন্য চিন্তা করবে কে? জুম্মনের মা আজ জুম্মনকে কাছে পেয়েছে, ঐটুকু বিছানায় মায়েপোলায় পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে, তার জন্য জায়গা কোথায়। ঐ পোংটা পিচ্চিটা আজ খিজিরের জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে। জুম্মনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারলে হাতটা আরাম পায়। তাই কি সে পারবে? ঠাণ্ডা মেঝেতে শুয়ে পড়তে পড়তে খিজির বলে, 'না, একটা রাইত তো, আপনের ঘরে থাকুম!'

'বিছানা কোথায়?'

'লাগবো না।'

ওসমান তবু জোর করে একটা চাদর দেয়। রেসকোর্সের ঘটনা বলার আগেই খিজিরের নাক ডাকতে থাকে। ঘুমের মধ্যে মেঝের হিমে সে এপাশ ওপাশ করে। মনে হয় মস্ত বড়ো ঠাণ্ডা হাত দিয়ে কে যেন তাকে ঝাপশা ১টি মাঠের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

১০

রানুর অঙ্কের মাথা তেমন ভালো নয়। এসএসসি ১বার ফেল করেছে অঙ্কের জন্যে, আরেকবার অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষা দেয়নি। অঙ্কের জন্য কোনো ক্লাসে তাকে ২বছর করে কাটাতে হয়েছে। রঞ্জু কয়েকদিন ওসমানের কাছে অঙ্ক নিয়ে এসেছিলো। এরপর রানুর বাবা নিজেই এসে ওসমানকে ধরে। কয়েকদিন কলেজে যাওয়া-আসা না করলে কালো রোগা এই মেয়েটিকে পার করা কি তার মতো ছা-পোষা মানুষের পক্ষে সম্ভব? এখন বেশি টাকা দিয়ে স্কুল বা কলেজের শিওর-শট মাস্টার রাখা সাধ্যের বাইরে। বড়ো ছেলে মারা যাওয়ার উপার্জনের নিশ্চিত পথ বন্ধ। ওসমান তো মাঝে মাঝে প্রাইভেট টুইশানি করতো। একটু বিবেচনা করে অল্প টাকা নিয়ে সে তার ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাবার ভার নিলে লোকটা নিশ্চিত হতে পারে। তা পয়সা দিয়ে মাস্টার রাখবে, এতে লোকটার এতোটা নুয়ে পড়ার

দরকার কি? সপ্তাহ দুয়েক হলো ওসমান পড়াচ্ছে, এর মধ্যে রানু এসেছে মোটে ৪দিন। এর ২দিন ছিলো শুক্রবার। আজকেও শুক্রবার, রানু হয়তো পড়তে আসবে। ওসমান তাই অফিস থেকে বেরিয়ে প্রভিন্সিয়ালে খেয়ে নিয়েছে, তারপর সোজা চলে এসেছে ঘরে। রঞ্জুকে নিয়ে রানু এখানে আসে সাধারণত আড়াইটে তিনটের দিকে। রঞ্জুটার স্বভাব এমন যে, রানু থাকলে সে বড়ো অমনোযাগী হয়ে পড়ে। পেন্সিল দিয়ে রানুর পিঠে খোঁচা দেয়, রানু কলম নিয়ে রেখে দেয় টেস্ট পেপারের আড়ালে। রানুটা অন্যরকম। একমনে খাতার দিকে তাকিয়ে সে অঙ্ক দ্যাখে বা অঙ্ক কষে। এই শীতেও তার শ্যামবর্ণের নাকের হাল্কা-শ্যাম ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। এই সব বিন্দু এতো স্পষ্ট এদের সংখ্যা এতো কম যে, ইচ্ছা করলে সে সবগুলো দিব্যি গুণে ফেলতে পারে। কিন্তু ওসমান তখন অঙ্কের সংখ্যা গুণতে ব্যস্ত থাকে বলে রানুর নাকের ও নাকের নিচে ঢেউ-খেলানো জায়গায় ঘামের বিন্দুগুলো অগণিত রয়ে যায়। ওসমান আজ বেশ কয়েকটা অঙ্ক গুছিয়ে রেখেছে, রানু ১টার পর ১টা অঙ্ক ভুল করবে বা ঠিক করবে এবং এই সুযোগে মাথা-নিচু করা রানুর নাকের ডগা বা তার আশেপাশের সবগুলো ঘামের বিন্দু গুণে ফেলবে। অথচ দ্যাখো, রানুর কোনো পাত্তাই নাই। কিংস্টর্কের প্যাকেট আর ২টো মোটে সিগ্রেট। সিগ্রেট খেতে পারছে না, কারণ রানুকে অঙ্ক করাবার সময় ওর ধূমতেষ্টা পায় বেশি, তখন সিগ্রেট পাবে কোথায়? আবার সিগ্রেট কেনার জন্যে নিচে যেতেও ভরসা পায় না, ঠিক ঐ সময়ে এসে রানু যদি ফিরে যায় তবে ফের কবে আসবে তার ঠিক কি? এখনো আসছে না কেন? তাহলে নরসিংদি থেকে কোনো খারাপ খবর এলো? নরসিংদি ইপিআরটিসি সাব-ডিপোতে পুলিসের হাতে কয়েকজন কর্মচারী মার খেয়েছে। সকালে সিঁড়িতে রঞ্জুর সঙ্গে দ্যাখা হয়েছিলো, ওরা আলাউদ্দিন মিয়ার দলের ১টি ছেলের মুখে শুনেছে যে, আহত কর্মচারীদের মধ্যে ওর দুলাভাইও থাকতে পারে। রঞ্জুকে হয়তো নরসিংদি যেতে হতে পারে। তা রঞ্জু নরসিংদি গেলেই বা কি? রানু কি একা আসতে পারে না? ওসমান বিরক্ত হয়: এই সব নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে কেবল আপন ভাই বাদ দিয়ে যাবতীয় তরুণের সঙ্গে একজন তরুণীর যৌন-সঙ্গম ছাড়া আর কোনো সম্পর্কের কথা চিন্তা করতে পারে না। যৌন-সঙ্গমকে নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুমোদন দেওয়ার জন্যে বিবাহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাকবিবাহ প্রেমের মহড়া চলে। বিয়ে করলেই যেমন ছেলেমেয়ে পয়দা করাটা অপরিহার্য, তেমনি প্রেম মানেই বিবাহ।

আবার ছেলেমেয়েদের মেলামেশা মানেই প্রেম।—প্রেম, বিবাহ ও যৌন-সঙ্গম ছাড়া এরা কি আর কিছুই ভাবতে পারে না? ওসমান এর মধ্যে ১টা সিগ্রেট ধরিয়েছে, তার সিগ্রেটের ধোঁয়া ঘরের শূন্যতায় ১টি ঝুলন্ত পর্দা তৈরি করে। মাঝে মাঝে হাওয়ায় নিজেদের ওজনের ভারসাম্য রাখতে না পেয়ে ধোঁয়াগুলো শাদা ও হাল্কা ছাই রঙের পর্দায় ছেঁড়া-খোঁড়া নানারকম ছবিতে ওঠানামা করে। এদিকে ধোঁয়ার দিকে একভাবে দেখতে দেখতে তার চোখজোড়ায় পানি জমে, তখন ১টি হাল্কা নীলচে খাকি রঙের বোর্ডের ওপর সাঁটা ডিম্বাকৃতি পুরু কাগজ থেকে রানু ওসমানের দিকে তাকায়। তার পাতা-কাটা-চুল নির্দিষ্ট আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে মিশে গেছে ঘন কেশরাশিতে। গোলগাল ফর্সা মুখে পাতলা ঠোঁটজোড়া খুব চেপে বসানো। কালো-সাদা ছবিতে পাতালা ঠোঁটে পান খাওয়ার আভাস। কাঠের ফ্রেম এবং ধুলো ও ঝুল দেখতে দেখতে ওসমানের চোখে পানি হু হু বাড়ে। বিষাদেও হতে পারে। কারণ, এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় গড়ানো এই ছবিটি তার মায়ের। হোক

না ধোয়ায় তৈরি, ভাসুক না শূন্যতায়, তবু তো মায়ের ছবি! ফিফটি সেভেন—সিক্সটি নাইন। এগারো বৎসর! ১১ বছর হলো মা মারা গেছে। ছবিটা কি তেমনি রয়ে গেছে? এই ছবির নিচে ছিলো জানলা, জানলার বাইরে পেয়ারা গাছের পাতা। পাতাগুলো রোদে কাঁপতো, বৃষ্টিতেও কাঁপতো। এমনকি খুব জ্যোৎস্না হলে নিজের বোঁটায় ভর করে পেয়ারা পাতাগুলো একটু একটু করে নাচতো! নাচন ছিলো পেয়ারা পাতায়, কিন্তু আওয়াজ শোনা যেতো বাঁশঝাড়ের। এর সঙ্গে মিশে থাকে ভাঙাচোরা ও পলেস্তারা-খসা পুরনো দালানের সোঁদা ও ভ্যাপসা গন্ধ। রাষ্ট্রীয় ও প্রাকৃতিক সীমানা এবং এতোগুলো বছর ডিঙিয়ে-আসা যেই সব দৃশ্য, ধ্বনি ও গন্ধের ভেতর বন্দি হয়ে শুয়ে থাকে ওসমান গনি। চোখের ওপরের পানি পাতলা পর্দায় দ্যাখা যায় পাতা-কাটা চুলের ভেতর বোকা সোকা চোখ-বসানো মায়ের গোলগাল মুখ। রানু মাথা নিচু করে অঙ্ক করবে যখন, ওসমান ওর মুখটা ঠিক ভালো করে দেখে নেবে।—রানু অনেকদিন বাঁচবে, এইতো রানু এসেই পড়েছে, সিঁড়িতে তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওসমান উঠে বসলো। দরজা খুলে 'এসো' বলে সিঁড়ির দিকে তাকালো।

'যাক, ঘরেই আছো। কয়েকদিন তোমার পাত্তা নেই।'

আনোয়ারকে দেখে ওসমানের ভয় হলো যে, ঘরে আর কাউকে দেখে রানু হয়তো ফিরে যাবে। এই ভয় অবশ্য এতো স্বল্পস্থায়ী যে, এটা ভালো করে বোঝবার আগেই রানুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে হচ্ছে না বলে ওসমান বেশ লঘুভার হয়। যেন ম্যাটিনিতে হিচককের ছবি দেখে গুলিস্তানের সামনে রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে উত্তেজনা থেকে অব্যাহতি-পাওয়া-চোখে সদ্যোজাত টাটকা বিকালবেলার মানুষের স্রোত ও যানবাহনের অবিচ্ছিন্ন চলাচল দেখছে।

'খবর জানো নাকি দোস্ত?' খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর দেওয়ার জন্য আনোয়ার জুতো খুলে বিছানায় উঠে বসে, 'খোকা ধরা পড়েছে। আই মিন পুলিস এ্যারেস্ট করেছে।'

'হ্যাঁ, কাগজে দেখলাম। এনএসএফের খোকা তো? পাক-মোটরের কাছে কোন হোটেলে কার ওয়াইফকে রেপ করেছিলো, সেই চার্জে ধরেছে।'

'আরে মানুষ খুন করে সাফ করে ফেললো, এখন রেপের চার্জে ধরে! আসলে ওর সেফটির জন্যে ওকে ধরেছে, টু গিভ হিম শেলটার।'

'শেলটার?'

'শেলটার বিহাইন্ড দ্য বার! গভমেন্ট দারুণ প্যানিকি! গবর্নর হাউসও এখন গুণ্ডাপাণ্ডাদের জন্য যথেষ্ট সেফ নয়। ছাত্রদের নতুন প্রোগ্রাম দেখেছো? স্টুডেন্ট ফ্রন্টে মনে হচ্ছে একসঙ্গে কাজ করা যাবে।'

'এগারো দফা?' ওসমান জিগ্যেস করলে আনোয়ার বলে, 'হ্যাঁ, কাগজে দেখেছো?'

'কাগজে দেখলাম। আলতাফ একটা লিফলেট দিয়ে গেলো কাল। ডিটেল আছে।'

'কাল আলতাফ এসেছিলো?'

'হ্যাঁ। আমার নিচে দোতলায় একটি ছেলে পুলিসের গুলিতে মারা গেছে না?'

'সে তো মাসখানেকের ওপর হবে।'

'আজ আলতাফের পার্টির ছেলেরা ঐ ছেলেটির ভাইকে নিয়ে যাবে ওদের মিটিঙে। কাল আলতাফরা ওর বাবার সঙ্গে আলাপ করতে এলো, আমিও ছিলাম।'

'তা ওর ছোটো ভাইকে পাবলিকলি কান্নাকাটি করার জন্যে পটাতে পারলো? কেন, ওর বাপ টাপ নেই?' বলতে বলতে আনোয়ার উত্তেজিত হয়, 'বুড়ো অথর্ব টাইপের বাপ হলে আরো জমে। কাঁপতে কাঁপতে স্টেজে দাঁড়াবে, কাঁদতে কাঁদতে পড়ে যাবে। ব্যাস সার্থক জনসভা! তারপর নাটক শেষ হলে অর্গানাইজাররা বুড়োর পাছায় লাথি মেরে বলবে, ভাগ শালা, বাড়ি গিয়ে প্যানপ্যান কর!' আনোয়ারের এই কথায় ওসমানের এতো খারাপ লাগে যে, ব্যাপারটিকে রসিকতা হিসাবে নিয়ে হাসি-হাসি মুখ করার জন্যে ঠোঁটের প্রয়োজনীয় প্রসারণ ও সঙ্কোচন ঘটাতে ওর অবস্থা কাহিল হয়ে যায়। রঞ্জুর বাবা মোটেও অথর্ব বুড়ো নয়, কিন্তু আনোয়ারের বর্ণনার ফলে ওসমানের চোখের সামনে মকবুল হোসেন সত্যি সত্যি অর্থব কুঁজো দাড়িওয়ালা ১ বুড়োর আকার পায় এবং নিহত পুত্রের জন্যে শোকপ্রকাশের পর পাছায় হাত দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের রেলিঙের বাইরে।

সিঁড়িতে ফের পদধ্বনি শোনা যায়। ওসমান টেবিলে হঠাৎ করে কি খুঁজতে শুরু করে। তার মনে হয়, রানু এসে পড়লো। আনোয়ারটা যদি ঘণ্টা দুয়েক পরে আসতে!

'আরে এসো।' আনোয়ার নবাগতকে খুব সাদরে আহ্বান করে, 'তোমাদের মিটিং কখন?'

আলতাফ একবার তার দিকে তাকায়, 'তুমি কখন এসেছো?' তারপর ওসমানকে বলে, 'ওসমান, ওরা বিট্রে করলো কেন? এসবের মানে কি?' আলতাফ বেশ রেগে গেছে, 'তোমার দোতলার ওরা এটা কি ব্যবহার করলো, এ্যাঁ? ঐ যে লোকটা পুলিসের গুলিতে মারা গেছে তার ছোটো ভাইকে আজ নরসিংদি পাঠিয়ে দিয়েছে। কেন? মিটিঙে যেতে দেবে না? কাল বললেই তো পারতো। গরজ তো খালি আমাদেরই, না?'

আনোয়ার হাসে, 'তোমাদের মিটিং, গরজ তোমাদেরই হবে।'

আলতাফ একটু তেতো হাসি ছাড়ে, 'মিটিং শুধু আমাদের নয়, তোমাদেরও। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ স্ট্রিট কর্নার মিটিং করে বেড়াচ্ছে না? ১৪৪ ধারা আছে, ঘোষণা করে মিটিং করা যাচ্ছে না বলে এই পথ বার করা হয়েছে। তা লোকজন সহযোগিতা না করলে আমরা কি করবো? ছেলেটা ওর বড়ো ভাই সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতো, তাতে ওদের অসুবিধাটা কি?'

ওসমান আস্তে আস্তে বলে, 'রঞ্জুর বড়ো বোনের হাজব্যান্ড নরসিংদি ইপিআরটিসি ডিপোতে কাজ করে। ওখানে কি গোলমাল হয়েছে, রঞ্জু বোধ হয় খোঁজ নিতে গেছে।'

'আরে ভাই, আমাদের ছেলেরাই তো প্রথম খবর দিলো।' আলতাফ অধৈর্য হয়ে উঠেছে, 'নরসিংদির ডিপোতে ওয়ার্কাররা স্ট্রাইক করেছিলো। মুসলিম লীগের এক লোক্যাল পাণ্ডা গুণ্ডাপাণ্ডা নিয়ে স্ট্রাইক ভাঙতে আসে, পুলিসও ছিলো। অনেক আহত হয়েছে। আমাদের ছেলেরাই তো বলেছে। এখন দেখছি বলেই ভুল করেছে।'

ওসমান জিগ্যেস করে, 'ও, তোমরাই খবর দিয়েছো?'

'আরে হ্যাঁ!' আলতাফ ফের বলে, 'আমরা বললাম, আপনার ছোটো ছেলেকে স্টেজে দাঁড় করিয়ে দেবো, লোকে একটু দেখবে। তখন তো দেখি ব্যাটার মহাউৎসাহ, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ছেলে যাবে না কেন? ওর ভাইয়ের কথা ও না বললে বলবে কে?—এই সব চাপাবাজি করে এখন দেখি সব হাওয়া! এদিকে মিটিঙের শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে শহীদ—কি নাম যেন?—শহীদটার নাম যেন কি?'

'আবু তালেব।' ওসমান নিহত ব্যক্তির নাম মনে করিয়ে দিলে আলতাফ বলে, 'হ্যাঁ, বলা হয়েছে যে, শহীদ আবু তালেবের ভাই আজ আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবে। লোকজন সব অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। ওর বাবা কি খুব ভয় পায় নাকি?'

'ভয় পাবে না কেন?' আনোয়ার বলে, 'এমনি পুলিসের গুলিতে মারা পড়ায় পুলিস সেই লোকটার ওপর চটে আছে। মরা লোককে শাস্তি দিতে পারে না, শোধ নেবে আত্মীয়স্বজনের ওপর। আবার তারা যদি মিটিং করে বেড়ায় তো ফ্যামিলি কমপ্লিট করে ছাড়বে। ভয় পাবে না কেন?'

আলতাফের রাগ আরো বাড়ে, 'আরে রাখো। হাজার হাজার লোক মিটিঙে যাচ্ছে, ১৪৪ ধারা আছে, তবু এ-ফাঁকে ও-ফাঁকে মিটিঙ করছে, মিছিল করছে, গুলির সামনে দাঁড়াচ্ছে। আর স্টেজে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলবে,— তাতেই বাপ মা ভয়ে অস্থির? পুলিসকে ভয় পায়, না? ভয় তো পাবলিকও দ্যাখাতে পারে!'

'পাবলিক মানে তোমাদের দলের ছেলেরা তো?' আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'ভয় দেখিয়ে গান-পয়েন্টে সবাইকে স্টেজে চড়াবে, তোমাদের দলের লোক বলে এ্যানাউন্স করবে, এটা কি ধরনের পলিটিক্স ভাই?'

কোন পক্ষ নেবে ওসমান ঠিক বুঝতে পারে না। মিটিঙে পাঠাবার ভয়ে যদি রঞ্জুকে নরসিংদি পাঠিয়ে থাকে তো মকবুল হোসেন খুব অন্যায় করেছে। আবার রঞ্জু বা ওর বাবাকে ভয় দ্যাখাবার জন্যে পাবলিককে ব্যবহার করার ইঙ্গিত দেওয়ায় আলতাফের ওপরেও তার রাগ হয়। তাহলে এই সব গোলমালেই রানু কি ওপরে আসতে পারলো না? একবার নিচে গেলে হতো। চায়ের কেতলি হাতে নিয়ে সে বলে, 'তোমরা একটু বসো। আমি রাস্তার ওপার থেকে চা নিয়ে আসি।'

ওসমানের দিকে কারো খেয়াল নাই। আলতাফ জবাব দেয় আনোয়ারকে, 'আমাদের দলে ওয়ার্কার এতো বেশি যে, যে-কেউ পুলিসের গুলিতে মরলেই তাকে দলের লোক বলে চালাবার দরকার হয় না। আমরা কথা দিয়েও ছেলেটিকে হাজির করতে পারলাম না বলে খারাপ লাগছে, কিন্তু এতে মিটিং পণ্ড হবে না, আমাদের ইমেজও নষ্ট হবে না। আমরা প্র্যাকটিক্যালি ইস্ট পাকিস্তানের ওনলি অর্গানাইজড পার্টি। এ কি দলের ফ্র্যাকশনের ফ্র্যাকশন, না চারজনের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি?' শেষের কথাটি আনোয়ারকে বিশেষভাবে খোঁচা দেওয়ার জন্যে বললো, আনোয়ার কিছু না বলায় তার কথার প্রবাহ দ্বিগুণ বেগ পায়, 'আমরা ছাত্র ফ্রন্টে ইউনিটি করেছি শুধু সকলের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তোলার জন্য। আমাদের পার্টির প্রোগ্রাম অনেক স্পেসিফিক, অনেক স্পষ্ট। কেবল সকলের মধ্যে পার্টিসিপেশনের ফিলিং দেওয়ার জন্যে সকলের সঙ্গে নেমেছি।' আলতাফের কথায় জনসভার বক্তৃতার আবেগ ও চাতুর্য। আনোয়ার তাকে প্রায় জোর করে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'এগারো দফা মেনে নিয়ে তোমাদের স্টুডেন্ট উইং কি অন্য পার্টিগুলোকে ফেভার করেছে?'

'আমি তা বলিনি। আমি বলছিলাম যে, আমাদের ছয় দফা নিয়েই আমরা সম্পূর্ণ এগিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু কাউকে বাদ দিয়ে কাজ করতে চাই না বলেই আমরা এগারো দফার প্রোগ্রামে সাপোর্ট দিয়েছি। এটুকু তুমি যদি এ্যাপ্রিসিয়েট করতে না পারো তো সেটা খুব দুঃখজনক।' বলতে বলতে আলতাফ হঠাৎ দাঁড়ায়, 'আরে ওসমান কোথায়?'

'কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে দেশের সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের কোনো গ্যারান্টি তো তোমরা দিচ্ছো না। অটোনমি অটোনমি করে পাকিস্তান হয়েছে। তোমাদের অটোনমিতে বাঙালি সিএসপি প্রমোশন পাবে, বাঙালি মেজর সায়েব মেজর জেনারেল হবে, বাঙালি আদমজী ইস্পাহানী হবে। তাতে বাঙালি চাষার লাভ কি? ডিপার্টমেন্ট ভাগাভাগি করে মানুষের ইম্যানসিপেশন হয়? তাহলে ওয়াপদা, পিআইডিসি, রেলওয়েজ ভাগ করে আইয়ুব খান বাঙালির ইম্যানসিপেশনে হেল্প করেছে? তোমাদের—।'

ওসমান চায়ের কেতলি নিয়ে ঘরে ঢোকে। কাপে ও গ্লাসে চা ঢালতে ঢালতে সে হাঁপায় এবং বলে, তাড়াতাড়ি চা খাও। নিচে একটা ঘাপলা হয়েছে।'

'কি হয়েছে? কি হলো?'

আনোয়ারের উদ্বেগে তেমন সাড়া না দিয়ে আলতাফ বলে, 'বাঙালি আদমজী ইস্পাহানী তৈরি করার প্রোগ্রাম নিলে মানুষ এভাবে সাড়া দেয়?'

'শোনো দোস্ত! পাকিস্তানের এ্যাবসার্ড ও উদ্ভট জিওগ্রাফির জন্যে যে কোনো নেগলেকটেড রিজিওনের লোকের ধারণা হতে পারে যে, এই ভৌগোলিক অবস্থাই তাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের একমাত্র কারণ। এই এ্যাবসার্ড জিওগ্রাফি থাকবে না, ইট মাস্ট গো। কিন্তু পাকিস্তান নিয়ে মুসলমানরা যখন নাচানাচি করছিলো তাদেরও আইডিয়া দেওয়া হয়েছিলো যে, হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই তাদের ইম্যানসিপেশন হবে।'

তাদের এই তর্ক আরো চলতো। কিন্তু ওসমান বারবার তাগাদা দেয়, 'চলো, চলো! রঞ্জুর বাবাকে ডেকে বাড়িওয়ালা খুব ধমকাচ্ছে। পাড়ার লোকেরা খবর পেয়ে উনার বাড়ি ঘেরাও করতে যাচ্ছে!'

নিচে রাস্তায় বেশ বড়ো ধরনের জটলা। চট করে হাড়ডি খিজিরকে চোখে পড়ে। তার গলাও সবচেয়ে উঁচু, 'আমি নিজে দেখছি মাহাজনে উনারে ধামকি দিতাছে, মাহাজনে কয় পুলিসে এক পোলারে মারছে, বাকিটারে পুলিসের হাতে তুইলা দিমু আমি নিজে। কি চোট ছাড়তাছে! আমাগো সায়েবে না গেলে মনে লয় দুইচাইরখান চটকানা ভি মাইরা দিতো!'

'আঃ! তুই চিল্লাস ক্যালায়?' আলাউদ্দিন মিয়া ধমক দেয়, কিন্তু তেমন জোরে নয়। আলতাফকে দেখে সে অনুযোগ করে, 'আপনে তো পিঠটান দিলেন, পোলাপানে আমারে কয়, মিটিং তো আর ধইরা রাখতে পারি না। পাবলিকে শহীদের ভাইয়েরে দ্যাখবার চায়।'

আলতাফ বলে, 'আমি তো ওদের ঘরে গিয়েছিলাম। শুনি ওর ছোটো ভাই গেছে নরসিংদি আর বাপ কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে।'

'যাইবো ক্যালায়?' খিজির আলি ফের এগিয়ে আসে, 'বাড়িআলা কাউলকা রাইতে একবার ধামকি দিয়া গেছে, রঞ্জুরে জানি মিটিঙে না পাঠায়। আবার আউজকা মকবুল সাবরে ধইরা লইয়া গেছে। মহল্লার পোলাপান না গেলে তো মাইর দিতো। মিটিঙের মইদ্যে উনিরে এই কথাগুলি কইতে হইবো। ব্যাকটি কইয়া দিবো! মাহাজনে কি কইরা তারে বেইজ্জতি

করছে পাবলিকরে কইয়া দিবো।' উত্তেজনা ও আবেগে খিজির কাঁপে, মহল্লার মাইনষে আউজকা মাহাজনরে বানাইয়া ছাড়বো!'

'তুই চুপ কর না!' তাকে ধমকে থামায় আলাউদ্দিন, 'বাঙ্গুর লাহান খালি প্যাচাল পাড়স! মিটিঙের মইদ্যে এইগুলি কইবো ক্যালায়? মিটিঙের এজেন্ডা আছে না?'

এইসব হৈ চৈ ও লোকজনের মাঝামাঝি হাতে-কাচা ঘি রঙের শার্ট ও সবুজ চেক চেক লুঙ্গির ভেতর থর থর করে কাঁপে মকবুল হোসেন।

তার ঠোঁটের কাঁপন দেখেই রঞ্জু ওপরের দিকে তাকায়। ওদের বারান্দায় রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানু। রানুর মুখ ভয়ানক ফ্যাকাশে। আহা! মেয়েটা নিশ্চয় খুব ভয় পেয়েছে। চারপাশের কোলাহল ওসমানের কানে বাজে আবহ-সঙ্গীতের মতো, এসব ছাপিয়ে শোনা যায় রানুর মিনতি, 'আপনে একটু বলেন না। আব্বারে মিটিঙে নিলে আব্বা কিছু বলতে পারবে না, আব্বা একেবারে সাদাসিধা মানুষ! আব্বারে আপনে ঘরে নিয়া যান!' ওসমান ফের ওপরে তাকায়,—না, কোথায় রানু? ইশারায় তাকে ডেকে রানু কি এই সব কথা তাকে বলতে পারতো না? ওসমান ভাবে, যাই, রানুকে বলে আসি, আমি তো আছি। তোমার বাবাকে আমি দেখবো। তুমি কিছু ভেবো না।—কিন্তু রানুর সঙ্গে এইসব কথাবার্তা বলার বা তার ওপর রানুর আস্থা উপভোগ করার কপাল কি ওসমানের হবে? লোকজন শালা ছুটছে।

ছুটন্ত জটলার ভেতর থেকে হঠাৎ শ্লোগান ওঠে 'শহীদের রক্ত'— 'বৃথা যেতে দেবো না।' এরপর ফের শ্লোগান 'আবু তালেবের রক্ত'— 'বৃথা যেতে দেবো না।' এরকম ২/৩ বার শ্লোগান দেওয়ার পর খিজিরের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়, 'আইয়ুবের দালাল মাহাজন!' কিন্তু এর কোনো জবাব পাওয়া যায় না। দ্বিগুণ শক্তিতে খিজির চিৎকার করে, 'আইয়ুবের দালাল মাহাজন!' এবার জবাব আসে, 'ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক!' তারপর ফের শ্লোগান ওঠে, 'মাহাজনের জুলুম, মাহাজনের জুলুম'— 'চলবে না, চলবে না!' খিজির এবার ফের নতুন শ্লোগান তোলে, মানুষরে ডাইকা বেইজ্জতি করা'-'চলবে না চলবে না!' পাড়ার ছেলেরা মনে হয় মজা পেয়েছে, খিজিরের রাগ তারা উপভোগ করে। রঞ্জুর বাবার ঠোঁট আরো তীব্রভাবে কাঁপে, ওসমানের ভয় হয়, এরা কি রহমতউল্লার বাড়ি থেকে রানুদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা করছে? আলাউদ্দিন মিয়া ছিলো মিছিলের পুরোভাগে, খিজিরের দিকে তাকিয়ে সে একটু থামে। মিছিল এগিয়ে চলে। ওপরের দিকে চামড়া জড়ানো হাড়ডিসর্বস্ব হাত ওঠানো খিজির তার সামনে এলে আলাউদ্দিন চোখ ঘুরিয়ে একটু নিচুস্বরে বলে, 'খ্যাচরামো করনের জায়গা পাইলি না, না? এইগুলি কি কস হারামজাদা, এইগুলি কি? খামোস মাইরা থাক!'

কিন্তু আনোয়ার এগিয়ে আসে, 'কেন? মহাজন তো খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। তার বিরুদ্ধে শ্লোগান দিলে ক্ষতি কি?'

খিজির আলি ভরসা পেয়ে বলে, 'আরে আমি তো তাই কই! রঞ্জুর বাপে ইস্টেজের উপর খাড়াইয়া কউক, মাহাজন আমারে লইয়া গিয়া বেইজ্জতি করছে! আপনেরা বিচার করেন!'

আনোয়ার সায় দেয়, 'বলুক না! আইয়ুব খানের লোক্যাল এজেন্টদের এক্সপোজ করা দরকার।'

আলাউদ্দিন মিয়া কিন্তু আনোয়ারের দিকে মনোযোগ দেয় না। এমন কটমট করে খিজিরের দিকে সে তাকায় যে, মনে হয় ওকে আচ্ছা করে পেটাতে পারলে তার শীররটা

জুড়ায়। কিন্তু মামার বদভ্যাসগুলো তার ওপর বর্তায়নি। চাকরের গায়ে সে কখনো হাত তোলে না, পারতপক্ষে মুখও খারাপ করে না। তাহলে কি খিজিরকে আজ বরখাস্ত করে দেবে? তবে আপাতত সেই কাজ স্থগিত রেখে আনোয়ারকে বলে, 'আপনেরা আমাগো মহল্লার খবর রাখেন না, তাই এইসব কথা কন! রহমতউল্লা সর্দাররে ওপেনলি কনডেম করলে মহল্লায় রি-এ্যাকশন খারাপ হইবো, বুঝলেন না?'

আলতাফ এবার এগিয়ে আসে আনোয়ারের সমর্থনে, 'মুসলিম লীগের এইসব পচা রদ্দি মালের বিরুদ্ধে কথা বললে কার গায়ে লাগবে?'

'দরকার কি?' আলাউদ্দিন তর্ক করে, 'মকবুল সাব মঞ্চে দাঁড়াইয়া কইবো, তার পোলারে পুলিসে গুলি করছে! তার পোলারে মারার ফলে তাদের ফ্যামিলিতে মুসিবত নাইমা আসছে, তার পোলা ছিলো ফ্যামিলির ওনলি আর্নিং মেম্বার।—এইগুলি বলুক। আমাদের দরকার পাবলিকের সিমপ্যাথি, না কি কন?'

আনোয়ার তবু গোঁ ছাড়ে না, 'স্টেজে উঠে কান্নাকাটি করার দরকার কি? এতো নাটক হচ্ছে না, পাবলিক কাঁদানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং মহাজনের শয়তানিটা এক্সপোজ করলে কাজ হয়। তাই না আলতাফ?'

আলতাফ এবার আলাউদ্দিনের ওপর খুব বিরক্ত হয়েছে, 'ঐ লোকটাকে এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনাকে পুলিশ এ্যারেস্ট করে যখন তখন এই লোক পুলিশকে ঠেকাতে এসেছিল?' তার স্বর একটু নরম হলো, 'আপনি সেই কবে থেকে পলিটিক্স করছেন, এতো সাফার করলেন, তবু এদের চিনতে পারেন না?'

'ঐগুলি কথা কইয়া ফায়দা কি, কন?' আলতাফকে থামিয়ে দিলেও আলাউদ্দিন নিজেই ঐসব কথা শুরু করে, 'মুসলিম লীগের এগেন্সটে কথা বললে যখন গুনা হইতো, বুঝলেন, গুনা হইতো, জমাতে নমাজ ভি পড়বার দিতো না, আমরা তখন ছোটো আছিলাম, তখন থাইকা জানটারে বাজি রাইখা চোঙা ফুঁকতাছি। ঐ যে মুজিব ভাইয়ের পিছে খাড়াইছি, আর ইমাম বদলাই নাই, তার পিছনেই রইছি! একটু থেমে সে ফের বলে, 'মহল্লার মইদ্যে কার কি রকম ইজ্জত আমরা জানি না?'

১১

কথা বলতে বলতে শ্লোগান দিতে দিতে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, পার্কের ভেতর থেকে আসে বক্তৃতার আওয়াজ। আরো একটু এগোলে কথাগুলো স্পষ্ট হয়, 'ভাইসব, তেইশ বছর থেকে সোনার বাঙলার সম্পদে ফুলে ফেঁপে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তান। বাঙলাকে শোষণ করে গড়ে তোলা হয় করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ। পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমিতে খাল কেটে আজ ফসল ফলানো হচ্ছে, সেসব কার টাকায়? আমাদের বন্যা সমস্যার কোনো সমাধান হয় না।

আমাদের কৃষক আজ পাটের দাম পায় না, বাঙলার ছাত্রসমাজ আমাদের এখানে তৈরি কাগজ কিনতে বাধ্য হয় বেশি দামে, বাঙালি বলে ভালো চাকরি থেকে আমরা বঞ্চিত। আমাদের অধিকার আদায়ের কথা বলার জন্য আমাদের নেতাকে কারাবন্দি হতে হয়, মিথ্যা ষড়যন্ত্রের মামলা চাপিয়ে তাকে নিঃশেষ করে দেওয়ার ফন্দি আঁটে আইয়ুব খান। ভাইসব, আমরা বাহান্ন সালে রক্ত দিয়েছে, বাষট্টিতে রক্ত দিয়েছি, উনসত্তুরের সূত্রপাত রক্তপাতের ভেতর। ভাইসব—।'

ভিক্টোরিয়া পার্ক ভর্তি মানুষ। শহীদ মিনারের বিশাল বেদীতে অনেক লোক, এদের বেশির ভাগই বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতা ও কর্মী। বেদীর চারদিকে সিঁড়িতেও ছেলেরা বসে রয়েছে, কারো কারো হাতে পোস্টার-সাঁটা বাঁশের চাটাই। পাশের রেলিঙ টপকে উপচে পড়েছে মানুষ, দেওয়াল ঘেঁষে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতে বক্তৃতা শুনছে। পূর্বদিকের গেট থেকে ফুচকাওয়ালা ঘুঘনিওয়ালাদের সরে যেতে হয়েছে ওপারে ইসলামিয়া কলেজের গেটে। এখান থেকে উল্টোদিকে ট্যাকসি-স্ট্যাণ্ডে ৩টে ট্রাক, ট্রাকে রাইফেল হাতে সদাপ্রস্তুত পুলিসবাহিনী। শীতের বিকালবেলাটা গড়িয়ে পড়েছে এই পার্কে, শেষ-রোদ লেগে শহীদ মিনারের গম্বুজ লালচে শাদা রঙে হাসছে। মাইকে এখন অন্য একটি কণ্ঠ, 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পাকিস্তানে তাদের পা-চাটা দালাল আইয়ুব খান ও তার চেলাচামুণ্ডাদের দিয়ে এদেশের মানুষকে শোষণ করে চলেছে। এদেশের সাধারণ মানুষের পেটে আজ ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই। অথচ সর্বহারা মানুষের শ্রমে উপার্জিত টাকায় কিছু মানুষ প্রতিদিন সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। ঋণ ও সাহায্য নেওয়ার নাম করে সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকুর আইয়ুব খান দেশকে, দেশের মানুষকে বন্ধক দিয়ে রেখেছে বিদেশী প্রভুর কাছে। আজ বিশ্বের সর্বত্র, এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকায় সর্বহারা মানুষ জেগে উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল মুৎসুদ্দীদের দিন শেষ হয়ে এসেছে, কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষ আজ—।'

একটু গম্ভীর ও একটু হাসিহাসি মুখ করে আলাউদ্দিন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। ১টি ছেলে এসে বলে, 'আলাতাফ ভাই, ওপরে চলেন।' আলতাফ মাথা নাড়ে, 'ছাত্রদের মিটিং, আমরা শুনতে এসেছি।'

আলাউদ্দিন মিয়ার পেছনে খিজিরও সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। কিন্তু বেদী পর্যন্ত না উঠে বসে পড়ে সিঁড়ির ওপরের দিকে একটি ধাপে। খিজির আলির পেছনে ছিলো মকবুল হোসেন। খিজির বসার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ওর পাশে দাঁড়ায়। আলাউদ্দিন উদ্যোক্তাদের একজনকে পাশে ডেকে কানের কাছে মুখ এনে কি বলে আর সেই উদ্যোক্তা দাঁড়ায় বক্তৃতারত ছেলেটির পাশে। ছেলেটি বলে, 'ভাইসব, আর মাত্র একটি কথা বলেই আমি বিদায় নেবো। আমি কেবল এই কথা বলতে চাই যে, শুধু সরকার বদলালেই আমাদের দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা চায় না যে আমদের ঘুণে-ধরা সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজে ব্যবস্থা থেকে আমরা মুক্ত হই। তারা তাই তাদের নানা রকম রঙ-বেরঙের দালাল দিয়ে—' তার বক্তৃতা শোনা যায় না, বেদীর নিচেই একটি জটলা শ্লোগান দিতে শুরু করে, 'জাগো জাগো'-'বাঙালি জাগো।' 'পিণ্ডি, না ঢাকা?'—'ঢাকা ঢাকা।' 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'—'মানি না মানি না।'

এর মধ্যে অন্য একটি তরুণ মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পাশে রঞ্জুর বাবার পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আলাউদ্দিন মিয়া। মাইকে শোনা যায়, 'ভাইসব, আপনারা বসে

পড়ুন, বসে পড়ুন! আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মহান শহীদ ভাইয়ের মহান পিতা। আপনারা জানেন', এখানে বক্তা বড়ো উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বড়ডো তাড়াতাড়ি কথা বলতে থাকে; একই সঙ্গে মাইকে কোঁ কোঁ আওয়াজ শুরু হওয়ায় তার কথা কিছু বোঝা যায় না। একবার শোনা যায়, 'আমরা জানি, আমরা জানি, আমরা জানি—' তার জানা জিনিসটা বলার সুযোগ পায় না, আরেকজন এসে মাইক দখল করে এবং বলে, 'গত ৮ই ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে নিহত ওয়াপদার তরুণ কর্মচারী শহীদ আবু তালেবের পিতা এখন আপনাদের সামনে কিছু বলবেন।' তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দক্ষিণ দিকের গেটের পামগাছের নিচে জটলা থেকে শ্লোগান ওঠে, 'সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা'—'হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!' 'দুনিয়ার মজদুর'—'এক হও!', 'কেউ খাবে, কেউ খাবে না'—'তা হবে না, তা হবে না!', 'জোতদারের গদিতে'—'আগুন জ্বালো এক সাথে।' 'মিল মালিকের গদিতে'—'আগুন জ্বালো এক সাথে।'

এইসব শ্লোগান চলছে, তখন আবার বেদীর নিচে সেই জটলা থেকে দক্ষিণ দিকে মুখ করে কয়েকজন শ্লোগান দেয়, 'বাঙলার মজদুর'—'এক হও,' 'ছয় দফা ছয় দফা'—'মানতে হবে মানতে হবে', 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'—'মানি না মানি না', 'শেখ মুজিবের শেখ মুজিবের' —'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।'

দুটো জটলা চিৎকার করার ভঙ্গি এমন যে, মনে হয় তারা যেন পরস্পরের দিকে শ্লোগান ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। শ্রোতাদের বেশির ভাগই দুই দিকের শ্লোগানেই সাড়া দিচ্ছিলো। কিন্তু শ্লোগান আর থামে না দেখে লোকজন এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করে। কিছু কিছু লোক রেলিঙের বাইরে যাবার উদ্যোগ নেয়। খিজির দাঁড়িয়ে মঞ্চে ওঠে এবং সেখান থেকে গোটা পার্কটাকে ভালো করে দ্যাখার চেষ্টা করে। মঞ্চে সবাই শিক্ষিত লোকজন। বেশির ভাগই ইউনিভারসিটি বা কলেজের ছাত্র, অন্তত ভদ্রলোক তা বটেই। কিন্তু এদের মধ্যে দাঁড়ালেও কেউ তাকে খেয়াল করে না, যেভাবে শ্লোগান-পাল্টা শ্লোগান চলছে তাতে মিটিঙের পরিণতি নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন। আলাউদ্দিনও ঘাবড়ে গিয়েছিলো বৈ কি! তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, সে জানে যেন এসব ব্যাপার কেবল শব্দবাণে সীমাবদ্ধ থাকে না। ছাত্রদের মধ্যে কি ধরনের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে কে জানে? ইউনিভারসিটিতে বছরের পর বছর ধরে ল ক্লাসে পড়ে-থাকা নেতাগুলো কি কিছুই আঁচ করতে পারে না? কর্মীদের অস্ত্র কখন যে মুখ থেকে হাতে সরে কোন্ শালা জানে?—আলাউদ্দিন তাই খিজিরকে একটু চোখ টিপে দেয়, সে যেন তার সামনেই একটু আড়াআড়িভাবে দাঁড়ায়। কিন্তু এই বাস্টার বুদ্ধি দ্যাখো! ব্যাটা তার ইশারার কি বুঝলো, হাত দিয়ে মাইকের স্ট্যান্ড ধরে ফেললো। তারস্বরে খিজির চ্যাচাতে শুরু করে, ভাইসব ভাইসব, আপনেরা খালি খালি চিল্লাচিল্লি করেন ক্যালায়? খামোস মাইরা মিটিং হোনবার পারেন না? পাঁচজনে দশজনে একলগে নামছেন, খালি চিল্লাচিল্লি করবেন তো খালি হাউকাউ হইবো, কাম হইবো আপনের কেলাটা! কাম করেন একলগে, হাউকাউ কইরেন না। হালার গ্যাঞ্জাম তো বহুত করছেন, অহন আল্লার ওয়াস্তে চোপাগুলিরে এট্টু আরাম দেন!' খিজির আলির দৈর্ঘ্য ও কৃশতা, তার ভাঙাচোরা গাল, কাটখোট্টা মার্কা চেহারা, কালচে পুরু ঠোঁট কিংবা তার ঘোরতর স্থানীয় উচ্চারণে শ্রোতাদের মধ্যে দারুণ হাসাহাসি শুরু হয়। এমনকি আলাউদ্দিনও হাসতে হাসতে তার পিঠে হাত রেখে বলে, 'ল হইছে!' লোকজন খুব হাসছে। যারা তাকে চেনে তারা তো হাসছেই; তারা

জানে যে, কোথাও কোনো গোলমাল কি জটলা দেখলেই হাড্ডি খিজির সেখানে হাজির হয়ে চাপাবাজি করে। শ্রোতাদের বেশির ভাগই তাকে চেনে না, তারা আরো হাসছে। মাইকের সামনে এখন মকবুল হোসেন। কিন্তু লোকজন খিজিরের উচ্চারণ ভঙ্গি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে, মকবুল হোসেনের দিকে তাদের মনোযোগ দেওয়ার সময় কোথায়? আনোয়ার ও আলতাফ শ্লোগান ও পাল্টা শ্লোগানে আড়ষ্ট হয়ে পরস্পরের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করছিলো। খিজিরের এই কাণ্ড দেখে তারা সহজ হলো, নিজেদের মধ্যে খুব হাসাহাসি করে। শ্লোগান বন্ধ করে ছেলেরা নিজেদের অজান্তেই খিজিরের আহ্বান মেনে নিয়েছে। খিজিরের প্রতি ঠাট্টা, কৌতুক ও বিদ্রূপের অভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন জটলার ছেলেদের পরস্পরের প্রতি তেতো মনোভাব স্থগিত রইলো। আলাউদ্দিন মিয়া ঠোঁটে হাসি বিছিয়ে রেখেই ঘোষণা করে, 'এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন শহীদ আবু তালেবের পিতা জনাব মকবুল হোসেন সাহেব।' শ্রোতারা মোটামুটি চুপচাপ হয়ে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু মকবুল হোসেন জিভ দিয়ে ঠোঁট মোছে, বারবার মোছে। 'আমি' বলার পর সে ঢোক গেলে এবং ফের শুরু হয় তার জিভ দিয়ে ঠোঁট মোছার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তার পেছন থেকে একজন তরুণ নেতা বলে, 'বলেন না, বলেন না!' এই গলা মাইকে বড়ো স্পষ্ট, 'বলেন, আইয়ুব-মোনেমের লেলিয়ে-দেওয়া পুলিসবাহিনী আমার ছেলেকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে।' কথাগুলো আস্তে বললেও মাইকে শোনা যায়। এবার শ্রোতাদের মধ্যে সাঙ্ঘাতিক নীরবতা। মকবুল হোসেনের ঠোঁট কাঁপে। পেছনের ছেলেটি ফের বলে, 'বলেন, বলেন।' মকবুল হোসেন আস্তে আস্তে বলে, 'আমার ছেলে, আবু তালেব, আমার বড়োছেলে মোহাম্মদ আবু তালেব গত মাসের ৮ তারিখে নিউমার্কেটের সামনে নীলখেতের মোড়ে পুলিসের গুলিতে—'

তরুণ ছাত্রনেতা প্রম্পট করে, 'বলেন মিছিল থেকে—'

মকবুল হেসেন বিড়বিড় করে,'মিছিল থেকে মারা গেছে।'

ছাত্রনেতা ফের প্রম্পট করে, 'বলেন, আমার একটি ছেলে মারা গেছে, কিন্তু আমার ছেলের মতো লক্ষ লক্ষ ছেলেকে আজ আইয়ুব শাহী উচ্ছেদ করার জন্যে—।'

কিন্তু মকবুল হোসেনের ভারি গলায় বলা হয়ে যায়, 'আমার একটি ছেলে মারা গেছে, কিন্তু আমার আরেকটি ছেলে আছে। তাকে যদি না বাঁচাতে পারি? তাকে ক্যামনে বাঁচাই, ক্যামনে বাঁচাই?' সে কাঁদতে শুরু করায় তার কথা একেবারে নেতিয়ে পড়ে। সে চোখে হাত দেয় না, নাক মোছে না। নাক থেকে চোখ থেকে পাতলা পানি গড়িয়ে পড়ছে। জনসভা নির্বাক হয়ে তার কান্নাজড়ানো ধ্বনি শোনে। মকবুল হোসেনের পাশে দাঁড়িয়ে খিজির বলে, 'মাহাজনে আপনেরে বেইজ্জতি করছে, কন! আরে কন না, কন না! কান্দেন ক্যালায়?'

আলাউদ্দিন মকবুল হোসেনের ঘাড়ে আলগা করে হাত রাখে। লোকটি একটু ঝুঁকে পড়ে। তারপর আলাউদ্দিনের ঘাড়ে মুখ গুঁজে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

খিজির বেশ উত্তেজিত। তার ঠোঁটজোড়া এমন বেসামালভাবে কাঁপে যে, ভয় হয় ঐ দুটো তার মুখ থেকে খসে নিচে না পড়ে। অস্থির ঠোঁটজোড়া থেকে বেরিয়ে আসে, 'কান্দেন ক্যালায়? কথাটা কইবার পারলেন না? কন না! ডর কিয়ের? আমরা এ্যাতোটি মানুষ আছি

না? কান্দনের কি হইলো? কইয়া ফালান, মাহাজনে আপনেরে ডাইকা লইয়া কেমুন বেইজ্জতি করলো, কন না!'

মঞ্চের ও সিঁড়ির লোকজন সমস্ত অডিয়েন্সের সঙ্গে মাইকে মকবুল হোসেনের ফোঁপানি শুনতে শুনতে তার প্রতি সহানুভূতিতে ও তার পুত্রশোকে বেশ বুঁদ হয়ে বসে ছিলো। খিজিরের এই সব উত্তেজিত অনুরোধও মাইকে ধরা পড়ায় মকবুল হোসেনের ফোঁপানি বারবার বিঘ্নিত হয়। লোকজনের মেজাজ চড়ে যায়, একজন বলে,'আঃ! আরেকজন বলে, 'আপদটা!' এই দ্বিতীয়জনের গলায় শিশুদের কোলাহলে কাঁচা-ঘুম-ভাঙা মানুষের বিরক্তি, 'কুত্তিটার কমনসেন্স নাই!'

মকবুল হোসেন তার বুকে মাথা রাখায় আলাউদ্দিন বড়ো অভিভূত। সমস্ত শ্রোতার চোখ এখন তার দিকে। তাকে দুই হাতে প্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে ধরতে কৃতজ্ঞগদগদ কণ্ঠে আলাউদ্দিন ঘর্ঘর করে, ভাইসাব, এট্টু শক্ত হইতে চেষ্টা করেন।' একটু থেমে সে বলে, 'শক্ত হন, ডর কইরেন না, রহমতউল্লা সর্দাররে আমি সামলাইবার পারুম!'

মিটিং শেষ হলে রিকশা আর পাওয়া যায় না। ওসমান ও আনোয়ারকে হাঁটতে হলো একেবারে রথখোলার মোড় পর্যন্ত। রিকশায় উঠে লাভটা কি হলো? মানুষে, গাড়িতে, স্কুটারে, রিকশায়, সাইকেলে নবাবপুর একেবারে ঠাসা। ওদের রিকশা কিছুক্ষণ চলে, ফের থামে। সামনে যানবাহনের স্রোত থামে, ওদের রিকশাও থামে, রাস্তা ফের চলতে শুরু করলে রিকশাও চলে।

মিটিং থেকে বেরুবার পর থেকেই আনোয়ারের মেজাজ চড়ে আছে, 'ব্যাটারা আছে খালি নিজেদের নিয়ে। নিজেদের লিডার, নিজেদের পার্টি ছাড়া কথা নেই।' ওসমান বলে, 'নিজেদের কথা বলবে না কেন? পার্টিগুলো তো আর মার্জড হয়ে যায়নি।'

'আরে ভাই, পাবলিক মিটিং তো সেমিনার নয়। সেমিনারে না হয় নিজের নিজের বক্তব্য বলতে পারে।' এই পর্যন্ত বলে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা ১টি দোকানের সামনে সিমেন্ট আনলোড-করা ট্রাকের উদ্দেশে আনোয়ার গালাগালি করে, তারপর ফের বলে, 'শুধু নিজেদের কথাই বলবে তো ইউনিটি করার দরকার কি?'

'বলতে দাও না', ওসমান এমন করে বলে যেন মিটিঙে দলের বক্তব্য প্রকাশ করতে দেওয়ার মালিক আনোয়ার, 'বলতে দাও। দ্যাখো মানুষ কার প্রোগ্রাম এ্যাকসেপ্ট করে।'

'আরে নাঃ! এর মধ্যে যদি বুঝতে পারে যে, অন্য কোনো পার্টির প্রোগ্রামে মানুষ সাড়া দিচ্ছে তো ব্যাটারা নিজেরাই সেই ইস্যু নিজেদের নামে চালাবে।'

'তাহলে তো ভালোই।' ওসমান হাসে, 'মনে করো তোমাদের প্রোগ্রাম ওরা এ্যাকসেপ্ট করলো, তাহলে কি তোমাদের বিজয় হলো না?'

'না। আমাদের প্রোগ্রাম ওরা নেবে শ্লোগান হিসাবে। কোনো প্রোগ্রামের পপুলারিটি বুঝে তাই নিয়ে শ্লোগান ঝাড়বে। এককালে অটোনমির নামে খড়্গহস্ত ছিলো, পাকিস্তানের

কনস্টিটিউশনে নাকি ৯৯% অটোনমি দেওয়া হয়েছে। আবার দ্যাখো এরাই এখন অটোনমির চ্যাম্পিয়ন। এরপর দেখবে সোস্যালিজমকে নেবে শ্লোগান হিসাবে। অথচ কোনো ইস্যুকে এরা পিপলের কাছে নিয়ে যায়নি। যে কোনো পার্টির যে কোনো প্রোগ্রাম মানুষের মধ্যে পপুলার হলে সেটার শ্লোগানটা এরা পিক আপ করে নিয়েছে।'

'কিন্তু একই প্ল্যাটফর্ম থেকে সবাই বললে লোকে কিন্তু বুঝতে পারে কার কথা জেনুইন, কারটা শুধু চাল মারা! এছাড়া কাজ করতে করতে ওয়ার্কারদের মধ্যে পরস্পরের মতামত সহ্য করার অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।'

'এখানে কি ধৈর্য পরীক্ষা আর পরমতসহিষ্ণুতার ট্রায়াল দেওয়া চলবে? কৈ, ঐ লোকটাকে তো বলতে দেওয়া হলো না?'

'কোন লোক?'

'আরে ঐ যে রিকশাওয়ালা না স্কুটার ড্রাইভার!—ঐ যে তোমাদের আলাউদ্দিন মিয়ার এমপ্লয়ি—ওকে তো বলতে দেওয়া হলো না! মতামতের আদান-প্রদান কি খালি ভদ্রলোকদের মধ্যে চালাচালি হবে?'

ওসমান এবার বিরক্ত হয়, 'তুমি বোঝো না! খিজিরকে বলতে দিলে বাড়িওয়ালা চটে গিয়ে আবু তালেবের বাবাকেও শহীদ করে ছাড়তো, অন্তত ঐ বাড়িতে থাকতে দিতো না।'

'কেন? বাড়িওয়ালা কি ফ্রি থাকতে দেয়?'

'ফ্রি থাকবে?' ওসমান ফিক করে হাসে, 'তিন তারিখের মধ্যে ভাড়া না দিলে দিনে দুবার, এক সপ্তাহ পার হলে দিনে চারবার তাগাদা দেয়।'

'তাহলে এতো ভয় পাবার কি আছে? এই বাড়ি ছাড়লে আর বাড়ি পাবে না?'

'পাবে না কেন? তবে ভাড়া বেশি দিতে হয়। বাড়ি বদলানো মানেই বেশি ভাড়ায় যাওয়া। আবার এই বাড়িতে যারা আসবে তাদেরও বর্তমান ভাড়া বেশি দিতে হবে। প্রব্লেমটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না—।' ওসমানকে কথা শেষ করতে দেয় না আনোয়ার, 'বুঝি। ঢাকায় বাড়িওয়ালা শালারা একেকটা থরো-ব্রেড হারামজাদা! দফায় দফায় ভাড়া বাড়াচ্ছে। এখন তো বছর বছর বাড়ে, এরপর ঈদে বাড়াবে, মহরমে বাড়াবে। শীতে বাড়াবে, গরমে বাড়াবে।'

ওসমান হো হো করে হাসে, 'রোদে বাড়াবে, ছায়ায় বাড়াবে।'

'তারপর ধরো বাঙালি জাতীয়তাবাদের তোড় যেভাবে আসছে তাতে মনে হয় শহীদ দিবস উপলক্ষেও বাড়াবে, পয়লা বৈশাখে বাড়াবে।' আনোয়ার হাসতে হাসতে বললে ওসমান খুশি হয়। আনোয়ারও তো বাড়িওয়ালা। যাক, ওসমানের কথায় সে রাগ করেনি। হাসি থামিয়ে আনোয়ার বলে, 'আমাদের বাড়িতেও তো দেখি। আম্মা আর ভাইয়া ভাড়া বাড়াবার ব্যাপারে সব সময় একমত!'

ওসমান বিব্রত হয়, 'না সবাই তো একরকম নয়। তবে ধরো বাড়ি ভাড়া দেওয়াটা এখন একরকম ব্যবসা।'

'ব্যবসা কি বলছো? জমিদারী, জমিদারী!' আনোয়ার অতিরিক্ত উত্তেজনা প্রকাশ করে, 'এ শালা আরেকটা পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট! লর্ড মাউন্টব্যাটেন'স্ পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট নাইন্টিন ফোর্টি সেভেন। এদিক ওদিক করে একটা বাড়ি বানাও, এক বাড়ি ভাড়ার টাকায় আরেকটা বাড়ি করো। সেকেন্ড টাইমে একটু পশ এরিয়ায়, থার্ড টাইমে গুলশান। ব্যস এক জেনারেশনেই বুর্জোয়া!'

বাড়িওয়ালাদের সম্বন্ধে কথা উঠলে আনোয়ার একটু বাড়াবাড়ি রকম চটে। অবশ্য ওদের বাড়ির বিশেষ ধরনের সুবিধা সে খুব একটা নেয় না! তার কলেজের চাকরির রোজগারের বড়ো ১টা অংশ তুলে দেয় মার হাতে। বাড়ির যে অংশে ভাড়াটেরা থাকে সেদিকে পারতপক্ষে পা মাড়ায় না। তাহলে এই বাড়িভাড়ার প্রসঙ্গ উঠলে সে এতো চড়া-গলা হয় কেন? ওসমান এ নিয়ে কোনোদিন ভাবেনি, এখনো ভাবলো না। তবে ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে। একজনের পরিবারের দুর্বল দিক যে কথায় এসে পড়ে তা এড়িয়ে চললে কি ভালো হয় না? ওসমান তাই আগের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চায়, 'খিজিরকে বলতে দিলে হতো কি, ও হয়তো রহমতউল্লা সর্দারের নামে যা তা বলতো, মিটিঙে ক্যাওস হতে পারতো!'

'রাখো! বাড়িওয়ালা যতো শক্তিশালী হোক না, মানুষ যেখানে টোটাল এক্সপ্লয়টেশনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সেখানে তার পজিশন আর কি এমন শক্ত?'

সামনের ট্রাক সিমেন্টের বস্তা নামিয়ে দিয়ে স্টার্ট দিলো। কিন্তু আলুবাজারের মোড়ে ফের জাম। ওসমান সেই ট্র্যাফিক জামের কারণ খুঁজতে খুঁজতে বলে, 'না, আবু তালেবের বাবাকে যদি উৎখাত করে তো তার সমস্ত কষ্টটা বহন করতে হবে তাকে নিজেকে। আমাদের বাড়িওয়ালার যারা অপোজিট গ্রুপের লোক, তারাও তাকে কম ভাড়ায় বাড়ি দেবে না। টাকা পয়সার ব্যাপারে লোকটা একটু ট্রাবলে আছে, তালেব মারা যাবার পর—।' ওসমানকে আনোয়ার মাঝখানে থামিয়ে দেয়, 'যার ছেলে মারা যায় পুলিসের গুলিতে তার আবার ভয় কি ? তার হারাবার আর কি আছে?'

'আছে। আরো একটি ছেলে। দুটো মেয়ে আছে—'

'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নাকি?' আনোয়ারের এই ঠাট্টায় ওসমান সাড়া দিতে পারে না। আনোয়ার বলে, 'আর কি আছে, বললে না?'

'আর কি থাকবে, বলো? ছোটোখাটো চাকরি আছে. খেটেখুটে খায়, সাহসটা কম।'

ওর বলতে ইচ্ছা করছিলো যে, মবকুল হোসেন গরিব মানুষ, চট করে বিপ্লব করা তার পোষায় না। আনোয়ার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ঢাকা শহর বলে তোমাদের এইসব রহমতউল্লা এখন পর্যন্ত দাপটে আছে। গ্রামে অবস্থা অন্যরকম। তোমাকে বললাম, চলো একবার ঘুরে আসি। সামনের সপ্তাহে চলো।'

'তোমার কলেজ?'

'আরে কলেজ তো সব সময় বন্ধ। একবার ছেলেরা স্ট্রাইক করে, একবার গভমেন্ট বন্ধ করে দেয়। বাকি সময়টা হয় রোববার, নয় ভ্যাকেশন। চলো, ঘুরে আসবে।'

আমজাদিয়ায় এক কোণে ওদের টেবিলের সামনে রয়েছে শওকত। মাথাটা সে ঠেকিয়ে রেখেছে পেছনের দেওয়ালে। সামনে এ্যাশট্রেতে মোটা চুরুট থেকে পাতলা ধোঁয়া জালের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আনোয়ার সামনে এসে বলে, 'একা যে?

'এর জবাব আমি কি করে দেবো? যারা আসেনি তাদের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব কি আমার?' এই কথার সঙ্গে নিঃশব্দ হাসিতে তার মস্ত বড়ো মুখ ভরে যায়, চোখজোড়া ঢুলুঢুলু। ওসমান জিগ্যেস করে, 'আপনার খবর কি?'

'সাথী হ্যায় খুবসুরত—মওসম কা ইয়ে খবর হ্যায়!' শওকত গুনগুন করে গানটার সুর ভাঁজে। সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আরো ছড়িয়ে বসে চোখ বন্ধ করে।

চা খেতে খেতে আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'ওসমান, তোমার ছুটি নেওয়ার কি করলে?'

ওসমান আমতা আমতা করে, 'একটু মুশকিল হচ্ছে দোস্ত। আমাদের সেকশনে একজন ছুটি নিয়েছে, তার আর ফেরার নাম নেই।'

'আরে তোমার তো মেলা ছুটি পাওনা! একবার এ্যাপ্লাই করেই দ্যাখো না!' ওসমান আমতা করে, 'না আবার একটা প্রাইভেট ট্যুইশনি নিতে হলো, এবার পরীক্ষা দেবে।'

'ইন্টারমিডিয়েট?'

'না। এসএসসি, মানে ম্যাট্রিক দেবে।'

'এখন পরীক্ষা কোথায়? চলো তো যাই। ঘুরে এসে তৈরি করে দিও।'

ওসমান সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'কিন্তু অঙ্কে খুব কাঁচা। তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করা যাবে না।' ওসমান ভাবে, ভালো করে দেখিয়ে না দিলে রানুটা এবারও ফেল করবে। দায়িত্ব নিয়ে এভাবে কেটে পড়াটা কি ঠিক?

'এইসব গাধাগরুকে পড়াও কেন? তুমি না ভালো ছেলে না হলেতো পড়াও না। একটা ব্লান্ট ছাত্রকে পড়াতে বিরক্ত লাগে না?'

এইবার রানুর জন্য ওসমানের খুব খারাপ লাগে। মনে হচ্ছে একই অঙ্ক বারবার ভুল করার অপরাধে বাইরের একটা লোক এসে রানুকে বিশ্রীভাবে হেনস্থা করছে। খাতা থেকে মুখ তুলে রানু ওসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। রানুর মুখ আস্তে আস্তে ঝাপশা হয়ে আসে, তখন রানু কি রঞ্জু কার মুখ ঠিক ঠাহর করা যায় না।

ওসমান গম্ভীর হয়ে বলে, 'নিতে হলো। প্রিন্সিপ্‌লে অতোটা স্টিক করাটা আমাদের পোষায় না ভাই!'

এদিকে ঝিমুনি বা তন্দ্রা থেকে সোজা হয়ে বসে নিভে-যাওয়া চুরুটে আগুন ধরাতে শওকত জিগ্যেস করে, 'এই ব্লান্ট স্টুডেন্টটা কোন জেনডারের?' উল্টোদিকের টেবিল থেকে উঠে আসে খালেদ। ঐ টেবিলটা থাকে কবিদের দখলে, খালেদও কবিতা না গল্প কি যেন লেখে। খালেদ এসেই শওকতকে বলে, 'কি ওস্তাদ, আউট হয়ে গেছেন নাকি?'

শওকত হাসে, 'এতো তাড়াতাড়ি? গুলসিতান থেকে পাঁচটা পেগ দিয়ে বউনি করে এলাম।'

'পাঁচ পেগ মেরে দিলেন?' পাঁচ পেগের কথা তার বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস করার কোনো কারণও নাই। 'কি খেলেন?' আনোয়ার জিগ্যেস করলে শওকত ফের হাসে, 'এই শীতে আর কি চলবে? দিস ওয়েদার হুইসপারস, হুইস্কি! হুইস্কি!'

খালেদ বলে, 'চলেন। এবার হাক্কায় একটু বঙ্গজননীর সেবা করা যাক!' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শওকত বলে,'আসেন না! আনোয়ার, একটা পাঁইট মেরে আসি।'

আনোয়ার সরাসরি না করে, 'না, এক জায়গায় যেতে হবে।'

খালেদ একটু ঠাট্টা করে ,'বিপ্লব ত্বরান্বিত করার কাজে?'

শওকত তখন ওসমানকে আহ্বান জানায়, 'ওসমান?'

ওসমান সঙ্গে সঙ্গে রাজি। আনোয়ারের দিকে না তাকিয়েই 'কাল দ্যাখা হবে দোস্ত' বলে শওকত ও খালেদের সঙ্গে সে বেরিয়ে যায়।

১২

'বললাম না আছে! তুমি কি আমার থাইকা বেশি জানো?'

'তুই তো সব জানিস!'

ওসমানের একটু ঘুম পাচ্ছিলো, রানু ও রঞ্জুকে ঘরে দেখে বিছানা থেকে উঠে বসলো। রাত্রিটা বিশ্রী কেটেছে, ঘুম হতে পারে এই আশায় অনেকক্ষণ ধরে মাস্টারবেশন করে, কিন্তু একটু তন্দ্রায় গড়াতে না গড়াতে পানিটোলার চাপা গলিতে সারি সারি খাটা পায়খানার বালতির পাশ দিয়ে কার সঙ্গে হেঁটে যাবার স্বপ্ন দ্যাখে এবং স্বপ্নের মধ্যেই গুয়ের গন্ধে জেগে উঠে ছাদে গিয়ে বমি করে ফেললো। বমির পর আর ঘুম হলো না। সকাল থেকে এ পর্যন্ত ৪টে এ্যান্টাসিড ট্যাবলেট এবং অফিস থেকে ফেরার পথে আনন্দময়ী হিন্দু হোটেলে বাটা মাছের পাতলা ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে বেশ ভালো লাগছিলো। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিতে পারলে সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটতো।

'আপনে কখন আসছেন?' রানুর এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই রঞ্জু বলে, 'নেন, আমারে কয়টা ট্রানস্লেশন দ্যাখাইয়া দেন। ইস্কুল টিস্কুল হয় না, আব্বা অস্থির হইয়া থাকে। আপারে বললাম, চলো খাতাপত্র নিয়ে চলো। না। যদি না থাকে?—এখন যাও, খাতা বই নিয়া আবার আসো! খালি আপ-ডাউন মারো!'

রানু জিগ্যেস করে, 'খাওয়া দাওয়া করবেন না?'

'খেয়ে এসেছি।'

'এখন বিশ্রাম করবেন?'

'আরে না না! দুপুরে আমি কখনো ঘুমাই না। একেবারেই না। নেভার! ওসমান এতোটা তাড়াহুড়া করে বলে যে, মনে হয় এই বিবৃতির ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কথার এই দ্রুত ও অস্থিরগতি নিজের কানেই মাত্রাছাড়ানো মনে হলে তাকে ফের বলতে হয়, 'গত বৎসর দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম মাত্র একদিন। তাও ছুটির দিন ছিলো, দুপুরবেলা ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিলো, না ঘুমিয়ে উপায় ছিলো না।'

রঞ্জু হাসতে হাসতে জিগ্যেস করে, 'তারিখ মনে আছে?'

'খুব!' স্মার্ট ভঙ্গিতে সায়েবি উচ্চারণে ওসমান বলার চেষ্টা করে, 'জানুয়ারি দ্য টুয়েন্টি সেকেন্ড, নাইনটিন হান্ড্রেড এ্যান্ড সিক্সটি এইট এডি।'

'জানুয়ারি মাসে বৃষ্টি হয়?' রঞ্জুর এই সংশোধনী বাক্যে হাসির হল্লা ওঠে, ওসমানের মাথার ভেতর ঘুমের যে প্রস্তুতি চলছিলো তার আর লেশমাত্র বাকি থাকে না। ভাইবোনকে বসতে বলে সে ১টা সিগ্রেট ধরায়। রঞ্জুকে বলে, 'তোমার ট্রানস্লেশন দেখি।'

রানুর সঙ্গে কথা বলার আগে সিগ্রেটে খুব জোরে টান দেয়, কিছুক্ষণ কাশে, তারপর ঢোক গেলে বার কয়েক। বলে, 'তোমার ঐকিক নিয়ম না আজ?'

ছাদের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে ওসমান সিগ্রেট টানে, তক্তপোষে পাশাপাশি বসেছে ভাইবোন। গায়ের রঙ দুজনের প্রায় একই রকমের শ্যামলা।

সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো ঢেউ তোলানো ২ জোড়া নীলচে ঠোঁট। নাকের নিচে ঠোঁটের ওপর ছোটো ভাঁজও দুজনের একরকম। দুজনের নাকও বোধ হয় এক মাপের, স্কেল দিয়ে মেপে দ্যাখা যায়। তবে রানুর নাকের ডগায় ও নাকের নিচে ছোট্টো ভাঁজটিতে বিন্দু বিন্দু কয়েক ফোঁটা ঘাম। কিন্তু রঞ্জুর মুখের কোথাও ঘামের চিহ্নমাত্র নাই। ওসমান নিজের নাকের ডগা ও নাকের নিচে আঙুল বুলিয়ে নিলো, নাঃ। একবারে শুকনা খাঁ খাঁ করছে। রানুর ও রঞ্জুর দুজনেরই হাসি হাসি মুখ, কিন্তু রানুর নাক ও ঠোঁটের ওপরকার একক ঢেউটির নাতিশীতোষ্ণ নোনতা শিশিরবিন্দু তাকে একেবারে আলাদা করে রেখেছে! সিগ্রেটের ধোঁয়ার পাতলা পর্দা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মতো রানুর ঘামের বিন্দুগুলোকে অনেক বড়ো করে দ্যাখায়। মনে হয় তার নাকের ডগায় ও ঠোঁটের ওপরকার ঢেউয়ে শিশিরবিন্দু সব বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে টলটল করছে। ওসমানের পিপাসা পায়, রানুর নাকের ডগায় ও ঠোঁটের ওপরকার ঢেউতে মুখ রেখে সমস্ত জলবিন্দু শুষে নেওয়ার জন্য সে ছটফট কর। ১টা চুমুক দিলে হয়তো সারাদিন আর পানি খেতে হবে না। সিগ্রেটে টান দিতে ভুলে গিয়ে ওসমান নিজের নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে। রঞ্জু বলে, 'ছোটাপা, তুমি থাকো। আমি তোমার বইখাতা নিয়া আসি।'

'আমার বই খুঁজতে গিয়া আমার সব বইপত্র তুই ওলটপালট করবি। আমি যাই।'

ওসমান বলে, 'রানু, তুমি বই খাতা আনোনি কেন?'

'রানু', কথাটা বলতে ওসমানের জিভ শিরশির করে, এই শব্দটি বলতে তার স্বেদবিন্দু পানের পিপাসা শতগুণে বেড়ে গেলো। নামটির উচ্চারণে তার ঠোঁট ও জিভ ছাড়িয়ে সেই পিপাসা যেন দাউ দাউ করে ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। ওসমান তখন তক্তপোষের সামনে টেবিলে টেনে এনে টেবিলের এপারে ঘরের একমাত্র চেয়ারটিতে বসে। রঞ্জু ও রানু এখন ওর মুখোমুখি। পিপাসা নিভিয়ে দেওয়ার কিছুমাত্র ইচ্ছা ওর নাই, চোখ জোড়া দিয়ে যতোটা পারা যায় রানুর ঘামের বিন্দু শুষে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পিপাসার তীব্রতা ক্রমে বাড়ে, তা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ওসমান হুকুম দেয়, 'রানু এখন আবার নিচে যাবে কেন? রঞ্জু যাও, ওর অঙ্ক বই খাতা নিয়ে এসো।'

রানু বলে, 'দ্যাখ, বইপত্র ওলটপালট করিস না!'

জবাব না দিয়ে লাফাতে লাফাতে রঞ্জু নিচে নামে।

ওসমানের মুখোমুখি একা বসে রয়েছে রানু। ওসমান কি এখনই অঙ্কের কথা বলবে? নাকি আগে রানুর নাকের ডগা ও তার নিচেকার ঘামের ফোঁটা শুষে নেওয়ার পিপাসার কথা

জানাবে? কথাটা শুরু করে কিভাবে? সে এই নিয়ে একটু প্রবলেমে পড়ে। রানু বলে, 'অনেক রাত্রে ফিরছেন, না?'

'হ্যাঁ, তুমি জানলে কি করে?'

'সিঁড়ি দিয়া আপনার ওঠার আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙছে!'

রানুর সেকেন্ড ব্র্যাকেট মার্কা ঠোঁটজোড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে-আসা এই সব শব্দ তার নাকের ডগা ও তার নিচেকার বিন্দু বিন্দু লিকার পানের জন্য ওসমানের পিপাসায় ইন্ধন জোগায়।

'আপনে এতো রাত্রে আসেন, ভয় লাগে না?'

'ভয় কিসের?' ওসমান বলে বটে, কিন্তু তার তীব্র স্বেদতৃষ্ণা তার ধ্বনিপ্রবাহের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে, বাক্য কাঁপে। রানু কিন্তু অনায়াসে বলে, 'রাস্তাঘাটে আজকাল কতোরকম গোলামাল। কোনদিন কি হইতে পারে আপনে জানেন?'

কোনো উদ্বেগ বা ভয় বা আবেগে নয়, রানুর গলার স্বর হয়তো সর্দিতে একটু ভারি। ওসমানের সবগুলো আঙুল সেই ভারিস্বরে একটু একটু কাঁপে। সে নিজের হাত মুঠি করে, ফের খোলে। এতে আঙুলের ব্যায়াম হয়, কিন্তু কাঁপুনি থামে না। আঙুল বেয়ে এই কাঁপুনি শেষ পর্যন্ত শালার মাথায় চড়ে না বসে! এটার প্রতিবিধান খুব জরুরি। সে করে কি তার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা এগিয়ে রানুর নাকের ডগায় ছুঁয়ে আস্তে আস্তে ঘামের বিন্দুগুলো মুছে ফেলে, তারপর ব্লটিং পেপার চেপে রাখার ভঙ্গিতে তর্জনীটাও আস্তে করে ঠেসে ধরে রানুর নাকের নিচেকার ছোট্টো ভাঁজের ওপর। রঞ্জুর ভাঁজটাও অবিকল এই রকম। ওসমানের নিজের নাকের নিচেও এরকম নিশ্চয়ই একটা ভাঁজ আছে। তার মতো গোঁফের আগাছা উঠে রঞ্জুর ভাঁজটাজগুলো আড়ালে পড়ে যাবে, রানুরটা এমনি স্থির ঢেউ হয়ে সারাজীবন সকালে বিকালে একটি দুটি করে ঘামের বিন্দু ফুটিয়ে তুলবে।

হাত সরিয়ে নিতে নিতে ওসমান বলে, রাত্রিবেলা ভয় পেয়ে আজ বিকালবেলা পর্যন্ত ঘামছো, না?'

১টি পলকের জন্য রানু তার চোখজোড়া যতোটা পারে ফাঁক করে ওসমানকে দ্যাখে, তারপর মাথা নিচু করে জড়সড় হয়ে বসে। এভাবে বসেই তার কালো ও সরু আঙুল দিয়ে সে তার নাক ও নাকের নিচে, এমন কি ঠোঁট ও চিবুক পর্যন্ত ভালো করে মোছে। ওসমানের ছোঁয়ায় কি তার সুড়সুড়ি লাগছিলো?

ওসমান হঠাৎ কথা বলতে শুরু করে। খুব সিরিয়াস গোছের কথা। যেমন, ঐকিক নিয়মটা রানুর ভালো করে রপ্ত করা দরকার। যেমন, ঐকিক নিয়ম একবার রপ্ত করতে পারলে এই সব অঙ্ক একেবারে জলবৎ। যেমন, অঙ্কে ভালো করতে না পারলে পরীক্ষায় কেউ ভালো ফল করতে পারে না। যেমন, অঙ্কে নম্বর ওঠে সলিড এবং নম্বর মানে ভালো নম্বর। অঙ্কে বেশি না, সত্তর পঁচাত্তর তুলতে পারলে রানু এমন কি ফার্স্ট ডিভিশনও পেতে পারে। ফাস্ট ডিভিশন পাওয়া এমন কিছু নয়।

রানুর বই খাতা নিয়ে রঞ্জু এসে পড়ে, বলে, 'ছোটাপা, তুমি পড়ো, আমারে বাইরে যাইতে হইবো।'

'এখন আবার বাইরে কি রে? বিকাল হইতে না হইতে খেলা?' ওর ঘামের বিন্দু নিশ্চিহ্ন হবার পর এটাই রানুর প্রথম কথা। রানুর কণ্ঠ থেকে ভিজে ভিজে ধ্বনিও কি কেউ শুষে নিলো? রানু যদি এই কাঠকাঠ গলায় হঠাৎ বলে, 'রঞ্জু, তুই যাবি তো আমি কি এখানে

একলা থাকবো?' কিংবা রানু যদি তার পুত্রশোককাতর মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, 'আম্মা, আমারে তোমরা পড়াইতে পাঠাও কার কাছে? সে আমার শরীরে হাত দিতে চায়!' কিংবা ওসমানের চোখে চোখ রেখে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'খালি লেখাপড়াই শিখছেন, বাপমা ভদ্রতা শেখায় নাই? ভদ্রলোকের মেয়েদের গায়ে হাত দেবেন না। কথাটা মনে রাখবেন!' —তাহলে কি হবে?—এরকম কিছু হলে তার প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে না পেরে ওসমান গনি চোখে মুখে এক ধরনের বেপরোয়া ভঙ্গি তৈরি করে এবং বুক চিতিয়ে বসে ওদের কথাবার্তা শোনে।

রঞ্জু বলে, 'জী না! এখন আবার খেলতে যাবো নাকি? আম্মা বলছে দোকানে যাইতে আদা আর তেল আনতে বলছে।'

রঞ্জু চলে যায়। রানুও চলে যাওয়ার সম্ভাবনায় ওসমান প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই দৃশ্য দ্যাখা থেকে রেহাই পাবার জন্যে সিগ্রেট ধরালে ভালো হয়। কিন্তু কিংস্টর্কের প্যাকেট খুঁজে পাওয়া যায় না। লাভের মধ্যে খোঁজবার কাজটি জুটে গেলো। সিগ্রেট খুঁজতে খুঁজতে রানুর ক্রুদ্ধ অন্তর্ধান ঘটলেও বরং বাঁচোয়া।

শেষ পর্যন্ত সিগ্রেট ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে ওসমান যখন ওর দিকে তাকালো রানু তখন নিবিষ্টচিত্তে পাটিগণিতের পাতা ওল্টাচ্ছে। একটু অন্যদিকে তাকিয়ে ওসমান বলে, 'দেখি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওসমান ঐকিক নিয়মের মধ্যে দারুণভাবে ডুবে গেলো। রানুকে কতোভাবে বোঝাবার চেষ্টাই সে যে করে। নিয়ম সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে বলে ১টার পর ১টা অঙ্ক কষে দ্যাখায়। ওসমান ১টি পলকও থামে না। ১টি অঙ্কের উত্তর লিখতে না লিখতে আরেকটিতে হাত দেয় এবং রানু বুঝলো কি বুঝলো না জিগ্যেস করার অবসর পর্যন্ত তার হয় না। রানুই শেষ পর্যন্ত বলে , 'দ্যান। বুঝলাম তো, দ্যান!'

রানুর এই অতিরিক্ত সপ্রতিভ ভঙ্গির সঙ্গে তার ঠোঁটের কোণে খুব ছোট্টো ১টি হাসির বাঁকা আভাস সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে গেছে। সেই আভাস অবিচলিত রেখে রানু বলে, 'আমারে অতো বুঝাইতে লাগে না। দ্যান!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। সে তো বটেই।' ওসমান এমনভাবে বলে যেন এতোক্ষণ ধরে অঙ্ক বোঝানোটা তার অপরাধ হয়ে গেছে।

রানু অঙ্ক কষে আর ভ্রূ একটুখানি তুলে ওসমানের দিকে দ্যাখে। ওসমানও আড়চোখে তাকায় বটে, তবে তার মনোযোগের ১০০ ভাগই রানুর অঙ্কের দিকে। রানু ১টার পর ১টা অঙ্ক ভুল করে যাচ্ছে। এতো ভুল দেখেও ওসমান বিরক্ত হয় না বা হতাশ হয় না। তার আফসোস এই যে, তার ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা শুকিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য আঙুল থেকে কায়দা করে ২টোকে সে আলাদা করে রেখেছিলো। কিন্তু অঙ্ক কষার জন্যে কলম ধরার ফলে ২টো আঙুল থেকে সমস্ত শিশিরবিন্দু কি একেবারে উবে গেলো? আড়চোখে একবার দ্যাখা গেলো যে রানুর নকের ডগায় কি তার নিচে ছোট্টো ভাঁজের ওপর ঘামের ফোঁটার আর চিহ্নমাত্র নাই। এদিকে রানুর ভুল অঙ্ক কষারও বিরাম নাই। রঞ্জুটার একটু বোকামির জন্য— কি দরকার ছিলো তার নিচে যাওয়ার—মেয়েটার নাকের ডগা খটখটে খাঁ খাঁ হয়ে গেলো। ঐ শ্যামবর্ণের মুখে আর রইলোটা কি? একটু আগে ওসমানের ছিলো ভয়, রানুর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার ভয়। সেটা বরং ভালো, এখন ক্লান্ত ও ভোঁতা ধরনের অনুভূতি সমস্ত শরীর জুড়ে দাপট মারে। কিছুক্ষণের মধ্যে এই অনুভূতির কারণ বা উৎস সে ভুলে যায়, ফলে অকারণ হতাশা চেপে বসে আরো

জোরেসোরে। তার বুক থেকে ছড়াতে ছড়াতে ওপরের দিকে মাথার শীর্ষভাগ এবং নিচে পেটের ডানদিক পর্যন্ত তার ডালপালা পৌঁছে যায়। পেটের চিনচিনে ব্যথা ফের জেগে ওঠে। ব্যথা আস্তে আস্তে বাড়ে এবং ১টা পর্যায়ে এসে আর বাড়ে না, সেখানেই থেকে যায়। তবে এতে লাভ হয় বৈ কি! একটু আগেকার ভয় বা ভোঁতা অবসাদ—সবই এই ব্যথায় একদেহে হয় লীন এবং তাদের আলাদা করে টের পেতে হয় না। এই ব্যথাটা ডাক্তারদের বুঝিয়ে বলাও মুশকিল। এর নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নাই। বুকের মাঝখানটা এই ছটফট করলো, ভালো করে বোঝাবার আগেই সরে পড়লো নিচের দিকে, বুক ও পেটের মাঝখানকার কোনো ফাঁকে-ফোকরে। সেখানে ভালো করে জানান দিতে না দিতেই একটুখানি ঢেউ খেলিয়ে নেমে গেলো আরো নিচে পেটের নিভৃত কোনো কোণে। আসন পেতে বসে শালার ব্যথা সেখানে জিরিয়ে নেয়, একটু মনোযোগ দিলে ওসমান নিজের এ্যাবডোমেনের দেওয়ালে তার ঝিমুনি টের পায়। মাথা নিচু করে অঙ্ক করতে থাকা রানুর চিবুক মাঝে মাঝে আলাদা করে দ্যাখা যাচ্ছে। একবার মনে হলো রঞ্জু বোধহয় একমনে ট্রানস্লেশন করে যাচ্ছে। একটু পর এই চিবুকের খানিকটা নিচে একটু বাঁদিকে দ্যাখা যাবে তার শার্টের পকেটে আঁকা রয়েছে খয়েরি সুতার প্যাগোডা। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাবডোমেনের ব্যথা আরো নিচে নামে, শিরশির করতে করতে রক্তস্রোতকে ওভারটেক করে পৌঁছে যায় তার উরু জোড়ার মাঝখানে, রঞ্জুকে ভালো করে দ্যাখার জন্য ওসমান সামনে তাকায়। কোথায় রঞ্জু? রঞ্জু তো এখন গেছে দোকানে, আদা, রশুন, তেল কেনার নাম করে রাস্তায় দুটো তিনটে চক্কর না দিয়ে সে কি আর ফিরবে?

রানু মুখ তুলে বলে, 'দ্যাখেন, কতোগুলি করলাম। আরো করি?'

'করো।'

ওসমানের পেটের ব্যথা ফিরে আসে যথাস্থানে। অফিসে কামালের কাছ থেকে এই ব্যথাটা সম্বন্ধে জেনে নেওয়া দরকার। প্রেমের মতো রোগেও ওর খুব আগ্রহ। এর আগে ক্যান্সার ছিলো কামালের ফেভারিট। কিন্তু বছর দেড়েক আগে ওর বাবা ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর কামাল ক্যান্সার-চর্চায় ক্ষান্ত দিয়েছে। আজকাল ওর প্রিয় প্রসঙ্গ হলো প্রেমিকা এবং ডিউওডিনাল আলসার। তার নিজের হাঁপানি, কিন্তু হাঁপানি সম্বন্ধে সে কখনো কিছু বলে না। আবার ডিউওডিনাল আলসারের ব্যাপারে এতো উৎসাহ যে, কথাটার উচ্চারণ ব্যাপারেও কামাল খুব শুচিবায়ুগ্রস্ত, কখনো ডিউডীনাল বা ডুইডিনাল বলবে না। ওসমানের পেটের এই অনিয়মিত ব্যথা, তার এ্যাসিডিটি কি শেষ পর্যন্ত ঐ রোগ বলে সনাক্ত হবে? নামটা গালভরা, কিন্তু কামালের মুখে এই রোগের বর্ণনা শুনে শুনে এর ওপর ওসমানের অরুচি ধরে গেছে। পেটের ছোটো অন্ত্র ফুলে গিয়ে নাকি ফুটো হয়ে এমন ব্যথা শুরু হয়ে যে রোগী ব্যথা ছাড়া শরীরকে আর কোনোভাবেই অনুভব করতে পারে না। আচ্ছা, দীপচাঁদের কি এই রোগই হয়েছিলো? হঠাৎ করে গতরাত্রিতে দ্যাখা স্বপ্নের মধ্যে পানিটোলার চাপা গলির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য ওসমানের বুকে খচ করে ওঠে, স্বপ্নের ভেতর সঙ্গেকার লোকটিকে তখন চিনতে পারেনি, এক্ষুনি চিনলো, আরে সে তো দীপচাঁদ! মরার এতোদিন পর দীপচাঁদ মুচি স্বপ্নের মধ্যে এসে ওসমানকে নিয়ে কোথায় যাত্রা করেছিলো?

দীপচাঁদ মরেছে সে কি আজকের কথা? অন্ত্রের ব্যাথায় নিংড়ে যেতে যেতে দীপচাঁদ প্রথমে স্টেশনের পাশে তার বসবার জায়গাটা ছাড়লো, কাজকাম সব বন্ধ হলো, কিছুদিন পর মেল ট্রেন পাস করার সময় হলে নিজেই কষ্ট করে গিয়ে শুয়ে রইলো রেল লাইনের

ওপর। বর্ধমান মেল বেগুনবাড়ি স্টেশন ক্রস করে রাত ৩টের দিকে, সকালে খবর পেয়ে ওসমানের বাবা ছেলের হাত ধরে চললো রেল লাইনের দিকে। বাপ বেটাকে একসঙ্গে যেতে দেখে পেছন থেকে ডাকে ওসমানের মা, 'আবার রঞ্জুকে সাথে নিচ্ছে দ্যাখো!'

'কেন? যাক না!'

'রাত পোয়াতি না পোয়াতি দুধের ছেলেটাকে মুচির মড়া দ্যাখাতি নে যাচ্ছে?'

'মুচি হয়েছে তো হলোটা কি? গোলমালের সময় লাইনের ওপারে সব শয়তানি আয়োজনের খবর দিতো কে? এই দীপচাঁদ মুচির মুখে খবর না এলে আমরা সাবধান হতি পারতাম?'

'আহা! সে কি না করিছি? রাতে ঘুম ভাঙলি পর যে ছেলে ভয়ে ঠকঠক করি কাঁপে সাত সকালে তাকে তুমি নে যাও রেলে-কাটা মড়া দ্যাখাতি?'

'পুরুষ মানুষের অতো ভয় পেতি হবে না!'

ইব্রাহিম শেখের কাছে বেটাছেলে মাত্রেই পুরুষমানুষ। পুরুষমানুষের ভয় পাওয়া, লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখা, মাথায় বড়ো চুল রাখা—এসব তার অসহ্য। তা লোকটার নামডাকও ছিলো গোঁয়ার্তুমির জন্যেই। লাইনের ওপারে বেগুনবাড়ি গ্রামের বোসদের খুব দাপট, এই বোসরা তাজহাট, রাবড়া—এই গ্রামগুলোতে কয়েকবার খোঁচা দিলেও গোয়ালঘূর্ণিতে হামলা করার সাহস পায়নি। গোয়ালঘূর্ণির কয়েক ঘর মুচি কি এর আশেপাশের জেলেদের পটাবার চেষ্টা করেও বাবুরা সুবিধা করতে পারলো না। শেখেরা কি কম দাপটে ছিলো? দেশভাগের পরেও ২ বছর ১৪ই আগস্ট এলে পাকিস্তানের নিশান ওড়াবার জন্য ইব্রাহিম শেখের হাত নিসপিস করতো। গ্রামের ছেলেছোকরাদের প্রথম প্রথম কী উৎসাহ! 'ইব্রাহিম ভাই, ঝাণ্ডা ওড়ান দিনি, বেগুনবাড়ির মালাউনরা কিছু করতি আসে তো বাছাধনদের রেললাইন পার হয়ে আর বাড়ি ফিরি যেতি হবে না।'

পরে সে উৎসাহ আর ছিলো না। গ্রামের খন্দকারদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে ইব্রাহিম শেখ সপরিবারে গেলো ঢাকায়, এসে বছর তিনেক যেতে না যেতেই পাকিস্তান বা পাকিস্তানের পতাকা কোনো ব্যাপারেই তার একটুও আগ্রহ রইলো না, ফের গ্রামেই ফিরে গেলো। শুরু হলো উঠতে বসতে নাজিমুদ্দিন-নূরুল আমিনকে মোনাফেক আর বেঈমান বলে গাল দেওয়া।

তো ওসমানের হাত ধরে নিয়ে চললো ইব্রাহিম। বাইরে উঠান পেরিয়ে বড়ো তরফের বাঁধানো ঘাটওয়ালা পুকুর। ঘাটের ইটগুলো তখন বড়োমিয়ার দাঁতের মতো খসে খসে পড়ছে। পুকুর পাড়ের রাস্তা ধরে ২০০/২৫০ গজ গেলে বুড়োবটতলা। এই বটতলা ছিলো ওসমানের খেলার জায়গা। এখান থেকে বাঁক নিলে ছিপছিপে ১টা পথ, সেই পথে খানিকটা গেলে ইটখোলা বিলের শুরু। বিলের পারে দীপচাঁদের মাটির ঘর। ঘরের আশেপাশে কি বিলের ধারে মুখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে চরে বেড়ায় দীপচাঁদের এক পাল শুওর। দীপচাঁদের বৌ মুনিয়া ঘরের দাওয়ায় বসে বাঁশের ধামা বোনে আর দুর্বোধ্য ভাষায় স্বামীকে কি দেবতাদের কি নিজের অদৃষ্টকে যা তা বকাবকি করে। কখনো কখনো মুনিয়া বিলের পানিতে বাসন মাজে, গা ধোয়। বর্ষাকালে পদ্মফুলে বুক উঁচু করে ইটখোলার বিল আকাশের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অনেকটা ওপরে উঠে আসে! তখন মেজাজ ভালো থাকলে মুনিয়া পদ্মবীজ খেতে দেবে বলে ওসমানকে বটতলা থেকে ডেকে আনে। সেদিন দীপচাঁদের শুওরগুলো আপন মনে মাটি খুঁড়ছিলো, বাড়ির ভেতর থেকে আসছিলো মুনিয়ার একটানা কান্নার শব্দ।

ইব্রাহিমের ডাকাডাকি শুনে বেরিয়ে আসে সুখনলাল। এ লোকটিকেও ওসমান চেনে, স্টেশনের জায়গা থেকে দীপচাঁদ সরে আসার পর ওখানে বসে জুতো সেলাই করে। দীপচাঁদ অসুখে পড়বর পর থেকে সুখনলাল ও মুনিয়াকে নিয়ে নানারকম মুখরোচক কথা চলে আসছে। সুখনলালকে দেখে ওসমানের তৎকালীন কচি হাড়গুলো সিঁটকে এসেছিলো; দীপচাঁদের রেলেকাটা মুণ্ডু যদি তার সঙ্গে গড়িয়ে বাইরে চলে আসে!—কিন্তু না, সুখনলাল জানায় শবদেহ এখনো রেললাইনের ধারে; দারোগাবাবুর হুকুম, পুলিসের লোক না পৌঁছা পর্যন্ত সরানো চলবে না। আশেপাশের গ্রামে জাতভাইদের খবর দেওয়া হয়েছে, তারা এসে লাশ ঘিরে বসে রয়েছে। দীপচাঁদের এক ভাগ্নে বুলবুলিয়া আজ সকালে পাঁইটখানেক পচানি টেনে সুখনলালের গায়ে অকারণে হাত তুলেছে, আর মুখ খারাপ যা করেছে মিয়াদের সামনে উচ্চারণ করলেও সুখনলালের পাপ হবে। মিয়াদের গ্রামে, মিয়াদের জমিতেই তো বুলবুলিয়ার বাস, সুখনলালও মিয়াদের জমিতেই জীবন কাটালো, ইব্রাহিম শেখ কি এর কোনো বিহিত করবে না?

ওদিকে দীপচাঁদের ঘরের ভিতর কয়েক মিনিট বিরতির পর মুনিয়া ফের কাঁদেতে শুরু করে। ইব্রাহিম শেখ ওসমানকে বলে, 'তুই বাড়ি যা রঞ্জু।' ওসমান তবু তার সঙ্গে হাঁটলে ইব্রাহিম ধমক দেয়, 'বললাম না, বাড়ি যা!'

'না আমি যাবো তোমার সঙ্গে'। ওসমান জেদ ধরে, 'আমাকে মরামানুষ দ্যাখাতি হবে!'

'আবার কথা বলে !' ইব্রাহিম ধমক দেওয়ার পর লোভ দ্যাখায়, 'যা। আমি ফেরার সময় স্টেশনের বাজার থেকে সন্দেশ আনবো'খন। যা!'

'না আমি সন্দেশ খাবো না। রেলে-কাটা মানুষ দেখবো! আমি কোনোদিন দেখিনি, আজ দেখবো, এ্যাঁ! ইব্রাহিম শেখ কিন্তু চটে ওঠেনি, বরং আরো নরম হয়ে বলে,'তুই যা বাবা! কাল তাজহাট থেকে টিয়া এনে দেবো, কেমন? এখন যা!'

ট্রেনের তলায় আত্মহত্যাকারী দীপচাঁদকে দ্যাখানো থেকে বিরত করার জন্য ইব্রাহিম শেখ শেষ পর্যন্ত ওসমানের অনেক দিনের আবদার পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। জ্যান্ত পাখি পাবার আশায় ওসমানের রেলে-কাটা মড়া দ্যাখার লোভ ছাড়তে হয়। আজ দ্যাখা, এতোদিন পর দীপচাঁদ নিজেই তার স্বপ্নের মধ্যে এসে হাজির হলো। সেদিন তাকে কেমন দ্যাখাচ্ছিলো?—লুঙি গিরের ওপর তোলা, গায়ে টুইলের হাফহাতা শার্ট, হাতে জ্বলছে কাঁচি সিগ্রেট—ইব্রাহিম শেখ দীর্ঘ পা ফেলে চলে যায় রেললাইনের দিকে; রোগা প্যাকাটি সুখনলাল যাচ্ছে পেছন পেছন, নালিশ করে, মাঝে মাঝ থুথু ফেলে, ফের নালিশ করে। কিছু দূর যাবার পর হাবু মল্লিকের ডাঙা-জমির বাবলা ঝোপের আড়ালে চলে গেলে ওদের আর দ্যাখা যায় না। আর এদিকে বিলের তীরে দাঁড়িয়ে ওসমান তার সর্বাঙ্গে শোনে মুনিয়ার একটানা কান্নার ধ্বনি। এই জায়গাটায় মুনিয়া বাসন মাজে আর গোসল করে বলে এখানে কোনো পদ্মফুল নাই। পানিতে ওসমানের ছায়া পড়ে, পানির পাতলা ঢেউতে তার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো ঠোঁটজোড়া বারবার স্থানচ্যুত হয়, শার্টের বুকপকেটে এম্ব্রয়ডারি-করা প্যাগোডা পানির অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে। দীপচাঁদের বাড়ির পেছনের আউশের খেত থেকে কালচে হলুদ রঙের গন্ধ এসে দীপচাঁদের বৌয়ের কান্নার সঙ্গে মিশে ধ্বনি, গন্ধ ও রঙের বিন্যাস নষ্ট করে দেয়। বিলের পানিতে শ্রীমান রঞ্জু তখন ওসমানের মুখোমুখি শুয়ে একটু ভয়ে ও একটু কামনায় কাঁপে। ওসমান নয়ন ভরে পানির সেই রঞ্জুকে দেখছে, রঞ্জু পানি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে তার সামনে, সে খেয়াল করেনি।

হঠাৎ রঞ্জুর কথা শুনে সে মাথা উঁচু করে তাকালো।

'আপনার ঘুম পাইতাছে। আপনি ঘুমান, আমি যাই।' না, রঞ্জু নয়, কথা বলছে রানু ওসমান বিব্রত হয়, 'হঠাৎ ঘুম পাচ্ছে কেন, বুঝতে পাচ্ছি না।'

'রাত্রে ঘুমাইবেন না! কতো রাত্রে বাসায় ফেরেন, ঠিকমতো ঘুমান না কেন?' এই অতি অল্প সময়ের তন্দ্রা কেটে যাওয়ায় ওসমানের চোখের ভেতরটা করকর করে, ভ্রূজোড়া থেকে শুরু করে গোটা কপাল পর্যন্ত মাথার অর্ধেকটা ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে। তোষকের নিচে থেকে ২টো নোভালজিন ট্যাবলেট মুখে দিয়ে সে পানি খায়।

টেবিলের ওপরকার শূন্যতায় রানুর খোলা চুলের হাল্কা গন্ধ। ওসমান এখন সোজা হয়ে বসেছে, ২টো নোভালজিনে তার কাজ হচ্ছে, মাথা ব্যথা আস্তে আস্তে সেরে যাচ্ছে। ওসমান বলে, 'কৈ তোমার খাতাটা দেখি!'

'আজ থাক! আপনার শরীর বোধ হয় খারাপ। ওষুধ খাইবেন!'

'না। একটু মাথা ব্যথা করছিলো, পাঁচ মিনিটে সেরে যাবে।'

নাঃ! ঐকিক নিয়ম রানুর মাথায় একেবারে ঢোকেনি। বছর ধরে পড়লেও ওর খুলি ভেদ করা অসম্ভব। আনোয়ারের সঙ্গে বরং ওদের গ্রামে গেলে হতো। গ্রামে গ্রামে মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে রুখে দাঁড়াচ্ছে। এই সব দ্যাখা ছেড়ে সে কি–না পড়ে রইলো এই ব্লান্ট মেয়েটাকে অঙ্ক কষাবার মতলবে? ওসমানের পেটের ব্যথাটা চিনচিন চিনচিন করে ওঠে। নাঃ! খেলেই হতো এ্যাসিড হচ্ছে, রাত্রে ঘুম হলো না, এর ওপর এ্যানালজেসিক ট্যাবলেট না খেলেই হতো। রানুর অঙ্কের ভুল শোধরাতে পেট ও বুক জুড়ে টক-তেতো স্রোতের উজান-ভাটা শুরু হলো। এখন একটু শুতে পারলে ভালো হয়। ওসমানকে বলতেই হলো, 'আজ বরং থাক। কাল এসো, কেমন?'

রানু জিগ্যেস করে, 'খুব খারাপ লাগতাছে, না?' গলার কাছে টক-তেতো স্রোতের একটা দমক সামলাতে সামলাতে হাসে, 'না হঠাৎ খুব ঘুম পাচ্ছে। নাইনটিন সিক্সটি নাইনের গোড়াতেই দিবানিদ্রা, বছরটা মনে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটবে।'

রানু কিন্তু একটুও না হেসে উঠে দাঁড়ায়। ওসমান দাঁড়িয়েছে তার গা ঘেঁষে। রানুর শ্যামবর্ণ নাকের শীর্ষে ঘামের অনেকগুলো টাটকা বিন্দু জমেছে, তার নাকের নিচে ঠোঁটের ওপরকার ছোট্টো নিখুঁত ঢেউতে বড়ো বড়ো ঘামের ফোঁটা টলটল করে। ওসমান ইচ্ছা করলে একটু ঝুঁকে রানুর নাকের ডগায় এবং তার নিচে মুখ লাগিয়ে এক চুমুকে সমস্ত স্বেদবিন্দু টেনে নিতে পারে। তার বদলে সে তার নিজের হাতের তর্জনী চোষে। রানু একটু অবাক হয়ে তাকালে ওসমান পানি-ওঠা মুখে তরল স্বরে বলে, 'কাল এসো, কেমন? এই সময় এসো, কেমন?'

বইপত্র নিয়ে রানু সিঁড়িতে নামবার সঙ্গে সঙ্গে ওসমান দরজা বন্ধ করে দেয়। ডান হাতের তর্জনী তার মুখেই রয়ে গেছে। কোনো নোনতা স্বাদ না পেয়ে সে তর্জনীটা আরো ভালো করে চোষে। টক-তেতো স্বাদের তর্জনী চুষতে চুষতে অন্য দরজা দিয়ে ওসমান বেরিয়ে যায় ছাদে। ছাদের রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে ওসমান একটু উপুড় হতে না হতে তার হড়হড় করে বমি হয়ে গেলো।

১৩

ইউনিভারসিটির যে ছেলেটি আজ পুলিসের গুলিতে মারা গেছে খিজির তাকে দ্যাখেনি। পুলিসের দিকে ইট-পাটকেল ছোঁড়ার তাগিদে যদি মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে না পড়ে তাহলে ঐ সময়টা সে থাকে ঢাকা হল আর পিজির মাঝামাঝি। ছেলেটা গুলিবিদ্ধ হয় ওখানেই। ধরো, খিজির আলি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে না ঢুকে মিছিলের সঙ্গে যদি থাকতো, তাহলে? পুলিসের লরি ছিলো পিজির পাশে রশিদ বিল্ডিঙের সামনে। গুলি করা হয়েছে ওখান থেকেই। ধরো, খিজির ওর পাশেই আছে, শ্লোগান দিতে দিতে চলেছে, এমন সময় গুলি এসে ওর হাত ঘেঁষে ঢুকলো ওর পাশের ছেলেটির বুকে। এমন তো হতে পারতো যে, গুলিবিদ্ধ ছেলেটি ওর গায়েই ঢলে পড়লো। লোকজন সবাই দৌড়াচ্ছে, সেও দৌড়াচ্ছে, গুলিবিদ্ধ তরুণের মৃতদেহ কোলো নিয়ে দৌড়াতে তার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। —তাহলে? এই সব ভাবতে ভাবতে কাঁচা গুয়ের গন্ধ নাকে ঝাপ্টা মারলে বোঝা যায় যে, তাদের বস্তি এসে গেছে। —কিন্তু তার হাউস কি কেউ দমিয়ে রাখতে পারে—আচ্ছা তার গায়েও তো এই গুলি লাগতে পারতো! পুলিসের বুলেট কি শিক্ষিত অশিক্ষিতে, ধনী গরীবে, ছাত্র মজুরে ভেদ করে? —নাঃ! বুকে গুলি লাগানো ঠিক হবে না। কয়েকটাকে সাফ না করে এখন মরাটা ঠিক নয়। ঠিক আছে, ধরো বাঁ পায়ে গুলি লাগলে এমন কিছু অসুবিধা হয় না। অনেকদিন রিকশা চালিয়ে পা ২টো তার লোহার পিলার। আবার এখন স্কুটার চালায়, রিকশা চালানো ছেড়ে দেওয়ায় পিলারজোড়ায় বাত ঢুকেছে, বৃষ্টি বাদলায় ভিজলে পা ২টো টনটন করে। ১টা গুলি লাগলে রক্ত বেরিয়ে বাতের ব্যথা চিরকালের মতো সারতো।

ঘরের ঝাঁপ তুলে ঢোকার পরও শ্লোগান, গুলিবর্ষণ ও টিয়ার গ্যাসের শব্দমুখর চান খাঁর পুল ও নিমতলী এলাকা মাথার মধ্যে গমগম করে। মেঝেতে বসে গপ গপ করে ভাত খাওয়ার পর থালে হাত ধুচ্ছে, বিছানার ওপর থেকে জুম্মনের মা বলে, 'ব্যাকটি খাইলা?'

'তুই খাস নাই?'

'জিগাইছিলা? জিন্দেগিতে জিগাইছো? আছে খালি নিজের প্যাটখান লইয়া। খালি হান্দাও! আল্লা রে আল্লা, এই হাড্ডি কয়খানের মইদ্যে মনে লয় দুই তিনখান ঠিলা ছুপাইয়া রাখছে!'

বিছানার এদিকে বসতে বসতে খিজির বলে, 'তর মাহাজনের প্যাটের মইদ্যে কলতাবাজারের পানির টাঙ্কি ফিট কইরা রাখছে। মাহাজনের প্যাট থাইকা দুই চার ঠিলা তুই লইয়া আইছস?'

বলতে বলতে খিজির বিছানার এক প্রান্তে শোয়, ডানদিকের বগল চুলকাতে চুলকাতে ভাবে, এই বাহু দিয়ে গুলিটা ঠেকাতে পারলে ইউনিভারসিটির ছেলেটা আজ মরে না। কিন্তু এখন ঝামেলা জুম্মনের মা, রাত্রে এর প্যাচাল পাড়া বন্ধ করে কে?

'অকর্মা! ভ্যাদাইমা মরদ একখান! আউজকা গাড়ি লইয়া বারাইছিলা, গাড়ি চালাইছো? ঘরের খরচ চালাইবো তোমার বাপে?'

এবার খিজিরের মেজাজ একেবারে খিচড়ে যায়, বলে 'আমার বাপে চালাবো ক্যালায়? তর মাহাজন বাপের লগে রাইত ভইরা ডাংগুলি খেলবার পারলি না? এখানে আইলি ক্যালায়? রাইত বাজে একটা আর খানকি মাগী অহন কলের গান একখান ছাড়লো!'

এবার জুম্মনের মায়ের কলের গান চলে দারুণ স্পীডে, 'মাহাজন কার বাপ লাগে মহল্লার ব্যাকটি মানু জানে! আমার মায়েরে মাহাজনে জিন্দেগিতে দেখছে? আমাগো বাপ থাকে একজন!'

খিজির ভাবে মিছিলের জায়গাটা অমন করে ছেড়ে দৌড় দেওয়াটা ঠিক হয়নি। একটা ঢিলও তো সে পুলিসের গায়ে লাগাতে পারলো না।

'গাড়ি লইয়া বারাও, রাস্তার মইদ্যে গাড়ি ছাইড়া দিয়া টাঙ্কি মারবার যাও, না?'

খিজির এবার অবাক হয়, এ বেটি জানলো কিভাবে? বলে, 'তরে এইগুলি কইলো ক্যাঠায়? তর মাহাজন বাপে, না? তর মাহাজনের মাথার উপরে ঠাঠা পড়বো, বুজলি?'

'আস্তে কও, আস্তে কও! মাহাজনের ঘরে থাকো আবার তারে উল্টা-পাল্টা কথা কও, শরম করে না?'

'মাগনা থাকি? ভাড়া দেই না?'

কিন্তু জুম্মনের মা বারবার একই প্রসঙ্গে তোলে, সকালবেলা বেবি ট্যাকসি নিয়ে সে বেরুলো, আর মানুষের পাগলামি দ্যাখার জন্যে গাড়ি ছেড়ে দিলো মাঝপথে? এসবের মানে কি? মহাজন না হয় লোক খারাপ। তাই সই। কিন্তু আলাউদ্দিন মিয়া খিজিরের এই বান্দর নাচ দ্যাখার পাগলামি সহ্য করবে কদ্দিন?

খিজির ফের জিগ্যেস করে, 'আমি জিগাই, তবে এই চাপাগুলি ছাড়ছে ক্যাঠায়?'

বলার লোকের কি অভাব?

আজ বিকালবেলা আলাউদ্দিন মিয়া নিজেই গিয়েছিলো রহমতউল্লার বাড়ি। গিয়েই বলে, 'মামু, ইউনিভারসিটির ইস্টুডেন মরছে, পুলিসে গুলি চালাইছিলো। ইট্টু হুঁশিয়ার হইয়া থাইকেন! পাবলিকে আইয়ুব খানের উপরে যা চেতছে না! মোনেম খানের মাতম আরম্ভ হইয়া গেছে!'

'তোমরা আইয়ুব খানের বালটা ছিঁড়বা!' রহমতউল্লা রাগ করে, 'আর কয়টার লাশ ফালায়া দিলেই এই হাউকাউ বন হইয়া যাইবো।'

আলাউদ্দিন কিন্তু রাগ করে না, স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে, 'মনে হয় না। ইউনিভারসিটি ছাত্র মইরা নূরুল আমিন খতম হইয়া গেছে না? আপনে এট্টু হুঁশিয়ার থাইকেন। আমলিগোলার মুসলিম লীগ অফিস ভাইঙ্গা দিছে।'

রহমতউল্লা মেয়েকে হাঁক দিয়ে চা দিতে বলে, মেয়ে গেছে পাশের বাড়িতে বেড়াতে। চা নিয়ে আসে জুম্মনের মা। টেবিলে বাকেরখানি, পনির ও চা রেখে সে চলে যাচ্ছিলো, আলাউদ্দিন বলে, 'খিজিরে এইগুলি কি করে? বেবি ট্যাকসি লইয়া বারাইয়া রাস্তার মইদ্যে গাড়ি দিয়া গেছে আরেকজনেরে। গাড়ি লইয়া ঐ হালায় যুদি পলাইতো!'

মহাজন একটু রাগ ও একটু অভিমানে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'তোমরা তো আমার ইজ্জত রাখবা না! তুমি অরে খেদাইয়া দিলে পরের দিনই আমি খানকির বাচ্চাটারে লাথি দিয়া বাইর কইরা দেই! আমার জুম্মনের মায়েরে আবার বিয়া দিমু কামরুদ্দিনের লগে।'

'কামরুদ্দিন? উই বিয়া করবো?'

'পসা দিলে করবো না? দোলাই খালের রাস্তা করতাছি, মিস্ত্রী আমার কম লাগে?' মহাজন খিজিরের নামে কতো অভিযোগ করে! তারই খেয়ে মানুষ হলো, আর সে কি-না

ভিক্টোরিয়া পার্কে তারই গিবত করে! 'মিয়া, বোঝো তো, দিন খারাপ। নইলে এইগুলি কীড়া উড়ারে পায়ের একখান উঙলি দিয়া এক্কেরে মাটির মইদ্যে হান্দাইয়া দিবার পারি।'

মামা ভাগ্নের কথা শুনতে শুনতে জুম্মনের মা বেশ ভয় পেয়েছে! জুম্মনকে কি এজন্যেই মহাজন আজ পাঠিয়ে দিলো মালীবাগে কামরুদ্দিনকে খুঁজতে?

আজ সন্ধ্যাবেলা আলাউদ্দিন মিয়া খিজিরকে একটু বকেছে। যাকে তাকে এভাবে গাড়ি দেওয়া সে পছন্দ করে না। খিজিরের অবশ্য মনে হলো গাড়িটা সে নিজেই গ্যারেজে রেখে গেলে পারতো। দিনকাল ভালো না, গাড়ি নিয়ে কে কোথায় উধাও হয় তার ঠিক আছে? ১টি বেবি ট্যাকসি হারালে সায়েবের কতোগুলো টাকা নষ্ট! নীলখেতে ইউনিভারসিটির সামনে ছেলেদের ভীড় দেখে সে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। নিউ মার্কেট থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছিলো কমলাপুর স্টেশন, নীলখেতে ছেলেদের মিছিল দেখে তার ইচ্ছা করছিলো, এক্ষুনি এদের সঙ্গে ভীড়ে যায়। খুব শ্লোগান চলছে তখন, মিছিল যাচ্ছে ফুলার রোডের দিকে। পেছনে মেয়েদের হলের সামনে পুলিসের গাড়ি, রাস্তায় পুলিসের কাঁটাতারের ব্যারিকেড। কমলাপুরে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে খালি গাড়ি নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলো গ্যারেজের দিক, গ্যারেজের আশেপাশে রঙ্গু, করিম, হোসেন—এরা সব ঘুরঘুর করছে, এদের কাউকে বেবি ট্যাকসি দিয়ে ৫টা টাকা নেবে, বিকালে এদের কাছ থেকে টাকা তুলে সায়েবকে দিলেই চলবে। সারাদিন গাড়ি চালালো কে আলাউদ্দিন কি আর তাই তদন্ত করতে যাবে? কিন্তু মতিঝিলে স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে দ্যাখে আদম আলি দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসের জন্যে। বেচারার গাল টাল বসে গিয়েছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ির অর্ধেকের বেশি পাকা। বছর খানেক আগেও আলাউদ্দিনের বেবি ট্যাকসি চালাতো, কাজ ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিলো চাষ করতে করতে। মাঝখানে খিজির একদিন দ্যাখে মাথায় তরকারির ঝাঁকা নিয়ে 'আলু পটল কাঁচামরিচ শুঁটকি' বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কে এম দাশ লেন ধরে হাঁটছে। আজ স্টেট ব্যাঙ্কের সামনে আদম আলিকে ডেকে ওর পাশে বসিয়ে খিজির বলে, 'গাড়ি চালাইবি?' কৃতজ্ঞতায় হালার গেরাইম্যাটা কথা বলতে পারে না। গুলিস্তানের কাছে নেমে খিজির বলে, 'পাঁচটা টাকা দে, বাকি পসা দিবি রাইত আটটা বাজলে, গ্যারেজের সামনে থাকুম। আবার সায়েবরে কইস না!'

ড্রাইভারের সিটে বসে আদম আলি লাইসেন্স চায়, পুলিস ধরলে আবার কিছু পয়সা খসবে!

পুলিসের মায়েরে বাপ! ব্যাকটি পুলিস অহন ইউনিভারসিটির মইদ্যে!'

খিজির পুলিসকে গালি দেয় কিন্তু আদম আলির হাতে লাইসেন্স বা বুক দিতেও রাজি হয় না, 'কিয়ের লাইসেন্স, তুই যা গিয়া!'

খানিকটা বাসে এবং বেশির ভাগ হেঁটে ও দৌড়ে খিজির মিছিল ধরলো শহীদ মিনারের সামনে। শহীদ মিনারে মিটিং চলছিলো বলে মিছিলটা ধরতে পারলো। মিছিলের সঙ্গে এগিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দক্ষিণ গেটে এসেছে, দ্যাখে হাসপাতালের ভেতর থেকে ছেলেরা পুলিসের দিকে ঢিল ছুঁড়ছে। রেলিঙ টপকে খিজিরও ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে খিজির মেডিক্যাল কলেজের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে পিজি হাসপাতালে। কিছুদিন আগেও এখানে ইউনিভারসিটি ছিলো। মহল্লার ২টো মেয়েকে রিকশায় নিয়ে খিজির এখানে নিয়মিত আসতো। লোকজন সব উল্টেদিকে দৌড়াচ্ছে, আর

সে কিনা পাগলের মতো ছোটে পিজির গেটের দিকে। গেটে পুলিসের মস্ত ৩টে লরি। ফের পেছনে গিয়ে বেলতলার ধারে পুকুরের পাশ দিয়ে ঘুরে উঠে দাঁড়ালো রশিদ বিল্ডিঙের শেষ মাথায়। পুলিস ও ইপিআরের ট্রাক এখন চলে যাচ্ছে নাজিমুদ্দিন রোডের দিকে। খিজিরের চারদিকে পলায়মান মানুষের প্রচণ্ড চাপ। 'গুলি, গুলি', 'মারা গেছে', 'না মরেনি', 'ব্লিডিং হচ্ছে', 'হাসপাতালে নিয়ে গেছে',—এই সব সংলাপের মধ্যে মানুষ এলোপাথাড়ি দৌড়ায়। টিবি ক্লিনিক থেকে এগিয়ে আসছে লাল গাড়িটা। এবার শুরু হলো কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়া। ঢাকা হলের ছাদ থেকে ইট পাটকেল ও বোতল এসে পড়ছে পুলিসের ওপর। পুলিস পিছে হটছে, তারা ঢুকে পড়ছে রেল লাইনের ধারে বস্তিতে। মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে এসে পুলিস ও ইপিআরের লোকজন বস্তির ভেতর এলোপাথাড়ি মারধোর শুরু করলো। পুলিস ও ইপিআরের সম্মিলিত শক্তিতে বস্তি জুড়ে শুরু হলো তছনছ কাণ্ড। এই সব ইট-চাপা ও হার্ডবোর্ডের বাড়ি ভাঙার জন্য তাদের বুলডোজার ব্যবহার করতে হয় না।—রাইফেলের বাঁটই যথেষ্ট। এক পাল হাতি যেন দৌড়ে চলে যাচ্ছে বস্তির ওপর দিয়ে। বাড়িঘর সব টপাটপ পড়ে যায়। এর ওপর মানুষের পিঠে, বুকে, পাছায় ও মাথায় রাইফেলের বাঁটের বাড়ি।

'আল্লা গো, মা গো', 'বাবা আমরা গরিব মানুষ, কিছু জানি না', 'বাবা আপনে আমার ধর্মের বাপ!'—নারী-পুরুষ-বালক-বালিকার আর্তনাদ ও কাকুতি-মিনতি, বস্তির মানুষের ছোটাছুটি, আবার ওদিক থেকে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার শব্দ। খিজির দৌড়াচ্ছে। তার কানে তখন স্লোগান-পিপাসা। স্লোগান শুনলেই বুঝবে যে, মানুষ পুলিসকে রুখে দাঁড়িয়েছে। রেল লাইনে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়াচ্ছে, এমন সময় দ্যাখা গেলো জুম্মনকে, জুম্মন দৌড়াচ্ছিলো উল্টোদিকে। জুম্মনকে ডাকতে খিজির একটু দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ে পড়ে রাইফেলের বাঁটের বাড়ি। খিজিরকে ফের দৌড়াতে হয়। পুলিসের লোক ঘরে ঘরে ঢুকে ঘর ভেঙে দিচ্ছে, মাটির কলসি হাঁড়িকুড়ি ভাঙার আওয়াজ ক্রমে বেড়েই চলে। এরই মধ্যে সব অমূল্য রত্নসামগ্রী সরাবার জন্য কেউ কেউ ভাঙা ঘরে মাথা ঢুকিয়ে পাছায় ও পিঠে রাইফেলের বাঁটের গুঁতো খায়। জুম্মনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

এখানে এতোক্ষণে মনে হলো, আরে জুম্মন তো বিছানায় নাই। খিজির জিগ্যেস করে, 'জুম্মনে কই?'

'আইবো না।' জুম্মনের মা জবাব দেয়, 'অর বাপেরে মাহাজনে মানা কইরা দিছে।'

'কি?'

'মিস্ত্রীরে ডাইকা কইছে, পোলায় থাকবো বাপের কাছে। তোমারে আমি থাকবার জায়গা দিমু।'

'ক্যামনে?'

'মাহাজনে তোমারে এহানে থাকবার দিবো না। কয় আমার বাড়ি থাইকা আমার লগে দুশমনি করবো! ঠিকই তো। মাহাজনে সইজ্য করবো ক্যালায়?'

সন্ধ্যাবেলা আজ জুম্মন ও জুম্মনের মায়ের সামনেই বাড়িওয়ালা কামরুদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, 'মিয়া নিজের বিবি পোলা লইয়া থাকে। ঐ নিমকহারামটারে আমি খ্যাদাইয়া দেই! দোলাই খালের উপরে রাস্তার কাম চলে পুরাদমে, তোমার কামের অভাব হইবে না!'

কামরুদ্দিন জবাব দেয়নি। জুম্মনের মা তখন পাকা উঠানের এক কোণে কলপাড়ে বাসন মাজছিলো আর তার দিকে বারবার দেখছিলো।

বাড়িওয়ালার খুব রাগ, 'অর রোয়াবিটা দেখছো? মিটিঙের মইদ্যে আমার নামে গিবত করে, বুঝলা? খানকির পয়দা,—আর কি হইবো, কও? থাকতি কান্দুপট্টির মইদ্যে, মায়ের ভাউরা হইয়া থাকতি! বইনের ভাউরা হইয়া থাকতি! মায়ের বইনের কাস্টমারের লাথি চটকানা খাইয়া দিন গুজরান করতি, ভালো হইতো! না? আমি থাকবার জায়গা দিছি, খাওন দিয়া বড়ো করছি, খানকির পুতের অহন পাখনা গজাইছে!' এইসব শুনতে শুনতে জুম্মনের মায়ের ছাইমাখা খড়-ধরা কালো হাত চলছিলো অতিরিক্ত দ্রুতবেগে।

'তুই কি কইলি?' খিজির আলি বৌকে জিগ্যেস করে,'তুই কিছু কইলি না?' জুম্মনের মা মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু কোনো কথা বাড়িয়ে বলতে পারে না। তবে খিজির আলি সম্বন্ধে বাড়িওয়ালার গালিগুলো এতোটা হুবহু না বললেও তো পারতো! সুযোগ পেয়ে মাগী নিজেই কি তাকে গাল দিয়ে সুখ করে নিচ্ছে?

খিজির বলে, 'আমি মাহাজনের নামে গিবত কি করছি? মহল্লার মানু ঐদিন তারে ধইরা ছেইচা ফালাইতো না? আমি ঝুটা কথা কইছি? অর আপনা ভাইগ্লাই তো আমাগো সর্দার, আমরা তো আলাউদ্দিন মিয়ার লগেই আছি। ভাইগ্না মিটিং করতাছে না? মিছিল করতাছে না?'

'কার লগে তুমি কার বিচার করো? কৈ তার ভাইগ্না, সায়েব মানু, দুইদিন বাদে বলে মাহাজনে নিজের মাইয়ার লগে বিয়া দিবো! গোলাম হইয়া তুমি তার সাথে এক লগে নাম ল্যাখাও? হায়রে মরদ! কৈ মহারানী, কৈ চুতমারানী!'

খিজিরের ইচ্ছা করে একটা ঘুষিতে মাগীর চোপাখান ফালাফালা কইরা ফালায়। কিন্তু তার সুযোগ না দিয়ে জুম্মনের মা বলে, 'এই মিছিল উছিলের হাউকাউ দেইখা মাহাজন খামোশ মাইরা রইছে, নাইলে তোমারে উঠাইতে তার কতোক্ষণ?'

'উঠাইয়া দিলে যামু গিয়া! ঢাকার শহরের মইদ্যে জায়গার অভাব?'

'আমারে কাম দিবো? তোমারে উঠাইয়া দিয়া মাহাজনে মিস্ত্রীর লগে আমারে বিয়া না দিয়া কাম দিবো?'

'এহানে কাম করবি না! কাম করলে কামের অভাব আছে?'

'আরে বাবা! মরদের লাহান কথা কইলা একখান! মাহাজনে আমার পোলারে রিকশা কইরা দিবো, আমারে থাকতে দিবো। এইগুলি ছাইড়া তোমার সিনার মইদ্যে গিয়া ছুপাইয়া থাকুম, না? তাও তো খালি হাড্ডি কয়খান আছে! ঐ হাড্ডির খাঁচার মইদ্যে আমারে রাখতে পারবা? ভ্যাদাইমা মরদ একখান!'

এর মধ্যে গলা ভরে টালমাটাল গান নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলো বজলু। ঢুকেই দরজায় বসে হড়হড় করে বমি করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বজলুর বৌয়ের চিৎকার, 'রাইতে গু-গবর খাইয়া বাড়ি আইছে, অহন এইগুলি সাফ করে ক্যাঠায়? এইগুলি ধোয় ক্যাঠায়?' এরপর বমি করার আওয়াজ সাঙ্গ হলে আওয়াজ ওঠে মারধোর করার। ১টা চড়ে মেয়েটা চেঁচিয়ে ওঠে, দ্বিতীয় চড়ে চুপ। তারপর বজলু তাকে মেঝেতে ফেলে দমাদম লাথি মারে। লাথির প্রবাহে বিরতি পড়তেই বজলুর বৌ বিড়বিড় করে, 'পুলিসের বাড়ি খাইয়া চোট্টাটার ত্যাজ বাড়ছে, না?' জবাব বজলু ফের লাথি মারতে শুরু করে। মেয়েটা ভয়ানক ত্যাড়া, মার খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য যা করে মাতালকে উস্কে দেওয়ার জন্য

তাই যথেষ্ট। এদিকে জুম্মনের মা বিড়বিড় করে, 'হায়রে! পাঁচ মাসের পোয়াতিটা! হায়রে!' তারপর পুরনো প্রসঙ্গ তুলে সে প্রায় মিনতির স্বরে বলে, 'তুমি না, বুজলা, মাহাজনেরে কও, মাহাজনেরে ভালো কইরা কইলেই—?'

কিন্তু তার কোনো কথা খিজিরের কানে যায় না। পোয়াতি বৌকে বজলু লাথি মারছে। খিজিরের চোখের ভেতর থেকে রক্তের একটানা স্রোত বেরিয়ে কোনো একটি দালানের সিঁড়ির তলা ভাসিয়ে দেয়, রক্তের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে পড়ে থাকে বজলুর বৌ।

খিজির এক লাফে উঠে বাইরে যায়। মাতালটাকে ফেলে দেওয়ার জন্য ১টা লাথিই যথেষ্ট। মাটিতে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে বজলু জড়ানো গলায় গাল দেয়, 'তুই ক্যাঠা? নিজেরটারে তামাম দিন বন্ধক রাখস মাহাজনের কাছে, রাইতে আইছস আমারটারে ধরতে, না? তরে ফালাইয়া একদিন টেংরি দুইখান না ভাঙছি তো আমি হালায় বাপের পয়দা না! মাহাজনে ভি হুকুম দিছে! খানকির বাচ্চাটারে একদিন এক্কেরে মাইরা বস্তার মইদ্যে বাইন্দা হালায় ফালাইয়া রাখুম ম্যানহোলের মইদ্যে! খাড়া!' বজলুর জড়ানো কথা কিন্তু সব বোঝা যায়।

জুম্মনের মা ঘুমিয়ে পড়েছে। খিজির একটু রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। ওদিকে শ্যাওলা-পড়া, খয়েরি রঙের দোতলা তিনতলা বাড়ির ফাঁক দিয়ে দ্যাখা যায় মস্ত বড়ো চাঁদ। ফাঁকা রাস্তা জুড়ে ময়লা আবর্জনা চাঁদের আলোতে জড়ানো। খিজিরের বুক ভয়ানক ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। মহাজন কি বজলুকে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে? শরীরটা শীতশীত করছে। ঘরে ঢোকা দরকার। কাল হরতাল। এখান থেকে মিছিল নিয়ে যেতে হবে ইউনিভারসিটি। আলাউদ্দিন মিয়া ঐ বেবি ট্যাকসি নিয়ে বকাবকি করার পর বারবার বলে দিয়েছে খিজির যেন রিকশাওয়ালাদের নিয়ে সকাল বেলাতেই অফিসের সামনে হাজির হয়। শ্লোগান কি হবে সায়েব তাও ঠিক করে দিয়েছে। নাঃ! এখন ঘুমানো দরকার, কাল ভোরে উঠতে হবে।

১৪

'আকবর ভায়ের ব্যাটা? দাঁড়াও, ভালো করা দেখ্যা নেই।' আনোয়ারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর খয়বার গাজী তাকে বসতে বলে, তার পাশে জালাল মাস্টার। তারপর ১টি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খয়বার গাজী অনুযোগ করে, 'তোমরা বাপু বাপদাদার ভিটাত আসবারই চাও না, একবার ফুচকিও পাড়ো না! তোমার মামু আর বছর জাতীয় পরিষদে কনটেস্ট করলো, আমার এখানে আসছিলো। আমার কুটুম্ব, ভায়ের সম্বন্ধী, আবার তোমার চাচীরও কি রকম ভাই হয়। তো কল্যাম, সিরাজ ভাই, আমার কিছু কওয়ার দরকার নাই। আমার ইউনিয়নের মেম্বর এগারোটা।—একটা জোলা আর একটা কৈবর্ত।—বাকি নয়টা ভোট আপনের। তা ফুল মার্কার টিকেট নিবার পারলেন না?—ওয়াদা দিলাম। কিন্তু বাবা

জামানা খারাপ, মানুষ হলো মোনাফেক। মানুষের ঈমান নাই। ভোটের আগের রাতে মটোর সাইকেল নিয়া দুইজন মানুষ আসলো, ভটভটিওয়ালারা টাকার বস্তা নিয়া আসছিলো, সব ভোট পড়লো ফুল মার্কাত। আমার ভোটটা নষ্ট হলো!' একটি প্রসঙ্গ থেকে আরেকটি এসে পড়ে। কোনোটাই ভালোভাবে শেষ হয় না। খয়বার গাজী কথা বলে একটু ধীরে, বিলম্বিত লয়ে, কিন্তু লোকটা খুব স্টেডি, থামে না। মাঝে মাঝে বিরতি দিলেও এমন একটা ভঙ্গি করে যেন তার বাক্য অসম্পূর্ণ রয়েছে, ঠিক পরবর্তী সময়টিও তার জন্যেই নির্ধারিত, অন্য কারো তাতে ভাগ বসাবার সুযোগ থাকে না। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে সিগ্রেটে টান দেয় বা তার সামনে লাঙ্গল-কাঁধে মাঠের-দিকে-রওয়ানা হওয়া কিষানের উদ্দেশে নির্দেশ পাঠায় বা সশব্দে থুথু ফেলে বা উচ্চকণ্ঠে আল্লার নাম নেয়। এরকম ১টি ফাঁক পেয়ে আনোয়ার বলে ফেলে, 'জী। বেসিক ডেমোক্র্যাটদের প্রায় সবাই টাকা নিয়ে ভোট দিয়েছে, সব জায়গাতেই তাই হয়েছে।'

মুখে একটু জর্দা পুরে ডান হাত তুলে খয়বার গাজী তাকে থামিয়ে দেয়, তারপর বলে, 'বাপু, বেসিক ডেমোক্র্যাসি কও আর আর এ্যাডাল্ট ফ্র্যান্‌চাইজ কও, আইয়ুব খান কও আর শেখ মুজিব কও, দ্যাশের মানুষের ঈমান ঠিক নাই। ঈমান না থাকলে কেডা কি করবো। না কি কও?' হঠাৎ ভেতর বাড়ির দিকে মুখ করে লোকটা হুঙ্কার ছাড়ে, 'ক্যারে সাকাত আলি, নাশতা হলো?'

আনোয়ার ক্ষীণকণ্ঠে একটু ভদ্রতা করার চেষ্টা করে, 'না, নাশতা থাক। বাড়িতে বলে আসিনি, নাশতা করে রাখবে, আপনি আর কষ্ট করবেন না।' খয়বার গাজী হাসে। এই হাসিতে আনোয়ারের প্রতি নাশতা খাওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

একটু অস্বস্তিকর হলেও লোকটাকে আনোয়ারের খারাপ লাগছে না। জালাল মাস্টারের অনুরোধেই আসতে হয়েছে, কাল সন্ধ্যায় জালাল ফুপা বার বার বলছিলো, 'দ্যাখো বাপু, চ্যাংড়া প্যাংড়ার কথাত কর্ণপাত করো না। খয়বার গাজীর সাথে বিবাদ করলে চেংটু কও আর অর বাপ কও, কারো পরিণতি ভালো হবার পারে না। কারণ কি?' কারণটাও ব্যাখ্যা করে সে নিজেই। নাদু পরামাণিক ও তার ছেলে চেংটুর নামে খয়বার গাজী যে ফৌজদারী মামলা করেছে তাতে অপরাধ প্রমাণিত হলে বাপব্যাটার ৭ থেকে ১৪ বছরের জেল একেবারে অনিবার্য। নাদু কি মামলার খরচ যোগাতে পারবে? আরো, খয়বারের কি? ১৫ দিন পর পর সে টাউনে যায়, চাঁদে চাঁদে তার মোকদ্দমা। এর সঙ্গে নাদুর নামে ১টা মামলা জুড়ে দিলে তার কি এসে যায়? আনোয়ার গিয়ে যদ খয়বার গাজীকে একবার বলে তো সে মামলাটা তুলে নিতে পারে। আনোয়ার তবু আসতে চায়নি। চেংটুর কথা না হয় ছেড়েই দিলো, ছোঁড়াটা মনে হয় সব সময় টং হয়ে আছে, কিন্তু জালাল মাস্টার, এমন কি নাদু পরামানিকের কথাতেও বোঝা যাচ্ছে যে, খয়বার গাজী লোকটা বিপজ্জনক। ১টা সুযোগ এসে পড়েছে, এখনি চিরকালের জন্য এদের উৎখাত করা সম্ভব। চারদিকে মানুষের ভাব যা দ্যাখ্যা যাচ্ছে তাতে মামলা যারা করে তারা তো নস্যি, মামলার রায় দেনেওয়ালারাই টেকে কি-না দ্যাখো!

কিন্তু ঝামেলা বাধায় নাদু পরামাণিক, 'চাচামিয়া' দ্যাখেন, গরীব মানুষ হামরা, বেন্ন্যা মানুষ, আপনাগোরে পায়ের তলাতে পড়্যা আছি বাপদাদার আমল থ্যাকা। হামার তিনকাল যায়া এখন এককালোতে ঠেকছে, হামি তো বুঝি বাপজান, হামি সোগলি বুঝি!'

বাপের বিবেচনাবোধে চেংটুর আস্থা নাই, 'হু! তুমি কি বোঝো?'

নাদু জবাব দেয় আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে, 'চ্যাংড়াপ্যাংড়ার ইগল্যান, নাফপাড়া ব্যারাম কয়দিনের, কন? যিগল্যান ইশকুল কলেজোত পড়ে দুইদিন বাদে সিগুল্যান ব্যামাক যাবো টাউনেত, অদ্দেক যাবো জেলের ভাত খাবার। খয়বার গাজী তখন হামাক মাটির তলাত পুঁত্যা থুবো, মাটির উপরে ঘাস জালাবো, কেউ ফুচকি দিয়াও দেখবো না।'

তারপর সে খয়বারের সঙ্গে আনোয়ারের বড়োচাচার আত্মীয়তার কথা বলে, বড়োচাচী ডালেপালায় খয়বারের মামাতো বোন। আনোয়ার কথাটা বললে গাজী তাকে না করতে পারবে না। হাজার হলেও ভদ্রলোক, আর যা-ই হোক খয়বার গাজীর বংশ তো ভালো। ছোটলোকের বাচ্চারা মেম্বার হয়ে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের গম মেরে বড়োলোক হয়, খয়বার তো সেরকম লোক নয়। কতো পুরানো বংশ, নইলে আনোয়ারদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা হয় কি করে?

'বুঝল্যাম তো! তা গোরু চুরির সোম্বাদ নিয়া তুমি থানাত গেলে তার গাওত লাগে কিসক?'

চেংটুর এই অভিযোগ নাদু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলে আনোয়ার তাকে থামিয়ে দিয়েছিলো, 'তারপর চেংটু যখন তার ভাইপোকে কুকুর ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন আপনিও রামদা হাতে তার সঙ্গে ছিলেন,—এই কথাটা খয়বার গাজী থানায় গিয়ে বললো কি করে, বলেন?'

জবাব না দিয়ে নাদু মাথা নিচু করে থাকে। সে বসেছিলো হাঁটু ভেঙ্গে,—আর দশজন চাষা যেভাবে বসে,—তার বড়ো পাকা দাড়ি এলোমেলোভাবে ছড়ানো, শীতে সেগুলো কেমন খাড়া খাড়া হয়ে গেছে, এতো ঘন দাড়িতেও তাই চেহারায় সৌম্য ভাব আসে না। তার দীর্ঘ দেহ সর্বদাই নোয়ানো, আনোয়ারের কথা শুনতে শুনতে তার ঘাড় এতোটা নুয়ে পড়ে যে, মনে হয় খয়বার গাজীর সমস্ত অপরাধের জন্যে দায়ী সে একা। আনোয়ারের দিকে সে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকায়, পরশু জালাল মাস্টারের কাছে সে তার পর্যবেক্ষণ জানিয়ে দিয়েছে যে, আনোয়ারের দাদাজীর সঙ্গে আনোয়ারের চেহারার সাদৃশ্য খুব স্পষ্ট। তা তার পূর্বপুরুষের আমলের এক চাকরের প্রতি সে কি তার মরহুম দাদাজীর মতো একটু করুণাহৃদয় হতে পারে না? খয়বার গাজীর কাছে একবার যেতে তার আপত্তিটা কি? আবার জালাল মাস্টারও বারবার চাপ দেয়। এ লোকটার কথা ফেলা মুশকিল। স্থানীয় হাই স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত ৪০ বছর ধরে বাঙলা পড়াবার পর লোকটা এখন ঘরেই বসে থাকে। সংসার দ্যাখে, মানে শ্বশুরের দেওয়া কয়েক বিঘা জমির তদারকি করে। মাসে দুমাসে বিষাদ-সিন্ধু, মোস্তফা-চরিত, কাসাসুল আম্বিয়া বা তাপস-চরিতমালা ও রবি ঠাকুরের চয়নিকা পড়ে বাঙলা ভাষার চর্চাটা চাগিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এই ভাষার ওপর দখল বোঝা যায় তার কথাবার্তায়, 'খয়বার গাজীর সহনশীলতার অভাব আছে, কিন্তু তার হৃদয় পরিষ্কার। আর তোমার বড়ো চাচীর তাঁই সাক্ষাৎ আত্মীয়, সম্পর্কে ফুফাতো ভাই। আর তোমার পিতার সাথে তার হৃদ্যতা কি এক আধ বৎসরের? চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের বন্ধুত্ব, প্রায় সমবয়স্ক, ইস্কুলে সহপাঠী না হলেও খেলার সাথী। শৈশবের বন্ধুত্বের কাছে আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কিছু নয়। তুমি একটা আবদার করলে গাজী কি হেলা করবার পারে?'

কিন্তু খয়বার গাজীর বৈঠকখানার বারান্দায় বসে জালাল মাস্টারের বাকপটুতার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। বারান্দার ধার ঘেঁষে শেফালি গাছ, টুপটাপ ফুল পড়ে শিশির-ভেজা সাদাটে সবুজ ঘাসের জমিতে নক্সী কাঁথা বোনা হয়ে চলেছে, জালাল মাস্টার তাই দ্যাখে। সামনের এই খালি জমির পর ঘাট-বাঁধানো পুকুর, শীতের পুকুরে স্থির পানির ওপর আবছা ধোঁয়া, জালাল উদ্দিন তাও দ্যাখে। একটু পশ্চিমে আনোয়ারদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তায় শিমুল গাছের মাথায় লালচে রোদ হলদে হয়ে আসছে, লোকটা তাও দ্যাখে। তাহলে আনোয়ার কথাটা পড়ে কিভাবে?

লুঙ্গি পরা ১টি ছেলে এসে দাঁড়ালে খয়বার গাজী আনোয়ারকে বলে, 'চলো বাবা, ঘরে নাশতা করি। গরিবের বাড়িতে আসছো বাবা, কি দিয়া যত্ন করি? একটা খবর দিয়া আসা লাগে, গাঁয়ের মদ্যে থাকি, বুঝলা না?—উপস্থিত কিছু পাওয়া যায় না।'

'না না কি যে বলেন!' 'না না, তাতে কি?' আনোয়ারের এসব বাকপ্রয়াস খয়বার গাজীর বিপুল বিনয়ের তোড়ে কোথায় ভেসে যায় তার আর কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

বৈঠকখানায় শতরঞ্চি পাতা তক্তপোষে দস্তরখান বিছানো। গোলাপি ও বেগুনি রঙের বড়ো বড়ো ফুলপাতা-আঁকা মোটা ও বড়ো চীনেমাটির প্লেটে প্রথমে পরোটা ও পায়রার গোশতের ভুনা খাওয়া হলো। তারপর মুড়ি দিয়ে পায়েস। পায়েস খেতে খেতে জালাল মাস্টারের বারবার ইঙ্গিত সত্ত্বেও আনোয়ার কথাটা তুলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মাস্টার বলে, 'ভাইজান, এই চ্যাংড়া আপনার কাছে একটা অনুরোধ, একটা আবদার নিয়া আসছে।' খয়বার গাজী সাড়া না দিয়ে তার পায়েসমাখা আঙুল চোষে। সবগুলো আঙুল পরিষ্কার করে হঠাৎ বলে, 'কি বাবা? কও, কও!'

জালাল মাস্টার বলে, 'নাদু পরামাণিক ধরেন এদের বাড়িতে আজ সুদীর্ঘ—।' চিলমচিতে হাত ধুতে ধুতে খয়বার গাজী তাকে থামিয়ে দেয়, 'জালাল মিয়া কন ক্যা? এই চ্যাংড়া নাকি কবো। তাকই কবার দ্যান না!'

আনোয়ার অনেকক্ষণ থেকে মনে মনে রিহার্সেল দিচ্ছিলো। এবার বলেই ফেলে, 'নাদুর বিরুদ্ধে মামলাটা তুলে নিলে ভালো হতো। বেচারা খুব ভেঙে পড়েছে। গরিব লোক, শরীর খারাপ, সেরকম খাটতেও পারে না। লোকটা এমনিতে খুব ভালো, অনেস্ট লোক—।'

'না, নাদু তো মানুষ খারাপ না,' অপরিবর্তিত গলায় খয়বার গাজী বলে, 'ছোটো জাতের মদ্যেও আল্লা হুঁশজ্ঞান দেয়, নাদুরও হুঁশজ্ঞান কম নাই। কিন্তু তার ব্যাটা? উই যে অকামটা করছে আর শালার কথাবার্তা যেমন শুনি, এখন তার সাথে কি করি কও তো? বিশ পঁচিশ বছর আগে হলেও বাপজানের দোনলা বন্দুকখান বার কর্যা শালাক গাঙের কিনারে নিয়্যা ফালায়া দিল্যামনি! তা বাপু দিনকাল এখন খারাপ। এখন সোগলি শালা বড়োলোক, —চাষাভূষা-জোলা-নাপিত-কৈবর্ত-কামার-কুমার—সোগলিক তোয়াজ কর্যা চলা নাগে। চেংটুক নিয়া এখন কি করি কও তো বাপু! জালাল মিয়াই কন তো, চেংটুর লাকান একটা শয়তানের সাথে কি করি? আজ লাই দিলে কাল আপনার মাথাত লাথি মারবো। এ্যাক নিয়া কি করি! আপনেই কন?

চেংটুর ব্যাপারে জালাল মাস্টারও খয়বার গাজীর সঙ্গে একমত। ছেলেপিলে আদব কায়দা ভুলে যাচ্ছে। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে চায় না!

আল্লা সব মানুষকে সমান মনোযোগ দিয়ে সৃষ্টি করেছে এ কথা অবশ্য ঠিক। সব মানুষের প্রতি আল্লার প্রীতি ভালোবাসাও সমান। কিন্তু হাতে পাঁচটা আঙুল যেমন সমান হয় না, এক বাপের পাঁচটা ছেলে যেমন সমান বুদ্ধি-বিবেচনা পায় না, সমাজের সব মানুষ তেমনি একই আসন পেতে পারে না। এই যে চেংটু, একে একা দোষ দিয়ে লাভ কি? আজকাল এই বয়সের সব ছেলেই এরকম হচ্ছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবেই এর কারণ বলে জালাল মাস্টার মনে করে। উপযুক্ত জ্ঞানলাভ না হলে আদবকায়দা রপ্ত করা অসম্ভব, আদবকায়দা হলো শিক্ষার ১টি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে 'নাদুটা মানুষ খুব ভালো। মনিবের হিত ছাড়া তাঁই কোনোদিন অহিত চায় নাই, মিয়াদের ইষ্ট ছাড়া তাঁই কোনো দিন অনিষ্ট করে নাই।'

খয়বার গাজী একটু বিরক্ত হয়, 'খবর কি আমি কম রাখি? আপনি জামাই মানুষ, উদিনক্যা আসছেন, আপনে কি জানেন? এর দাদার আমল থাকা এই বাবাজীদের বাড়িতে যারা কাম করে সবাইকে আমি চিনি।'

বারান্দায় বসে পান খেতে খয়বার গাজী আনোয়ারকে বলে, 'তুমি একটা আবদার নিয়া আসছো, আমি কি না করবার পারি? চেংটুক কয়ো একবার আমার সাথে যেন দ্যাখা করে। চেংটুর কথা শুনবো, আমার ভাইস্তা আফসারের কথাও শোনা দরকার। চেংটু বেয়াদবি করছে আফসারের সাথে, আমার সামনে আফসারের কাছে যদি মাফ চায়, আফসার যদি মাফ করে তো আমি মামলা তুল্যা নেবো।' একটু থেমে সে বলে, 'আফসারেক আমি বুঝায়া বলবো, চ্যাংড়া প্যাংড়া একটা ভুল কর‍্যা বসছে, আফসার মাফ কর‍্যা দেবে।'

এতো সহজে কাজ হবে আনোয়ার ধারণা করতে পারেনি। জালাল মাস্টারের অনুমান তাহলে অভ্রান্ত, সে একবার দ্যাখা করলে খয়বার গাজী অস্বীকার করতে পারবে না। হাজার হলেও আব্বার ছেলেবেলার খেলার সাথী। কিন্তু খয়বার গাজী মামলা তুলে নেওয়ার এই সিদ্ধান্তে জালাল মাস্টারকে একটুও খুশি মনে হচ্ছে না। কেন? গ্রামের লোকদের আবেগ প্রকাশের ব্যাপারটা অনোয়ারের কাছে বড়ো এলোমেলো ঠেকে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে কৌটা বার করে মুখে জর্দা ফেলে খয়বার গাজী বলে, 'বাবাজী, তুমি আসছো আমার এই গরিবখানায় এক সন্ধ্যা ডালভাত খাওয়া লাগবে। কিন্তু না, দুইটা ডালভাত খায়া যাবা। ওয়াদা কর‍্যা যাও, এ্যাঁ?'

আনোয়ার কি রাজি না হয়ে পারে? সে কেবল এদিক ওদিক দ্যাখে। শেফালি গাছের নিচে ফুল এখন মাত্র কয়েকটি। ওরা খেতে বসলে কেউ এসে নিয়ে গেছে। পুকুরের বাঁধানো ঘাটের দুই পাশে মস্ত ২টো গাছ, ১টা তো বকুল, আরেকটা কি? কনক-চাঁপা হতে পারে, হাটখোলা রোডের ১টা বাড়িতে এরকম গাছ দেখিয়ে ওসমান একদিন ওটা কনক-চাঁপা বলে সনাক্ত করেছিলো। পুকুরের বাঁ পাশে নতুন খড়ের টাটকা হলুদ রঙের গাদা। তার নিচে নতুন একটি সাদা বাছুর কচি মুখে খড়ের একটি গাছা নিয়ে খেলা করে। কচি নরম রোদ এসে পড়েছে বারান্দা জুড়ে।

পুকুরের ওপর পাতলা ধোঁয়া আস্তে হারিয়ে যায়, সেখানকার নতুন রোদের কাঁপন যেন ঢেউ তুলছে খয়বার গাজীর ভরা গলায়, 'এই যে পুষ্করনি, তোমার বাপেরা কয়ো ভাই সাঁতার শিখছে এটি। তোমার দাদা বড়ো শক্ত মানুষ ছিলো গো, ছেলেপেলেক ইঁদারার তোলা পানি ছাড়া গোসল করবার দেয় নাই। বড়োমিয়া বিছনা ছাড়ছে রাত থাকতে, বেলা ওঠার আগে

বাড়ির ছেলেপেলে সব কয়টাক উঠায়া দিছে। নামাজ পড়া লাগছে বাড়ির সব মানষেক; জায়গির, কিষান, চাকরপাট—সোগলি নামাজ পড়ছে তার বাড়িত। নামাজ পড়া হলে তিন ব্যাটাক পড়বার বসায়া তার অন্য কাম। তোমাদের বাড়িতে দুইজন তিনজন জায়গির থাকছে বারো মাস। সকালবেলা তোমার বাপচাচাগোরে পড়া দ্যাখায়া দিছে তারাই। এই তো জালাল মিয়াও ছিলো। ক্যাগো, আকবর ভায়েক আপনে পড়ান নাই?'

'না, আমি যখন আসি আকবর ভাই তখন কলকাতার কলেজে পড়ে।'

'হুঁ! আপনে তাহলে এই চ্যাংড়ার ছোটোচাচাক পড়াছেন, না?' জালাল মাস্টারের জবাবের অপেক্ষা না করে সে নিজেই মনে করতে পারে, 'না, আপনে পড়বেন ক্যামন কর‍্যা? জাহাঙ্গীর তো তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবো।'

জালাল মাস্টারকে একটু ছোটো করার এই সংক্ষিপ্ত তৎপরতা কিন্তু খয়বার গাজীর স্মৃতি-আপ্লুত আচ্ছন্নতায় এতোটুকু চিড় ধরায় না, তার গলা নেমে আসে খাদে, সে বিড়বিড় করেই চলে, 'দেখতে দেখতে দিন গেলো!' সময়ের দ্রুতগতির কথা ভেবে সে ১টি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এই দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতর হয় তার কথায়, 'দিন কি বস্যা থাকে? এই বারান্দার উপর বস্যা কতো গপ্পো, কতো খেলা, কতো গান শোনা, মনে হয় সেদিনকার কথা! কলকাতা গেলো, কলেজ ছুটি হলে বাড়িতে আসছে, ছুটির মধ্যে সারাটা দিন বস্যা থাকছে এই বারান্দায়, এই বৈঠকখানায়, ঐ পুকুরের ঘাটে। ছুটির মধ্যে অ্যাসা খালি গান শুনছে। আকবর ভায়ের ছিলো গান শোনার নেশা।'

লোকটা বলে কি? আনোয়ার ওর বাবাকে গান শুনতে দেখতো বটে, কিন্তু তাকে ঠিক নেশা বলা যায় না।

খয়বার আলি বলে, 'তোমার দাদা ছিলো কড়া মুসল্লি মানুষ, গান বাজনা আমোদ ফূর্তি ছিলো তার দুই চোক্ষের বিষ। আমার বাপজান আছিলো খুব হাউসআলা মানুষ, মাসের মধ্যে না হলেও পনেরো দিন টাউনে থাকছে। বাড়িত থাকলে একদিন দুইদিন অন্তর খাসি জবো করো, পোলাও-কোর্মা খাও। এই থানার মধ্যে প্রথম কলের গান কেনে বাপজান, পদুমশহরের জগদীশ সেন কিনলো তার ছয় মাস পর। তোমার বাপ করছে কি—?' বলতে বলতে খয়বার হাসে, 'গান-পাগলা মানুষ, করছে কি ছুটির সময় কলকাতা থ্যাকা নতুন নতুন রেকর্ড নিয়া আসছে। সায়গল, আঙুরবালা, কমলা ঝরিয়ার যতো রেকর্ড আমার বাড়িতে আছে সব তোমার বাপের কেনা। আব্বাসউদ্দিনের রেকর্ড প্রথম কিন্যা আনলো আমার বাপজান।' ১টি মহাকৌতুককর বিষয় বর্ণনার ভঙিতে খয়বার হাসে, 'আকবর ভাই আবার ঐ রেকর্ডই নিয়া আসলো পূজার ছুটির সময়!'

খয়বার গাজীর বিরামহীন সংলাপে আনোয়ারের কাছে তার বাবা ক্রমেই ঝাপশা মানুষ পরিণত হয়। আনোয়ার তো কোনোদিন আব্বাকে একটা রেকর্ডও কিনতে দ্যাখেনি। অথচ ওদের স্টেরিও রেকর্ড-প্লেয়ারের জন্য ভাইয়া-ভাবী মাসে অন্তত একটা লংপ্লে কেনে, এমন কি সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত কলকাতা থেকেও মাঝে মাঝে রেকর্ড আসতো। ঝাপশা বাবাকে স্পষ্ট করার জন্য আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'আব্বা রেকর্ড কিনতেন?'

'হ্যাঁ বাপু', এবার বলে জালাল মাস্টার, 'খয়বার ভায়ের বাবার ঢালাও আদেশ ছিলো, নতুন গান বার হলেই নিয়া আসবা, অর্থ যা লাগে চিন্তা করবা না।' মরহুম পিতার প্রসঙ্গ তোলায় খয়বার গাজী জালাল মাস্টারের ওপর একটু প্রসন্ন হয়, 'জালাল মিয়া ঠিক কথা

কছেন। বাপজান হাউস কর‍্যা হারমোনিয়াম কিনছে, তাঁই নিজে গান করছে ছয়মাসে নয়মাসে একবার। হারমোনিয়াম বাজাছে আকবর ভাই, একোটা গান একবার, বড়োজোর দুইবার শুনলে ঠিক তুল্যা নিবার পারতো, তাই না জালাল মিয়া?'

'ঠিক কছেন। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিলো অসাধারণ! একবার একটা পুস্তক পড়লে—'

'আরে আপনে কি দেখছেন?' খয়বার গাজী তাকে থামিয়ে দেয়, 'তোমার দাদার হাউস ছিলো এক ব্যাটাক উকিল বানাবো। বড়ো ব্যাটা, তোমার বড়োচাচার শরীরটা নরম, কলকাতার হোস্টেলের খাবার সহ্য হলো না, আইএ পাস কর‍্যা বাড়িতে আসলো। আর গেলো না, সংসার দ্যাখা আরম্ভ করলো। মানুষের নসিব! তোমার বাপ বিএ পাস কর‍্যা ল'য়েত ভর্তি হলো, পরের বছর বড়ো মিয়া মারা গেলো। তোমার বড়োচাচা পড়ার খরচ কুলাবার পারে না। ল' পড়ার জন্যেই আকবর ভাই বিয়া করলো, কি মনে কর‍্যা এক বছর বাদে পড়া বাদ দিলো, চাকরি নিলো। আকবার ভাই উকিল হলে এই তামাম ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে তার সাথে পারে কেডা?'

আনোয়ার ভাবে উকিল না হয়েও আব্বা এমন কি খারাপ করেছে? পার্টিশনের সময় পাকিস্তানে অপশন দিয়ে এসেই ওয়ারিতে বাড়ি কিনেছে, ব্যাংকে টাকা যা রেখে গেছে তাই নিয়ে ব্যবসা করে ভাইয়া দিব্যি রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে।

'আকবর ভায়ের ছোটোভাইটা জাহাঙ্গীরও খুব মেধাবী ছাত্র ছিলো।' জালাল মাস্টার এই মন্তব্য করে ফের খয়বার গাজীর ধমক খায়, 'জাহাঙ্গীরকে আপনে আর কয়দিন দেখছেন?' এই চাচাটিকে আনোয়ার অবশ্য একেবারেই দ্যাখেনি, জাহাঙ্গীর হোসেন মারা গেছে তার জন্মের আগে। আব্বা তার সম্বন্ধে খুব একটা কথা বলতো না, আম্মাও না। বড়োচাচার বোধ হয় বেশ দুর্বলতা আছে, ভাইয়া পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে চিঠি লিখলে বড়োচাচা জবাবে লিখতো, 'তোমার নিকট আমাদের প্রত্যাশা অনেক। জাহাঙ্গীর জীবিত থাকিলে আজ বড়ো আনন্দিত হইত। উহার মেধার লক্ষণ বংশে কেবল তোমার মধ্যে লক্ষ করা যায়।' আজ খয়বার গাজীও তার প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, 'হ্যাঁ, জাহাঙ্গীর ছিলো স্কলার ছাত্র। একটা স্টুডেন্ট বটে। ওরকম তুখোড় ছাত্র এই গোটিয়া, পদুমশহর, দরগাতলা, চন্দনসহ, কর্ণিবাড়ি—এই অঞ্চলে জন্ম হয় নাই। এমনকি পার্টিশনের আগে, তখন মোসলমানের স্থান কোটে? সেই সময় হিন্দুগোরে মধ্যেও এরকম মেরিট এই অঞ্চলে একটাও আছিলো না গো।' জাহাঙ্গীর হোসেন সম্পর্কে খয়বার গাজীর দীর্ঘ প্রশস্তিমূলক বিবৃতি আর শেষ হয় না। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় সে ম্যাট্রিক ক্লাসের টেস্ট পেপার দেখে অঙ্ক করতো। 'ক্লাস নাইনে যখন পড়ে', এবার জালাল মাস্টার প্রায় জোর করে স্মৃতি ঘাঁটে, 'হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কেশব মিত্রের ফেয়ার-ওয়েল বক্তৃতা করলো ইংরাজিতে, যারাই শুনছে তারাই বলছে, মনে হলো বিলাত থ্যাকা সদ্য আগত ইংরাজ ভাষণ দিতেছে!' তো সেই ছেলে, ঐ বয়সে অতো মেধা, —মুরুব্বিদের কেউ কেউ বলতো এতোটা ভালো নয়। 'সন্দেহ করতো,' খয়বার গাজী বলে, 'চ্যাংড়ার সাথে তেনাদের কেউ আছেন। না হলে এই বয়সের চ্যাংড়া এতো বুদ্ধি পায় কোটে?' তেনারা মানে কারা?—আনোয়ার বুঝতে পারে না।—আরে আগুনের জীব! তবুও বোঝে না! খয়বার গাজী বিরক্ত হয়, 'জীন! জীন চেনো না?—মুরুব্বিদের অনুমান কি ভুল হতে পারে? ম্যাট্রিকে ২টো লেটার পেলো, ডিস্ট্রিক্টে ফার্স্ট, 'তখন বাপু হিন্দুরা আছিলো, পরীক্ষা দিলাম আর পাস করলাম—অতো সোজা না!' কলেজে ভর্তি হলো কলকাতায়। আকবর ভাই তখন

পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকে, জাহাঙ্গীর তার বাসায় থেকে কলেজ করতে লাগলো। বছর না ঘুরতে জাহাঙ্গীরকে গ্রামে নিয়ে আসা হলো, তার হাতে পায়ে শিকল পরানো, তার মাথা কামানো। চোখজোড়া তার অষ্টপ্রহর লাল, মানুষ দেখলে চিৎকার করে, না দেখলেও আকাশের দিকে তাকিয়ে বিকট শব্দে কার উদ্দেশে গালাগালি করে। কি ব্যাপার? জোনপুরের মৌলবি সাহেবের ভাগ্নে,—জবরদস্ত পীরসায়েব, নৌকা করে যমুনার শাখানদী বাঙালি দিয়ে যাচ্ছিলো মুরিদ বাড়ি, নাদু পরামাণিকের কাছে খবর পেয়ে আনোয়ারের বড়োচাচা নিজে গিয়ে নৌকা থামিয়ে পীরসায়েবের হাতে পায়ে ধরে। পীরসায়েব এসে জাহাঙ্গীরের রোগ সনাক্ত করে ফেললো। কলকাতায় কোথায় কোন অজায়গায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করছিলো, সঙ্গেকার জীন তাই খেপে গিয়ে একটা বদস্বভাব জীনকে তার ওপর আসর করিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়েছে। বদ জীন ঝেড়ে ফেলা পীরসায়েবের কাছে ডালভাত, জাহাঙ্গীরকে বেঁধে কয়েকটা আয়াত পড়তে পড়তে ঝাড়ুর বাড়ি মারলে শয়তানটা বাপ বাপ করে পালাবে। কিন্তু পীরসায়েব তা করতে নারাজ; কারণ তাতে ভালো জীন অসন্তুষ্ট হয়।

জীন হলো ফেরেস্তাদের মতো, তাকে অসন্তুষ্ট করার ঝুঁকি পীরসায়েব নেয় কি করে? —তা কলকাতায় গিয়ে জাহাঙ্গীরের মতিভ্রম ঘটেছিলো বৈ কি। কয়েকটা হিন্দু কমুনিস্টের সঙ্গে তার মেলামেশা শুরু হয়। এতো পরহেজগার পরিবারের ছেলে, সে নাকি নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছিলো, আল্লা রসুল নিয়ে ঠাট্টা পর্যন্ত করতো!—আহারে, হিন্দু কম্যুনিস্টদের পাল্লায় পড়ে পাগল না হলে জাহাঙ্গীর এই এলাকা কি, এই জেলার একটা মাথা হতে পারতো। এই নিয়ে খয়বার গাজী ও জালাল মাস্টারের পালা করে আক্ষেপ প্রকাশের আর শেষ হয় না। কতোক্ষণ চলতো কে জানে? ১টি মোটর সাইকেলের আওয়াজে ২জনেই থামে এবং তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। শিমুল গাছের নিচে এলে হোন্ডা আরোহীকে দু'জনেই চিনতে পারে, জালাল মাস্টার বলে, 'ফকিরগোরে আসমত না?'

খয়বার গাজী সেদিক থেকে চোখ ফেরায় আনোয়ারের দিকে, 'কয়টা দিন থাকবা তো বাবা?' 'জী, কলেজ তো আজকাল প্রায় বন্ধই থাকে। কোনো অজুহাত পেলেই গভমেন্ট একেবারে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত— ?'

'শিক্ষার বিস্তার হয় কেমন কর‍্যা?' জালাল মাস্টার শিক্ষাবিস্তারে বাধাবিপত্তি নিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেছিলো, হোন্ডা এসে পড়ায় তাকে থামতে হয়। হোন্ডার আরোহী হোন্ডা দাঁড় করাতে করাতে বলে, 'মাস্টার সায়েব সকালবেলা কি দরবার নিয়া আসছেন?'

কিন্তু খয়বার গাজীর সঙ্গে তার জরুরি আলাপ, তাই প্রশ্নের জবাব না শুনেই সে এগিয়ে আসে, 'ওদিককার খবর শুনছেন? হোসেন চাচামিয়া খবর পাঠাচ্ছে। কথা আছে।'

খয়বার তাকে বৈঠকখানায় বসতে বলে নিজে উঠে দাঁড়ায়। আনোয়ার ও জালালের সঙ্গে সে বারান্দা থেকে নিচে নামে। আনোয়ারের পিঠে হাত রেখে বলে, 'বাবা, কথাটা যেন মনে থাকে। একদিন অ্যাসা ভাত খায়া যাওয়া লাগবো। আকবর ভায়ের ব্যাটা, আমার নিজের ঘরের মানুষ, তোমাকে আমি মুখে না কলেও তোমার একদিন আসা লাগে!' তার মুখের জর্দা ও পানের গন্ধ আনোয়ারের মাথার ভেতরে ঢুকে তাকে একটু আচ্ছন্ন করে, তার হাতের মস্ত থাবা দিয়ে আনোয়ারের পিঠ সে আলগোছে চাপ দেয়। খয়বার গাজীর হাতের মধ্যে দিয়ে বহুকাল আগেকার বাপের-ভয়ে-তটস্থ গান-পাগল ১টি তরুণ আনোয়ারের শিরদাঁড়ায় সারেগামা সাধে, আনোয়ারের পিঠ শিরশির করে।

বারান্দার নিচে শুকনো শিশিরের দাগ লাগা ঘাসের ধারালো ব্লেডে গলা-বসানো শেফালি ফুল আস্তে আস্তে কুঁকড়ে যাচ্ছে।

শিমুলগাছের কাছাকাছি এসে জালাল মাস্টার পেছনে তাকায়। ঐ সঙ্গে তাকায় আনোয়ারও। হোন্ডাওয়ালা ছেলেটির সঙ্গে খয়বার গাজী কথা বলছে, কথা বলতে বলতে ২জনে এগিয়ে যাচ্ছে পুকুর ঘাটের দিকে।

আরো কয়েক পা হাঁটার পর জালাল বলে, 'খালি খালি কষ্ট করলা, কোনো কাম হলো না বাপু।'

আনোয়ার ঠিকমতো শুনতে পায় না। তার চোখের ঠিক সামনে মস্ত শিমুলগাছ জুড়ে টকটকে লাল রঙ। এর উপর নীল আকাশ। হাল্কা ফেনার মতো মেঘ উড়ে বেড়ায় নির্ভার শরীরে। এই লাল, ঐ নীল ও সাদা দেখে দেখে আশ আর মেটে না। কতোকাল আগে আনোয়ারের বাপও এই রাস্তায় এই রঙবাহার দেখতো? ছোটোচাচার হাতের শিকল বড়ো হতে হতে সমস্ত দৃশ্যে কালোর দাপট বিস্তার করলে আনোয়ারের বড়ো অস্বস্তি লাগে। জালাল মাস্টার এই অস্বস্তি থেকে তাকে একরকম উদ্ধার করে, 'খালি পণ্ডশ্রম। খালি খালি আসা হলো।'

'কেন?' আনোয়ার অবাক হয়, 'মামলা তুলে নেবে বললেন তো'।

'তুমি বুঝবার পারো নাই আনোয়ার, গাজীর শর্ত পালন করা দুঃসাধ্য।'

'শর্ত?' জিগ্যেস করতে করতে আনোয়ারের মনে পড়ে, 'চেংটুর আসার কথা বলছেন তো? চেংটু মাফ চাইবে না?'

'কথা তো তা নয় বাবা, দিনকাল ততো সুবিধার নয়, খয়বার গাজী চট কর্যা কিছু করব্যার পারতিছে না। না হলে চেংটু যা করছে কোনদিন তার লাশ পড়্যা থাকতো! চেংটুক বাড়ির সীমানার মধ্যে পালে পরে কি করবো তা অকল্পনীয়। নিজে কিছুই করবো না, হয়তো সামনে থাকবোই না, আফসার গাজীকে হাত তুলব্যার মানা কর্যা দিবো। দুইজনে ঘরের মধ্যে থ্যাকা খালি ইশারা করবো, কাম সারবো বাড়ির কামলাপাট।'

আনোয়ারের মাথায় ভেতরকাল বিন্যাস ফের এলোমেলো হয়ে পড়ে। খয়বার গাজীর মুখ ও একটানা সংলাপ ক্রমেই ঝাপশা হয়, প্রতি পদক্ষেপে তার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে। হাঁটতে হাঁটতে সে বারবার জালাল মাস্টারকে দ্যাখে। নিজেই একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে, 'আচ্ছা, আমিও যদি চেংটুর সঙ্গে থাকি?'

'এ্যাঁ?'

ধরেন আপনি আর আমি যদি চেংটুকে নিয়ে আসি? এতে কাজ হবে না?' জালালউদ্দিন জবাব দেয় না! জেলা বোর্ডের রাস্তার ২ দিকে ধান জমি। ধান কাটা হয়ে গেছে, ন্যাড়া মাঠ শরীর এলিয়ে রোদ পোহায়। একটু দূরে আলুর জমি। একনাগাড়ে কয়েক বিঘা জমিতে আলুর চাষ করা হয়েছে, ৩/৪ জন কিষান আলুর জমিতে কাজ করে, তাদের মাথার পেছনে

ও পিঠে আর্দ্রতাশূন্য রোদ পিছলে পিছলে পড়ে। জালাল মাস্টার চোখের ওপর হাত রেখে রোড আড়াল করে ওদের মধ্যে কাউকে খুঁজছে। সে জোরে হাঁক দেয়, 'ক্যারে, করমালি আছে?' জবাব আসে, 'নাই।'—আনোয়ারের দিকে মনোযোগী না হয়ে জালাল মাস্টারের তখন আর উপায় থাকে না। এসব ছেলেদের নিয়ে মুশকিল,—শহরে জন্ম, শহরে মানুষ, এখানকার সমস্যা এরা বুঝবে কোত্থেকে? চেংটুও থাকবে, খয়বার গাজীও থাকবে, জালাল মাস্টার সেখানে স্পষ্টভাবে চেংটুর পক্ষ নিয়ে কথা বলবে—একি হতে পারে? এতোবড়ো মানী মানুষটাকে কি ছোটো করা যায়? চেংটুকে বিশ্বাস করা মুশকিল, কি বলতে যে কি বলে ফেলবে, তখন তার ধকল সামলাবে কে? জালাল মাস্টার সংক্ষেপে বলে, 'চেংটু যাবো না। ছোঁড়া ভারি বেয়াদব!'

'আমরা যদি ভালো করে বুঝিয়ে বলি?'

'দ্যাখা যাক!'

১৫

আনোয়ারদের বাড়ির বাইরে কাঁঠালতলায় কাঠের বেঞ্চ। বেঞ্চের পাশে মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে নাদু পরামাণিক হুঁকা টানছিলো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তার দাড়ি অরো এবড়োখেবড়ো এবং এলোমেলো হয়ে গেছে। ওদের দুজনের দিকে একবার তাকিয়ে সে ফের হুঁকা টানে এবং বেশি ধোঁয়া গলগল করে বেরিয়ে ওর মুখকে ক্রমে অস্পষ্ট ও নির্বিকার করে ফেলে। অথচ নাদু কিন্তু এদেরই প্রতীক্ষা করছিলো অনেকক্ষণ ধরে।

আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'আপনি এখনো অপেক্ষা করছেন?'

নাদু তার দিকে তাকায়। ধোঁয়ামুক্ত হলে নাদুর লাল ও ভোঁতা চোখের রঙ স্পষ্ট হয়, কিন্তু তাতেও তার ব্যাকুলতা ফোটে না।

কাঁঠালতলায় পশ্চিমে ভাঙা দালানের স্তূপের আড়ালে লুকোচুরি খেলা স্থগিত রেখে বড়োচাচার ছোটো মেয়ে রোজী এসে বলে, 'আনু ভাই, নাশতা খাবেন না? আম্মা ডাকে।'

বেঞ্চে বসতে বসতে জালাল মাস্টার বলে, 'যাও তোমার চাচীর সাথে সাক্ষাৎ করা৷ আসো।' ভেতর বাড়ির দিকে যেতে যেতে আনোয়ার নাদুর মৃদুকণ্ঠ শুনতে পায়, 'কি কয়।'

বিকালবেলা বোঝা যায় যে, নাদুর মেজো ছেলেটা একটু বেয়াদবই বটে! ছেঁড়া বাপের স্বভাব তো পায়ইনি, কিন্তু খয়বার গাজী সম্পর্কে মাঝে মাঝে মন্তব্য যা করে তাতে তার বাপ তো

বটেই, জালাল মাস্টারেরই বুক কেঁপে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আনোয়ারকে দেখিয়ে জালাল মাস্টার বলে, 'এই চ্যাংড়ার পরামর্শে কর্ণপাত করবি তো? কথা কম কলে কি হয়, ঢাকাত যতো আন্দোলন হবা নাগছে, যতো সংগ্রাম—সব কয়টার সাথে আছে। তুই খালি পুটি মাছের লাকান লম্ফঝম্প করিস, এই চ্যাংড়াকে দ্যাখ তো! কথাবার্তা শুন্যা বোঝা যায় যে, ঢাকা থেকে একজন নেতা মানুষের আগমন হছে?'

আনোয়ার কোন আন্দোলনের নেতা নয়, কিন্তু জালাল মাস্টারের কথার প্রতিবাদ করলে বেচারা একটু বিব্রত হতে পারে। চেংটু আনোয়ারের দিকে একবার তাকায়, চেংটুর চোখ বেশ স্বচ্ছ, রাগ কি ঘৃণা থেকে সেগুলো মুক্ত। কিন্তু অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করামাত্র তার চোখজোড়া ছোটো হয়ে যায়, আস্তে আস্তে সে বলে, 'খয়বার গাজী হামাক ঘরত তুল্যা বন্দুক বার করবো। দোনলা, একনলা, আইফেল, পিস্তল—ব্যামাক কয়টা তাঁই শান দিয়া থুছে, হামাগোরে উপরে একচোট নিবো। ঐ খুনীর সর্দারের কাছ যায় কোন শালা? হামি অর ভাত খাই, না উই হামাক জর্ম দিছে? অর কাছে হামার কিসের ঠ্যাকা?'

জালাল মাস্টার রাগ করে, 'শালা মূর্খ কোথাকার! গণ্ডমূর্খ! অশিক্ষিত ভূত! কুবাক্য না কলে শালার মুখ থ্যাকা বায়ু নির্গত হয় না!'

নাদুর সেই ঔদাসীন্য কেটে গেছে, মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে ছেলের কাছে যায়, চিৎকার করে বলে, 'আজ তোরই একদিন, কি হামারই একদিন! হামি নিজে তোক জবো করমু। মুন্সি লাগবো না, আল্লাহু আকবার কয়া তোর গলাত ছুরি দিমু!' একটু হাঁপাবার পর ফের শক্তিসঞ্চয় করে সে চূড়ান্ত সংকল্প ঘোষণা করে, 'তোক জবো না কর্যা আজ হামি মুখোত ভাত তুলমু না!'

চেংটু জিগ্যেস করে, 'ভাত তোমার ঘরোতে উথলাচ্ছে? হামাক জবো করলে মিয়ারা তোমাক ভাগের ধান বেশি দিবো?' আনোয়ারের পরিবারের প্রতি কটাক্ষ করায় নাদুর পক্ষে রাগ সামলানো আর সম্ভব হয় না। লাফিয়ে এসে ছেলের ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি ধরে ধরে ঝাঁকায়। তার নিজের রুক্ষ দাড়ি, বড়ো মোটা নাক ও ভোঁতা লাল চোখজোড়ায় ছোটোবড়ো ঢেউ উঠতে থাকে। চেংটু কিছুক্ষণ সহ্য করে, তারপর সামান্য একটু চেষ্টাতেই বাপের মুঠি থেকে নিজের কেশরাশি মুক্ত করে। মাথা ঝাঁকিয়ে চুল পেছনে ফেলে বাপকে সে ধমক দেয়, 'অতো নাফ পাড়ো কিসক? পিঠত বিষ সুলক্যা উঠবো না? ঘরোত তোমার মালিস করার ত্যাল আছে এক ছটাক? অতো নাফ পাড়ো কিসক?'

চেংটুর এই উক্তিতে তার বাবার পিঠের ডানদিককার ব্যাথার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকদিনের ব্যথা। বহুকাল আগে গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিতে গিয়ে ধোঁয়া না দিয়ে নাদু ঘুমিয়ে পড়ায় আনোয়ারের দাদাজীর খুব রাগ হয়েছিলো। সে কি আজকের কথা? নাদুর বয়স তখন ১০/১১ বছর, মিয়াদের বাড়িতে ফাই ফরমাস খাটে, কিষানদের পান্তা নিয়ে ভাত নিয়ে জমিতে যায়, সকালবেলা গোয়াল থেকে গোরু-বাছুর বার করে, সন্ধ্যাবেলা গোয়ালঘরে ধোঁয়া দেয়। তো সেদিন বড়োমিয়ার বড়ো মেয়ের বিয়ে কি পানচিনির উৎসব। সারাটা দিন সবারই খুব ছোটাছুটির মধ্যে কাটে। সন্ধ্যার পর গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিতে গেছে নাদু। গোয়ালঘরের পাশেই একটা পীতরাজ গাছের কাটা গুঁড়ি। আগুন-ধূপের মালসা পাশে রেখে ঐ কাঠের গুঁড়ির পাশে শুয়ে নাদু ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ সময় ওখানে বড়োমিয়ার যাওয়ার কথা নয়। কেন গিয়েছিলো আল্লাই জানে! মনে হয় মেয়ের জন্যে আড়ালে একটু চোখের

পানি ফেলার জন্যে জায়গাটা নিরাপদ ছিলো। গোয়ালঘরে মশার কামড়ে ছটফট-করা গোরুদের দেখে বড়োমিয়া আর সহ্য করতে পারেনি। তার কাঠের খড়ম-পরা পা দিয়ে নাদুর পিঠে বড়োমিয়া এ্যায়সা ১লাথি দিয়েছিলো যে, মাস দুয়েক সে আর পিঠ তুলতে পারেনি। আজ বুড়ো হয়ে মরতে বসেছে নাদু, তার সেই ব্যথা আজো তাকে ছেড়ে গেলো না। একটু আঘাত পেলে, পূর্ণিমায় অমাবস্যায়, অসময়ে বৃষ্টি হলে কি শীত পড়লে ব্যথাটা উসকে ওঠে। এ ঘটনা এখানকার প্রায় সবাই জানে। বড়োমিয়া নিজেও ২/১ বার বলেছে। আর নাদুর খুব প্রিয় প্রসঙ্গের মধ্যে এটি ১টি। ঘটনাটি বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলতো, 'নিন্দের মধ্যে খাব দেখব্যা নাগছি! কি? না, পাতারের মদ্যে গোরু খুঁজ্যা বেড়াই। ধলা বকনাখান গো, বড়োমিয়ার খুব হাউসের বকনা, সেই বকনাক আর পাই না। ঘড়ি বাদ দেখি, পাতারের উত্তরে মস্ত বড়ো পিপুল গাছটার তলাত খাড়া হয়া আছি,—ঝড় নাই, পানি নাই, মোটা একখান পিপুলের ডাল ভ্যাঙা পড়লো হামার পিঠোত। ইটা কি বাবা? চ্যাতন পায়া দেখি কোটে পাতার? কোটে পিপুলের ডাল? বড়োমিয়ার বোলআলা খড়মখান পিঠের উপরে।' ঘটনাটা সে এমনভাবে বলতো যেন ঘুম ভাঙার পরেও সে স্বপ্নের মধ্যেই ছিলো। এই ব্যথাটিকে নাদু কতোদিন থেকে পুষে আসছে। মিছে কথা বলে লাভ কি? ব্যথাটাকে মূলধন করে বড়োমিয়ার করুণা সে কম আদায় করেনি। এই ব্যথা সারাবার জন্যে বড়োমিয়ার খরচ হয়েছে মেলা, কিন্তু বড়ো কথা হলো এই যে, ব্যথাটা ছিলো বড়োমিয়া ও তার মধ্যেকার সম্পর্কের প্রকাশ। যখনি তার ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন আসতো কিংবা ভিটা থেকে উচ্ছেদের সম্ভাবনা দ্যাখ্যা দিতো কি তার কাছ থেকে বর্গাজমি ছাড়িয়ে নেওয়ার কথা উঠতো নাদু তখন উসকে তুলতো এই ব্যথাটিকে। বড়োমিয়া আস্তে আস্তে বলতো, 'থাক! কতোদিনের চাকর! অর বাপও কাম করা্যা গেছে। থাক!' আহা, নাদুর দেহে বড়োমিয়ার এই চিরস্থায়ী স্পর্শ কি যেন তেন সম্পর্ক হলো? বড়োমিয়া মারা গেলে লাশের পাশে বসে নাদু কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করছিলো, 'তোমার নাথি হামার পিঠোতেই থাকলো গো বড়োমিয়া, তুমি কেটে চল্যা গেলা!'

কিন্তু এই লাথির মর্যাদা চেংটু বুঝবে কোত্থেকে? বাপের হাতের রেঞ্জের বাইরে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'পিঠ তো ভাঙছে একজন, এখন বাকি আছে বুকখান। তুমি গাজীগোরে ঘরত যাও, খয়বার মিয়ার পাও আছে দুইখান, বুকখানা প্যাতা দিও, খাম করা্যা দিবো!' বলতে বলতে সে চারদিকে একবার তাকায়, তারপর অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় বলে, 'নাথিগুড়ি যা খাবার চাও তাড়াতাড়ি খায়া আসো। কুনদিন যায়া শুনব্যা ব্যাটার দুটা ঠ্যাংই ভ্যাঙা দিছে, তখন নাথি দিবো কি দিয়া?'

আশেপাশের সবাই একেবারে চুপ। জালাল মাস্টার এই নীরবতা ভাঙে, 'চেংটু, মুখ সামলা। বিবেচনা করা্যা কথা কোস! তোর ভাগ্যে কি যে আছে চিন্তা করলেও ভয় লাগে।'

এর মধ্যে লোকও জমে গেছে। বেশির ভাগ চাষাভুষা মানুষ, মিয়াবাড়ির আলুর জমির কাজ সেরে কিংবা ধান মাড়াইয়ের কাজ করতে এসে জমায়েত হয়েছে। মিয়াবাড়ির ছেলে আছে কয়েকজন। এদের কেউ কেউ স্কুলে পড়ে। চাষা বা ভদ্রলোক সবাই চুপ করে জালাল মাস্টারের সতর্কবাণী শোনে। কাঁঠালতলার পশ্চিমে ভাঙা দালানের স্তূপে বসেছে কয়েকজন। শীতের বেলা দেখতে দেখতে গুটিয়ে যাচ্ছে। একটু দূরের শিমুলগাছের ওপর থেকে ছাইরঙের ১টি ডানা যেন গাঢ় হতে হতে এগিয়ে আসছে এদিকে। দালানের ভাঙা স্তূপ রঙ পাল্টায়।

চেংটু জবাব দেয়, 'মুখ সামলাবার হুকুম দিবেন আপনে কয়জনোক? হামি একলা মুখ সামলালে কাম হবো? ডাকাত-মারা চর তাঁই ভর্‌যা ফালাছে গোরু দিয়্যা, এতো গোরু গাজীর ব্যাটা পালো কোটে?'

ছাইরঙ আরো গাঢ় হয়। মস্ত জোড়াদিঘির ওপারে মরিচের জমি, ছাইরঙের পাতলা অন্ধকারে পাকা মরিচের টকটকে লাল রঙ, হঠাৎ করে তাকালে, ছাইয়ের ভেতরকার আগুনের মতো ঝাপ্টা মারে। এদিকে ছেলের কথাবার্তা শুনে নাদু মাথায় হাত দেয়। অনেকক্ষণ পর স্বগতোক্তি করে, উগল্যান কথা কওয়া হয় না বাপ, মুখখান তোর বড়ো দুষমন!' ছেলেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সে চেষ্টা করে গাজীদের দোষক্ষালণের, 'গাজীগোরে বাথান কি আজকার? কতো ছোটো থাকতে হামরাই দেখছি, যমুনার এই চর, ঐ চর ব্যামাকই গাজীগোরে দখলে। কতো বাথান, কতো গোরু, কতো মোষ দেখছি! মাটির ঠিলা ভর্‌যা দুধ আসছে। হামরাই তো দেখছি।'

তার সমর্থনে আরেকজন কিষান বলে, 'গাজীগোরে বাথান ভরা গোরু মোষ কি গুন্যা শ্যাষ করা গেছে?'

কিন্তু চেংটু বলে, 'উগল্যান কথা থোও গো! আগে কার কি আছিলো হামরা কবার পারি না। এখন ডাকাত-মারা চরত যায়া দ্যাখো, ব্যামাক এই অঞ্চলের গোরু! গেরস্থের গোরু-বাছুর সব আটকা রাখছে। চালান হয় পুবে, যমুনার ঐ পার। মাদারগঞ্জের হাটোত বেচা হয়! ডাকাত-মারা চর দখল করছে কেডা, তোমরা জানো না?'

কথা বলতে বলতে চেংটু কখন যেন উঠে পড়েছে দালানের ভাঙা স্তূপে। আনোয়ার এবার ভালো করে তার দিকে দেখলো। আনোয়ারের দাদাজী মারা যাওয়ার ৩ বছর আগে এই বৈঠকখানা দালানে চিড় ধরে, নতুন করে তৈরি করার জন্য গোটা দালান ভেঙে ফেলা হয়। সেই বছর তার মৃত্যু হলো। এরপর আর কিছু করা হয়নি। চেংটু সেই স্তূপের উঁচু চূড়ায় দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসেছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে তার মুখ অস্পষ্ট।

১৬

'বুড়ো হয়া গেলেন, তাও আপনের হুঁশ হলো না! জামাই মানুষ, জামায়ের লাকান থাকেন। কোটে কেটা মার খালো, কোটে কেটা কার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে—সোগলির প্যাগনা কি আপনার ঘাড়তই তোলা লাগবো? তোমাক কই বাপু, সারাটা জেবন মানুষটা হামাক জ্বল্যা পুড়্যা কিছু থুলো না!'

হ্যারিকেনের লালচে হলদে আলোয় কৈ মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে আনোয়ার জালাল মাস্টারের বৌয়ের সংলাপ শোনে। জালাল মাস্টারকেও শুনতে হয়। তার স্ত্রীর বাক্যে সম্বোধন করা হয়েছে ২জনকেই। ভাত খেতে অনোয়ারের ভালোই লাগছে। লতায় পাতায়

জড়ানো দূর সম্পর্কের এই ফুফুটা তার রাঁধে ভালো। তার কথা শুনতে শুনতে মনে হয় অন্যের জিভে সুখ দেওয়ার ব্যবস্থা করে নিজের জিভের সুখ ফুফু উসুল করে অন্যভাবে। জিভটা তার ভয়ানক সচল, ঘণ্টা খানেক হলো ফুফু তার সামনে আসছে, যাচ্ছে,—এর মধ্যে একনাগাড়ে ৫ মিনিটও বিরতি দেয়নি। আবার জালাউদ্দিনকেও আনোয়ার কখনো এতোটা বাকবিমুখ দ্যাখেনি। স্বামীর এই নীরবতায় জালালউদ্দিনের স্ত্রীর উৎসাহ মাঝে মাঝে বাড়ে, তখন তার কথা বেরিয়ে আসে তীব্র বেগে। আবার স্বামীর ঔদাসীন্যে মাঝে মাঝে তার রাগ হয়, তাতেও কথার বেগ বাড়ে।

'খয়বার গাজীর সাথে আপনে সামাল দিব্যার পারবেন? এ্যাঁ, তুমিই কও তো বাবা? তাঁই বলে শয়ে শয়ে বিঘা জমির মালিক, যমুনার চর যেটি যা উঠবো ব্যামাক নিবো তাঁই। তাঁক আঁটো করবার চান আপনে? কোটে বলে মহারাজ আর কোটে কলাগাছ। আপনার সাহসটা এ্যানা বেশি, বুদ্ধিটা যদি তার এক আনাও থাকলোনি তো—।'

জালাল মাস্টার আস্তে করে বলে, 'খয়বার গাজীক আঁটো করে কেটা? সকল গ্রামবাসীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করার জন্যে তিনি অস্থির! তার সাথে আমার কিসের কলহ? কিসের বিবাদ?'

'বিবাদ আপনে পাকান! আসমানের মধ্যে আপনে ঢেঁকির পাড় দিবার চান।—বাবা, মাছ আরেকটা দেই?' আনোয়ারের পাতে আরেকটা পাবদা মাছ দিয়ে ফুফু তার অসমাপ্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ করার উদ্যোগ নেয়, 'এই চেংটু ছোঁড়া গোলামের পয়দা গোলাম, এটা অতো লাফ পাড়ে কিসক? খয়বার গাজী এ্যার পিছে লাগছে, এটাক শ্যাষ না কর্যা তাঁই ছাড়বো? গাজীর ব্যাটার ভয়ে তার বাপ, তার জন্মদাতা বাপ তাক জায়গা দেয় না, সেই চেংটুক আপনে ঘরত তোলেন! এই সোম্বাদ পালে খয়বার গাজী আপনার কি দশা করবো তা জানেন?'

জালালউদ্দিন একটু হাসি মুখ করে, 'মোসাম্মৎ রহিমা খাতুন, তোমার প্রথম কর্তব্য নিজের অজ্ঞতা দূর করা। না দেখ্যা, না শুন্যা, খালি আন্দাজে কথাবার্তা কলে বিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয় না।'

নাম ধরে ডাকায় রহিমা খাতুন লজ্জামিশ্রিত সুখে ও রাগে স্বামীকে ধমকায়, 'বুড়া হলেন আপনার আক্কেল হলো না। চ্যাংড়া প্যাংড়ার সামনে কি কয় না কয়—!' তার কথা আর শেষ হয় না, আঠালো শব্দে এই নিঃসন্তান প্রৌঢ়ার কণ্ঠ জড়িয়ে আসে, পান-খাওয়া ঠোঁটের কালচে খয়েরি কোণ দুটো বাঁকা হয়, বাঁকা হয়েই থাকে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে জালাল মাস্টার, 'নাদু আমাকে খুব ধরছিলো। এবার বর্ষা খুব প্রবল হলো তো, নাদুর একটা ঘর হেল্যা গেছে। গত বছর বড়ো ব্যাটার বিবাহ দিলো, ঘরের এক কোণে কলাপাতার বেড়া তুল্যা পুত্র পুত্রবধূ থাকে, আর বাকি কয় হাত জায়গাত থাকে নাদু, নাদুর পরিবার দুটা ব্যাটা, ছোটো বেটিও থাকে। নাদু কয়, সরকার, আপনার গোয়াল তো খালি থাকে, বকনাটা মরার পর আর গোরু কিনলেন না, এঁড়াটাও বেচলেন, গোয়াল সাফ সুতরা কর্যা নিয়া চেংটু কয়টা দিন থাকবো। ধান মাড়াইয়ের কামটা হলেই মিয়াবড়িত থ্যাকা খ্যাড় নিয়া নতুন ঘর তুলমু। এই কয়টা দিন চেংটুক এ্যানা জায়গা দেন।—তা কি করি! কল্যাম, থাকো বাপু! বিপদে আপদে আশ্রয় দান মানুষের ধর্ম। না কি কও আনোয়ার?'

এই বিবৃতিতে নিরঙ্কুশ আস্থা স্থাপন করা রহিমা খাতুনের পক্ষে মুশকিল। অবিশ্বাসে তার স্বর মৃদু হয়, 'বর্ষা গেছে চার মাস হলো, এই কয়টা মাস তারা থাকবার পারলো; নাদুর

বড়োব্যাটা বিয়া করছে এক বছরের উপরে, মরা একটা বিটিও হলো তার; আর এখন জায়গা নাজাই পড়ে চেংটুর, না?'

জালাল মাস্টার এখন নীরব। দুধ দিয়ে কলা দিয়ে গুড় দিয়ে ভাত মাখার কাজে সে একাগ্রচিত্ত। রহিমা খাতুনের অবিশ্বাসী কণ্ঠ ক্রমে চড়া হয়। চেংটুকে রাত্রিবেলা থাকতে দিয়েছে কেন সে কি বুঝতে পারে না? খয়বার গাজীর লোক তাকে যে কোনো সময়ে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে—এ কথাটা কে না বোঝে? নেহায়েৎ মিয়াদের জমিতে থাকে, তাই দিনে দুপুরে তাকে তুলে নেওয়াটা দেখতে খারাপ লাগে, নইলে খয়বার গাজীর কাছে এটা কি কোনো শক্ত কাজ? খয়বার গাজীকে সে তার স্বামীর চেয়ে অনেক ভালোভাবে চেনে। তার আপন খালুর চাচাতো ভগ্নীপতির মামাতো বোনের শ্বশুরবাড়ির দিক থেকে খয়বার কি তার মামা হয় না? খয়বার মামুর সম্পত্তির কথা, প্রতাপের কথা তারা শুনে আসছে জন্মের পর থেকে। তার সঙ্গে লাগতে যায় কোথাকার গোলামের বাচ্চা গোলাম চেংটু পরামানিক। আবার সেই ছোঁড়ার সর্দার হয়েছে জালাল মাস্টার। চেংটুর শয়তানিটা তার চোখে পড়ে না? তার মামার ভাইপো, সেও তো তার মামাতো ভাই হলো, তাকে কুকুর লেলিয়ে দেয় যে শয়তান সে কি-না নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন করতে এসেছে তারই বাড়িতে? স্বামীর জন্য পান সাজতে সাজতে রহিমা খাতুন বিড়বিড় করে, 'খয়বার মিয়া হাজার হলেও একজন মানী মানুষ। আপনে যে এতোদিন মাস্টারি করলেন সেই ইস্কুলের জমি দান করছিলো কেটা? খয়বার গাজীর বাপ না? খয়বার মিয়ার বাপ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলো পুরা তিরিশ বছর। তাঁই নিজেও চেয়ারম্যানগিরি করছে দশ বছর; চেংটু লাগে তার সাথে?'

জালাল মাস্টার বলে, 'আরে মানী মানুষ, ভালো বংশের সন্তান, ঐ কারণেই মিটমাট কর্‌যা ফালান দরকার। বোঝো না, গাঁয়ের চাষাভুষারা কেমন বেয়াদব হয়া উঠতিছে। চাষার রাগ, জাহেল মানুষের রাগ হলে কি হয় কেউ কবার পারে? তখন তোমার মামুই বেইজ্জত হবো! হবো না?'

'হলে হোক!' রহিমা খাতুন ভাত খাবার থালা বাসন তোলে, তক্তপোষে বিছানা মাদুর, দস্তরখান তুলে ঝাড়ে আর বলে, 'তাঁই মানুষ হলো একখান বদের হাড়ডি! খয়বার গাজীক আমি চিনি না? আত্মীয় হলে কি হয়, হক কথা কতে দোষ কি? তাঁই কতো মানষের সর্বনাশ করছে তার ল্যাখাজোকা নাই। কতো মানুষ তাক শাপমণ্যি দিছে! এই অঞ্চলের গরিব মানষের গোরু তাঁই সব নিয়া রাখছে চরের মধ্যে। এই মানুষের কিছু হলে আপনের কি?' রহিমা খাতুনের এই পক্ষ পরিবর্তনে আনোয়ার হাঁ হয়ে যায়। জালাল মাস্টার বলে, 'খয়বার মিয়া অন্যায় যদি কর্‌যা থাকে তো তাক ভালো কর্‌যা বুঝায়া কলেই তাঁই বুঝবো। মানী মানুষটার বেইজ্জত করা কি সৎ কাম হবো?'

'বেইজ্জত কন কি?' রহিমা খ্যাঁক করে ওঠে, 'মানষের সাথে তাঁই যা ব্যবহার করতিছে, সুযোগ পালে মানষে তাক পিস্যা খাবো, ছেঁচ্যা খাবো। কল্যাম, এই কথাটা কল্যাম। দ্যাখেন, ঠিক হয় নাকি দ্যাখেন।'

'উত্তেজিত হও কিসক? খয়বার মিয়া জেদি মানুষ। বড়োমানষের ব্যাটা, বড়োমানষের নাতি, শৈশবকাল থ্যাকা যা কামনা করছে তাই তার হাতোত আসছে। জেদী হবো না? তাক সৎ পরামর্শ দিবার মতো মানুষের বড়ো অভাব!'

'আপনের পরামর্শ তাঁই নিবো? আপনাক দুইটা পয়সার দাম দেয়? তার মান-সম্মান-ইজ্জত নিয়া আপনের লাগে কিসক, কন?'

আনোয়ার জটিলতার মধ্যে পড়ে। জালাল মাস্টার খয়বার গাজীর মান-সম্মান নিয়ে এতো মাথা ঘামায় কেন? রহিমা খাতুন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'বাবা রাত হছে, তোমায় চাচা চাচী আবার অস্থির হয়া পড়বো। এই মানষের পাল্লায় পড়লে রাত ভর খালি গপ্পোই করবো!'

আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। বারান্দা থেকে নিচে নামতেই মনে হলো যেন সর-পড়া পুকুরে লাফ দেওয়া হলো। জালাল মাস্টার বৌকে ডাকে, 'ক্যাগো, দুয়ার দাও। একটু আগায়া দিয়া আসি!'

'না না, আপনি যান। আমি একাই যেতে পারবো।' আনোয়ার ভদ্রতা করে বলে বটে কিন্তু বাইরে বেশ অন্ধকার। চাঁদ উঠেই ডুবে গেছে, তারার আলো ততো স্পষ্ট নয় বলে উঠোনের শূন্যতা তবু একটু সহনীয়। চাঁদের আলো থাকলে এই উঠান থেকে শুরু করে সামনের শূন্য ধানজমি পর্যন্ত খাঁ খাঁ করতো। অন্ধকারের জন্য ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে না, কিন্তু আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত বিপুল জায়গা জুড়ে ঘোরতর অনিশ্চয়তা।

বারান্দার ওপর থেকে রহিমা খাতুন বলে, 'কিষানপাট কেউ নাই? নিওড়ের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করা্যা অ্যাসা আপনে দম নিবার পারবেন? তখন বুকত ত্যাল মালিশ করবো কেটা? তামামটা দিন হামি চোকির সাথে পিঠ ঠেকাবার পারি নাই, আবার রাত ভর্যা আপনের খেদমত করা নাগবো? হামার নিন্দা পাড়া নাগে না?'

আনোয়ার বিব্রত হয়, 'আপনার শরীর খারাপ, আপনি বরং শুয়ে পড়েন।' এই সময় অন্ধকারে খড়ের গাদার আড়াল থেকে শোনা যায়, 'আপনে ঘরত থাকেন, হামি যাই।'

'কেটা? কথা কয় কেটা?' রহিমা খাতুন চমকে ওঠে, 'কেটা গো?'

'হামি চাচী!' গায়ে কাঁথা-জড়ানো চেংটু এগিয়ে আসে।

'তুই!'

'হু!' আনোয়ারকে দেখিয়ে চেংটু বলে, 'তাঁই একলা যাবো, তাই উঠ্যা আসলাম।'

চেংটুর কথায় জালালউদ্দিন হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'তুই যাবু? তোর প্যাট কানা কর‍্যা দিবো না? তোর সাহস বেশি হছে, না?'

রহিমা খাতুন শান্ত গলায় হুকুম দেয়, 'চেংটুই যা। চ্যাংড়াক ঘরোত দিয়া আয়। দেরি করিস না বাবা!'

রাত্রি ১০টায় মনে হচ্ছে গভীর রাত্রি। জালাল মাস্টারের বাড়ি থেকে ওদের বাড়ি যেতে ছোটোখাটো একটা গ্রাম পেরোতে হয়। এই গোটা গ্রাম জুড়ে ওদের আত্মীয়স্বজন, ওদেরই জ্ঞাতিগুষ্টি। বাড়িঘর সব হাতের ডানদিকে। বেশির ভাগই টিনের ঘর, মাঝে মাঝে একতলা দালান। কারো কারো বৈঠকখানায় খড়ের পুরু ছাউনি। তারার খুব আবছা আলোয় রাস্তা কোথাও চওড়া হয়ে যায়, কোথাও গাছপালার ছায়া পড়ায় সঙ্কীর্ণ হতে হতে পরিণত হয়েছে সরু রেখায়। মাঝে মাঝে কারো বাঁশঝাড়ের কয়েকটা বাঁশ নুয়ে পড়ায় এককেটা তোরণের মতো হয়েছে। বাঁদিকের জমির কোথাও কোথাও ধান কাটা হয়ে গেছে, সেখানে কেবল

কুয়াশা। কোনো কোনো জমিতে মরিচ গাছ। ডানদিকের উঠানগুলোতে লাল মরিচ বিছানো, টিনের ছাদে ছাদে পাকা মরিচের লাল রঙ, লাল রঙের বিছানা। অন্ধকারেও লাল রঙ একটু আলাদা। অন্ধকারের কালো রঙ ও মরিচের লাল রঙ ছাপিয়ে ওঠে ভয়াবহ নীরবতা, এই গ্রামে কি ঝিঁঝি পোকাও ডাকে না? চেংটু হেঁটে যাচ্ছে সামনে, গায়ে তার টুটাফাটা কাঁথা, এই কাঁথার নিচে একটুও না কেঁপে কি করে যে শীত ঠেকায় সে-ই জানে। এই সব কাঁথায় দুর্গন্ধের আর শেষ থাকে না। নিজের নাকটাকে আনোয়ার এখন পর্যন্ত ঠিক আয়ত্তে আনতে পারেনি, ইচ্ছা করেই তাই সে একটু তফাতে হাঁটে। কোনো কোনো বাড়ির উঠান থেকে নতুন সেদ্ধ-করা ধানের গন্ধ পাকা মরিচ বা অন্য কেনো কিছুর গন্ধের সঙ্গে মিশে এদিক ওদিক ভাসে। এই শীত, এই বিচিত্র গন্ধ, এই আবছা আলো—সব কিছুই নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা যেতো। কিন্তু চেংটুর সাঙ্ঘাতিক নীরবতাকে জেদ বলে মনে হওয়ায় আনোয়ারের সারা শরীরে তেতো স্বাদ। তার রাগ হয়: চেংটুক এই জেদ কি শোষিত মানুষের ডিফেন্স? আনোয়ারকে সে তার প্রতিপক্ষের লোক ভাবে নাকি? কেন? আদর্শ কিংবা রাজনীতি যদি ছেড়েও দেওয়া যায়,—সবাই শেষ পর্যন্ত এসব বহন করতে পারে না,—কিন্তু আনোয়ারের রুচির ওপর তো তার আস্থা থাকা উচিত! খয়বার গাজীর মতো আনোয়ার কি কখনো কোনো নিঃস্ব মানুষকে সর্বস্বান্ত করার ফন্দি আঁটতে পারে? মিয়াবাড়ির ছেলে বলে সে কি চেংটুর কাছে সন্দেহজনক চরিত্র? তাহলে মাস্টার? জালাল মাস্টারের কাছে আশ্রয় চাইতে চেংটুর ভয় হয় না। জালালউদ্দিন কি খয়বার গাজীর ইজ্জতের বাহার ঠিক রাখার জন্য উদগ্রীব নয়? চরম সঙ্কটের সময় সে কি চেংটুর পক্ষে থাকবে? তবে? রাজনৈতিক শিক্ষা নাই বলে চাষা ও দিনমজুর মানুষ চিনতে ভুল করে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আনোয়ারের ক্ষোভ দূর করতে পারে না। ক্ষুব্ধ শরীরে হাঁটতে হাঁটতে সে শোনে, 'কেটা যায়?'

ডানদিকে জুম্মার ঘরের পাকা দালান। দালানের উঁচু বারান্দায় বসে-থাকা ১টি মানুষের অস্পষ্ট কাঠামো। কয়েক পলক পর বোঝা যায় লোকটি অজু করছে। বদনা হাতে রেখে লোকটি ফের জিগ্যেস করে, 'কেটা যায় গো!' চেংটু জবাব দেয়, 'হামরা হুজুর!'

'হামরা কারা?' লোকটির মোটা স্বর একটু সন্দেহপ্রবণও বটে, 'নাদুর ব্যাটা না? কোটে যাস?' চেংটু থামে না, এমন কি তার পদক্ষেপও ধীরগতি হয় না।

বদনা হাতে লোকটি জানতে চায়, 'সাথে কেটা রে?'

দাঁড়িয়ে আনোয়ার জবাব দেয়, 'জী, আমার নাম আনোয়ার।'

চেংটু চাপা গলায় বলে, 'পাও চালান ভাইজান।' চেঁচিয়ে আনোয়ারের পরিচয় দেয়, 'বড়োমিয়ার নাতি।'

লোকটি শব্দ করে কুলকুচো করে। এর মধ্যে ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে আনোয়ার বলে, 'কে চেংটু?'

'কারী সায়েব।'

'কে?'

'কারী সায়েব। জুম্মাঘরেত থাকে। কোরান শরীফ পড়ে। এক বছরের উপরে মোয়াজ্জিন গেছে বাড়িত, কারী সায়েব আজানও দেয়।' কয়েক পা হেঁটে চেংটু বলে, 'এমনি মানুষ ভালো। কিন্তু দোষের মধ্যে ঐ একটাই।' বলতে বলতে সে হাসে, 'খালি কথা কয়। হয় কোরান শরীফ পড়বো, না হলে কথা কবো। মুখ বন্ধ হয় না। একবার টাউনেত যাবো, কথা

কতে কতে মটর চল্যা গেছে, দিশা পায় নাই। বাকসো সামান আছিলো মটরের মদ্যে, আর পায় নাই।' চেংটু বেশ জোরে হাসে, আনোয়ারও হাসে। একটু বেশিই হাসে।

সেই হাসিটা ঠোঁটে সেঁটে রেখে বাঁ দিকে তাকালে দ্যাখা যায় বেশ বড়ো একটা মজা পুকুর। পুকুরটা আনোয়ার ভালো করে চেনে, এর নাম বৈরাগীর দিঘি। বৈরাগীর দিঘির পর বিঘা তিনেক চাষের জমি, তারপর অন্ধকারে সুযোগ পেয়ে এই জমি যেন হঠাৎ করে ফেঁপে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। না। ভুলটা আনোয়ারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভাঙে। অন্ধকার রাত্রে বৈরাগীর ভিটার বটগাছের অদ্ভুত জবুথবু চেহারা হয়েছে! দিনের বেলা এই গাছের কি গম্ভীর মূর্তি! চারদিকে ছড়ানো শিকড়বাকড়ের মধ্যে তার বিস্তৃত ও বর্ধমান রূপ দেখে সবাই মোহিত ও ভীত হয়ে পড়ে। পুরো সাড়ে তিন বিঘা জমি গ্রাস করার পরও তার থামবার লক্ষণ নাই, সে কেবল বেড়েই চলেছে। আরো তিন বিঘা জমি পেরিয়ে এই দিঘি পর্যন্ত পৌঁছলে হয়তো তার সম্প্রসারণের পিপাসা মিটবে। জমাট-বাঁধা অন্ধকার আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লে আনোয়ারের চোখে বটগাছের চেহারা নির্দিষ্ট আকার পায়। সমস্ত শরীরটাকে গুটিয়ে ফেলে বটগাছ যেন ঘুমাচ্ছে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের ওঠানামা তার শরীরে স্পষ্ট। প্রাচীন বটবৃক্ষের এই বিশ্রামের দৃশ্যে অভিভূত আনোয়ার একটু পিছিয়ে পড়েছিলো। চেংটু বলে, 'পাও চালান।' পা চালিয়ে চেংটুর পাশে এসে পড়লে সে জিগ্যেস করে, 'আপনে ঢাকাত যাবেন কোন দিন?'

'ঠিক নাই। কয়েকদিন থাকবো, বেশ কয়েকদিন। কেন?'

'না, এমনি!'

কিছুক্ষণ পর চেংটু ফের জানতে চায়, 'জালাল মিয়া কয় আপনে বলে সংগ্রামের একজন নেতা? ইস্কুল কলেজের চ্যাংড়া প্যাংড়া আপনাক খুব মানে, না? মিছিল বার করলেই তো পুলিশ গুলি করে। ছাত্রগোরে ভয়ডর নাই, না?'

এই চাষা ছেলেটির কাছে তাকে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে জালাল মাস্টারের ওপর তার রাগ হয়। জালাল মাস্টার হয়তো তাকে ভালোই বাসে। জালাল মাস্টার আবার খয়বার গাজীর জন্যে তাকে ব্যবহার করছে না তো? আসল কথাটা বলা দরকার। কিন্তু কি করে বলবে? সে জবাব দেয়, 'রাজনীতি তো করিই। কিন্তু নেতাগোছের কেউ নই। নেতা হওয়ার জন্য আমরা রাজনীতি করি না।'

'তাহলে? কিসের জন্যে করেন?' চেংটুর এই প্রশ্নে কোনো শ্লেষ নাই, তার কথার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় যে, নেতৃত্ব অর্জন ছাড়া রাজনীতিতে তৎপর লোকজনের আর কি লক্ষ্য থাকতে পারে সে জানে না। এই লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করার মধ্যে চেংটু দোষেরও কিছু দেখতে পায় না।

আনোয়ার বলে, 'রাজনীতি ছাড়া মানুষ ভালোভাবে বাঁচতে পারে না। রাজনীতি ছাড়া মানুষ ঐক্যবদ্ধ, মানে একতাবদ্ধ, মানে একজোট হবে কি করে? কিসের জোরে? একজোট না হলে ধরো খয়বার গাজীর মতো লোকদের তোমরা ঠেকাতে পারবে?'—খুব চেষ্টা করেও কথাগুলো এর চেয়ে সহজ করে বলা গেলো না। আর কিভাবে কথাটা পরিষ্কার করা যায় আনোয়ার তাই ভাবে। কিন্তু তার কথার মাঝখানে চেংটু বলে, 'আলিবক্স ভাই কয়, আর বেশিদিন লাগবো না। হামাগোরে গাঁওত হামরা বিচার বসামু!'

'আলিবক্স?'

'চেনেন না, না? সিন্দুরিয়া চরের। শঙ্করপুর চেনেন তো? শঙ্করপুর ভাঙলে পরে পুবে সিন্দুরিয়া চরে উঠছে। মাদারগঞ্জ কলেজত পড়ে। সিন্দুরিয়াত আদালত বসছিলো, মেলা কিষানপাট জড়ো কর্যা ডাকাত-মারা চরত গেছিলো। যাগোরে গোরু চুরি হছিলো, সোগলিক নিয়া গেছিলো, সোগলি ঠিক করছিলো খয়বার গাজীর বাগান থ্যাকা গোরু নিয়া গোরুর মালিকগোরে ফেরত দিবো।'

'পারেনি?'

'না। খয়বার গাজীর মানুষ মেলা, হাতিয়ারও মেলা। আলিবক্স ভাই কুলাবার পারে নাই, নাও নিয়া আবার সর্যা গেছে।' তবে চেংটু এতে হতাশ নয়। 'কয়বার ঠেকাবো কন? এই শালা খয়বার গাজী মানষের পয়দা না। কতো গরিব মানুষের উজিওজগার তাঁই বন্ধ কর্যা দিছে! গোরু হারালে চাষামানুষ কাম করবার পারে? হামরা অর বিচার করমু। অর ভাইয়ের ব্যাটা আফসার গাজী, মিয়াবাড়ির অশিদুল, ফকিরবাড়ির ফরিদ,—সোগলির বিচার হবো। আফসার শালা আছে খালি মাগীমানষের পাছাত, চাষাভূষার ঘরত এ্যানা সুন্দর মাগীমানুষ দেখলে তাঁই খালি ফাল পড়ে। আর শালা অশিদুল করে কি জানেন?—এক জমিত কাকো তাঁই দুই তিনবারের বেশি বর্গা করবার দিবো না! শালা এক জমি পাঁচজনের কাছে বর্গা দেয়, বর্গাদাররা কাইজা করে অশিদ মিয়া মজা মারে। তাঁই—।' চেংটু হঠাৎ থেমে যায়। তার কি মনে পড়ে গেছে যে, রশিদুল হক লোকটি আনোয়ারের বাপের চাচাতো ভাইও বটে? আরে বাবা, তাতে আনোয়ারের কি? রশীদ মিয়া পুরা টাউট, ঢাকায় গিয়ে আনোয়ারের মাকে পটিয়ে ১০০টা টাকা বাগিয়ে এনেছিলো, সেই ব্যথা আম্মা এখন পর্যন্ত ভুলতে পারেনি।

আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'কারা বিচার করবে?'

'হামরাই! হামি আলিবক্স ভাইয়েক কছি, বৈরাগীর ভিটার বটগাছের তলাত আদালত বসবো, বিচার হবো ওটি!'

আনোয়ার উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে, 'সত্যি?'

'হামি মিছা কথা কই না ভাইজান!' চেংটুর গলায় তলানি পড়ে। সে ফের চুপ করে যায়। আনোয়ারকে সে ঠিক বুঝতে পারে না কেন? নিজেকে ঠিকমতো প্রকাশ করার জন্যে আনোয়ার ছটফট করে, নানাভাবে সে শব্দ খোঁজে, বাক্য ঠিক করে, কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ তৈরী হতে পারে না। এইরকম ভাবতে ভাবতে একবার বলে, 'বিচার করাই দরকার! আমাদের দলের ছেলেরা, এইতো কাছেই, সিরাজগঞ্জ মহকুমা চেনো?—সিরাজগঞ্জের গ্রামে গণআদালত করেছে। কিন্তু এখানে তো আবার ভদ্রলোক, মানে জোতদার, মানে অবস্থাপন্ন লোক বেশি, এখানে গণআদালত করা কি সুবিধা হবে?'

'না, এটি বড়োলোক বেশি কৈ? এই কয়টা ঘরই আপনার চোখত পড়ছে? মাঠের ঐপারে তো সোগলি হামাগোরে চাষাভূষার গাঁও। ঐ যে বটগাছের ঐপারে জমি—।' বটগাছের মাথার দিকে তাকিয়ে চেংটু হঠাৎ নীরব হয় এবং থমকে দাঁড়ায়। আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'কি হলো?'

'চুপ করেন!'

চারদিকে ভয়াবহ নীরবতা। চেংটুর চোখ বটগাছের মাথার ওপর। সুতরাং সেদিকেই না তাকিয়ে আনোয়ারের উপায় নাই। সেখানে কি? কুয়াশা টাঙানো বটগাছ যেন সমস্ত প্রান্তর জুড়ে রাজত্ব করে। তার চোখের পলক পড়ে না। বটগাছের ঝাঁকড়া মাথায় চেংটু কি দেখছে?

টিনের কি খড়ের চাল ও উঠান থেকে পাকা মরিচের গন্ধ আসছিলো, সুযোগ পেয়ে তাও শালা উধাও। সেদ্ধ-করা ধানের সুবাসও কি হাওয়া হয়ে গেলো? কান দুটোও মনে হয় বটগাছ দ্যাখার কজে নিয়োজিত। এখন যাবতীয় আওয়াজ লুপ্ত। গাছ থেকে শিশিরবিন্দু পড়ার মৃদু, অতিমৃদু ধ্বনিটুকুও লুফে নেয় শীতের শুকনা মাটি। আনোয়ারের বুকে টিপটিপ আওয়াজ হয়, তাও তার সমস্ত বোধের বাইরেই থাকে। এইভাবে কতোক্ষণ কেটে গেছে আনোয়ার জানে না। হঠাৎ শুনলো, 'চলেন।'

কোনো কথা না বলে দুজনে চলতে শুরু করলে চেংটু বলে, 'উড়্যা গেলো, দেখলেন?'

'কি?'

'দেখলেন না? ঐ পুবকোণের মগডাল থ্যাকা একটা উড়াল দিলো, সোজা উত্তরের মুখে গেলো, দেখলেন না?'

'কি গেলো? কি?'

চেংটু চুপ করে থাকে, আনোয়ার অস্থির হয়ে ওঠে, 'কি?'

'আত্রে নাম নেওয়া হয় না, আত্রে-তেনাগোরে নাম নেওয়া মানা।'

আনোয়ারের সারা গা ছমছম করে উঠলো। চেংটুর পিঠে ডান হাত রেখে তার কাঁধা খামচে ধরে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে, 'জীন?'

চেংটু বলে, 'কল্যাম না? আতোত নাম নেওয়া হয় না।' হাঁটতে হাঁটতে আনোয়ারের মুখের দিকে তাকায়, 'ভয় পালেন?'

'না?' আনোয়ার একটু হাসার চেষ্টা করলে তার মুখের অসহায়ত্ব আরো প্রকট হয়, তবে অন্ধকারে তাও অদৃশ্যই থাকে। কিন্তু তার পিঠের ওপর আনোয়ারের হাত চেংটুকে সব বুঝিয়ে দেয়। চেংটু নরম করে বলে, 'ভয় করেন কিসক? কিছু কবো না। এটিকার পুরানা বাসেন্দা। কাকো কিছু কয় না।'

শুকনা কাঁটা-কাঁটা ঢোঁক গিলে আনোয়ার বলে, 'থাকলে তো বলবে!' অশরীরী জীবের অস্তিত্বের প্রতি আনোয়ারের এই অবিশ্বাস ঘোষণা এতো ক্ষীণ যে, প্রায় শোনাই যায় না। অথবা শুনতে পারলেও চেংটু পাত্তা দেয় না। খুব স্বাভাবিক গলায় সে বলে, 'অনেকদিনের বাসেন্দা। মুরুব্বিরা কয়, তার সবই ভালো, যতো কিছুই হোক এটিই থাকে। নড়ে না। খালি বিবাদ দেখলে তার গাও জ্বলে! বিবাদ তাঁই সহ্য করবার পারে না!'

'বিবাদ ?'

'হুঁ! বিবাদ! গাঁয়ের মদ্যে গোলমাল কি ঝগড়া-কাজিয়া, বিবাদ-বিসম্বাদ, লাঠালাঠি, মারামারির দিশা পালে উত্তরের মুখে তাঁই উড়াল দেয়!'

'উত্তরে?'

'হুঁ! ছোটো থাকতে দাদার কাছে শুনছি চান্দের পয়লা সাত দিনের মধ্যে বৈরাগীর ভিটার বটবিরিক্ষের এই পুরানা বাসেন্দা উত্তরের মুখে উড়াল দিলে গাঁয়ের মানুষ ভয়ে সিটকা নাগছে, বড়োলোকরা মিলাদ দিছে, শিরনি দিছে, মানত করছে। জুম্বার ঘরত নফল নামাজ পড়ছে।'

'এবার হবে না?'

আপনাগোরে বাড়িত একবার ডাকাত পড়ছিলো, আপনার দাদার আমলে। হুনছি তার সাতদিন আগে পুরানা বাসেন্দা এই জায়গা ছাড়া চল্যা গেছিলো।'

'তো এবার মিলাদ দেবে না? নফল নামাজ পড়বে না? আনোয়ার বেশ সহজ হয়ে আসছে, তার কথায় ভয়ের জায়গায় ঠাট্টার একটুখানি ঝাপ্টা লক্ষ করা যায়, 'মিলাদ না দিলে আবার ঝগড়া বিবাদ লাগতে পারে না?'

চেংটু বলে, 'কেউ দেখলে তো! দেখছে কেটা? আপনেও তো দেখলেন না?'

'তুমি দেখেছো। তুমি বললেই সবাই জানবে। কাল তুমি সবাইকে বলবে না?'

চেংটু হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'হামার গরজ?'

চেংটু ফের চুপ করে থাকে। ১টা ২টো ৩টে ৪টে ৫টা ৬টা ৭টা ৮টা কদম ফেলা হয়, ছেলেটা আর কথাই বলে না। এদিকে মানুষের কথা ছাড়া আনোয়ারের গতি নাই, ওপরে তাকাতে সে ইতস্তত করে: কি জানি মাথার ওপর বিশাল শূন্যতায় কেউ হয়তো দীর্ঘ অগ্নিময় উড়াল দিচ্ছে। সেই উড়ালের হিস্‌হিস্ ধ্বনি না শোনার জন্যে কানজোড়া তার বন্ধ রাখা দরকার। চেংটুটা দিব্যি সামনে সামনে হেঁটে চলেছে, এর পরেও তার পা টলে না। চেংটুর কথায় যা হয়নি, ওর নীরবতায় বটগাছের অশরীরী জীব প্রতি মুহূর্তে আকৃতি পাওয়ার পাঁয়তারা করে; তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অদৃশ্য বলে সেগুলোকে হাত পা মুণ্ডু বলে সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু চেংটুর এই নীরবতা অব্যাহত থাকলে আনোয়ারের সামনে সশরীরে আসতে জীনের আর কতোক্ষণ? আনোয়ারের রাগ হয়, অশিক্ষিত মূর্খ ছোকরা কুসংস্কারের ডিপো। কিন্তু বিভ্রম দ্যাখার জন্যে চেংটুর ওপর এই রাগ তেমন জমে না। বরং প্রতিটি নীরব পদক্ষেপে তার নিজেরই জীন দ্যাখার সম্ভাবনা বেড়ে চলে। তখন চেংটুর দ্যাখা এই বিভ্রম থেকে রেহাই পাবার জন্য শ্লেষখচিত কণ্ঠে আনোয়ার বলে, 'জীন উড়াল দিলো, সবাইকে খবর দিতে হবে না? ঝগড়া বিবাদ হলে সকলেরই বিপদ।'

'কিসক?' চেংটুর কথায় পাল্টা ক্রোধ। ঠাট্টাবিদ্রূপ বোঝা এই ইডিয়টটার সাধ্যের বাইরে। ঠাট্টার জবাবে রাগ না করে করবেটা কি? সে বলে, 'সোগলির বিপদ হবো কিসক? হামাগোরে আবার বিপদ কি? হামাগোরে জমি নাই, জিরাত নাই, ঘর নাই, ভিটা নাই, ধান নাই মরিচ নাই,—বিপদ বিসম্বাদ হলে হামাগোরে নোকসান কি?'

জীনের উড়াল দেওয়ায় বিভ্রমটার ওপর কতো আস্থা থাকার ফলে ছোকরা পরম বিশ্বাসের সঙ্গে এরকম ভবিষ্যৎ বাণী ছাড়ে! আনোয়ারের পক্ষে এখন এমনকি সামনে তাকানো পর্যন্ত মুশকিল। উত্তর কোনদিকে? দিক জানা থাকলে চোখে সামলানো সহজ হতো। এখন মনে হয় শালা সবদিকই উত্তর! সবদিকেই বৈরাগীর ভিটার পুরনো বাসিন্দার দীর্ঘ উড়াল। প্রায় জোর করে আনোয়ার বলে, 'দ্যাখো চেংটু জীন টিন কোনো কথা নয়। কিছু করতে হলে নিজেদেরই করতে হয়। জীন কি সাহায্য করতে পারে?' খুব জোর দিয়ে বললেও ওপরদিকে তাকাবার মতো বল আনোয়ার পায় না।

চেংটু বলে, 'সাহায্য করবো কিসক? আগুনের জান তো, তাঁই সোম্বাদ পায় আগে।'

২জনে ফের চুপচাপ হাঁটে।

'আপনে?' হঠাৎ চেংটুর গলা শুনে চমকে উঠে আনোয়ার চোখ বন্ধ করে, এক পলকের জন্য মনে হয়, উড়াল-দেওয়া জীন কি ডাঙায় এসে নামলো? তবে মুহূর্তের মধ্যে কাঁঠালতলায় গায়ে শাল জড়ানো এবং মাথা ও কানে মাঙ্কি ক্যাপ পরা বড়োচাচাকে চিনতে পেরে আনোয়ার বড়ো করে নিশ্বাস ছাড়ে। এবার সে মহা ডাঁটে তাকায় ওপরের দিকে।

ওপরে কাঁঠালগাছের ঝাঁকড়া মাথা। আর কি? কুয়াশার মসলিন মোড়ানো তারা বসানো আকাশ। শীতের রাত্রে গ্রামের আকাশ বড়ো মোলায়েম।

বড়োচাচা বলে, 'এতো রাত করলি?'

এই শীতের রাত্রে বড়োচাচা একা দাঁড়িয়ে তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। বড়োচাচা কাউকে ডেকে বলে, 'তুই এখন যা। রাত হছে।'

আবার কে? ভাঙা দালানের স্তূপের আড়ালে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে? ১টা হাফ—হাতা জামার ওপর হাতজোড়া বুকে আড়াআড়িভাবে রেখে লোকটা শীত ঠেকাবার চেষ্টা করছে। বড়োচাচার লম্বা চওড়া কাঠামোটার পেছনে যেতে যেতে এবং ইচ্ছামতো উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম-আকাশের সবদিক দেখতে দেখতে আনোয়ার শোনে যে, লোকটা চেংটুকে বলছে, 'তুই আসছস? মাস্টারের বাড়িতে তোক রাখা হলো কিসক? তোর বুকের বল বেশি বাড়ছে, না?' এই সব বাক্যের আওয়াজ চাপা, কিন্তু স্বর বেশ ভারি। এ তো নাদু পরামাণিক! নাদু এতোক্ষণ ধরে পাহারা দিচ্ছিলো বড়োচাচাকে। আর তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এলো নাদুর ছেলে! চেংটুর কাছ থেকে ভালো করে বিদায় করে বিদায় নেওয়া দরকার। পেছনে তাকালে চোখে পড়ে যে, বাপ ব্যাটা ২জনে ২দিকে চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে চেংটু জোড়াপুকুর পার হয়ে গেলো। আবছা আলোয় মনে হয় চেংটু যেন পায়ে পাল খাটিয়ে নিয়েছে। না, তার ছায়া পর্যন্ত এখন দ্যাখা যাচ্ছে না।

১৭

দুপুরবেলা ভাত খেয়ে আনোয়ার আবিষ্কার করলো যে, সিগ্রেটের স্টক প্রায় শেষ। সিগ্রেটের কথা বলতে মন্টু প্রস্তাব করে, 'আজ বিকালে চন্দনদহ চলেন।'

'সিগ্রেট কিনতে দুমাইল যাবো? জালাল ফুপার বাড়ির সঙ্গে ছোট্টো দোকানটা থেকে নিয়ে আয় না!'

'দূর! ওখানে তিন মাসের বাসি সিগারেট। চন্দনদহ বাজারে আজ যাত্রা আছে। যাত্রা দেখবেন? আব্বাকে বলেন, আপনি গেলে আমাকেও যেতে দেবে।'

সিরাজগঞ্জের নামকরা অপেরা পার্টি। চন্দনদহের নতুন কলেজের ফান্ড তৈরির জন্য 'সিরাজদ্দৌলা' পালার আয়োজন। ঐ অপেরা পার্টির আরো ভালো ভালো পালা আছে, কিন্তু কলেজের সাহায্যে টাকা তোলা হচ্ছে, যে সে বই হলে চলে না। স্কুলের মাঠে প্যান্ডেল করে যাত্রা, চারদিকে বাঁশের বেড়া। সামিয়ানার নিচে চাটাই পেতে খড় বিছানো রয়েছে, মঞ্চের সামনে তিন সারি চেয়ার। আনোয়ারকে খাতির করে সামনে বসতে বলা হয়েছিলো, কিন্তু বিনয় করে সে বসেছে দ্বিতীয় সারিতে। ওর পাশের চেয়ারে মন্টু। কয়েক মিনিট পর আফসার গাজী ঢুকতেই সামনের সারির অনেকেই উঠে দাঁড়ালো। আফসার ১টা চেয়ারে বসে পাশের লোকটিকে বলে, 'প্রিন্সিপ্যাল সায়েব বসেন।' তারপর কার কথা শুনে সে

তাকালো পেছনে, আনোয়ারকে বলে, 'আকবর চাচার ব্যাটা না? আরে সামনে এসো, সামনে এসো।' বসে বসেই আনোয়ারের হাত ধরে তাকে সামনের সারিতে টেনে আনে, প্রিন্সিপ্যাল চালান হয়ে যায় দ্বিতীয় সারিতে আনোয়ারের চেয়ারে। আনোয়ার ভালো করে আফসারকে দ্যাখে, এই লোকটিকেই চেংটু কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলো! লোকটা খুব মিশুক, আবার এক আধ পাঁইট টেনেও এসেছে! মঞ্চের চেয়ে আনোয়ারের দিকেই তার মনোযোগ বেশি, 'তুমি আমার চেয়ে অন্তত দশ বারো বছরের জুনিয়ার তো হবেই। তোমার বড়োভাইও আমার জুনিয়ার।' বলে সে হাসে। তারপর আনোয়ারের ডান হাতটা নিয়ে সোজা ঢুকিয়ে দেয় তার কোটের পকেটে, আনোয়ারের হাত ঠেকে একটা বোতলে, পাঁইটের সাইজের বোতল। আফসার তার হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, 'চলবে?'

তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলে, 'কেরুর সিংহ মার্কা!'

'এখানে?'

আনোয়ারের অবাক-হওয়া দেখে সে হাসে, 'ক্ষতি কি? কে কি বলবে? এখানে না চাইলে বাইরে চলো, বাজারে আমার রাইস মিল। বাসাও আছে।'

আনোয়ার না করলে লোকটা বলে, 'বুঝছি! বাড়িতে তো আসো না, বাড়ি এসে ক্যারেক্টারটা দ্যাখাতে চাও একেবারে ধোপাবাড়ির ইস্ত্রি-করা শার্ট? ভালো! ভালো! আমরা ভাই গ্রামেই থাকি, ভালো কও, মন্দ কও, দরবেশ কও, লোফার কও—সব খোলাখুলি, ওপেন টু অল।—না কি কোস রে আবুলের বাপ?' কিন্তু তার পায়ের সামনে নিচে বসা লোকটি কিছু না বলায় সে ধমক দেয়, 'ক্যারে শ্যালা, কথা কোস না কিসক?' এতেও আবুলের বাপ সাড়া না দিলে সে বলেই চলে, 'তোমারা আসো দেশ দেখতে, এঁ্যা? দুদিন থাকবে, চাষা-ভূষাদের উস্কে দিয়ে ঢাকা যাবে, ঢাকায় সব বড়ো বড়ো হোটেল, বার তো আছেই, না কি বলো?'

লোকটা একনাগাড়ে কথা বলেই চলে। একটু টিপসি হলেও কথাবার্তা কিন্তু বেসামাল নয়। এদিকে পালা যে কখন শুরু হবে কিছু বোঝা যায় না। স্টেজে ১টি মেয়ে তিড়িং বিড়িং করে লাফায়, তার লিকলিকে পা ২টো চোস্ত পাজামায় মোড়ানো, মাংসহীন, উরু ও পাছা নিয়ে সে কতোরকম ক্যারদানি মারে, দেখে মেয়েটার জন্যে আনোয়ারের খারাপই লাগে, পায়ের ব্যথায় বেচারি রাত্রে ঘুমাতে পারবে কি-না সন্দেহ। রোগা পটকা মেয়েটার বুক বেঢপ রকমের উঁচু, গ্যাটিস-মারা স্তন দুটো সে এমনভাবে এগিয়ে ধরে যে, যে কেউ হাত দিলে তার ভেতরকার কাপড় না হার্ডবোর্ড সব বেরিয়ে পড়তে পারে। স্নো পাউডার ও রুজের পলেস্তারার নিচে তার মুখের বসন্তের দাগ হ্যাজাগের চড়া আলোয় অনেকগুলো কুৎকুতে চোখের মতো পিটপিট করে। আফসার গাজীর দিকে চোখ রেখে তার শরীরের ব্যস্ত তৎপরতা পরিচালিত হয়। চোখের ইশারায় আফসার একবার দেখিয়ে দেয় আনোয়ারকে, 'কি গো সুন্দরী, আমার ভাইটাক চোখত পড়ে না? ভালো কর‍্যা নাচ! ঢাকার নেতামানুষ, একদিন মন্ত্রী হবো, দেখিস!' তারপর আনোয়ারের দিকে ঝুঁকে সে বলে, 'তুমি তো ভাই রাজধানীর মস্তান, বলো তো ভালো মাল পাওয়া যায় কোথায়? বলো তো?—পারলে না?—বাদামতলী বলো, কান্দুপট্টি বলো, কুমারটুলী বলো, গঙ্গাজলী বলো,—নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের কাছে এসব একেবারে নস্যি! আর লাহোর যদি যাও তো এসব মনে হবে চুলার লাকড়ি। লাহোর কলকাতা কিছু বাকি রাখিনি। হীরামন্ডি কও, সোনাগাছি কও—পাকিস্তান

হিন্দুস্থান সব চষ্যা বেড়াছি!' কথার তোড়ে তার আঞ্চলিক বুলি বেরিয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে, 'একদিন শুনলাম বাদামতলী উঠে গেছে। আমি বলি, হায় হায় ঢাকা তো অন্ধকার হয়ে গেলো—! কিসের কি? এখন গোটা ঢাকা শহর দেখি শালার একখান বেশ্যাপাড়া! রাস্তায় মাগীরা সব কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রিকশায় তোলো, জায়গায় নিয়ে কাজ সারো!'

আনোয়ার ভয় পায় যে, আফসার গাজীর বেশ্যাগমনের বর্ণনা এভাবে অব্যাহত থাকলে যাত্রা দ্যাখার বারোটা বাজবে। যে লোকটি নাম-ভূমিকায় নেমেছে, চলচ্চিত্র অভিনেতা আনোয়ার হোসেন তার আদর্শ। 'সিরাজদ্দৌলা' ছবির সংলাপ সে হুবহু মুখস্থ বলে, চোখ বড়ো করে এদিক ওদিক তাকায়। আফসার গাজী কথা বলা বন্ধ করে ঢুলুঢুলু চোখ যতোটা পারে খুলে তার গতিবিধি দ্যাখে। একেকটি দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে রিকেটিগ্রস্ত মেয়েটি মঞ্চে নামে, লাফায় ও লাফাতে লাফাতে হাঁপায়। তার কৃত্রিম স্তন ও অকৃত্রিম উরু-পাছা এবং সিরাজদ্দৌলার দেশপ্রেম আফসার গাজীকে ক্রমেই উত্তেজিত করে তোলে। মেয়েটি এলে সে একেকবার হাত পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়, তবে মঞ্চ অনেক দূরে, তার ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যায়। আর নবাব সিরাজদ্দৌলাকে দেখলে সে বুক টান করে বসে। পরাজিত সিরাজদ্দৌলা বন্দি হবার পর তার শত্রুরা যখন তাকে কাঁটার আসনে বসিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, চেয়ার থেকে আফসার গাজী চিৎকার করে ওঠে, 'শালারা তোরা হাসিস? দ্যাশের স্বাধীনতা যায়, তোরা মজা করিস! গাদ্দারের পয়দা গাদ্দার!' বাঙলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলুপ্তিতে লোকটা ক্ষোভে ছটফট করে। এরপর শত্রুদের সামনে নিজের ও দেশের দুর্ভাগ্যে সিরাজদ্দৌলা যখন খুব চটপটে গলায় বিলাপ করছে এবং দর্শকমণ্ডলী চোখের পানির ট্রান্সপারেন্ট পর্দা ভেদ করে তাই দেখছে, অফসার গাজী হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'থামো, থামো! বাঁড়ার এ্যাকটো করো! আনোয়ার হোসেনের লাকান হলো না। আবার করো!'

এদিকে আনোয়ার ভাবে পাবলিক এই উত্তেজিত দর্শককে ধরে মার না দেয়! নবাব সিরাজদ্দৌলার আঠালো সংলাপের মাঝখানে আফসার ফের হুকুম ছাড়ে, 'কল্যাম না শালা রিপিট করো। কানোত কথা যায় না, না?'

বিড়িটা হাত থেকে ফেলে যাত্রার অধিকারী মঞ্চে উঠে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার অধিপতিকে কি নির্দেশ দেয়, নবাব ঐ সংলাপের পুনরাবৃত্তি করে।

আনোয়ার নবাব সিরাজদ্দৌলার কথা একরকম ভুলেই যায়। তার অবিচল দৃষ্টি তার পাশে-বসা আফসার গাজীর দিকে। তার চোখ ঢুলু ঢুলু হয়ে আসছে, মনে হয় নেশা বোধ হয় জমছে। যাত্রার ঐ দৃশ্য শেষ হতে না হতে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'অনেকটা হছে। আবার করো। দোবারা এরশাদ!' লোকটা বোধ হয় হীরামণ্ডি কি সোনাগাছির কোনো বাইজির আসর রিপিট করছে।

যাত্রার অধিকারী মশাই এবার মঞ্চে না উঠে জোড়হাতে এসে দাঁড়ায় আফসারের সামনে। বলে, 'হুজুর! এক সিন বারবার রিপিট করলে বোঝেন তো পাবলিকে—'

আফসার গাজী অধিকারীকে ঢালাও নির্দেশ দেয়, 'পাবলিকের গোয়া মরো!' এই আদেশ পালনে অধিকারী মশাই তার সম্মতি বা অপারগতা জানাবার আগেই পেছন থেকে চিৎকার শোনা যায়, 'হামরা পয়সা খরচ কর‍্যা দেখব্যার আসছি। একজনের কথাত সব হবো?' অডিয়েন্স পেছনে তাকায়, আনোয়ারও ঘাড় ফেরালো। পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে লোকটি

তাকে সে চিনতে পারে। কাল দুপুরে আনোয়ারদের কাঁঠালতলায় জালাল মাস্টারের সঙ্গে কথা বলছিলো, এর নামে করমালি, জালাল মাস্টারের জমির বর্গাচাষী। বৈরাগীর ভিটা পার হয়ে কয়েক বিঘা জমি আছে জালাল মাস্টারের, সেই জমির ওপারে তালপোঁতা গ্রামে এদের বাড়ি। লোকটার দাঁত অস্বাভাবিক উঁচু বলে একে ১বার দেখলে ভোলা যায় না। তো তার এই চিৎকারের সঙ্গে ৩ সারি চেয়ারের দর্শকদের ভেতর থেকেও তাকে সমর্থন জানানো হয়, 'যাত্রার মাঝখানে আফসার ভাই কি আরম্ভ করলো!' এমন কি গাজীদের কলেজে-পড়া একটি ছেলেও বলে ওঠে, 'মাতলামি করার আর জায়গা পায়নি, না?'

এরপর পেছন থেকে একসঙ্গে এমন হৈ চৈ শুরু হয় যে, কারো কথাই স্পষ্ট বোঝা যায় না। এর মধ্যে ২/১ টি বাক্য বেশ পরিষ্কার, যেমন, 'মাস্টার, তুমি পয়সা নিছো সোগলির কাছ থ্যাকা আর যাত্রা দ্যাখাবা খালি একজনোক?'

'তুমি এক চোখত নুন ব্যাচো এক চোখত ত্যাল ব্যাচো, না?'

'চিয়ারত বস্যা তাঁই লবাব হছে নাকি? হামরা পয়সা দিয়া ঢুকছি, চিয়ারত বস্যা মাগনা দেখি না।'

'লবাব সিরাজদ্দৌলার লাতি। শালাক এ্যাকটো করব্যার দিলেই হয়!'

এইসব উক্তির ফলে চেয়ারে উপবিষ্ট দর্শকরা উসখুস করে এবং হঠাৎ চুপ করে যায়। পেছনের কোলাহল অব্যাহত থাকে। চেয়ারে বসা ১জন দর্শক, আনোয়ারদের এক আত্মীয়, দাঁড়িয়ে ধমক দেয়, 'করমালি থাম! কি শুরু করলি?'

'দ্যাখেন না ভাইজান! খালি ক্যাচাল করবো! ইগল্যান করলে যাত্রা হবো?' করমালির অভিযোগ শেষ হতে না হতে আফসার গাজী শক্তি পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হয়, 'শালা বেন্ন্যার বাচ্চাগুলাক ঢুকাছে সামিয়ানার তলাত! ট্যাকার গরম দ্যাখাস? এই শালার কলেজের নাম করয়া যাঁই যা খুশি করবো?'

আনোয়ার মৃদু গলায় বলে, 'আঃ! আপনি কি শুরু করলেন?'

আফসার এবার দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে আনোয়ারের দিকে, 'আরে ভাই, দ্যাখো না! আমার দাদার দান-করা এই জায়গা—এখানে শালারা আমাকে বেইজ্জত করে। আমার দাদার জায়গা আর তোমার দাদার টাকায় এই স্কুলের দালান,—এখানে আমাদের সঙ্গে নিমকহারামি করে!'

স্কুলের জায়গাটা গাজীদের দেওয়া, এটা ঠিক। কিন্তু এই স্কুল ভবন নির্মাণে তার নিজের পূর্বপুরুষদের কোনোরকম অবদানের কথা আনোয়ারের জানা নাই। ওর দাদা স্কুলের জন্য টাকা দিলে জালাল মাস্টার অন্তত একদিন না একদিন বলতো। তবে আফসারের এই তথ্য চ্যালেঞ্জ না করে সে বলে, 'আপনি বরং বাইরে যান। আপনার শরীর ভালো না।'

'বাইরে যাবো কেন হে? আমার জায়গা ছেড়ে বাইরে যাবো আমি?' আফসার গাজীর বাক্যে যাত্রার প্রভাব লক্ষ করা যায়, 'ছোটোলোকের দাপট সহ্য করবো আমি!'

'তাহলে চুপচাপ বসেন!' এবার আনোয়ারের অসহ্য ঠেকে, 'দাপট তো দ্যাখ্যাচ্ছেন আপনি! সবাই চুপচাপ শুনছিলো, আপনিই তো গোলমাল শুরু করলেন।'

আফসার গাজীও ধৈর্য রাখতে পারে না, 'নেতাগিরি দ্যাখাবার আসছো, না? হবো না! লাভ হবো না, তোমার মামু আসছিলো ভোট নিবার, ভোট পায় নাই। তোমাকও ভোট দেওয়া হবো না, বুঝল্যা?'

'ভোটের কথা কি হলো? আপনি তো ইতরামো করছেন। হয় চুপচাপ বসেন, নয় বেরিয়ে যান!' এই সময় চেয়ারের দ্বিতীয় সারি থেকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের কেরানী হামিদ মণ্ডল এসে আফসারকে একরকম জোর করে বসিয়ে দেয়। লোকটি খয়বার গাজীর খাস লোক। তার অনুপস্থিতিতে তার ভাইপোর নিরাপত্তা ও কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখাও হামিদের কর্তব্য। আফসার গাজী এবার নেতিয়ে পড়ে। সে বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতে শুরু করে। আনোয়ার বুঝতে পাচ্ছে যে, ওর নেশা কিন্তু একেবারে কেটে গেছে। কিন্তু আপাতত কিছুই করা সম্ভব নয়, তাই মাতলামোর ভাণ করে, কিছুই না বোঝার ভাব করেও খানিকটা উদ্ধার পায়।

যাত্রার প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে করমালি দাঁড়ায় আনোয়ারের পাশে। বলে, 'চলেন।' মন্টু জিগ্যেস করে, 'তুই বাড়ি যাবি না?'

'হুঁ! চলেন, আপনাগোরে বাড়ির উপর দিয়া যামু।'

আনোয়ার একটু অবাক হয়, 'বেশ ঘোরা হবে না?

'অল্প এ্যানা!'

মন্টু বলে, 'চল! যে অকামটা করলি আজ! তুই খালি লাফ পাড়িস!' মন্টু বেশ বিরক্ত। আফসার গাজীকে সে দুইচোক্ষে দেখতে পারে না, এতোক্ষণ ছিলো, ভালো করে কথাও বলেনি। তার অপমানে মন্টু বেশ খুশি। কিন্তু তাই বলে করমালি এভাবে কথা বলবে কেন?

একটু দূরে আবুলের বাপের পাশে দাঁড়িয়ে আফসার গাজী ডাকে, 'মন্টু শোন!'

এরা একটু দাঁড়ায়। মন্টু ফিরে এলে করমালি জিগ্যেস করে, কি কলো?'

'কিছু না!'

'তাই বাড়িতে যাবো না?'

'না! আজ বাজারে থাকবে।'

আনোয়ার বলে, 'কেন? বাজারে থাকবে কেন?'

মন্টু জবাব দেয়, 'কি জানি? বোধহয় নষ্টামি ফষ্টামি করবে। এইসব মানুষ শয়তানের হাড্ডি। এইসব মানুষের সাথে লাগা ভালো না, বুঝলেন? আমাকে বলে কি, আনোয়ার ইচ্ছা করলে আমার সাথে থাকতে পারে! আপনাকে কিসব খাওয়াতে চায়! লোকটার ছোটো বড়ো জ্ঞান নাই!'

করমালি তার বড়ো দাঁতে হাসে, 'বাড়িত যাবো না ভয়ে! ভয় পাছে, বুঝলেন না? ইন্দুরের জান নিয়া তাঁই নাফ পাড়ে। রাত হছে তো, ঘাটা ধর্য্যা যাবো, ভয় করে! হামরা ইগল্যান বুঝি না?' হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'অর কল্লাখান দিয়া কেডা কি করবো? অর টিংটিঙা কল্লাখানের কানা পয়সা দাম আছে? অর চাচা খয়বার গাজী সন্ধ্যা হতে না হতে বাড়ির মধ্যে সান্ধায়, তামাম আত বাড়িত ডাকাত পড়লেও বারাবার সাহস পায় না! আর উঁই তো ইন্দুরের বাচ্চাও না!'

করমালি কথা বলে একটু বেশি। এটা বরং ভালো। আনোয়ারের এতে সুবিধাই হয়। চেংটুর মতো হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে আনোয়ারের অকারণ অপরাধবোধটিকে কাঁটার মতো উস্কে তোলে না। চেংটু চুপ করলেই মনে হয় খুব মনোযোগ দিয়ে সে যেন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে।

সেদিন কাঁঠালতলায় করমালি এসেই আনোয়ারকে দেখিয়ে জালাল মাস্টারকে জিগ্যেস করছিলো, 'বড়োমিয়ার নাতি, না? চেংটুর মুখোত শুনলাম ঢাকাত থ্যাকা আসছে? তা কতোদিন থাকার নিয়ত কর্‌য়া আসছেন?'

জালাল মাস্টার সব প্রশ্নের জবাব বলে, 'করমালি, আরেকটা হাল দিয়া গম বুন্যা দে!' করমালি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, 'গোরু পাই না সরকার। হামার গোরু তো গেছে— ।'

'গোরু কি আর নাই? তোর গাঁওত গোরু কি খালি তোরই আছিলো?'

'না চাচামিয়া', করমালি ফের হাসে, 'হামাক কেউ গোরু দিবার চায় না। সোগলি ভয় করে, হামাক গোরু দিলে তার নিজের গোরুখানও চুরি হয়া যাবো।'

মানে?—মানে তো করমালির কাছেও দুর্বোধ্য। তার গোরু চুরি হয়েছে, এতে অন্যদের ধারণা যে, গোরুচোরেরা তার ওপর অসন্তুষ্ট। তার প্রায় একঘরে হবার দশা, তার সঙ্গে কথা বলার সময় সবাই এদিক ওদিক দ্যাখে, তার বাপটার সঙ্গে পর্যন্ত ভালো করে কথা বলতে চায় না। এমনকি করমালির প্রতিবেশী, তার জ্যাঠা, বাপের বড়ো ভাই, সে আরো বেশি সাবধান। গোরু চাইলে নানা বাহানা দ্যাখায়। তার কথাবার্তা বড়োলোকদের মতো। কি রকম?—না, আজ গোরু দেওয়া যাবে না। কেন? গোরুকে বেশি খাটানো ঠিক নয়। ১ জোড়া গোরু, ৭/৮ দিন টানা খাটনি পড়লো, ২টো দিন আরাম করুক! আবার করমালির ফুপাতো ভাই না ভাইপো, সে আজ-দেবো কাল-দেবো করছিলো, তার গোরু শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেলো কিসমত সাকিদার।

কিসমত হলো খয়বার গাজীর পুরনো বর্গাদার, সে চাইলে তাকে গোরু না দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এখন করমালি গোরু পায় কোথায়? জালাল মাস্টারও ঘাবড়ে যায়, 'এখন চাষ করবি কি দিয়া? আমার গোরুও তো একটা মরলো, একটা বেচ্যা দিলাম।'

করমালি ১টি সমাধান প্রস্তাব করে, এজন্যেই তার এখানে আসা। কি প্রস্তাব? জালাল মাস্টার নিজে একবার তাদের গ্রামে গিয়ে যদি গোরুওয়ালাদের কাউকে বলে তো কাজ হয়। কিন্তু জালাল মাস্টারের সময় কোথায়?—না, সময় একবার করে নিতেই হবে। গোরু নাই বলে করমালিকে বর্গাচাষ থেকে সে যদি খারিজ করে তো বেচারা একেবারে পথে বসবে।

এটা কয়েকদিন আগের কথা। এখন যাত্রা দেখে ফেরার পথে করমালি এক মুহূর্তের জন্য কথা থামায় না। প্রথমে কথা চললো সিরাজদ্দৌলা নিয়ে। পালার কাহিনী সে অর্ধেক বোঝেনি, মীরজাফর ও মোহনলালের ভূমিকা সম্বন্ধে একেক মন্তব্য করে। তবে খয়বার গাজীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চত, এবার তার মরণ ঠেকায় কোন বাপের ব্যাটা? 'কিভাবে?'—আনোয়ারের এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে সে দেখিয়ে দেয় মন্টুকে, 'মন্টু ভাইজানেক পুস করেন তো! তাঁই তো তার মামুই হয়। তাঁই কবো, খয়বার গাজী কতোগুলো মানুষের সব্বোনাশ করছে!'

'তাতে তার অসুবিধাটা হচ্ছে কি?'

'বোঝেন না? এতোগুলা মানুষের শাপমণ্যি লাগলে তার উপরে আল্লার গজব পড়বো না?' এই সব নিয়তিবাদী লোকজন কি করবে? মানুষের অভিশাপই যদি কাউকে প্রাপ্য দণ্ড দিতে পারে তো বিপ্লবের এতো প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার কি?

বিদায় নেওয়ার সময় কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে করমালি বলে, 'ভাইজান, মাস্টার সায়েবের সাথে আপনেও তালপোঁতাত আসেন। সেদিন না কোল্যাম কোনো শালা গোরু দিব্যার চায় না, অ্যাসা দ্যাখেন, কি তামশা আরম্ভ হছে!'

১৮

বৈরাগীর ভিটার বটগাছের বিশাল সাম্রাজ্যে হাঁটতে হাঁটতে জালাল মাস্টারের অন্যমনস্কতা আনোয়ারের চোখে পড়ে, এতোটা সময় ধরে এরকম চুপচাপ থাকা জালাল মাস্টারের স্বভাবের বাইরে। এই বটগাছ নিয়ে লোকটার খুব বড়াই, এই নিয়ে কথা বলতে পারলে লোকটা বাঁচে।

'এই গাছ অনেক দিনের, না?' আনোয়ারের এই প্রশ্নে জালাল মাস্টারের নীরবতা ভাঙে, কিন্তু সে তোলে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ, 'এই ছোঁড়াটা আমাকে উভয় সঙ্কটে ফালালো। কি বিপদ হলো কও তো বাপু!'

'কি রকম?'

'যার গোরু নাই তাক কি বর্গা দেওয়া যায়? করমালির বাপেরও একাধিক গোরু আছিলো না। কোনো কোনো সময় একাধিক গোরু হছে তো কার্তিক মাসে নির্ঘাত একটা বেচ্যা দিছে। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীর সাথে তার সদ্ভাব আছিলো, কাম ঠিকই চালায়া নিছে। ফসলও মোটামুটি ঠিকই দিছে।'

'করমালি দেয় না?'

'বয়স কম তো! বাহানা করে বেশি। একটু খরা হলো তো কিছু মাপ করেন। অর বাপের আমলেও এরকম হছে, তা বাপটা আছিলো নরম মানুষ, কছে, "আপনে কম নিলে আপনে মরবেন না, হামাগোরে কম হলে তো বৌছোলবিটি নিয়া মর্যা যামু।" কিন্তু এই ছোঁড়ার কথাবার্তা ত্যারা ত্যারা!'

'কি রকম?'

'ধরো, কবে, "সার ভালো কিন্যা দিলেন না, ফসল কম হলো হামার কি দোষ? আপনে জমি দিয়া তো খালাস, মেন্নত যা করছি এই ফসলে তার এক আনা দামও ওঠে না।" এই সব কথা কয়।—আবার পরিশ্রমও যে নিষ্ঠা সহকারে করে তাও না!'—আপাতত করমালির আর তেমন কোনো দোষ খুঁজে না পেয়ে জালাল মাস্টার একটু দমে যায়। বটসাম্রাজ্যের শেষের দিকে এসে সে তার দ্বিধার কথা জানায়, 'দ্যাখো তো, করমালি গোরু জোগাড় করবার না পারে তো কি বিপদ! এখন যদি কেউ ওকে গোরু না-ই দেয় তো আমার জমি দেওয়া লাগে ওর জ্যাঠোক। দরিদ্র চাষা, ওর অন্ন বিনষ্ট করাটা মানবিক কাম হয় না। কিন্তু আমি করি কি?'

'ওকে গোরু দিতে গ্রামের লোকে এতো ভয় পায় কেন?'

'এসব করমালির কল্পনাপ্রসূত বাক্য হবার পারে। এখন দ্যাখো, আমি কি করি? ঐ জমির ধান কাটা হছে কোনদিন! ফসলও এঁবার ভালো দিবার পারলো না, এদিকে এখন পর্যন্ত হালও দিবার পারলো না। গম বুনবো, তো হাল দিবো কোনদিন, বীজ বুনবো কোনদিন!'

জালাল মাস্টারের সমস্যা আনোয়ার বুঝতে পারে বৈ কি! করমালির ওপর সে আর কতোদিন নির্ভর করবে? এখন গোরুওয়ালা কোনো চাষাকে বর্গা দিয়ে গম বুনতে না পারলে গম তুলবে কবে? এই জমিগুলো তার তিন ফসলী, গম তোলার পর অন্য ফসল বুনতে পারে। তবে জালাল মাস্টার বিবেচক ধরনের লোক বলে এতোদিন ধৈর্য ধরলো। জালাল

মাস্টারের শ্বশুরের আমল থেকে এসব জমিতে করমালির বাপদাদারা বর্গাচাষ করে আসছে, হঠাৎ ছাঁটাই করতে তার বাধো বাধো ঠেকে।

কিছুদিন আগে করতো করমালির বাপ, বছর পাঁচেক হলো সে বাতে পঙ্গ। বয়স ৫০ হয়নি, শক্ত তামাটে পাকা দাড়ি, খরখরে শক্ত চুল, বাতে বাঁকচোরা হাত পা ও কোমর এবং ঘন ঘন কাশির কল্যাণে তার হাল হয়েছে ৭০/৭২ বছরের অথর্ব বুড়োর মতো। কারো কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া পুরানো জরাজীর্ণ কোট ও দুর্গন্ধময় ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে কুণ্ডুলি পাকিয়ে একটা বস্তার মতো সে শুয়েছিলো তার বাড়ির বাইরে, শুকনা কলাপাতার পর্দার ধার ঘেঁষে। সেখানটায় বেশ রোদ। সূর্যের দিকে মুখ রেখে পুরু ও ফাটা ঠোঁটজোড়া অনেকটা ফাঁক করে লোকটা রোদ খাবার চেষ্টা করছিলো। জালাল মাস্টারকে দ্যাখামাত্র কাউকে ডাকার উদ্দেশ্যে সে হাউমাউ করে চ্যাচাতে শুরু করে। তার কাশির দমক ওঠে, শ্লেষ্মাধ্বনিমুখর গলা তার আর থামে না; আনোয়ার ভয় পায়, কাশতে কাশতেই বুড়োর সবটা বাতাস বেরিয়ে না যায়!

তার বাকপ্রয়াস ও তুমুল কাশির জবাব আসে উত্তরদিকের বাঁশঝাড়ের ওপার থেকে, 'চাচামিয়া, ও চাচামিয়া, এক ঘড়ি খাড়ান গো, হামরা আসি!' জালাল মাস্টার ও আনোয়ার সেদিকে তাকালে তার লম্বা লম্বা দাঁতে করমালি মহামধুর হাসি ছাড়ে। জোয়ালের পাতায় বুক পেতে করমালি গোরুর প্রকসি মারার চেষ্টা করছে। ঐ জোয়ালের পাতার আরেক দিকে বুক পেতে রেখেছে একটু বয়স্ক আরেকজন। লাঙল ধরে তাদের পেছনে পেছনে চলেছে ৮/১০ বছরের ১টি বালক। এই ছোকরা আবার 'হেট হেট' শব্দ করে বাপচাচার বয়সী লোক ২জনকে গোরুর সম্পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করছে। করমালির সঙ্গী জোয়াল থেকে নিজের বুক সরিয়ে নিচ্ছিলো, কিন্তু করমালি বাধা দেয়, 'আরো খানিক দ্যাখো না গো! গোরু পারলে হামরা পারমু না কিসক? এখনি হ্যাপসা গেলা?' কিন্তু জোয়ালের পাতা থেকে তার সঙ্গীর বুক প্রত্যাহার করার কারণ তার ক্লান্তি নয়, ২জন ভদ্রলোকের সামনে গোরুর ভূমিকার অবতীর্ণ হতে লোকটির বাধো বাধো ঠেকছে। একটু পর করমালি বালকটিকে কি নির্দেশ দিয়ে রওয়ানা হয়, তার সঙ্গীটি কিন্তু আসে না। আরেকটু দূরে একটা তালগাছের নিচে বসে হুঁকো-হাতে বসে-থাকা এক বুড়োর পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলে।

করমালি এসেই তাদের দিকে এক প্রস্থ হাসি বিতরণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু খুব হাঁপাচ্ছে বলে তার হাসি ঠিক হাসির আকার পায় না। শুকনা কলাপাতার পর্দা সরিয়ে সে ভেতরে যায় এবং ফের বেরিয়ে আসে বাঁশের চাটাই হাতে। চাটাই পাতবার মতো জায়গার বড়ো অভাব। বিঘার পর বিঘা চাষের জমির পাশে করমালিদের ১মাত্র ঘর ও বাইরের উঠান এমন জড়সড় হয়ে রয়েছে যে, হাত পা ছড়াবার জায়গা পর্যন্ত নাই। এরই ১দিকে কলাগাছের ছোটো ঝাড়ের সঙ্গে লাগোয়া গোরুর জাবনা খাবার মাটির গামলা। তবে গোরু নাই বলে জায়গাটা খালি। করমালি বাঁশের বাতা ঘেরা গামলার পাশে চাটাই পেতে দিলো। জালাল মাস্টার বসতে বসতে বলে, 'করমালি, মুখেত তালি!' জালাল মাস্টারের এই ছন্দোবদ্ধ রসিকতায় করমালি শব্দ করে হাসে, তবে হাঁপাতে হাঁপাতেই সে বলে, 'চাচামিয়া, হাল দেওয়া শুরু করলাম। ধরেন দিনা সতেকের মদ্যে গম বোনা যাবো। বেছন তো আরো লাগবো চাচামিয়া!'

'পাঁচ সের গম দিলাম যে! খাওয়া সারা?'

'এক বিঘা জমিত কম্ করা হলেও দশ সের গম লাগে!'

'আর পাঁচ সের দিবা তোমরা, আদি নিছো, বিছন দিবা না?'

'তা দিমু! কিন্তু চাচামিয়া আপনের পাঁচ সের গমের আট আনা গেছে পোকের ভোগেত!'

'মিছা কথা কবার জায়গা পাস না? কোনদিন আবার বলবি গমের মধ্যে হ্যাতা লাগছে!' গমের বীজে চালের হাতি পোকা ধরার ঠাট্টা করে করমালির পোকার পেটে গমের বীজ যাবার তথ্য একেবারে প্রত্যাখ্যান করা হলো। ৩/৪ বছর হলো এদিকে গমের চাষ হচ্ছে, জালাল মাস্টার ১ বিঘা জমিতে গম করতে চায়। সপ্তাহ দুয়েক আগে করমালিকে গমের বীজ দিয়েছে ৫ সের, বাকিটা দেবে করমালি, এর মধ্যে তার অর্ধেক গেলো পোকার ভোগে,—এ কথা বিশ্বাস করবে কে? আবার এটাও এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, গোরু জোগাড় করা করমালির সাধ্যের বাইরে। তার কাছে জমি বর্গা দিলে এবারকার ফসল আর ঘরে আসবে না। কিন্তু কথাটা জালাল মাস্টার বলে কি করে? আহা! কতোকাল ধরে এরা এই জমি চাষ করে! জালাল মাস্টার মুখের হাসি বজায় রেখেই বলে, 'মোহাম্মদ করম আলি মণ্ডল, মনুষ্য জাতি হইতে তোমাকে খারিজ করা হইল। তোমাকে দিয়া কাম হবো? গোরু হাল বয়, ইহাই গোরুর কর্ম, ইহাই গোরুর ধর্ম, কিন্তু ফসল উৎপাদনের দায়িত্ব কি গোরুর উপর অর্পণ করিতে পারো?'

এবার কথা বলে করমালির বাবা। জোয়ালের পাতায় বুক দিয়ে গোরুর ভূমিকা পালন করার ব্যাপারে সে সন্দেহ প্রকাশ করলে করমালি চড়া গলায় জবাব দেয়, 'গোরু পারলে মানুষ পারবো না কিসক?'

'পারলু না তো! কাল থ্যাকা কবেজের সাথে তিন শতাংশ জমিত হাল দিবার পারলু?' তা অবশ্য পারেনি, করমালিকে তাই চুপ করে থাকতে হয়। প্রবলভাবে কাশতে কাশতে করমালির বাবা যা বলে তা থেকে এই তথ্য উদ্ধার করা যায় যে, চষা জমিতে মই দেওয়ার সময় গোরুর বদল মানুষ কাজ করতে পারে, সে নিজেও দড়ি ধরে মই টেনেছে। মইয়ের ওপর থাকতো শিশু করমালি বা তার ভাই বরকতালি, সেও তখন বালক। কিন্তু শীতকালের এই শক্ত মাটিতে লাঙল টানা কি মানুষের কর্ম? আল্লা তাহলে গোরু পয়দা করেছে কেন?

জালাল মাস্টার বলে, 'তুই না আমাক আসতে বললি? তোর জ্যাঠো কৈ? তাক কয়া দেখি, এখন হাল গোরু দিবো, ফসল উঠলে তুই উপযুক্ত—।'

'তার গোরু কোটে?' করমালির এই নির্লিপ্ত প্রশ্নে জালাল মাস্টার অবাক হয়, বিরক্তও হয়, 'মানে?'

করমালি হাসে, গোরুর প্রকসি দেওয়াজনিত কারণে ক্লান্তি তার এখন কেটে গেছে। বড়ো বড়ো দাঁতে সে বিরাট হাসি ছাড়ে, 'চাচামিয়া, গোরু এটেকার কারু নাই। তালপাঁতার ব্যামাক মানুষের এখন চারটা কর্যা পাও নাগবো, পছন্দ হলে সোগলির মাথাত জোড়া জোড়া শিঙের বন্দোবস্ত করেন!'

এরপর মহা উৎসাহে করমালি জানায় যে, গত কয়েক রাত্রে এই গ্রামের প্রায় সব চাষীর বাড়ি থেকে গোরু চুরি হয়েছে। প্রথম চুরি হলো তার নিজের গোরু, তাতে তার প্রায় একঘরে হবার দশা হয়েছিলো। তারপর উত্তরপাড়ার ২টো ঘর থেকে গেলো জোড়া জোড়া বলদ। করমালির জ্যাঠা আরো সাবধান হয়, সামনাসামনি হলেও করমালির দিকে এমনভাবে তাকায় যেন তার সামনে কোনো লোক নাই। পশ্চিমে শেখপাড়ায় এক রাত্রে ৩ ঘর চাষার ২টো গাই, ৩টে বলদ ও ১টা এঁড়ে চুরি হলে জ্যাঠা ধুনট গিয়ে লোহার শিকল ও তালা নিয়ে

এলো। ধুনট থেকে জ্যাঠা আসছে, করমালি বসেছিলো বড়ো রাস্তার মোড়ে গাবগাছতলায়, জ্যাঠা তাকে এড়াবার জন্য জমির ভেতর নামলো, নতুন-কেনা দামী জিনিষগুলোর দামটা পর্যন্ত জিগ্যেস করার সুযোগ দিলো না। আল্লার কি কাজ, করমালি চোখজোড়া ছোটো করে হাসে, সেই রাত্রেই নতুন শেকল তালা ভেঙে চোর ঢুকলো জ্যাঠার ঘরে, গাই নিলো, বকনাটা নিলো, বলদ নিলো, যাবার সময় উপরি নিলো শেকল ও তালা। পরদিন শেখপাড়ার গোরুগুলো যাওয়ার পর করমালি এখন একঘরে হওয়া থেকে মুক্ত হয়েছে। লোকে এখন তাকে আর এড়িয়ে চলে না। আবার চাষের জন্য গোরু ভাড়া পাওয়ার সম্ভাবনাও এখন একেবারে শূন্য।

দেখতে দেখতে ৭/৮ জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। এদের ১জন হলো করমালির ঐ সঙ্গী, ওর সঙ্গে জোয়ালে বুক দিয়ে লাঙল টানার চেষ্টা করছিলো। তার নীরব ও কখনো হাই-তোলা মুখ ও প্রায় নিশ্চল কালোকিষ্টি গতর দেখে মনে হয় না যে, করমালির উত্তেজিত কথা তাকে স্পর্শ করতে পেরেছে। আর সবার সঙ্গে সে কখনো তাকিয়ে থাকে করমালির দিকে, কখনো দ্যাখে আনোয়ারকে। করমালির সঙ্গী হঠাৎ তার নিজের গোরু চুরি হওয়ার বর্ণনা দিতে শুরু করে, 'ঐ আত্রে হামি নিজে শুত্যা থ্যাকলাম গোলের মধ্যে, ছোটো এ্যানা গোল হামার, তারই মধ্যে হাতপাও মেল্যা দেই কোটে?—আর মশা! হায়রে মশা গো মশা! মশার কামড় খাতে খাতে তামান আত দুই চোখের পাতা এক করবার পারি নাই!' তার দীর্ঘ বিবৃতির শেষ ভাগ বিশ্বাস করা একটু কঠিন। গোরুচোর গোয়ালঘরের বেড়া কেটে ঢুকে বলদের দড়ি ধরে চলে গেলো; গাইটা বাঁধা ছিলো একদিকে বাঁশের থামের সঙ্গে, অন্যদিকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। দড়ি খুলেছে, খুঁটি উপড়ে ফেলেছে, বলদ গেছে, গাই গেছে,—কাবেজের বিনিদ্র নিশিযাপনের কথা বিশ্বাস করে কে? এই নিয়ে সবাই একটু হাসাহাসি করলে কাবেজ বলে, 'না চাচামিয়া, ঘুম লয়, আরা কি য্যান ছিট্যা দেয়। মন্তর পড়্যা ঘরের মধ্যে বালু ছিটায়, হামি চ্যাতনই প্যালাম না! দিশা পালে এক শালাক জান লিয়া যাবার দেই? শালার ব্যাটা শালারা!'

করমালির নিয়ে-আসা পান খেয়ে জালাল মাস্টার ও আনোয়ার উঠছে এমন সময় একটু দূরের তালগাছতলা থেকে এসে দাঁড়ায় করমালির জ্যাঠা। লোকটার বয়স ৫৫-এর মধ্যেই, তার পাকা দাড়ি তামাটে সাদা, মাথার চুল বেশ কম। লম্বা ও রোগা লোকটির কোমর একটু বাঁকা, বাঁকা শরীরটাকে আরেকটু নুইয়ে সে দাঁড়ায় জালাল মাস্টারের মুখোমুখি।

জালাল মাস্টার তাকে জিগ্যেস করে, 'ক্যাগো পচার বাপ, আমেশা নিরাময় হছে?' তার পুরনো রোগ সম্বন্ধে জালাল মাস্টারের উদ্বেগ দেখে পচার বাপ কৃতজ্ঞতায় আরো নুয়ে পড়ে। করমালি বলে, 'আর আমেশা। জ্যাঠোর গোরু তো গেলোই, তার তালাও গেছে, শেকলও গেছে। এখন তো হাগা ফির নয়া কর্যা শুরু হবো। নয়া শিকলখান গো! ধুনটের হাট থ্যাকা কিনছিলা না জ্যাঠো?' করমালির উঁচু দাঁতের স্পর্শে তার কথাগুলো ঝনঝন করে বাজে, কিন্তু তার কথায় পচার বাপ কান দেয় না। জালাল মাস্টারের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আস্তে বলে, 'দ্যাখেন তো গো মাস্টার সায়েব, কারুবারু কর্যা গোরুবাছুরগুলান পাওয়া যায় নাকি?'

করমালি ফের এগিয়ে আসে, 'পাবা না কিসক? খুতির মধ্যে ট্যাকা পঞ্চাশটা লিয়া ডাকাত-মারা চরত যাও। ট্যাকা দিবা, তোমার হাতোত শালারা গোরুর দড়ি তুল্যা দিবো। দড়ি ধর্যা বিসমিল্লা কয়া বাড়ি বিলা ঘাটা ধরো।'

'দ্যাখ করমালি, 'পচার বাপ রাগ করে, 'আলতু ফালতু কথা কস না!'

'ফালতু কথা কমু কিসক? উত্তরপাড়ার ল্যাংড়া নবেজ বলা বলদখান লিয়া আসছে, তাক পুছ কর্যা দ্যাখা!'

'নবেজক তুই কোটে দেখলু? নবেজের ভাই জানে না আর তুই জানিস, না?'

নবেজের ভাই কাবেজ কোনো মন্তব্য না করে গম্ভীর হয়ে থাকে। গত বছর নবেজের সঙ্গে সে পৃথগন্ন হয়েছে, দুইভায়ের সম্পর্কে এখনও খারাপ।

করমালি বলে, 'ভাই হলে কি হয়, কাবেজ কি জানে?'

'নবেজ তোক কছে না?' পচার বাপ রেখে গেলে করমালিও কড়া জবাব দেয়', হুঁ, নবেজ তো হামাক সবই কছে।'

১৯

নবেজ অবশ্য ব্যাপারটি গোপন রাখবার জন্যে চেষ্টা কম করেনি। কিন্তু করমালিকে তার সব কথা বলতে হয়েছে। করমালি অতো সোজা মানুষ নয়!

১দিন খুব ভোরে, ফর্সা হতে না হতে নবেজউদ্দিন রওয়ানা দিয়েছিলো তার সাদা বলদের খোঁজে। তার নিজের নৌকা নাই, নৌকা ভাড়া করতে গেলে খরচ পড়ে ১৫/২০ টাকা। বড়ো বড়ো খেয়ানৌকায় উঠে সে এককেটা চরে গেছে, চর পার হয়েছে হেঁটে, চরের আরেক মাথায় এসে ফের অপেক্ষা করেছে আর ১টি খেয়ানৌকার জন্য। যমুনার ১ চর থেকে আরেক চরে খেয়ানৌকায় পার হওয়া মানে এই উঠলাম-আর-নামলাম নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকার পর খেয়ানৌকা আসে, নৌকা একবার চলতে শুরু করলে ওপারে পৌঁছাতে ফের দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টার ধাক্কা। এইভাবে সারাটি দিন এবং ১টি রাত্রি হেঁটে ও খেয়ানৌকায় পার হয়ে নবেজ পৌঁছেছিলো ডাকাত-মারা চরে। ফিরে এসেছে ১দিন পর। গোরুর দড়ি ধরে নবেজ যখন ফিরছে, ধারাবর্ষা চরের এদিকে খেয়ানৌকা থেকে তাকে দেখতে পায় আসমত আলি। খেয়ানৌকা দেখে নবেজ মুখ ফিরিয়েছিলো অন্যদিকে, আসমত অনেক ডাকাডাকি করলেও তার দিকে তাকায়নি। আসমত মরিচ বেচতে এসেছিলো ধুনটে, সে এই বৃত্তান্ত বলে করমালির ভাই বরকতালিকে। বরকতালির কাছে শুনে করমালি সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় উত্তরপাড়া।

বিকালবেলা নবেজউদ্দিন কাঁথা গায়ে শুয়ে ছিলো ঘরের ভেতর মাচার ওপর। নবেজের বৌ করমালির কিরকম ভাগ্নী হয়, গলা খাঁকারি দিয়ে করমালি সোজা ঢুকে পড়ে শুকনা কলাপাতা ঘেরা উঠানে। মানুষের সাড়া পেয়ে মাচা থেকে নবেজ নিচে নামে এবং মাচার তলে বসে থাকে মাথা গুঁজে। তার বৌয়ের চোখের ইশারায় জানতে পেরে করমালি তাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। নবেজ কথাই বলতে চায় না। গ্রামের মানুষের চোখ এড়াবার জন্য আজ ৩দিন থেকে সে কোথায় কোথায় ঘোরে,—তার বৌ পর্যন্ত বলতে পারে না। বৌটা

খুব বিরক্ত,—গোরু নিয়ে এলো, কিন্তু কিভাবে উদ্ধার হলো, কি সমাচার—সব কিছু সে চেপে রাখতে চায়। বৌ এদিক ওদিক থেকে নানারকম কথা শুনে তাকে খয়বার গাজীর কথা জিগ্যেস করে, 'ক্যাগো, গাজীর বেটা বলে ডাকাত-মারা চরত দুনিয়ার গোরু জড়ো করছে?' নবেজ তাতে বৌয়ের চুল ধরে ঘাড়ে একটা থাপ্পড় মারে, 'আত নাই দিন নাই, খালি খয়বার গাজীর কথা কস ক্যা? খয়বার গাজীর সাথে তোর মায়ের নিকা দিবু?' কাঁদো কাঁদো গলায় নবেজের বৌ করমালির কাছে সব বললে নবেজের হাত ধরে টানতে টানতে করমালি তাকে নিয়ে আসে নিজেদের পাড়ায়। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কুয়াশায়, অন্ধকারে, নাড়ার ধোঁয়ায় কিছুই ভালো করে দ্যাখা যায় না। পচার বাপের গোয়াল ঘরের পেছনে সারের গাদার পাশে তাকে বসিয়ে করমালি সোজাসুজি জিগ্যেস করে, 'কও তো দামান, গোরু ফেরত পাওয়া গেলো কেমন কর‍্যা?'

নবেজউদ্দিন কথা বলবে কি?—তার ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা, হাত-পা কাঁপা দেখে মনে হয় তাকে যেন গলা টিপে মারার জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে। সে কি তবে চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে? বেশ তো, তাতে ক্ষতি কি? করমালি তাকে অভয় দেয়, তারাও না হয় বাটপাড়ি করবে, তাতে নবেজের অপরাধ বিভক্ত হয়ে তার ভার লাঘব হবে। নবেজ তবু কাঁপে! হয়তো করমালির হাত থেকে নিজের রোগা-পটকা গলা বাঁচাবার জন্যে সে জানায় যে, সে গিয়েছিলো ডাকাত-মারা চরে। না, না, তার কোনো দোষ নাই, এটা তার নিজের সিদ্ধান্ত নয়। খয়বার গাজীর খাস বর্গাদার কিসমত সাকিদারের পরামর্শে সে ওদিকে রওয়ানা হয়। মাসে ১০ টাকা হার সুদে কিসমত তাকে ৬০ টাকা ধারও দেয়। নগদ ৫০ টাকা এবং এই ব্যাপারে পূর্ণ নীরবতা পালনের অঙ্গীকার দিয়ে সে তার গোরু ফেরত পেয়েছে। কোরান শরীফ ছুঁয়ে নবেজ কথা দিয়ে এসেছে যে, কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কানে এই কথা দেবে না। এই কথা ফাঁস হয়ে গেলে নবেজউদ্দিনের কপালে যে কি আছে তা কেবল সে-ই জানে, আর জানে খয়বার গাজী, আর জানে খয়বার গাজীর প্রধান সহকারী ও অংশীদার হোসেন আলি ফকির। এদের নাম বলতে বলতে সে কাঁপে এবং কিছুক্ষণ পর তার ভাগ্য সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞাতদের তালিকায় সর্বজ্ঞ আল্লাতালার নাম যোগ করে। এতো কথা বলে ফেলার পর নবেজউদ্দিন কিছুক্ষণ কাঁদে এবং নাক চোখ না মুছেই করমালির ঠোঁটের বিড়িটা চেয়ে নিয়ে কয়েকটা টান দেয়।

বিড়ি খেয়ে সে ঘ্যানঘ্যান করতে শুরু করে নতুন উদ্যমে। এই বিশাল পৃথিবীতে করমালি ছাড়া কোনো কাকপক্ষীও এসব কথা জানে না। করমালির হাতে তার জীবনমরণ, করমালির মুখ থেকে এইসব কথাবার্তা বেরিয়ে পড়ে তো খয়বার গাজীর লোকজন নবেজউদ্দিনকে বাড়ি থেকে, গ্রাম থেকে তো বটেই, এই সাধের দুনিয়া থেকেও তাকে উৎখাত করবে। অথচ এবার বর্গাচাষ করে সে ফসল পেয়েছে ভালোই, বাড়ির পেছনে খাইখালাসি দেওয়া ১০ শতাংশ জমিটাও তার উদ্ধার হয়ে যাবে। এবার এমন কি বর্ষাতে তার বৌটাকে বাপের বাড়ি না পাঠালেও চলবে। ৫০টা টাকা গেছে, তা যাক। ওদেরও তো খরচা আছে। গোরু নিয়ে গেছে, গোরুকে জাবনা দিতে হয়েছে, গোরু দ্যাখাশোনার জন্যে কতোগুলো লোক পুষতে হয়। তারপর থানা সামলাও রে, আইয়ুব খাঁর পার্টির মেম্বারদের সামলাও রে, এমএনএ, এমপিএ, চেয়ারম্যান—কিসব হাবিজাবি, এদের কি লেখাজোকা আছে? এদের আদরযত্ন করো, খাতিরদারি করো! টাকা তো ওদেরও যায়! 'না, মামু খয়বার গাজী মানুষ খারাপ না! কলকাঠি নাড়ে সব হোসেন আলি ফকির!' খয়বার গাজী চরের দিকে কোনোদিন পা-ও মাড়ায় না।

আসল শয়তান হলো হোসেন ফকির। কার গোরু নিতে হবে, কার কতো জরিমানা ধার্য করা হবে, গোরু ফেরত দেওয়া যাবে না কাকে, কাকে মেরে পুঁতে ফেলতে হবে যমুনার নতুন চরে—সব সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক হোসেন আলি। খয়বার হাজার হলেও ভালো বংশের মানুষ, তার ছেলেপেলে সব লেখাপড়া জানা শহুরে লোক, তার এক ছেলে বিলাত থেকে ঘুরে এসেছে। না, হোসেন আলি ফকিরের কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নেওয়া ছাড়া এইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে খয়বার গাজীর কিছুমাত্র যোগ নাই।—নবেজউদ্দিন এক নাগাড়ে কথা বলে, কথা বলার পালা এখন তার। ৫০ টাকা জরিমানা দেওয়ার কথাটা বলে এতো ভয় পেয়েছে যে, খয়বার গাজীর প্রতিশোধের কথা ভেবে সে নিজেই খয়বারের পক্ষে যুক্তি তৈরি করছে। খয়বার গাজী ভালো, সে নিষ্পাপ পুরুষ—এমনকি নিজের মধ্যেও এই বিশ্বাস খাড়া করার জন্যে নবেজ তখন অস্থির। কিন্তু এইসব বলতে বলতে তার বোধোদয় ঘটে যে, দাপট হোসেন আলিরও কম নয়। গতবার বড়ো ভোটের সময় আইয়ুব খানের ফুল মার্কা ক্যান্ডিডেটের পক্ষে এই এলাকার মৌলিক গণতন্ত্রীদের সংগঠিত করেছে তো সে-ই। হারিকেন মার্কার ক্যান্ডিডেট ছিলো খয়বারের কি রকম আত্মীয়, খয়বার তাই একটু চুপচাপ ছিলো। এমএনএ হওয়ার পর ফুল মার্কা শালা এদিকে এসে খয়বার গাজীর বাড়িতে যতোই উঠুক, সে চেয়ারম্যান হোক আর মেম্বার হোক, কাজের মানুষ হলো হোসেন আলি। এই যে মেম্বারগুলো,—বেঈমানের বেঈমান, মোনাফেকের বাপ মোনাফেক—এদের সামলায় কে? হোসেন আলি ছাড়া আবার কে? সুতরাং হোসেন আলিকেও ভয় পাওয়া নবেজউদ্দিনের কর্তব্য এবং তাই সে বলে, 'তারই দোষ দেই কি? চরের মদ্যে তার দাপট কি আজকালকার কথা গো?' তা অবশ্য ঠিক। ২৫/২৬ বছর আগে যমুনায় ডাকাত-মারা চর যখন জেগে ওঠে তখন থেকে সেখানে তার বাথান। চরের একদিক ভাঙে, বাথানও সরে যায় অন্যদিকে। জামালপুর মহকুমার চর থেকে এমন কি বীর এলাকা থেকে গোরু বাছুর মোষ সব নৌকায় ভাসিয়ে সে নিয়ে আসতো এদিকের চরে। ওদিকে বালিজুড়ি, এদিকে ডাকাত-মারা চর—এই ২জায়গার নাম শুনলে গোরুওয়ালা চাষার বুক কাঁপে কি আজ থেকে? হোসেন আলির মস্ত বড়ো জলঙ্গি নৌকা যমুনার কোনো ঘাটে বাঁধা দেখলে সেই এলাকার মানুষ রাত জেগে গোয়াল পাহারা দেয়। এসব কি আজকের কথা? গোরুওয়ালাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের ফন্দি কিন্তু তার মাথায় আসেনি। এই শালা খয়বারের বুদ্ধিতে তার এই ব্যবসার শুরু। খয়বার গাজীর কথা না শুনলেও আজকাল তার চলে না। ইউনিয়ন বোর্ড, আইয়ুব খানের পাট্টি, ভোট—এসবের মধ্যে না থাকলে এখন কোথাও সুবিধা করা মুশকিল। একবার ওয়ার্কস প্রোগ্রামের গম সবটাই বেচে দেওয়ার সুযোগ করে দিলো খয়বার, তখন থেকে এসব লাইনে ঢুকলো সে। না, হোসেন আলি মানুষ ভালো, তার দেলটা পরিষ্কার।

এসব এলোমেলো কথা শোনার পর করমালিকে চুপচাপ থাকতে দেখে নবেজের ভয় ফের মাথা চাড়া দেয়। তার শ্বাসকষ্ট হবো হবো করে, হঠাৎ করে করমালির একটা হাত ধরে বলে, 'তোমার পাওত পড়ি মামু, ইগল্যান কতা কাকো কবা না।' করমালি উঠে দাঁড়ালে নবেজ ফের তার হাত ধরে, 'মামু ইগল্যান কথা অষ্ট্র হলে হামার বাড়িঘর ব্যামাক পুড়্যা দিবো গো! তুমি হামাক জবান দ্যাও, কাকো কয়া দিবা না, কও!'

এদিকে পচার বাপের ছেলে পচা তখন গোয়ালঘরে ঢুকেছে। নবেজউদ্দিন করমালির প্রতিশ্রুতি না নিয়েই আড়ালে চলে যায়।

সেই রাত্রিটা করমালির খুব অস্থির কাটে। সারারাত ছটফট করে একটু ঘুমিয়েছে, ভোরবেলার দিকে স্বপ্ন দ্যাখে, চষা জমির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নবেজউদ্দিন, নবেজের হাতে মাছ ধরার তরা জাল। নবেজের আগে আগে এক ভদ্রলোক। 'কেডা গো?' নবেজ জবাব দেয়, 'চিনলা না? হোসেন আলি ফকিরের ব্যাটা!' করমালি জানতে চায়, 'কোটে যাও?' নবেজ হাসতে হাসতে বলে, 'টাউনেত থাকে, বাড়িত আ্যাসা মাছ ধরার সখ হছে!' স্বপ্নের মধ্যেই করমালির মনে হয়, হোসেন আলির ছেলে মাছ ধরা দ্যাখার জন্য এই গ্রামে আসবে কেন? এই কথা ভাবতে ভাবতে নবেজ কোথায় উধাও হয়, পাটকিলে রঙের একটা কুকুর সেই ছিপছিপে ভদ্রলোককে তাড়া করে। করমালি বলে, 'তু তু ধর শালাক ধর!' ভদ্রলোক সামনের দিকে দৌড়ায় এবং কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে তার পেছনে ছোটে।

কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজে করমালির ঘুম ভাঙ্গে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। বাইরে একটা কুকুর অবিরাম ডেকে চলেছে। করমালির তলপেটে তখন বেগ হচ্ছে, পানি ভরা মাটির বদনা হাতে সে বেরিয়ে পড়লো।

বাইরে কুয়াশা। বাড়ির সামনে কলাগাছের পেছন দিকে তাকিয়ে নেড়ি কুত্তাটা ডেকেই চলে। কলাগাছের ঝাড়ের ওদিকে জমির আলের দিকে যাচ্ছিলো করমালি, হঠাৎ চমকে উঠে দ্যাখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে নবেজ। কুকুরের ভয়ে কাঁপতে পারে, আবার শীতও পড়েছে সাঙ্ঘাতিক, তার গায়ে পোষাক বলতে কেবল ১টি জামা, নবেজ তাই শীতেও কাঁপতে পারে।

কারমালি বলে, 'ক্যাগো তুমি? এই জাড়ের মদ্যে খাড়া হয়া আছো? কি সমাচার?'

এবার কাঁপে নবেজের গলা, 'না এমনি!'

একটু-আগে-দ্যাখা স্বপ্ন এবং একটু-আগে-বোধ-করা তলপেটের বেগ ভুলে করমালি তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নবেজ হঠাৎ তার পায়ের ওপর পড়ে যায়, একটু হলেই করমালির বদনা তার মাথায় পড়তো। নবেজ কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'মামু, তুমি হামাক বাঁচাও! কাল তোমাক কি কছি না কছি হামি দিশা পাই নাই। অরা মানুষ খুব ভালো মামু, মানুষ খারাপ লয়। হোসেন ফকির মানুষ লয় বাপু! উদিনক্যা শালা হামার ট্যাকা লিয়া আঙুলেত ছ্যাপ দিয়া এট্টা এট্টা কর‍্যা গোণে আর কয়, 'শালা ছোটোজাতের পয়দা, ইগল্যান কথা আষ্ট্র হলে তোর জান থাকবো না!' মামু, তার কি? তার কিছু হবে না! হামাক ঝাড়ে বংশে শ্যাষ করবো! মামু, তুমি হামার ধর্মের ভাই, তোমাক কারুবারু করি, কাকো কিছু কয়ো না! তুমি হামাক জবান দ্যাও!' সে কিছুতেই করমালির পা ছাড়ে না। এদিকে করমালির পায়খানার চাপ ফের ফিরে এসেছে, সে পা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলে, 'দিলাম!'

কিন্তু কথা দিলেও নবেজউদ্দিনের গোরু ফেরত পাওয়ার ঘটনা করমালি যাকে পায় তাকেই বলে।

'খালি খালি মানুষটাক নিয়া টানাটানি করবা, ট্যাকা না দিলে গোরু অরা দিবো না!'—পচার বাপ জ্যাঠাকে এই কথা বলে নবেজউদ্দিনের কাহিনী সে বিস্তৃতভাবে বলার উদ্যোগ নেয়, কিন্তু পচার বাপ তাকে আমল না দিয়ে দাঁড়ায় জালাল মাস্টারের গা ঘেঁষে। তার ফ্যাসফেসে গলা যতোটা পারে কোমল করে সে বলে, 'আপনে কলে পরে তারা শুনবো গো! হামরা চাষাভূষা মুখ্য মানুষ, হামাগোরে মূল্য কি? আপনে শিক্ষিত মানুষ, তাঁইও শিক্ষিত। হামরা গরিব-গরবা চাষা, হামাক বেচলেও দশ ট্যাকা বারাবো না, ছেঁচলেও

বারাবো না। আপনে এ্যানা কয়া দ্যাখেন, এই গাঁয়ের সোগলি আপনেক মানে। খালি এই গেরাম কিসক, তামান ইউনিয়নের মদ্যে আপনের একটা কথা ফালাবার পারবো কেটা?'

জালাল মাস্টার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বেঢপ খাঁচার মতো বুক থেকে তার ফসফস করে বাতাস বেরোয়, কিন্তু সেটা হাঁপানির টান নয়। তার নিজের সম্বন্ধে প্রকাশিত পচার বাপের মতামত সে সম্পূর্ণ অনুমোদন করে, 'তা ধরো, আমি কথা একটা কলে কেউ ফালাবার পারবে না।' তার প্রভাবাধীন এলাকা সে আরো সম্প্রসারিত করতে চায়, 'এতদঞ্চলে, এই তামাম থানার যতো বড়ো অফিসার দেখব্যা, ম্যাজিস্ট্রেট কও পুলিশ কও আর জজ হাকিম ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার—যার কাছে যে কামে যাই আমাক প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা কারো নাই!' বলতে বলতে সে একটু থামে, হয়তো নিজের সম্বন্ধে এতোটা বলে ফেলে সে একটু লজ্জা পেয়েছে কিংবা আনোয়ারের সামনে একটু সঙ্কোচও হতে পারে। এবার একটু বিনীত ভঙ্গিতে বলে, 'তা কাকো তো কোনোদিন কোনো অনুরোধ করি নাই, তাই—।'

করমালি বলে, 'আপনে গেলে খালি খালি বেইজ্জত হবেন। ট্যাকা না হলে গোরুর একটা খুরও দিবো না!'

জালাল মাস্টার সোজা হাঁটতে শুরু করে। এখনো তার নাক দিয়ে ফসফস করে বাতাস বেরিয়ে আসছে। করমালির ওপর সে বিরক্ত, তার ফুলে-ওঠা বুকটাকে ছোঁড়া একেবারে ফুটো করে দিয়েছে। মাঠের ভেতর আল পেরিয়ে দুজনেই এসে পড়েছে বৈরাগীর ভিটার কাছাকাছি। কয়েক পা পর বটগাছের এলাকা। পেছন থেকে ডাকে পচার বাপ, 'ও ভাইজান!' পা চালিয়ে জালালউদ্দিনের পাশে এসে বলে, 'ভাইজান, কথাটা শোনেন। চ্যাংড়াপ্যাংড়ার কথা থোন! আপনে চলেন, হামরাও যামো!'

'কোথায়?'

'গাজীর ব্যাটার কাছে না যান তো ডাকাত-মারা চর চলেন।' আনোয়ারকে দেখিয়ে পচার বাপ বলে, 'এই চ্যাংড়ার চাচার নাও বান্দা আছে খালের ধারে, তাঁই তো আপনের সম্বন্ধীই হয়, আপনে কলেই নাও পাওয়া যাবো। খালেত এখন পানি নাই, তো নাও হামি কান্দোত কর্যা নিয়া যামু মুলবাড়ির ঘাট।'

'নৌকা না হয় হলো, চরে অনর্থক যায়া ফল কি?' বলতে বলতে জালাল মাস্টার বটগাছের দিকে হাঁটে।

আনোয়ারের চোখের সামনে এখন কেবল বটগাছ। পাশে জালাল মাস্টার, পাশে পচার বাপ, পেছনে মাঠের ওপার থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে করমালি, করমালির ছোটো বাড়ির সামনে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে থাকা চাষারা। কিন্তু বটগাছের এলাকায় পা দিয়ে সাঙ্ঘাতিক নির্জন মনে হচ্ছে। যেন জনমানবহীন বড়ো ১টি প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করতে যাচ্ছে। জালাল মাস্টার বলে, 'বুঝল্যা আনোয়ার, এই বটগাছের বয়স কম কর্যা হলেও আড়াইশো বছর তো হবেই! ধরো—।' কিন্তু পচার বাপ তাকে কথা শেষ করতে দেয় না, 'কথাটা শোনেন ভাইজান! ডাকাত-মারা চরেত হোসেন ফকিরেক কলে কাম হবো। হোসেন ফকির এখন থাকে ঐ চরেত, কিন্তু বাড়িঘর, জোতজমি, চাষবাস সব ধারাবর্ষা চরের মদ্যে। ধারাবর্ষা চরে মিয়াগোরে জমির বর্গাও তারই হাতোত আছিলো।' এবার সে তাকায় আনোয়ারের দিকে, 'আপনের দাদার আমল থ্যাকা হোসেন ফকিরের বাপ ঐ জমিত বাস করে। আপনের দাদা বড়োমিয়ার মেলা জমি তাঁই বর্গা নিছিলো, আপনের বাপচাচারা সব

বেচ্যা দিছে তারই কাছে। অনেকদিনের কায়েমি চর, ধান পাট কালাই খুব ভালো হয়। আপনে গেলেও খুব কাম হলোনি গো!'

কিন্তু আনোয়ার তখন দুই চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে বিশাল বটপ্রসাদ। যেদিকে চোখ পড়ে কেবল গাছের ঝুড়ি। অজস্র ঝুড়ি নেমে এসেছে ওপরের ডাল থেকে। অনেকগুলো ঝুড়ি দেখতে মোটা থামের মতো। এরকম থাম যে কতো গুণে শেষ করা যাবে না। আবার অনেকগুলো ঝোলে দড়ির মতো। মোটা থামগুলোর শরীরে শাদা কষ। ম্লান ধূসর বাকলের ওপর এই কষ দেখে পুরনো বাড়ির নোনা-ধরা থামের কথা মনে পড়ে। আর ঝুলন্ত ঝুড়িগুলো একাগ্রচিত্তে মাটির দিকে নামছে, একদিন এরাও মাটি ছোঁবে, ঢুকে পড়বে মাটির ভেতর, পরিণত হবে এককেটি স্তম্ভে। ঝুড়ি ও থামের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে ১টা রাস্তা, রাস্তায় সাইকেলের চাকার দাগ। ১টা জায়গায় থাম ও ঝুলন্ত ঝুড়ি এমনভাবে সাজানো যে, একটু-ভাঙা পুরনো খিলানের মতো মনে হয়। এই সব থাম, কাণ্ড, ডালপালা, ঝুলন্ত ঝুড়ি নিয়ে বটবৃক্ষ কি কেবল বেড়েই চলবে? জালাল মাস্টার ও পচার বাপের সঙ্গে আনোয়ার বট এলাকার একেবারে ভেতরে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো কয়েক রকম পাখির বিচিত্র কলরব। এই কোলাহল এরকম আকস্মিক মনে হচ্ছে কেন? এটা কি এতোক্ষণ স্থগিত ছিলো? মাঠ থেকে, এমন কি বটগাছের তোরণে পা দিয়েও তো এর কিছুই বোঝা যায়নি। এর মানে কি? কিন্তু মানে বোঝার আগেই পচার বাপের প্রতি জালাল মাস্টারের কথা শোনা যায়, 'না, না, আনোয়ার যাবে কোথায়? ধারাবর্ষা কি এখানে?'

'না, আমার আপত্তি নেই। চলেন না। কবে যাবেন?' আনোয়ার রাজি হওয়ায় পচার বাপ তার হাত জড়িয়ে ধরে, 'যাবেন? তুমি, আপনে, আপনে গেলে গরিবের বড়ো উপকার হয় বাবা। হোসেন আলী ফকিরকে কয়া বল্যা হামার গুনা গরিটা মাপ করায়া দাও বাপ। আল্লা আপনার ভালো করবো বাবা!'

'গুনাগারি?' আনোয়ার দাঁড়ায়, 'গুনাগারি কিসের?'

ঐ তো হলো বাপ। জরিমানা আর কি?' পচার বাপ বোঝাতে চেষ্টা করে, 'জরিমানা কও দণ্ড কও, ট্যাকসো কও, খাজনা কও—ইগল্যান কি?—মানুষের পাপগুনার শাস্তি, না কি কন, ভাইজান?' মানুষের পাপের শাস্তি সম্বন্ধে তার মতামতের অনুমোদন লাভের জন্যে জালাল মাস্টারের দিকে তাকিয়ে পচার বাপ আনোয়ারকে বলে, 'একদিক চলেন বাবা! ফজরের আজানের আগেই নৌকা দিয়া মেলা করলে আগাবেলার মদ্যেই ধারাবর্ষা যায়া ওঠা যাবো। তাক বাড়িতে না পালে যামো ডাকাত-মারা চর। দুইটা চর এক্কেরে কাছাকাছি!'

'যাবো। কবে যাবেন?'

কিন্তু ইতস্তত করে জালাল মাস্টার, 'না বাপু! টাউনের অধিবাসী। নদী খাল চরের মদ্যে ঘোরাঘুরি করলে একটা রোগ ধরতে কতোক্ষণ?'

'না আমার কোনো অসুবিধা হবে না।' আনোয়ারের জেদ বেশ টের পাওয়া যায়। জালাল মাস্টার কিছু না বলে কেবল বটগাছের সাম্রাজ্য দ্যাখে।

'আপনে বাড়িত যায়া বোঝেন! আজ পাছাবেলা আপনের বাড়িত যামো, তখন না হয় তারিখ ঠিক করা যাবো। তো বাবা, গেলে দুই একের মদ্যেই যাওয়া লাগবো।' নিচু ও স্পষ্টভাবে কেবল আনোয়ারের উদ্দেশে বলে পচার বাপ তার বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো। তার চলে যাওয়াটা একটু আকস্মিক, তার অনুরোধে আনোয়ারের সায় পেয়ে সে হয়তো

অভিভূত, তাই ঠিকঠাক নিয়মমতো বিদায় নিতে ভুলে যায়। আবার এও হতে পারে যে, আনোয়ারকে সিদ্ধান্ত বদলের সুযোগ সে দিতে চায় না।

কিন্তু এসব নিয়ে আনোয়ার মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। জালাল মাস্টারের মতো সেও তখন সম্পূর্ণভাবে বটগাছের কব্জায়।

২০

ঝুলন্ত ও মাটিতে-গাঁথা ঝুড়ির মাঝে মাঝে শুকনা পাতা, হলদে ঘাসে-ঢাকা জমির কোথাও কোথাও ছোটো বড়ো আকারের রোদ ও ছায়ার কারুকাজ। রোদ এখানে ঢোকার ফাঁক পেলো কোথায়? আনোয়ার তখন তাকায় ওপরদিকে। মাথার ওপর বটশাখার বীমের ওপর ঘন বটপাতার বিস্তৃত ছাদ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ ও ফিকে লাল গোল ফল। গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ঘিরে কলরব!— ডালের সঙ্গে ঝুলছে, বাদুড়, ডালপালার ফাঁকে চলন্ত পাতার মতো চরে বেড়ায় শালিক। আর খুব ছোটো ছোটো হরিয়াল দফায় দফায় উড়ে অতিক্রম করছে স্বল্পতম দূরত্ব। একটু করে ঠোকর দিচ্ছে লাল ফলের পাতলা রোঁয়াওয়ালা চামড়ায়। ফের উঠে যাচ্ছে আরেকটি ফলগুচ্ছের দিকে। বটপ্রাসাদের ছাদে চলমান প্রাণীদের কোলাহলের সঙ্গে ঠাসবুনুনি পাতার স্পন্দন। পাখি ও পাতার মিলিত গতিবিধি অপরিচিত কোনো ভাষার মতো আনোয়ারের কানে অভিনব ঠেকে। বটছাদ তার কাছে অনেক দূরের কিছু বলে মনে হয়, সে মাথা নামিয়ে নেয় নিচের দিকে। নিচে রোদ ও ছায়ার আলপনার তলায় ল্যাজ ও মুণ্ডু দিব্যি মাটিতে ডুবিয়ে পিঠ উঁচু করে শুয়ে রয়েছে এক মাতাল অজগর। অজগর সাপটির বোধ হয় বোধশোধ লোপ পেয়েছে, আর এদিকে আনোয়ারের সামনে অজগরটি ছাড়া সব কিছু হাওয়া হয়ে যায়। হঠাৎ করে অজগর সাপ নিশ্বাস ফেললে বটতলার শুকনা পাতা ও ধুলোবালি উড়ে গিয়ে পড়ে দূরের ধান-কাটা জমিতে, বুক দিয়ে জোয়াল ঠেলার চেষ্টা খান্ত দিয়ে করমালি সেখানে কোদাল কুপিয়ে চাষ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। ধুলোবালি কি শুকনা পাতার সঙ্গে আনোয়ারও সেখানে ছিটকে যেতে পারলে ভালো হতো। এ ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে যাবার কি কোনো উপায় নাই? এই অজগরের গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে কতোক্ষণ? না, উপায় পাওয়া যায়, কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে বটে, কিন্তু 'আনোয়ার, তোমাকে আগেই বলছিলাম, মনে আছে?' জালাল মাস্টারের প্রশ্নবোধক বাক্যে সে চমকে ওঠে। জালালউদ্দিন দাঁড়িয়ে রয়েছে বুক চিতিয়ে, তার ডান পায়ের নিচে অজগর সাপের ফুলে-ওঠা পিঠ। আনোয়ার নিজে নিজেই লজ্জা পায়, বটগাছের শিকড় শালা কি ভয়ানক ভয় দ্যাখাতেই পারে! গাছের শিকড় অজগরের দেহের বিভ্রম তৈরি করে কিভাবে? সে কি কেবল বয়সের জোরে? নাকি, একই বস্তু শিকড় ও অজগরের দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম? এসব কি এখানকার পুরনো বাসিন্দার কারসাজি?

'আনোয়ার', জালাল মাস্টার ফের বলে, 'এই গাছের বয়স কম কর‍্যা ধরলেও দুইশো তো হবেই। বেশিও হবার পারে!'

প্রমাণ কি? জিগ্যেস করার আগেই জালাল মাস্টার বলে, 'দেখব্যা?' ঝুড়ির ফাঁকে ফাঁকে তাদের হাঁটতে হয়। সরু মোটা, কিলবিল করা ও পিঠ-উঁচু অনেক শিকড়, সেগুলো ডিঙিয়ে, নতুন পুরনো বেশ কয়েকটা কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে জালাল মাস্টার ও আনোয়ার এসে দাঁড়ায় মোটামোটা ১টা কাণ্ডের সামনে। মস্ত মোটা কাণ্ড, কিন্তু সবচেয়ে মোটা নয়। তবে চেহারায় এর বয়স ধরা পড়ে প্রকটভাবে। রোগশয্যায় শুয়ে ছাদের সিলিঙের দিকে ভোঁতা ভোঁতা চোখে তাকিয়ে-থাকা বুড়ো মানুষের ভাঙা গালের মতো কাণ্ডটির শরীর মাঝে মাঝে তোবড়ানো, তার এখানে ওখানে গর্ত। এর একদিকে উঁইপোকার একটা ঢিবি। এই ঢিবির সংযোজনে শরীরের আয়তন বাড়েনি, মনে হয় এটা দিয়ে তার পড়ো পড়ো গতরটা ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

'দ্যাখো।' জালাল মাস্টারের তর্জনী অনুসরণ করে আনোয়ার মাটির দিকে দ্যাখে। ইঞ্চি দুয়েক উঁচু বাঁধানো একটি ইটের বেদি। চুনসুরকির খাবলা খাবলা প্লাস্টার এবং তার নিচে পাতলা চওড়া ইট। এটা দেখিয়ে জালাল মাস্টার বটগাছের বয়স বোঝায় কি করে?

জালাল মাস্টার গম্ভীর হয়ে বলে, 'বৈরাগীর ঘর। এইখানে বৈরাগী বসবাস করছে!'

'বৈরাগী কে?' আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'বৈরাগীর ভিটা তো সবাই বলে, কিন্তু বৈরাগীটা কে?'

আনোয়ারের দিকে না তাকিয়েই জালাল মাস্টার বলে, " 'বৈরাগীটা' নয়। এককালের সম্মানিত ব্যক্তি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ!'

'ও, বৈরাগী তাহলে সত্যি সত্যি ছিলো? আমি ভেবেছি স্রেফ গল্প!'

'গল্প হবে কেন? ইতিহাসের কথা। ইতিহাসের কথা নিয়া মানুষ গল্প করে না? নাটক নভেল লেখে, বায়োস্কোপ করে। ইতিহাস কি তাই কেচ্ছা হয়া যায়?'

বৈরাগীর ব্যাপারে জালাল মাস্টারের উৎসাহের অন্ত নাই। অতিরিক্ত উৎসাহে প্রায় ১৫/২০ সেকেন্ড সে কথাই বলতে পারে না! কেবল এদিক ওদিক দ্যাখে। তারপর বিড়বিড় করে, 'হুঁ! দদুইশো ব্বছর তো হলোই।'

একটুখানি তোতলালেও কয়েকটি বাক্যের ঘষায় তার জিভ হাল্কা হয় এবং মুখ দিয়ে কথা বেরোতে শুরু করে প্রবল-তোড়ে-আসা বমির মতো। মনে হয় কিছুই সে রেখে দিতে পাচ্ছে না, ২শতাব্দী আগেকার সব ঘটনা ও দৃশ্য যেন তার নিজের চোখে দ্যাখা, সেই সব উগড়ে ফেলার জন্যে একেবারে অস্থির!

'দুশো বছর?'

আনোয়ারের সংশয় দেখে জালাল মাস্টার চটে যায়, কেন, ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে, কোম্পানি আমলের শুরুতে ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কথা কি আনোয়ার জানে না? —সে তো জানেই। মজনু ফকির, মুসা শাহ্, ভবানী পাঠক—এদের কথা কে না জানে? —যদি জানে তো এতো সন্দেহ করার কি আছে?

কিন্তু ঐ বিদ্রোহের সঙ্গে বটগাছের সম্পর্ক কি? এই বটতলা থেকে কি বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিলো?

আনোয়ার ঠাট্টা করলে এবার জালাল মাস্টার আর রাগ করে না, বরং এতে তার উৎসাহ বাড়ে। বটগাছের গহীন ভেতরে এই ভাঙাচোরা পাকা জায়গার সঙ্গে বিদ্রোহের একজন নেতার স্মৃতি জড়িত। ইতিহাস বইয়ের ওপর কি সব সময় সম্পূর্ণ নির্ভর করা আনোয়ারের

উচিত? ইতিহাস বই যারা লেখে তাদের চেয়েও অন্তরঙ্গ মানুষের কাছে এসব কথা শোনা, তাহলে অবিশ্বাস করে কি করে?

'শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা গেলো কোথায়?'

জালাল মাস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মনে হয় পরাজিত বিদ্রোহীদের পরিণতির সঙ্গে তার নিজের ভাগ্যও জড়িত। একটু থেমে নিজের দীর্ঘশ্বাসটি সে হজম করে। তারপর জানায় যে, ইংরেজদের হাতে তখন আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। এদেশী বড়োলোকেরা পরিণত হলো তাদের লাঠিয়ালে। মার খেয়ে সন্ন্যাসী-ফকিরের দল ছিটকে পড়ে এদিক ওদিক। যমুনা তখন ছোটো নদী, খাল বললেও চলে, তার পশ্চিম তীরে নওখিলা পরগণার এক প্রান্তে বনজঙ্গল। বনেজঙ্গলে লুকিয়ে তারা আরো বড়ো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ভবানী পাঠক কিছুদিনের জন্য এদিকে আসেন। আনোয়ার বোধ হয় জানে না যে, শেষের দিকে ভবানী পাঠক ও মজনু শাহ্ একজোট হয়েছিলেন। তো এখানে এসে ভবানী পাঠক মিলিত হন ফকিরদের পলাতক কিছু কর্মীর সঙ্গে। বটগাছের তলায় এই বেদী ভবানী পাঠকের তৈরি। তাঁর কি স্থায়ী ঠিকানা থাকতে পারে? ভবানী পাঠক তাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে কখনো চলে যান মহাস্থান, বাঙালি নদী পেরিয়ে, করতোয়া পেরিয়ে মহাস্থান—ফকিরদের বড়ো ঘাঁটি। কখনো বা ঘোড়াঘাট। আবার গঙ্গা পার হয়ে বিহার। কিন্তু বিদ্রোহ আস্তে আস্তে নিভে যায়। বিদ্রোহ নির্বাপিত হওয়ার গল্প বলতে বলতে জালালউদ্দিনের কণ্ঠও মিইয়ে আসে, 'খানদানীরা কেউ অগ্রসর হয়া ফকির-সন্ন্যাসীদের সহায়তা করলো না। তার সব নীরব হয়া থাকলো।'

'না নীরব ঠিক থাকেনি।' আনোয়ার বলে, 'ইংরেজদের চাকর-বাকরে পরিণত হয়ে তারা হামলে পড়লো দেশবাসীর ওপর।'

'দেশের মানুষ কি করে, কও? ফকির-সন্ন্যাসীরা কি করতে পারে? যতোই কও বাপু, শিক্ষিত মানুষ, বড়ো ঘরের মানুষ যদি নেতৃত্ব না দেয় তো কিছুই হয় না।' জালাল মাস্টার হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'দ্যাখো, মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আজম, জওহরলাল নেহরু, ফজলুল হক, শহীদ সোহরোওয়ার্দি—এই সব বড়ে বড়ো ঘরের উচ্চ শিক্ষিত মানুষ অগ্রসর না হলে দেশে স্বাধীনতার সূর্য উদয় হয়?'

উপমহাদেশের এতো সব নেতার নাম ও জালাল মাস্টারের অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাক্য আনোয়ারকে মুগ্ধ করে না, সে বরং পাল্টা জিগ্যেস করে, 'কিন্তু আন্দোলন যদি ঐসব বড়ো বড়ো ঘরের বিরুদ্ধে হয়?'

'বিদেশীর বিরুদ্ধে আন্দোলন, তার আবার বড়ো ঘর ছোটো ঘর কি? দেশের সকল অধিবাসীর সংগ্রাম।'

'কিন্তু বড়ো ঘরের মানুষদের যদি বিদেশী শাসকরা পোষে, তাহলে? এই দুইয়ের স্বার্থ যদি এক হয় তাহলে বড়ো ঘরের শিক্ষিত মানুষ বিদ্রোহীদের সঙ্গে আসবে কেন?'

এসব কথা জালাল মাস্টারের মাথায় ঢুকতে চায় না। ঢোকাবার সখও নাই তার। সে তখন ব্যস্ত সন্ন্যাসীকে নিয়ে। বটতলার এই আস্তানা থেকে তার নিয়মিত অন্তর্ধানের কথা সে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলে। কোথায় যুদ্ধে আহত হয়ে সন্ন্যাসী একবার ফিরে এসেছিলেন। একটু সুস্থ হলে মজনু শাহের কয়েকজন সাগরেদকে নিয়ে তিনি চলে যান পশ্চিমে। সেই যুবকদের কয়েকজন ফিরে আসে, কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর দ্যাখা যায়নি। বটগাছের নিচে মজনু শাহ্ কি মুসা শাহ্—জালাল মাস্টার ঠিক বলতে পারে না,—এই ২জনের ১জনের প্রধান

সাগরেদ সুলতান শাহ্‌ ১টি মক্তব খোলে। সুলতান শাহ্‌ চিরকুমার, তার মৃত্যুর পর তাই ভাইপোর ছেলে কুদ্দুস শাহ্‌ করলো পাঠশালা। আবদুল কুদ্দুসের পাঠশালা, এই অঞ্চলে খুব নামকরা ইস্কুল। নদীতে গোসল করতে গিয়ে কুদ্দুস মৌলবি কুমিরের ভোগ হলো। তারপর কোথায় মক্তব? কোথায় পাঠশালা? বৈরাগীর ভিটা তখন থেকে খালি পড়ে থাকে। দুশো পৌনে দুশো বছর আগেকার কার্যকলাপ জালাল মাস্টার যেন চোখের সামনে দেখতে পায়। কুদ্দুস মৌলবির কথা আনোয়ার আগেও তার কাছে কয়েকবার শুনেছে, এই লোকটি জালাল মাস্টারের প্রপিতামহ। এখন তাঁর সম্বন্ধে বলতে বলতে জালাল মাস্টার হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দীর্ঘশ্বাসের কারণ কি? না, এতো বড়ো মানুষের ভিটা, তার সবটা আর কি-না একটা গাছের কব্জায় চলে যাচ্ছে। আরে বাবা, আল্লাহর জায়গা;—বসত করো, আবাদ করো, লাঙল দাও, ফসল হোক, খাও, সংসার বাড়ুক। তা না করলে? না করলে কি হতে পারে তা এই বটগাছ থেকেই বুঝতে পারো। দ্যাখো না শালার বটগাছ কি রকম ছড়িয়ে পড়ছে। এখানকার এক ছটাক জমিও কি হেলাফেলার বস্তু? এই সব জায়গা হাজার বছর ধরে সুপ্ত ছিলো নদীর জলধারার নিচে, তা নদী থেকে উঠে এসেছে, সেও কয়েক শো বছর তো হবেই। ফসল ফলাবার জন্যে তার প্রচণ্ড কামনা পানির নিচে চাপা পড়েছিলো, জেগে উঠে তাই শরীর বিছিয়ে সে তৈরি হয়ে রয়েছে। লাঙল ছোঁয়ালেই এখানে ফসল; জমির কামুক শরীরে মানুষের গতর খাটালেই শস্য। অথচ দ্যাখো, বটগাছ কিনা দিনের পর দিন মাটি দখল করে চলে। বটগাছ এদিকে বাড়ে, ওদিকে বাড়ে, ৩ বিঘা সাড়ে ৩ বিঘা জমি তো খেয়েই ফেলেছে, মাঠের ওপারে তালপোঁতার মানুষ ভয় পায়, একটা ডাল যদি কোনোরকমে ওদিকে যায় তো সেখান থেকে ঝুড়ি ঝুলে পড়বে, শিকড় বেরুবে, তারপর গ্রাম কি আর লোকালয় থাকবে?

আনোয়ার অবাক হয়, 'তাই কি হয়? যেখানে মানুষ বসবাস করছে, চাষবাস হচ্ছে, সেখানে গাছ বাড়ে কি করে?'

'না গো, তোমরা জানো না। এই গাছের লোভ বড়ো বেশি। মনে হয় ব্যামাক জমি না খালে এর খিদা মিটবে না।' জালাল মাস্টার চোখ দিয়ে বটগাছ চাটে, আস্তে আস্তে হাঁটে, বলে, 'তৃতীয় রিপু শালার বড়ো উগ্র। প্রথম রিপুর কথা আল্লাই জানে!' শেষ বাক্যটিকে রসিকতা বলে মনে করে সে নিজেই একচোট হেসে নেয়, হাসি থামলে বলে, 'কখন মাথা তুল্যা শালা মানুষের ঘরবাড়ির মধ্যে থাম্বা তোলে কেউ কবার পারে?'

গাছের এরকম স্বেচ্ছাচারী সম্প্রসারণের কথা আনোয়ার বিশ্বাস করে না। কিন্তু সেই কথা সরাসরি বলাটাও বেয়াদবির পর্যায়ে পড়ে, সে জিগ্যেস করে, 'তা লোকে গাছ কাটে না কেন? গাছ কেটে ফেললেই তো হয়!'

জালাল মাস্টার হঠৎ একেবারে চুপ করে। চুপচাপ সে হাঁটে, একটু পেছনে হাঁটে আনোয়ার। মাথার ওপর বটপ্রাসাদের শেষ অংশ। এদিকটায় রোদ বেশ উজ্জ্বল। পায়ের নিচে বটপাতার ছোটো ছোটো স্তূপ ক্রমেই আরো ছোটো হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বোঁটা থেকে কি পাখির ঠোঁট থেকে খসে পড়ে পাকা বটফল। এইসব পাতা ও ফল পায়ে মাড়িয়ে কি পাশ কাটিয়ে তারা হাঁটে। এই ২জন মানুষের নীরবতার সুযোগে গাছ ভর্তি শালিক ও হরিয়ালের ধ্বনি উচ্চকণ্ঠ হয়। আনোয়ার কথা বলতে শুরু করলে সেই আওয়াজ ফের পেছনে পড়ে যায়। এই যে জমির ওপর এই মোটা ডালটা এগিয়ে এসেছে, এর থেকেই তো

ঝুড়ি নামবে। ঝুড়ি ঢুকে পড়বে মাটির ভেতর, এইভাবে মাটি মানুষের হাতছাড়া হচ্ছে। কালই করমালিকে বলে এই ডাল কেটে ফেলার বন্দোবস্ত করুক না জালাল মাস্টার!

বটগাছের সীমা পার হয়ে জমির আলে পা দিয়ে জালাল মাস্টার বলে, 'পুরানা গাছ প্রাচীন কালের বৃক্ষ, বহুদিনের সাক্ষী। তাজিম কর্‌য়া কথা কওয়া দরকার।'

'জি?'

'না, ধরো এতোদিনের সাক্ষী। এই গাছ হলো এই এলাকার মুরুব্বি। এ্যার দেহে আঘাত দিলে মুরুব্বিক অপমান করা হয় না?'

আনোয়ার হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঠের ওপারে গ্রাম দেখতে দেখতে জালাল মাস্টার বলে, 'বুঝলা না? গাছের আত্মা থাকে না?'

'গাছের আত্মা? মানে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আত্মা মানো?' জালাল মাস্টার বিরক্ত হয়, 'গাছেরও আত্মা থাকে। বিজ্ঞানেই তো বলে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কি আবিষ্কার করছে, কও তো বাবা?'

'সে তো প্রাণ। গাছের প্রাণ আছে।'

'ঐ তো। জীবের বয়স হলে তারা আল্লার রহমত পায়। পুরানা গাছেরও রুহ্ থাকে। গাছের দেহে ব্যথা দিলে আত্মা কষ্ট পায়।'

'কি রকম?'

'এই গাছে আঘাত করলে তার ভালো হয় না। গাছ রুষ্ট হয়।'

'ভালো হয় না মানে?'

'অমঙ্গল ঘটে।'

'কিভাবে?'

'কতোভাবে হবার পারে।' জালালউদ্দিন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, 'তোমার বাপু আজকালকার শিক্ষিত চ্যাংড়াপ্যাংড়া সবই ন্যাংটা কর্‌য়া দেখবার চাও! মুরুব্বি মানো না!' কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর সে বলে, 'কেউ এই গাছের ডাল কাটলে কি দেহের কোনো জায়গায় কোপ দিলে সেই মানুষের অকল্যাণ ঘটে। তার ক্ষতি একটা না একটা হবেই।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তোমার সাথে মিথ্যা উক্তি করলে আমার লাভ কি?' আনোয়ারের বিস্ময়কে স্বতঃস্ফূর্ত সশ্রদ্ধ ভয় বলে গণ্য করে জালালউদ্দিন উৎসাহিত হয়, 'তো কি? কুড়ালের কোপ দিলে সেই মানুষ রক্তবমি করতে করতে মরবে। না হলে মাথাত বায়ু চড়ে, তখন নিজেই গলাত দড়ি দিয়া মরে।'

'বলেন কি?' আনোয়ারের মনে পড়ে জিনের কথা, 'চেংটু বলছিলো এখানে নাকি জীন থাকে?'

'আরে ঐ ব্যাটার কথা থোও!' জালাল মাস্টার চেংটুর ওপর বিরক্ত হয়েছে, 'জীন থাকলে আছে! তো ঐ চেংটুর কথা বাদ দাও। শালা হস্তিমূর্খ, শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, মাথা গরম, জীন-পরী নিয়া কথা কোস তুই কোন আক্কেলে?'

আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'এখানে কেউ মারা গেছে এভাবে?'

'অনেক!' জালাল মাস্টার পেছনদিকে মুখ করলে আনোয়ারও সেদিকে তাকায়। শীতকালের রোদ নির্দ্বিধায় শুয়ে থাকে সমস্ত মাঠ জুড়ে। মাঠের পর বটগাছকে এখান থেকে

সুদূর ও নির্বিকার বনের মতো মনে হচ্ছে। ঐ বটবনের ভেতরকার অধিবাসী শালিক হরিয়ালের ঐকতান এখন বনের বাইরে আসতে না আসতে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মাঠের রোদের নিচু স্বরের সঙ্গীতের বিস্তৃত ধ্বনিতে। কানে বাজছে অন্য কোনো তৃতীয় ধ্বনি। জালাল মাস্টার তার স্বর হঠাৎ খাদে নামায়, ফিসফিস করে, 'গোটা ইউনিয়ন যদি হিসাব করো তো গড় ৩০/৪০ বছরে কম কর্‍্যা হলেও জনা দশেক মানুষের অপঘাতে মৃত্যু ঘটছে। অভাবে পড়লে চাষাভূষা মানুষের দিশা থাকে না, বিবেচনা বোধ লুপ্ত হয়, বাজারে নিয়া বেচার জন্য গাছের ডাল কাটে। কেউ কেউ কোপ মারার সাথে রক্তবমি কর্‍্যা মৃত্যুবরণ করছে, কেউ আবার বাড়িত যায়া গাছের সাথে দড়ি ঝুলায়া মরছে!'

'সে তো দারিদ্রের জন্যেও হতে পারে। খেতে পায় না, ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে না—!' প্রতিবাদ করলেও আনোয়ারের গলাও এখন নিচু।

'এইসব কথা বেশি না কওয়াই ভালো!' জালাল মাস্টার বিষয়টির উপসংহার টানতে চাইলেও আনোয়ারের বুক শিরশির করে। রোদ কি ঠিক কি একটু দূরের গ্রাম, এমনকি গোটা বটবৃক্ষ ছাড়িয়ে অন্য ১টি ছায়া তার চোখে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে এই অনুমানে সে ওপরের দিকে তাকায়। না, সেখানে বিশাল শূন্যতায় কাঁপে কেবল সাদা। তবু, বটগাছের প্রাচীনতম বাসিন্দার উড়ালের ফলে ১টি শিক্ষা হিসহিস করে ওঠে যদি! আনোয়ার জালাল মাস্টারের গা ঘেঁষে হাঁটে।

২১

রায়সায়েবের বাজারের পুলের মুখে মসজিদের উল্টোদিকে বন্ধ হার্ডওয়্যার দোকানের রকে দাঁড়ালে মানুষের আর শেষ দ্যাখা যায় না। ওসমান প্রথমে তাকায় উত্তরে। কালো কালো হাজার হাজার মাথা এগিয়ে আসছে অখণ্ড স্রোতোধারার মতো। এই বিপুল স্রোতের মধ্যে ঘাইমারা রুইকাতলার ঝাঁক নিয়ে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে কোটি ঢেউয়ের ঢল। দক্ষিণে তাকালেও দ্যাখা যায় এই স্রোতোধারা কেবল এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। ক্যালেন্ডারে যা-ই থাক, ঢাকায় আজ আষাঢ় মাস। উত্তর থেকে আসে বরফ-গলা শহরের স্রোত, উপচে উঠে মানুষ গড়িয়ে পড়ছে পাশের গলিতে উপগলিতে। গলি-উপগলি ভরা কেবল মানুষ, দুই পাশের বাড়িগুলোর ছাদ পর্যন্ত মানুষ। গলি উপগলি থেকে স্রোত এসে মেশে মূলধারার সঙ্গে, মানুষ বাড়ে, নবাবপুর সামলাতে পারে না, মানুষের প্রবাহ ফের গড়িয়ে পড়ে পাশের ফাঁকা গলিতে। ফাঁকা গলি কি আর আছে? সব জায়গা কানায় কানায় ভরা। ঢাকায় কি এতো লোক বাস করে? মনে হয় ঢাকা শহর তার ৩৫০/৪০০ বছরের বুড়ো হাবড়া রোগা-পটকা লোনা-ধরা গতর ঝেড়ে উঠে ছুটতে শুরু করেছে সামনের দিকে। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা। ওসমানের বুক ধক করে ওঠে, এই এতোদিনকার শহর কি আজ তার সব মানুষ, সব রাস্তা গলি উপগলি, বাড়িঘর, সব অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে গড়িয়ে পড়বে বুড়িগঙ্গার অতল

নিচে। না দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা তার শীতের শীর্ণ তনু একেবারে নিচে ফেলে উঠে এসেছে বিপুল স্ফীত হয়ে, বুড়িগঙ্গার অজস্র তরঙ্গরাশির সক্রিয় অংশগ্রহণ না হলে কি এরকম জলদমন্দ্র ধ্বনি উঠতে পারে, 'আসাদের রক্ত'—'বৃথা যেতে দেবো না!' পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখতে চেষ্টা করে ওসমান, না হে, মিছিলের মাথা দ্যাখা যায় না। অনেক সামনে উঁচু ১টা বাঁশের মাথায় ওড়ে আসাদের রক্তমাখা শার্টের লাল ঝাণ্ডা। বাঁশের মাথায় এই শার্ট হলো দস্তিদারের হাতের লাল লণ্ঠন। নদীর জাহাজ নয়, নদীই আজ ছুটতে শুরু করেছে দস্তিদারের লাল লণ্ঠনের পেছনে। এই পাগলপারা জলোস্রোতকে আজ সামলায় কে? ভরা বুকেও ওসমানের একটু খারাপ লাগে বৈ কি?—আনোয়ারটা এসব দেখতে পারলো না। এতো বড়ো মিছিল ঢাকায় কোনোদিন বেরিয়েছে? বেচারা কোথায় কোন গ্রামে গেলো, গ্রামে যতো আন্দোলন হোক, এতো মানুষ কি একসঙ্গে দ্যাখা যাবে? কাল ইউনিভারসিটির ছেলেকে মেরে ফেললো আইয়ুব খানের পুলিস, এতো বড়ো বিক্ষোভ ঘটে যায়, আনোয়ার কিছুই দেখতে পারলো না! আনোয়ার কি জানে যে ঢাকা এতো মানুষকে ঠাঁই দিতে পারে? সেই কোন ছেলেবেলায়, ৪ বছর বয়সে ওসমান ঢাকায় এসেছে। দিন যায়, লোকসংখ্যা বাড়ে, এলাকা প্রসারিত হয়। কিন্তু না, এতো মানুষ ঢাকায় সে কোনোদিন দ্যাখেনি। কোন বইতে যেন পড়েছে, শায়েস্তা খাঁ না কার আমলে ঢাকায় লোকসংখ্যা নাকি লন্ডনের চেয়ে বেশি ছিলো। সে কবে? কতোকাল আগে? ওসমানের বুক ছমছম করে: এই এতো মানুষের সবাই কি তার মতো শ্বাসপ্রশ্বাস-নেওয়া মাছ-ভাত খাওয়া সাধারণ মানুষ? এই যে জনপ্রবাহ, এর অনেকের কাপড় চোপড়, চেহারা তার কাছে অপরিচিত ঠেকছে? এরা কে? তার মানে, অনেক কাল আগেকার মানুষও কি মিছিলে যোগ দিয়েছে? ঐ তো, মিছিলের মাঝখানে ইসলাম খাঁর আমলের খাটো-ধুতি-পরা ঢাকাবাসী! এমনকি তারো আগে চালের বস্তা বোঝাই নৌকা বেয়ে যারা সোনারগাঁও যাতায়াত করতো তারাও এসেছে। বাঙলা বাজার, তাঁতীবাজারের মানুষ লুপ্ত-খালের হিম হৃদপিণ্ড থেকে উঠে এসেছে? ঐ তো ইব্রাহিম খাঁর আমলে শাহজাদা খসরুর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত পাগড়ি-পরা সেপাইরা। শায়েস্তা খাঁর টাকায়-আট-মণ-চালের আমলে না-খেয়ে-মরা মানুষ দেখে ওসমান আঁতকে ওঠে। ৩০০ বছর ধরে তাদের খাওয়া নাই,—কালো চুলের তরঙ্গ উড়িয়ে তারা এগিয়ে চলে পায়ে পায়ে। মোগলের হাতে মার-খাওয়া, মগের হাতে মার-খাওয়া, কোম্পানীর বেনেদের হাতে মার-খাওয়া—সব মানুষ না এলে এই মিছিল কি এতো বড়ো হয়? রেসকোর্সের কালীবাড়ির ইটের শুকনা পরত খুলে খাঁড়া হাতে নেমে এসেছে মারাঠা পুরোহিত, মজনু শাহের ফকিররা এসেছে, ঐ তো বুড়ো আঙুল-কাটা মুঠির ঘাই ছুঁড়তে ছুঁড়তে যাচ্ছে মসলিন তাঁতী, তাদের কালে কালো খালি গা রোদে ঝলসায়। ৪০০০ টাকা দামের জামদানী-বানানো তাঁতীদের না-খাওয়া হাড্ডিসার উদোম শরীর আজ সোজা হেঁটে চলছে। সায়েবদের হাতে গুলিবিদ্ধ বাবুবাজার মসজিদের ইমাম মোয়াজ্জিন মুসল্লিরা চলেছে, বিড়বিড় করে আয়াত পড়ার বদলে তারা আজ হুঙ্কার দিচ্ছে, 'বৃথা যেতে দেবো না!' লালমুখো সাহেবদের লেলিয়ে-দেওয়া নবাব আবদুল গনি-রূপলাল মোহিনীমোহনের শ্বাদন্তের কামড়ে-ক্ষতবিক্ষত লালবাগ কেল্লার সেপাইরা আসে, ভিক্টোরিয়া পার্কের পামগাছ থেকে গলায় দড়ি ছিঁড়ে নেমে আসে মীরাটের সেপাই, বেরিলির সেপাই, সন্দ্বীপ-সিরাজগঞ্জ-গোয়ালন্দের সেপাই। না হে, তাতেও কুলায় না। যুগান্তর অনুশীলনের বেনিয়ান ও ধুতি-পরা মাতৃভক্ত যুবকেরা আসে, তাদের মাঝখানে কলতাবাজারে নিহত ছেলে ২টিকে আলাদা করে চেনা যায়।

নারিন্দার পুলের তলা থেকে দোলাই খালের রক্তাক্ত ঢেউ মাথায় নিয়ে চলে আসে সোমেন চন্দ। ঐ তো বরকত! মাথার খুলি উড়ে গেছে, দেখে একটু ভয় পেলেও ওসমান সামলে ওঠে। এতো মানুষ! নতুন পানির উজান স্রোতে ঢাকার অতীত বর্তমান সব উথলে উঠেছে আজ, ঢাকা আজ সকাল-দুপর-বিকাল-রাত্রি বিস্মৃত, আর তার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ নাই, সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সকল ভেদচিহ্ন আজ লুপ্ত। সীমাহীন কাল সীমাহীন স্থান অধিকারের জন্য ঢাকা শহর আজ একাগ্রচিত্ত। ওসমানের বুক কাঁপে; এই বিশাল প্রবাহের সঙ্গে সে কতোদূর যেতে পারবে? কতোদূর? গোলক পাল লেনের মুখে কলের নিচে কাঁপতে-থাকা কলসি যেমন পানিতে ভরে স্থির হয়, আমাদের ওসমান গনির বুকটাও দেখতে দেখতে পূর্ণ হলো, এই অবিচ্ছিন্ন স্রোতোধারার ক্ষুদ্রতম ১টি কণা হয়েও তো সে এই হৃৎপিণ্ডে তাপ বোধ করতে পারছে। তাই বা কম কি? ভরা-বুকে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে সে হুঙ্কার দেয়, 'বৃথা যেতে দেবো না।'

'ওসমান!'

ওসমান প্রথমে এই ডাক শোনে নি। আরেকবার ডাকলে সে চমকে ওঠে, কে ডাকে? মজনু ফকিরের কোনো কর্মী তাকে চেনে? নাকি ভিক্টোরিয়া পার্কের পামগাছ থেকে দড়ি ছিঁড়ে-আসা-বেরিলির সেপাই? নাকি সোমেন চন্দ?—কে ডাকে? তার শরীর শিরশির করে। তাকে কে চেনে? এখানে কে চেনে?

'ওসমান! এই যে!'

কে?

'আরে রকে দাঁড়িয়ে কি করছেন? আসেন!' শওকতের হাতের চুরুট নিভে গেছে, ফের ধরাতে ধরাতে বলে, 'আসেন।'

শওকতের পাশে চলতে চলতে ওসমান এদিক ওদিক তাকায়। ঐ লোকগুলো গেলো কোথায়? আনোয়ার থাকলে এসব কথা বলা যেতো। শওকত বিশ্বাস করবে না।

বেলা গড়ায়। বুড়িগঙ্গার পাশাপাশি ইসলামপুর ধরে আরেকটি স্রোতোধারা বইছে। চাপা রাস্তায় অকুলান হয় বলে উঁচু উঁচু বাড়ির মাথা থেকে পা পর্যন্ত থৈ থৈ করে মানুষ, কেবল মানুষের পাক, মানুষের ঢেউ।

বাবুবাজারে পৌঁছে শওকত বলে, 'চলেন কিছু খেয়ে নিই। সোয়া তিনটে বেজে গেছে।' কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছা ওসমানের একেবারেই নাই। যতোই বাজুক, হোক না শীতকাল, ঢাকায় আজ ভরা বর্ষা। বর্ষাকালের মেঘহীন আকাশে কিসের দুপুর, কিসের বিকাল? এই তো একটু গেলেই বাবুবাজারের পুল, তারপর দুদিকে কেমিক্যাল ও পারফিউমারি দোকান, সুগন্ধের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে কিছুটা পার হলেই চকবাজারের ফাঁড়ি, সেখানে একটা চক্কর দিয়ে এই স্রোতোধারা চলে যাবে জেলখানার দিকে, জেলখানার পাশ দিয়ে নাজিমুদ্দিন রোড। জেলখানার দেওয়াল ঘেঁষে যাবার সময় এর ঢেউ কি আরো উত্তাল হয়ে উঠবে না? এমন তো হতে পারে জেলখানার কাছে পৌঁছুলে এই ঢলের মুখে ভেঙে পড়লো জেলখানার মস্ত উঁচু দেওয়াল! হতে পারে না? ভেঙে পড়লো জেলখানা, জেলখানার নিচে লুকিয়ে থাকা ইব্রাহিম খাঁর দুর্গ, সাহাজাদা খুররমের দুর্গ? ওদিকে চলবে এই প্লাবনের ভাঙন, আর সে কি না বাবুবাজারের কোনো এক নিচু ছাদ-চাপা রেস্টুরেন্টে বসে রুটি-গোশত গিলবে?

'না, না। চলেন। শহীদ মিনার পৌঁছে না হয় কিছু খেয়ে নেবো।'

'আরে আমরা খেতে খেতে মিছিল আর কতোদূর যাবে? এতো বড়ো মিছিল, এর শেষ মাথা আসার আগেই আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে যাবে।'

ওসমান কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না, মিছিল যদি তাদের ছেড়ে এগিয়ে যায়! বলে, 'দরকার কি? রেস্তে গিয়ে পরোটা-শিককাবাব খাওয়াবো। এখন চলেন।'

শওকতকে ঠেকানো অতো সোজা নয়, 'হু কেয়ার্স ফর পরোটা-শিককাবাব? চলেন, পালোয়ানের দোকানে মোরগ পোলাও মেরে দিই।'

কিন্তু ওসমানের ভয় হয় মূল স্রোতোধারা থেকে ছিটকে পড়ে একটি নিঃসঙ্গ জলবিন্দুর মতো সে আবার হাওয়ায় শোষিত না হয়। খুব আস্তে করে বলে, 'আপনি খেয়ে নিন। আমি যাই।' কিন্তু এই কথা এতো আস্তে বলা হয়েছে যে, শওকত তাতে কান দেয় না। কিংবা শওকতের চুরুটের গন্ধে কি তার খিদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে? চুপচাপ সে শওকতকে অনুসরণ করে। ওসমানের পাশ দিয়ে মিছিল গর্জন করতে করতে সামনের দিকে চলে।

রাস্তা থেকে খুব সরু ও ছোট্টো গলি, তারপর ২টো ৩টে ধাপ নিচে নামতে হয়। ঘরে ঢোকার আগেই মোরগ পোলাওয়ের গন্ধ মাথা জুড়ে একচ্ছত্র রাজত্ব করে। ওরা বসার কিছুক্ষণের মধ্যে ২টো প্লেট আসে, পোলাওয়ের ওপরে ২টো মুরগির রান। পাশে এনামেলের ২টো পিরিচে কলজে ও গিলা।

খেতে খেতে মুখ তুললে দেওয়ালের আয়নায় ওসমান বাঁকা-চোরা প্রতিফলন দ্যাখে। চারিদকের দেওয়াল জুড়ে আয়না, যেদিক তাকানো যায় মোগর-পোলাওতে-মনোযোগী মানুষের মুখ। এতো মানুষের প্রতিকৃতির মধ্যে ওসমান নিজেরটা খোঁজে। কিন্তু ঠিক ঠাহর করতে না পেরে তার গলা শুকিয়ে আসে, তার মুখ কোথায়? আয়নায় সবাই আছে, তো সে নাই কেন? এতো মানুষের মধ্যে সে কি তবে হারিয়ে গেলো? তাহলে মিছিলে লক্ষ মানুষের মধ্যে তার গতি হবে কি? খাওয়া স্থগিত রেখে ওসমান আয়নায় নিজের চেহারা সনাক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। শওকত জিগ্যেস করে, 'কি হলো? আর এক হাফ আনতে বলি? বলতে বলতে শওকত হাত তুললে আয়নায় তার প্রতিকৃতি আলাদা করে বোঝা যায়। পাশে ওসমান। স্বস্তি পেয়ে ওসমান ফের রান চিবায়। তবে আয়নায় তাকে বেশিরকম ইয়াং লাগছে, চেহারাটা একেবারে বালকোচিত হয়ে গেছে। মুরগির রানের হাড়ের ভেতরকার কচুকুচে শাঁস তার দাঁতে জিভে টাকরায় ও গালের ভেতরদিকের দেওয়ালে অপূর্ব স্বাদ ঘনীভূত করে তোলে। এই স্বাদ কি তার জিভের ও মুখের এতোকালের আস্তরণ ভেদ করে কতোকাল আগেকার অন্য ১টি মুরগির অন্য ১টি রানের পিষ্ট আমিষকে উত্থিত করে তুলছে? এইতো আয়নার দ্যাখা, দিব্যি বালক হয়ে ওসমান পোলাওয়ের গ্রাস মুখে নিচ্ছে। তার সামনে কে? একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারে যে, সামনে ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনকে মনে নাই?

ক্লাস সিক্সে, ক্লাস সেভেনে ক্যাপ্টেন আর ওসমান একই বেঞ্চে বসতো, বাইরে বেড়াতো এক সঙ্গে। প্রথমদিকে কিন্তু এতো খাতির ছিলো না। স্যার ক্লাসে ঢোকার আগে গোলমাল করার জন্যে ছেলেদের নাম লেখার দায়িত্ব ছিলো ক্যাপ্টেনের, তাকে তাই যমের মতো ভয় করতো সবাই। তাকে তোয়াজ করতে করতেই খাতির জমে গেলো। আজ এতোকাল পর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সে এই দোকানে বসে মোরগ-পোলাও খাচ্ছে! ওসমানের হাসিও পায়, এতোকাল আগেকার সব ঘটনা, ঠিক মনে থাকে। আবার দ্যাখা পরশুদিন পড়া বই দিব্যি ভুলে যাই।—ওসমান চারদিকে তাকায়, এখানে এর আগে একবারই এসেছিলো; না, সব

অমনি আছে। সামার ভ্যাকেশনের আগের দিন স্যারদের সেবার মোরগ-পোলাও খাওয়ানো হলো। ছুটির আগের দিন ওদের স্কুলে ক্লাসে ছোট্টো উৎসব হতো। হেড স্যারের নেতৃত্বে স্যাররা ক্লাসে ঢুকলে ছেলেরা গান ধরতো, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।/পুরব বাঙালার শ্যামলিমায়/পঞ্চ নদীর তীরে অরুণিমায়/'—আর কোনো লাইন মনে নাই। গান করতে করতে কেউ হেসে ফেললেও স্যররা সেদিন কিছু বলতো না। গানের পর হেডস্যরের বক্তৃতা, তারপর খাওয়া দাওয়া। প্রস্তুতি চলতো কয়েকদিন আগে থেকে। স্যররা ক্লাসে এসে উস্কে দিয়ে যেতো। রমিজ স্যর হয়তো বললো, 'কি রে কটাবানরের দল, এবারও কি কদলীভক্ষণ?' গতবার এই ছেলেদের ক্লাসে সিঙাড়া মিষ্টি কম পড়ায় ঐ স্যরদের কেবল কলা খেয়ে বিদায় নিতে হয়েছিলো। রমিজ স্যর তাই মনে করিয়ে দিলো, 'শোন, 'ক্লাস ফোরের সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, এবার পরোটা-কাবাব-পনিরের ব্যবস্থা করছে! তোমরা সব ধাড়িগুলো ডালে বসে কদলী সেবন করো!' আবার সারদাবাবু এসে উপদেশ দেয়, 'এবার কালচান্দরে আগেই বইলা রাখিস! ক্লাস সিক্স আষ্ট আনা প্লেট মিষ্টি দিবো, আগে অর্ডার না দিলে ফাঁকির মধ্যে পড়বি কইয়া রাখলাম!'

সাইনু পালোয়ানের দোকানে আগেই বলা ছিলো, সেবার ক্লাস সেভেন মোরগ-পোলাও দিয়ে সবাইকে থ করে দেবে! ক্যাপ্টেন খুব ভোরে জানলার কাছে এসে ডাকে, 'এই রঞ্জু, ওঠ!' রঞ্জু তো রাত থাকতে জেগে বসে আছে, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বেরিয়ে দ্যাখে তাদের রাজার দেউড়ির ভাঙাচোরা বাড়িঘরের ছাদে, লোনা-ধরা দেওয়ালে, খোয়া ও পিচ-ওঠা গলিতে কী সুন্দর গোলাপি রঙের ভোর। কয়েক পা হেঁটে ক্যাপ্টেন বলে, 'ল, মালাউনটারে লগে লই!' শঙ্করকে মালাউন বলে ওর প্রতি নিজের দুর্বলতাকে ক্যাপ্টেন আড়াল করতে চায়। রঞ্জু এসব তখনই বুঝতো! বুঝতো না কে? ক্লাসে স্যর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যাদের নামে শাস্তিবিধানের সুপারিশ করা হয় তাদের মধ্যে শঙ্কর কখনো থাকে না। আবার স্কুলের পায়খানার সারির পেছনে একদিন স্কুলে ছুটির পর ক্যাপ্টেন আর শঙ্করকে এক সঙ্গে প্যান্ট খোলা অবস্থায় দেখছে আমিন। ব্ল্যাকবোর্ডে কে যেন একদিন লিখেও রেখেছিলো ক্যাপ্টেন + শঙ্কর। রঞ্জু এসব খুব বোঝে।

তাঁতীবাজার ঢুকে প্রসন্ন পোদ্দার লেনের উল্টোদিকে শঙ্করদের বাড়ি, বাড়ির সামনে হাল্কা নীল শাড়ি-পরা একটি মেয়ে টগর ফুল তুলছে। তার হাতে বেতের সাজিতে গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা। গরমের ভোরবেলাটা কি ফর্সা, মেয়েটার গায়ের রঙ ফর্সা, ওর হাতের ফুলগুলো সাদা। ঝিরঝির করে হাওয়া বইলে মেয়েটার বাসি মাথায় এলোমেলা চুল একটু একটু ওড়ে। কয়েক গাছি চুলের নিচে ফর্সা মুখ আরো ফর্সা মনে হয়। ঠিক প্রতিমার মতো। স্কুলে সরস্বতী পূজার সময় একে বেদীতে বসিয়ে দিলে কার সাধ্য ধরে যে এ আসল দেবী নয়!

ক্যাপ্টেনকে দেখে সরস্বতী প্রতিমা বলে, 'কি কবীর, সব রেডি?

মেয়েটির উঁচু-নিচু দাঁত দ্যাখা যায়, তাতে প্রতিমাত্ব অনেকটা কমে, ফলে সে আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

কবীর বলে, 'মেজদি, এতো ভোরে উঠছেন?'

'ভোর কোথায়? পোনে ছয়টা বাজে, সোয়া পাঁচটায় সূর্য ওঠে, এখন কি ভোর হলো?'

'ফুল দিয়া পূজা করবেন মেজদি?'

'তোমাদের স্যরদের পূজা। শঙ্কর অর্ডার দিয়া রাখছে, ভোরবেলা ফুল চাই!' রঞ্জুর ইচ্ছা করে সে-ও একে মেজদি বলে ডাক। হিন্দুদের ডাকগুলো কি সুন্দর! চেহারার সঙ্গে কি চমৎকার খাপ খায়! শরৎচন্দ্রের মেজদিদির চেহারা বোধহয় এরকম ছিলো। না, সে তো অনেক বড়ো, তার ছেলেও ছিলো ১টা। আর যে কেষ্ট না ফেষ্ট তাকে মেজদি বলে ডাকতো সেটা একটা গাধা! কয়েকদিন আগে রূপমহলে 'নিস্কৃত' দেখেছে, সন্ধ্যারানীর সঙ্গে এই মেজদির মিল আছে নাকি? একদিন রাত্রে আব্বার নিয়ে-আসা কোন এক ম্যাগাজিনে সন্ধ্যারানীর ফুল-পেজ ছবিতে ওসমান চুপ চুপ করে কয়েকটা চুমুও খেয়েছে। সেই কথা মনে পড়লে রঞ্জুর ঠোঁট শুকিয়ে এসেছিলো। আরে নাঃ! এই মেজদি কতো রোগা, কতো ফর্সা, কতো আবছা-আবছা।

মেজদি বলে, 'কবীর, যাও না! শঙ্কর তো এখনো ওঠে নাই। না ডাকলে ওর ঘুম ভাঙে?' ক্যাপ্টেন গটগট করে ভেতর চলে যায়। শালার হাঁটুর নিচে এখনি লোম উঠেছে বড়ো বড়ো, ফেল করতে করতে ওঠে, নইলে এতোদিন ক্লাস নাইনে পড়তো! ভেতরে গেলো, রঞ্জুকে একবার সঙ্গে যেতে বললো না পর্যন্ত!

'তুমি ওদের সঙ্গে পড়ো, না?' তার জবাব না শুনেই মেজদি ফের বলে, 'তোমাদের ইস্কুলই ভালো, আজ হইয়া ছুটি, না? আমাদের ছুটি হতে এখনো সাতদিন। পচা ইস্কুল। দেশে যাইতে যাইতে কাঁচা আম একটাও যদি পাই!'

'ক্যাঠা রে আরতি? ক্যাঠা? কার লগে কথা কস, এ্যাঁ?' কাশতে কাশতে বেরিয়ে আসে এক প্রৌঢ়, ধুতিটা লুঙির মতো পরা, খালি গা খালি পা। বলে, 'কি চায়?'

একটু রাগ ও একটু ভয় মেশানো গলায় আরতি বলে, 'পল্টুর ক্লাসমেট বাবা!'

'রাত পোয়াইতে না পোয়াইতে বাবুর ইয়ারবন্ধুরা সব আইসা পড়ছে?'

বাবাকে সামলাবার জন্য আরতি বলে, 'মর্নিং স্কুল চলতাছে তো, তাই ডাকতে আসছে।' নিশ্বাসের একই টানে রঞ্জুকে জিগ্যেস করে, 'ও মা তোমার নামই শুনি নাই। তোমার নাম যেন কি?'

'শেখ মোহাম্মদ ওসমান গণি।'

এবার শঙ্করের বাবা হঠাৎ বলে, 'পল্টুরে ডাইকা দে।' ওসমানকে জিগ্যেস করে, 'পল্টুর ক্লাসমেট?'

'জী।'

জবাব শুনে লোকটা চ্যাঁচায়, 'অরে ডাইকা দে না! পল্টু, উঠলি না? নয়টা না বাজলে বাবুর ঘুম ভাঙবে না। মানুষ খাড়াইয়া থাকবো?'

তার ব্যস্ততা বাড়াবাড়ি ঠেকে। চারদিকের কেমন ফাঁকা ফাঁকা। কয়েক মাস আগে রায়ট হয়ে গেছে, কোনো কোনো বাড়িতে লোকজন নাই, অনেকে হয়তো কোনোদিন ফিরবেও না। কয়েকটি বাড়িতে মেয়েরা নাই, তাদের ইন্ডিয়া পাঠিয়ে পুরুষগুলো সিচুয়েশন দেখছে। শঙ্করের বাবার উদ্বেগ ও ধমক এই বাড়িতে একটু কাঁপন তোলে, সেই কাঁপুনি বশ করার জন্যেই যেন আরতি ফের জিগ্যেস করে, কি নাম যেন বললে?'

'রঞ্জু!'

নাম জিগ্যেস করলে ওসমান কখনো কিন্তু ডাকনাম বলে না। কেউ জানতে চাইলে পুরো নাম না বললে আব্বা খুব রাগ করে। ইব্রাহিম শেখের কাছে নাম মানে পুরো নাম, 'তোমার নাম শেখ মোহাম্মদ ওসমান গনি। নাম জানতে চাইলে তো বললে, "রঞ্জু"! কি তোমার

নাম? তোমাকে যেমন "বাবা" "বাবু" বলি, তেমনি "রঞ্জুও" বলি। সবসময় আসল নাম বলবে। নইলে দুটো খাসি জবাই করে আকিকা দেওয়ার কি দরকার ছিলো?'

কিন্তু মেজদির সামনে ওসমান রঞ্জুই থাকতে চায়। মেজদি কি তাকে ওসমান বলে ডাকবে? দূর! তাই কি হয়?

আরতি বলে, 'রঞ্জু? ওসমান না কি যেন বললে?'

এই কথায় ওসমান লজ্জায় মরে যায়। সে যেন প্রত্যাখ্যাত হলো। কি থেকে প্রত্যাখ্যাত? সহপাঠীর বোনের কাছে তার ডাকনামটা নিবেদন করেছিলো, তাই কি নাকচ হয়ে গেলো? —রঞ্জুটা বড়ো ছেলেমানুষ ছিলো! শওকতের মুখোমুখি মোরগ পোলাও খেতে খেতে ওসমান গনি আপন মনে হাসে, ছেলেবেলায় সে বড়ো সেন্টিমেন্টাল ছিলো! কি কথায় যে রাগ হতো, কোন কথায় যে তার অপমান বোধে টং করে বাড়ি লাগতো! আরতিকে মেজদি বলে ডাকার সাধটা একেবারে নিভে গিয়েছিলো।

শাঁখারি বাজার দিয়ে বেরিয়ে ৩জন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। ফুলের ডালা নিয়ে বসে ছিলো ২জন মালী। রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি, রিকশা চলতে শুরু করেছে। ফুলের ডালার বিপরীত দিকে মাঠা মাখন নিয়ে বসেছে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা বুড়োটা। সেখানে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন কি হিসাব করে, তারপর বলে, 'মাঠা খাইবি?'

এর মধ্যে কালাচাঁদের দোকানের ঝাড়পোঁছ শেষ হয়। হাঁড়িতে মিষ্টি ও ঝুড়িতে ফুল দিয়ে শঙ্কর একটা রিকশায় উঠলে ক্যাপ্টেন বলে, 'চল না, এক প্লেট খাইয়া এক লগে যামু!'

'না।' মোরগ পোলাও খেয়ে শঙ্কর জাত নষ্ট করবে না। ওর বাবা প্রায়ই বলে, রায়টে যখন বেঁচে গেছে তার মানে ভগবানের একটা ইঙ্গিত রয়েছে: 'ভগবানে প্রাণটা রক্ষা করলো, জাত বাঁচাবার দায়িত্ব তার সৃষ্টির।' হরেন ডাক্তারকে কে বোঝাবে যে আরতির বড়োবোন সবিতার দিকে তাহের গুণ্ডার একটা চোখ বিশেষভাবে সাঁটা ছিলো বলে ওরা প্রাণে বেঁচে গেছে। রায়টের পর পরই সবিতাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতায়। দূর সম্পর্কের মামার বাড়িতে রেখে তার বিয়ের চেষ্টা চলছে। এরপর রায়ট বাধলে জাত ও প্রাণ ২টোর ১টাও সামলাবার দায়িত্ব ভগবান নেবে কি-না সন্দেহ।

সাইনু পালোয়ান নিজে তদারক করে হাঁড়িতে ৫০ প্লেট মোরগ-পোলাও পরিপাটি করে গুছিয়ে দিলো। সঙ্গে ৫৫টা কাঁঠাল-পাতার ঠোঙা। ক্যাপ্টেন ও রঞ্জু ২ প্লেট খায় ফ্রি। খাওয়ার জন্যে ব্যবহৃত সেই সব দাঁতে অনেক খাবার চিবানো হয়েছে, জিভে আস্তরণ পড়েছে, অথচ দ্যাখো এখনো তারিয়ে তারিয়ে গলা পর্যন্ত সেই স্বাদ নেওয়া যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন খেতে খেতে বলছিলো, 'আমরা খাইছি কেউরে কইবি না, বুঝলি? জলদি খা!'

'জলদি করেন!' চুরুট ধরাতে ধরাতে এখানে এখন তাড়া দিচ্ছে শওকত। তার মুখ দ্যাখা যায় না, ওসমান বলে, 'রিকশায় যাবো, স্কুলে যেতে কতোক্ষণ লাগবে?'

'রিকশায় যাবেন? কোন স্কুলে?' শওকতের হাসির শব্দে ও চুরুটের গন্ধে ওসমানের ঘোর কাটে।

ওসমান একটু হাঁপায়। কয়েকটি মিনিটের মধ্যে এতোগুলো বৎসর পারাপার করার ধকল কি কম? তার আর উঠতে ইচ্ছা করে না। ধীরেসুস্থে হাত ধুয়ে কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালো। শওকত তখন বিল শোধ করছে। ওসমান দেওয়ালের আয়নার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। আরে একি! রঞ্জু এসে পড়লো কখন? রঞ্জুর সঙ্গে কি রানুও আছে? সামনের

পারদ-ওঠা আয়নায় মঞ্জুর প্রতিকৃতি, তার হাওয়াই শার্টের পকেটে এম্ব্রডারি করা প্যাগোডা। রঞ্জুকে দ্যাখার জন্য সে পেছনদিকে মুখ ঘোরায়, নাঃ রঞ্জু কোথায়। রঞ্জু এখানে আসবে কোত্থেকে? এইসব ৫০/৬০ বছরের আয়নায় মানুষকে যে কিরকম দ্যাখায়! ওসমান ঘুরে দাঁড়ালে আয়না থেকে রঞ্জু অদৃশ্য হয়।

আয়নায় রঞ্জুকে দেখছে মনে করে যে চঞ্চলতা ও উত্তেজনা হয়েছিলো তা কেটে যাওয়ায় ওসমানের মাথা ও বুক খুব খালি খালি লাগে। অবসাদ আরো বাড়ে। মিছিলের ল্যাজের পাতলা অংশটি তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দোকান থেকে সিগ্রেট কিনে ওসমান সিগ্রেট ধরায়। মিছিলের গর্জনে তার ভয় হয়, এর ভেতর ঢুকে সে কি সমান তালে হাঁটতে পারবে? এমনকি শ্লোগানও দিতে পারবে কি? এতো মানুষের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলে তাকে চিনবে কে? শওকতকে বলে, 'আপনি যান, আমি ফিরে যাবো।'

'মানে?'

'আমার শরীরটা খারাপ। খুব টায়ার্ড! আমি বরং বাসায় যাই।'

'বাসায় যেতে হলেও তো হেঁটেই যেতে হবে। তার চেয়ে চলেন, একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে মিছিলের মাঝামাঝি চলে গেলে দেখবেন ভালো লাগবে।'

শওকতের যুক্তি ও পরামর্শে ওসমান ভ্রূ কোঁচকায়, এই লোকটা অন্যের প্রব্লেম বুঝতে পারে না। এর কথার প্রতিবাদ করাও মুশকিল। তার খুব বমি বমি লাগছে। আস্তে আস্তে বলে, 'না, আমি চলি।'

শওকত তাড়াতাড়ি মিছিলে যাবার জন্য উদগ্রীব, 'আপনি বোধহয় খুব সিক। একা যেতে পারবেন?'

'খুব!'

২২

শাঁখারি পট্টিতে ঢুকে পলেস্তারা-খসা ও ইঁট বার-করা চুনসুরকির উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে ওসমান হাঁটছে আর সেই সব বাড়িঘরের শুকিয়ে-যাওয়া মজ্জার গভীর ভেতরকার শাঁস থেকে সোঁদা সোঁদা ও ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে তার শরীরে! ফলে অবসাদ একটু একটু করে কাটে, শরীর ফুরফুরে মনে হয়। সেই হাওয়ার এককেটা দমক এসে হাথায় ঝাপটা মারে: ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এই রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে এরই একটা গলি ধরে সে ঢুকে পড়েছে তাঁতীবাজার, কিংবা বেরিয়ে গেছে ইসলামপুরের দিকে। না, শঙ্করদের বাড়ি আর যাওয়া হয়নি। ক্যাপ্টেন ঐ একদিনই ওকে নিয়ে গিয়েছিলো, তা শঙ্করের কাছে যাবার সময় ক্যাপ্টের কোনোদিন কাউকে সঙ্গে নিতো না। ওসমান পরে হয়তো যেতো, কিন্তু ম্যাট্রিক পাস করে আরতি কলকাতা চলে গেলো, মাস ছয়েকের মধ্যে গেলো শঙ্করদের বাড়ির আর সবাই। হ্যাঁ, ওসমানের সব মনে আছে। যতোই ইন্ডিয়া নিয়ে যাক, ঐ খাটো-ধুতি খালি গা,

খালি পা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সাধ্য কি ওদের দুই ভাইবোনকে এই পাড়া থেকে শেকড়বাকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলে? ওসমান এইতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, অপরিবর্তিত শাঁখারি পট্টির কলের ধারে ধারে কলসি, বালতি ও হাঁড়ির সারি। পাশে পাশে দাঁড়ানো শাড়ি ও ফ্রকওয়ালা ফ্যাকাশে ফর্সা মুখের মেয়েগুলো। মেয়েদের ঝগড়া চলছে, তাদের নালিশ চলছে, তাদের স্বর এই আবদেরে আবদেরে, আবার পরের মুহূর্তে ঝাঁঝালো। ওসমান একটা গা-ঝাড়া নিশ্বাস ফেলে: না, এখানে অবিকল সব একই রকম রয়ে গেছে! ফ্রকের নিচে তাদের চিকন বা শাঁসালো পাগুলো এবং শাড়ির তলায় তাদের নিস্তেজ বা চাঙা বুক একইভাবে পুরুষের শরীরে হাওয়া খেলায়। খোঁচা খোচা কালো-সাদা দাড়িওয়ালা যে প্রৌঢ় লোকটি ওসমানের, এমন কি ওসমানের বাপ-দাদার জন্মেরও আগে থেকে পূর্ব পুরুষের সঙ্কীর্ণ বারান্দায় বসে রাস্তার নোঙরা নালায় সশব্দে থুথু ফেলতে ফেলতে মস্ত ভাঙা-চাঁদের মতো করাতে শাঁখ কাটতো, তার থুথু ফেলা ও শাঁখ কাটা আজো অব্যাহত রয়েছে। এমন কি এই ২টো নির্ধারিত কাজের মধ্যে সময় করে নিয়ে কলের পাশে পানির প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের কলাগাছের মতো পাগুলোর দিকে তার শ্যাওলা-পড়া চোখে তাকাবার অভ্যাস থেকেও লোকটা ছাঁটাই হয়নি।

তাঁতীবাজারে ঢুকেও ওসমান বেশ ধীরে সুস্থে হাঁটে। কিন্তু যে জায়গায় এসে সে থামবো থামবো করে সেখানকার চেহারা একটু পাল্টে গেছে। কয়েকটা বাড়ি ভেঙেচুরে এমন আকার দেওয়া হয়েছে যে ওসমানকে বারবার ওপরে নিচে এবং ডাইনে ও বাঁয়ে তাকাতে হয়। চেনা জায়গায় থাকার ফুরফুরে ভাবটা নষ্ট হওয়ার দশা ঘটলে ওসমান টগর বা গন্ধরাজ বা শেফালি ফুলের গাছ দ্যাখার জন্য ব্যাকুল হয়ে চারদিকে তাকায়। ১টি পুরনো অপরিবর্তিত বাড়ি তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। না, সেই বারান্দায় ঝুলন্ত টবে অর্কিড, বারান্দার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরতির বয়সের একটি মেয়ে। না, এই মেয়েটির পরনে সালওয়ার-কামিজ। এ বাড়ি হতেই পারে না। এরকম পর পর কয়েকটি বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। না, এ বাড়ি নয়। ওসমান অস্বস্তি বোধ করে এবং তার বুকের নিচে চিনচিন ব্যথা শুরু হয়। অথচ এরকম হওয়ার কোনো কারণ নাই। সকালবেলা ঘর থেকে বেরুবার সময় নোভালজিন ও এ্যান্টাসিড ২টো করে ট্যাবলেট খেয়েছে। আবার এখন খিদে পাওয়াও উচিত নয়, একটু আগে পেট ভরে মোরগ-পোলাও খাওয়া হলো। দুত্তোরি! তার খুব রাগ হয়। রাগের টার্গেট না পাওয়ার উত্তেজনায় ছটফট করে এবং দ্রুত পায়ে এ-গলি সে-গলি হয়ে বেরিয়ে আসে কোর্ট হাউস স্ট্রিটে। আর হরতাল বলে এই রাস্তায় লোকজন কম। ছোট্টো ১টি রেস্টুরেন্টের সামনে কয়েকজন তরুণ দাঁড়িয়ে মিছিলের গল্প করছে। কিন্তু এই রাস্তাটি তার চোখে ধাবমান ছবিই রয়ে যায়, কোনো দৃশ্যে স্থির হবার সুযোগ পায় না। ওসমান বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে, মিছিলটাও মিস করলো, এখন কোথাও পৌঁছুতে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। পৌঁছুতে হবে কোথায়? কৈলাস ঘোষ লেনের ১টি বাড়ির সামনে এসে দুরুদুরু বুকে সে বাড়িটাকে সনাক্ত করার চেষ্টা করে। এইতো ছোট্টো দোতলা বাড়ি, রাস্তার ঠিক ওপরে উঁচু ইঁট-বের-করা খয়েরি রঙের বারান্দা। দোতলা বারান্দায় শিশু বটগাছের রোগা ডালাপালার ভারে ঝুলে পড়েছে কার্নিশের অংশ। নাঃ এই বাড়ি তাকে প্রতারিত করেনি। ওসমান একটু একটু হাঁপায় এবং সকৃতজ্ঞ চোখে বাড়িটার দিকে দ্যাখে। এইতো নিচে রাস্তার দিকে জানলাওয়ালা ঘরটিতে ক্যাপ্টেন থাকে। সিমেন্টের স্ল্যাপে পা রেখে

বারান্দায় উঠে সে আঁশ ওঠা, বৃষ্টির ঝাপ্টায় রেখা-রেখা-দাগ-হয়ে-যাওয়া এবং রোদে এবড়োখেবড়ো কাঠের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করে। কিন্তু ভেতর থেকে সাড়াশব্দ নাই। একটু বিরতি দিয়ে ওসমান এদিক-ওদিক দ্যাখে। উল্টোদিকের ডাস্টবিনটাও আছে, কেবল ড্রামের জায়গায় সিমেন্টের নিচু দেওয়াল। মুখ ফিরিয়ে সে ফের কড়া নাড়ে এবং ডাকে, 'ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!' ২বার ডাকার পরও তার খুব হাসি পায়, এতোদিন পর ক্যাপ্টেন বলে ডাকলো কি করে? একি? সে কি এখনো ক্লাস VIB না VIIA-তে পড়ে? তাহলে কি ঘোরের মধ্যে ফের অনেকদিন আগে চলে গিয়েছিলো? এরকম যাওয়া যায়? খুশি ও কৌতুকে তার এতো হাসি পায় যে ঠোঁটে হাত দিয়ে হাসি চাপতে হয়। ক্যাপ্টেন শালা আসুক, ওসমান বলবে, 'কি ক্যাপ্টেন চিনতে পারো?' চিনতে পারলে ওসমান বলবে, 'দোস্ত তোমাকে শালা এতো ভয় পেতাম যে আজও নাম ধরে ডাকতে সাহস হয় না!' ক্যাপ্টেন বলবে, 'রংবাজি ছাড়, তুই শালা আছিলি কৈ? ইস্কুলে থাকতে চিকনা আছিলি, অহনও আমসিই রইলি!' ওসমান বলবে, 'তুমি আমাদের বডি-বিল্ডার ক্যাপ্টেন, তোমার সামনে সবাই আমসি!' ক্যাপ্টেন একটু হাসবে 'না দোস্ত বডি আর রাখতে পারলাম কৈ?'

এই কাল্পনিক কথোপকথন স্থগিত রেখে ওসমান ফের ডাকে, 'কবীর! কবীর! এই কবীর!' এইভাবে কয়েকবার ডাকার পর ওপর থেকে জবাব আসে, 'কে?' ওপরের বারান্দার দিকে তাকাবার জন্যে ওসমানকে রাস্তায় নামতে হয়। দোতলার বারান্দায় একজন প্রৌঢ় মহিলা, ফর্সা গালের মেচেতা থেকে তাকে কবীরের মা বলে চেনা গেলো, কাঠের রেলিঙে হাত রেখে জিগ্যেস করে, 'কাকে চান?'

'কবীর আছে?' ওসমান বলে, 'কবীর আছে? আমাকে চিনলেন না খালাম্মা?'

এর আগে কবীরের মায়ের সঙ্গে ওসমানের তেমন কথাবার্তা হয়নি। ওসমান সাধারণ রাস্তা থেকেই কবীরকে ডাকতো, কবীর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। আবার কোনো কোনোদিন ওপর থেকে টানা গলায় জবাব এসেছে 'না-ই!' কবীরের মা একদিন বারান্দার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করেছিলো, 'তোমাদের ইস্কুল খুলবে কবে? ইস্কুল কি সারা বছর বন্ধই থাকে?' আজ এতোদিন পর মহিলাকে খালাম্মা বলে ডাকতে ওসমানের ভালো লাগলো। মহিলা তার পুরু লেন্সের চশমা-পরা ২চোখের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওসমানকে চেনার চেষ্টা করে। ওসমান বলে, 'আমার নাম রঞ্জু, কবীরের সঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম।'

মহিলার পাশে কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ২২/২৩ বছরের একটি যুবকের দিকে চোখ পড়লে ওসমান হাসে, ঐ তো ক্যাপ্টেন তার দিকে চোখ রেখে কি বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু না, সঙ্গে সঙ্গে সে সামলে ওঠে, ক্যাপ্টেন আমাদের আরো কালো, তার বয়স আরো বেশি। ক্যাপ্টেনের নাকের পাশে এরকম কালো তিল নাই। একেও চিনতে পারলো, এ হলো কবীরের ভাই। সগীর কি এতো বড়ো হয়ে গেছে? মায়ের ইঙ্গিতে সগীর ওসমানকে ডাকে, 'ওপরে আসেন।'

নিচের দরজা খুলে যায়। দরজার ডান দিকে সিঁড়ি। এই সিঁড়ি বেয়ে রঞ্জু ওর ক্লাসের আরো ২জন ছেলের সঙ্গে একবার ওপরে উঠেছিলো। কবীরের বাবা মা সেদিন সারাদিনের জন্য কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলো। ওপরতলার বারান্দায় বসে গরমের একটি দীর্ঘ দুপুর ওরা ক্যারাম খেলে কাটিয়ে দেয়! সেই সময় কিন্তু সিঁড়ির এই ধাপগুলোকে আরো উঁচু মনে হতো। ক্যারাম খেলতে সেদিন ভয়ও হচ্ছিলো, ঘোড়ার গাড়ি করে কবীরের মা আবার কখন

এসে পড়ে। আর সেই মহিলার আহ্বানে ওসমান লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে। মোটা ও ভাঙা গলায় ঘরের ভেতর থেকে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি শোনা যায়, 'কে? কেডা? অ কবীরের মা, কেডা কথা কয়?' কিন্তু ওসমান ছাড়া এই গোঙানি কারো কান স্পর্শ করে বলে মনে হয় না। গোঙানি আসছে সিঁড়ির ডানদিক থেকে, কবীরের ভাইয়ের পেছনে পেছনে ওসমান ঢুকলো বাঁ দিকের ঘরে।

ঘরে ৩ রকম ৩টে চেয়ার। হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ওসমান এবং মাদুর-পাতা তক্তপোষে বসে কবীরের মা। আরো আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও অন্য সবাই দাঁড়িয়ে থাকে। চেয়ারে বসতে বসতে ওসমান বলে, 'কবীর বাসায় নেই?' জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই বলে, 'ক্লাস এইট পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে পড়েছি। আপনাদের এই বাড়িতে কতো এসেছি?' তারপর সে তাকায় সগীরের দিকে, 'তোমার নাম তো সগীর, না? আমাকে তুমি চিনতে পাচ্ছো?'

'ভাইয়ার সব বন্ধুরেই তো চিনি। কয় বছরে আরো ভালো কইরা চিনলাম।' এর পরও ওসমানের মুড অবিকৃত থাকে, 'খালাম্মা, এই বারান্দায় আমরা একদিন সারা দুপুর ক্যারাম খেলে গিয়েছি, আপনারা কোথায় যেন গিয়েছিলেন।' এদিক ওদিক তাকিয়ে সে প্রায় আপন মনে বলে, 'ইস! কতোদিন হয়ে গেলো!'

কবীরের মা আস্তে আস্তে জিগ্যেস করে, 'আপনে ইন্ডিয়া চইলা গেছিলেন না?'

'আট দশ মাসের জন্যে। আমার বাবা-মা আর ফিরলেন না। আমি ফিরে এসে অন্য স্কুলে ভর্তি হলাম। সেই থেকে কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গেলো।'

'আপনার বাবা মা ইন্ডিয়া থাকে?'

কতোদিন হয়ে গেলো, এই মহিলার সঙ্গে ওসমানের কোনোদিন তেমন আলাপও হয়নি, অথচ দ্যাখো, সব মনে রেখেছে। ছেলেবেলার বন্ধুর মা, নিজের মায়ের চেয়ে কম কি? কথা বলতে গেলে তার গলা থেকে আঠোলো ধ্বনি বেরোয়, 'আব্বা ইন্ডিয়ায় থাকে। গ্রামের বাড়িতে। আম্মা মারা গেছে এখান থেকে যাবার পর কয়েক বছরের মধ্যেই।' তার বলার ইচ্ছা ছিলো, 'আমার মা নেই খালাম্মা!' কিন্তু ২/১বার চেষ্টা করে ঐ বাক্য নির্মাণে ব্যর্থ হয়ে সে বলে, 'আমাকে "আপনি" বলছেন কেন?'

'আপনি বোধ হয়—।'

ওসমান তাকে জোরেসোরে বাধা দেয়, 'আমাকে "আপনি" বলবেন না খালাম্মা। আমি কবীরের খুব ছেলেবেলার বন্ধু। আমার নাম রঞ্জু, মনে পড়ে?'

কবীরের মা তার অনুরোধ মেনে নেয়, 'তোমার নাম কি কইলা? তাইলে ওসমান কার নাম?'

রঞ্জু এবার নিভু-নিভু হয়ে যায়, তবু যতোটা পারে জোর দিয়ে বলে, 'আমারই নাম। কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধব সব ডাক-নামেই ডাকতো।'

'আচ্ছা। তুমি পরে আর্মানিটোলা থাকতা না?'

'জী। সেই জন্যেই তো আর্মানিটোলা স্কুলে ভর্তি হলাম।' ওসমান ফের উৎসাহিত হয়।

'কার বাড়ি জায়গির থাকতা না?'

ইন্ডিয়া থেকে ফিরে এসে ওসমান বাস করতে শুরু করে তার এক চাচার সঙ্গে, বাপের মামাতো ভাই। চাচাতো ভাইবোন ছিলো মেলা, তাদের পড়াতে হতো, চাচার স্ত্রী ঠিক ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করতো না। আজ কবীরের মায়ের গলায় জায়গির কথাটি ওর খারাপ লাগলো। আমার চাচা চাচী যে ব্যবহার করেছে তাতে কথাটার প্রতিবাদ করাও যায় না। তবে কবীরের সঙ্গে দ্যাখা করার প্রবল স্পৃহা এইসব ফালতু ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম। সে জিগ্যেস করে, 'খালাম্মা, কবীর এলে আমার কথা বলবেন। ওকে বাসায় পাওয়া যায় কখন?'

কবীরের মা ওসমানের চোখে ১বার সরাসরি তাকায়, তারপর হঠাৎ বলে, 'কবীর মারা গেছে।'

ওসমান জিগ্যেস করে, 'কোথায় গেছে?'

কবীরের মা একই ভঙ্গিতে তার বাক্যের পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু দ্বিতীয়বার শোনার আগেই ওসমান তার বন্ধুর পরিণতি বুঝতে পেরেছে। ভয়ানক বিচলিত গলায় সে বলে, 'কি? মারা গেছে?'

'তুমি জানো না?'

'না তো!' কিন্তু আর কিছু জিগ্যেস করার মতো শক্তি তার হয় না।

'এইতো পাঁচ বছর হইয়া গেলো। চৌষট্টি সালে রায়ট হইছিলো মনে আছে?'

'রায়টে মারা গেছে?'

'না। রায়টের আগের দিন।'

এইবার ওসমান নিজেকে খানিকটা গুছিয়ে নেয়, 'কি হয়েছিলো?'

কবীরের মা নিচের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরে ভয়ানক নীরবতা, এমন কি পাশের ঘরের গোঙানিও ফিরে যাচ্ছে দরজার কপাট থেকে। কিছুক্ষণ পর সগীর তার বড়োভাইয়ের মৃত্যুর কারণ জানায়, 'খুন হইছে। গট কিলড্!'

'কিভাবে? কারা মারলো? কেন?' ওসমান নিস্তেজ গলায় জিগ্যেস করে। কবীরের স্থায়ী অনুপস্থিতি তাকে এতোটা বিচলিত করেছে যে তার কারণ জানবার কৌতূহল তৈরি করার শক্তিও সে খুঁজে পায় না।

'আর কারা?' সগীর বলে, 'সেই সব কথা তুইলা লাভ কি? ভাইয়ার বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কারা? কার কার সাথে বিজনেস করতে নামলো, তারাই মারছে।'

তারপর সবাই ফের নীরব হলে পাশের ঘরের গোঙানির আওয়াজ ফাঁক বুঝে ঘরে ঢুকে পড়ে, 'অ করীরের মা, অ হাসিনা, কেডা রে? কথা কয় কেডা?' কবীরের মা তার কিশোরী কন্যাকে হুকুম দেয়, 'হাসিনা দ্যাখ তো তর বাপে কি চায়? দ্যাখ না।'

কিন্তু বাপের বক্তব্য কি জিজ্ঞাসায় হাসিনার কোনো উৎসাহ নাই। দরজার চৌকাঠ ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকে!

সগীর হঠাৎ খ্যাঁক করে ওঠে, 'যা না! এখানে কি দ্যাখস? যা।' সেই বিরক্তি অক্ষত রেখে ওসমানকে বলে, 'আপনে কিছুই জানেন না? পাঁচ বছর বাদে আসছেন বন্ধুর খবর লইতে? এতোদিন পুলিসের ভয়ে আসেন নাই?'

কবীরের মা উঠে দাঁড়ায়, 'যাই। অর বাপের শরীর খুব খারাপ, সাত বচ্ছর প্যারালাইসিসে পইড়া রইছে।' অপরিবর্তিত স্বরে ওসমানকে বলে, 'আমাদের উপরে খুব জুলুম গেছে। পুলিসের লোক একটা বচ্ছর খুব জ্বালাইছে। আবার কতো মানুষ যে আসছে,

কেউ কয়, কবীর আমার সাথে বিজনেস করার কথা কইয়া পাঁচ হাজার টাকা নিছিলো। কেউ কয় কবীর হাওলাত নিছে তিন হাজার টাকা। আমরা খুব ভুগছি!'

বন্ধুর জন্যে শোক ওসমানের দানা বাঁধতে পারে না। সগীরের কিংবা তার মায়ের কথাবার্তায় যে অপমান বোধ করবে মনে সেরকম বলও পায় না।

বিদায় দেওয়ার জন্যে নিচে এসে সগীর বলে, 'আপনে আছেন কোথায়?'

'আমি লক্ষীবাজার থাকি।'

'না, আই মিন আপনি কোন প্রফেশনে আছেন? কি করেন?'

'ইপিআইডিসি-তে কাজ করি।'

'কোন সেকশনে। কি পোস্টে?'

ওসমানের জবাবে সগীর উৎসাহিত হয়, 'টাকা পয়সার জায়গা। আমি ফ্লাইং বিজনেস করি, আমারে একটু হেল্প কইরেন। ভাইয়া বিজনেসে নামলো, কতোগুলি শয়তানের পাল্লায় পইড়া লস দিলো। জানটা পর্যন্ত দিতে হইলো। নিজে মরলো, ফ্যামিলিটা রুইন কইরা দিয়ে গেলো। আপনারে কই, আব্বার স্ট্রোকের কজটা কি?—ভাইয়ার ডেথ।'

ওর বাবা তো কবীর নিহত হওয়ার আগে থেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কিন্তু এসব প্রশ্ন করে লাভ কি?

ওসমান রাস্তায় নামলে সগীর বলে, 'আপনের এ্যাডরেসটা দিলেন না?' ওসমান তার ঠিকানা দিলে সগীরও রাস্তায় নামে, তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমারে একশোটা টাকা দিতে পারেন? সামনের মাসে বিল উঠাইয়া আপনার বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসবো।'

ওসমান বিব্রত হয়, 'টাকা তো নেই।'

আরে দেন না! সামনের মাসে মোটা বিল পাবো, ওয়াপদায় আড়াইশো ফ্যান সাপ্লাই দিলাম। আপনার বাসার এ্যাডরেস তো রাখলাম, মাসের ফার্স্ট উইকে দিয়া আসবো।' ওসমানের বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে তার দয়া হয়, 'কতো আছে? যা পারেন দেন।'

প্যান্টের পকেট থেকে ১০ টাকার ১টা নোট বের করে ওসমান বলে, 'আর টাকা তিনেক সঙ্গে থাকলো। এই নেন।' সগীরকে সে কখন থেকে 'আপনি' করে বলতে শুরু করেছে নিজেও খেয়াল করেনি।

নোটটা হাতে নিয়ে সগীর তেতো হাসি ছাড়ে, 'ওনলি এ টেনার?'

ওসমান এগিয়ে যেতে যেতে সগীরের উচ্চকণ্ঠ স্বগতোক্তি শোনে, 'কি সব ফ্রেন্ড! দশটা টাকা দিতে জান বারাইয়া যায়, দোস্তের খবর নিতে আসছে!'

রাস্তা চিনতে ওসমানের অসুবিধা হয়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তার মোড়ে চাপা প্যান্ট পরা কয়েকটা ছোকরা পোজ মোর দাঁড়িয়ে আশেপাশের বাড়ির জানলা ও দোতলার বারান্দা সার্ভে করছে। ওসমান এদের কাউকে চেনে না। ১টা সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কথা বলছে ৩ জন লোক। কারা? কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে? উপচে-পড়া ডাস্টবিনে সামনের ২টো পা তুলে দিয়ে ১টা নেড়ি কুত্তা খাবার খোঁজে, এই কুকুর জাতটাকে বিশ্বাস নাই, ওসমানের দিকে হঠাৎ তেড়ে আসতে কতোক্ষণ? শাঁখারি পট্টির এই মাথায় চায়ের দোকানটা নতুন, দোকানের মুখে তন্দুরের ভেতর থেকে লোহার আঁকসি দিয়ে রুটি বার করে আনছে গেঞ্জি পরা ১টি বালক, ব্যাটা কাজ করতে করতে ওসমানের দিকে তাকালো কেন? দোকানের ভেতর তারস্বরে হিন্দী গান চলছে, গানের সুরটা ওসমান কোনোদিন শুনেছে বলে

মনে করতে পারলো না। একবার ইচ্ছা হয়, শাঁখারি পট্টি ক্রস করে ইসলামপুর হয়ে চলে যায় চকবাজার। কিন্তু শাঁখারি রাস্তা যদি ঠিকমতো চিনতে না পারে? তাহলে? চকবাজার গিয়ে এখন লাভ কি? এই ১ঘণ্টায় মিছিল কতোদূর চলে গেছে। শহীদ মিনারে মিলিত হয়েছে বিশাল সমাবেশে। রিকশা নাই, বাস নাই, স্কুটার নাই,—ওসমান কি অতোটা হাঁটতে পারবে? মিছিলে থাকলে মাইলের পর মাইল হাঁটলেও গায়ে লাগে না, ক্যাপ্টেনের খোঁজ করতে এসে সব বরবাদ হয়ে গেলো।

২৩

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে সাড়া দিয়ে অফিসের লোকজন বেরিয়ে আসে সকাল ১০টার আগেই। মতিঝিলে বিরাট মিছিল। মিছিল ডিআইটির সামনে পৌঁছুলে স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন শোনা যায়, 'আরে চেয়ারম্যান, ডিআইটির চেয়ারম্যান মিছিলে!' ওসমান ছিলো মিছিলের মাঝামাঝি। সেদিন সে বেশ ব্যস্ত। তাদের যাদের অফিসার বলা হয় এই মিছিলে তাদের নামবার ব্যাপারে প্রেম-পত্র-লেখা কামালের সঙ্গে সে-ও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলো। কামালের এখন প্রচুর অবসর, মালীবাগের প্রেমিকার কাছে তার হাঁপানির ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেছে, প্রেমিকা ইদানীং রোগমুক্ত ১জন ছেলের সঙ্গে প্রত্যেক দিন চাইনীজ খেয়ে বেড়াচ্ছে। মিছিলের মাঝখানে চলতে চলতে কামাল ওসমানকে একটু ধাক্কা দেয়, 'দ্যাখেন না, ডিআইটির চেয়ারম্যান পর্যন্ত নেমে এসেছে!'

'এ্যাঁ! এরা এ্যাকশনে নামলে আইয়ুব খান টিকতে পারে?' ওদের সেকশনের প্রধান খালিলুর রহমান অন্য সংস্থার চেয়ারম্যানকে মিছিলে দেখে গদগদ হয়ে বলে, 'আরে, ওরা হইল সব সিএসপি। পাকিস্তানের প্রথম দিকের সিএসপি। ব্রিলিয়ান্ট প্রোডাক্টস অব দি ইউনিভারসিটি। এরা কেউরে পরোয়া করে?'

কিন্তু কামাল কথাটা অগ্রাহ্য করে, 'কতো সিএসপি দেখলাম! কৈ আমাদের চেয়ারম্যান নামুক তো!'

খলিলুর রহমান দমে না, আস্তে করে বলে, 'সকলের নামার দরকার কি? সরকারের মধ্যে থাইকাও সরকারের বারোটা বাজান যায়!'

সেক্রেটারিয়েটের কাছে এলে মিছিলের মূল প্রবাহ চলে যায় প্রেস ক্লাবের দিকে। আর ছোটো ১টি ধারা ঢোকে আবদুল গনি রোডে। সেক্রেটারিয়েটের ফার্স্ট গেটে সার করে দাঁড়ানো হেলমেট ও রাইফেলধারী পুলিস। মিছিলের লোকজন রাস্তার মোড়ে সাজানো ব্যারিকেড সরিয়ে সমবেত হয় ঐ গেটের দুইদিকে। নতুন স্লোগান শোনা যায়, 'সেক্রেটারিয়েটের ভাইয়েরা'—'বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো!' 'আইয়ুব খানের দালালদের 'জ্বালিয়ে মারো, পুড়িয়ে মারো!' পুলিসের সারির পেছনে গেটের ভেতরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ১টার পর ১টা স্লোগান তাদের শরীরে ঝাপ্টা দিচ্ছে। মিছিল থেকে বেশ

কিছু লোক লাফিয়ে উঠে পড়ে সেক্রেটারিয়েটের দেওয়ালে। হঠাৎ কি করে পুলিসের দুর্ভেদ্য সারি ভেঙে পড়ে, হুহু করে বেরিয়ে আসে সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরা। আবদুল গনি রোড উপচে পড়ে মানুষে। বিপুল সমাবেশ চলতে শুরু করে কার্জন হলের দিকে। ওসমানও ঐদিকে রওয়ানা হয়েছিলো, হঠাৎ সেক্রেটারিয়েটের ভেতর থেকে গুলিবর্ষণের আওয়াজ শুনে ওসমানের সমস্ত শরীর ও মাথা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। ও দ্যাখেনি, তবে মনে হচ্ছে গুলিটা চলে গেছে ওর মাথা কিংবা বুকের ঠিক পাশ দিয়ে। লোকজনের এলোমেলো ছোটাছুটির মধ্যে সে এসে পড়ে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে, জিপিও-র কাছাকাছি। ছোটাছুটি করতে করতেই লোকজন স্লোগান দিয়ে চলেছে, 'ধ্বংস হোক, নিপাত যাক!' ১রাউণ্ড গুলির পর আর কোনো আওয়াজ নাই। মানুষ ফের দাঁড়ায় এবং ওসমানের চোখে পড়ে লাল রঙের সেই গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে জিপিও-র সামনে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে। গাড়িটা দেখে ওসমানের গা ছমছম করে: অনেকক্ষণ ধরে তো সে এখানেই রয়েছে, এই রায়টকার কখন এলো? কিভাবে এসে পৌছুলো? এতো মানুষের চলমান স্রোত উজিয়ে এলো? ওই লাল গাড়িটাকে লোকে আক্রমণ করে না কেন? ওসমান তার ছমছম-করা গা একবার ঝাঁকালো, এই শালাদের ভয় পেলেই এদের লাই দেওয়া হয়। যা হয় হোক, এই জায়গা ছেড়ে সে নড়বে না।

ওখান থেকে সত্যি সে অনেকক্ষণ সরেনি। আর আর মানুষের সঙ্গে সে-ও এদিক ওদিক থেকে কাঠের টুকরা কাগজ, গাছের শুকনা পাতা জোগাড় করে পাক-বাগিচার উল্টোদিকের ফুটপাথে স্তূপ করে ফেললো। আইয়ুব খানের মস্ত ১টা ছবি রেখে সেই স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলে ওসমান তার প্যান্টের পকেট থেকে অফিসের একটা কাগজ ও লন্ড্রির রিসিট বার করে সেই স্তূপে অঞ্জলি দিলো। আগুনের শিখার চারপাশে স্লোগান ওঠে, 'দিকে দিকে আগুন জ্বালো'—'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো!' 'জাগো জাগো'—'বাঙালি জাগো!'

এর মধ্যে তোপখানা রোড ও পল্টনের মোড়ে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সামনে লোহার রডের সঙ্গে টাইট করে লাগানো মস্ত সাইনবোর্ড নিয়ে আসা হয়েছে। এটা হলো আইয়ুব খানের শাসনের ১০ বছর পূর্তির বাহাদুরি ঘোষণার বিজ্ঞাপন। আগুনের ভেতর বোর্ডটা ফেলতেই মানুষ সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো। এতো বড়ো টিনের বোর্ড দেখতে দেখতে দুমড়ে যায়। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পাশে সেক্রেটারিয়েটের গেট, সেই গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছিলো দমকলের গাড়ি। লোকজন ঐ গাড়ির দিকে ছুটে যেতেই সেটা ব্যাক গিয়ারে চলে গেলো ভেতরে।

দমকলের গাড়ির পলায়ন দেখে ওসমানের হাসি পায়, মানুষের বাড়িঘর দোকানপাট পুড়ে সাফ হয়ে গেলেও এই শালাদের টিকিটি দ্যাখা যায় না। আর দ্যাখো আইয়ুব খানের বাহাদুরির বিবরণ বাঁচাবার জন্য শুওরের বাচ্চারা কেমন তৎপর! এইরকম ভাবতে ভাবতে ফট করে পর পর ২বার আওয়াজ হয়, ২টো শেল ফাটে এবং বাতাস হয়ে ওঠে ঝাঁঝালো। লাল রায়ট-কার থেকে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হচ্ছে। ঝাঁঝালো বাতাসে ওসমানের চোখ থেকে পানি ঝরতে শুরু করে, চোখ দারুনরকম জ্বলছে, নিশ্বাস নেওয়াটা এখন কষ্টের কাজ।

রায়ট কার মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেলো কোথায়? মানুষ এখন ছুটে চলেছে স্টেডিয়ামের দিকে। আউটার স্টেডিয়ামে খুব ভিড়। এই ভিড়ে ওসমান স্বচ্ছন্দ বোধ করে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে অকারণে সে এদিকে-ওদিক ঘোরে। এরকম ঘুরতে ঘুরতে মাইকের একটি হর্নের সামনে এসে শুনতে পায় যে সেক্রেটারিয়েটের ফার্স্ট গেটের সামনে গুলিবর্ষণে দুজন মারা গেছে। তাদের লাশ হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। তরুণ কোনো নেতার কণ্ঠ শোনা যায়, 'ভাইসব, স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনেমের লেলিয়ে দেওয়া কুকুরের গুলিতে আজ নিহত হয়েছে আমাদের দুজন ভাই। ভাইসব, আমাদের শহীদ মকবুলার রহমান ও রুস্তম আলির লাশ এক্ষুনি এসে পড়বে। শহীদ আসাদুজ্জামানের শোক-সভা আজ জানাজার পরিণত হলো কেন? কার জন্যে? ভাইসব—।'

সমবেত জনতা বারবার তাকায় স্টেডিয়ামের গেটের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে কালো কাপড়ে ঢাকা দুটো মৃতদেহ কালো কালো চুলের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে আসে। তাদের বহনকারীদের দ্যাখা যায় না, মনে হচ্ছে শহীদদের লাশ যেন শূন্যে সাঁতার দিয়ে এগিয়ে আসছে।

ওসমানের বুকে খচ করে একটা কাঁটা বেঁধে: গুলির সময় সে তো ঠিক ঐ জায়গাটাতেই ছিলো। ওসমান হয়তো একটুর জন্যে বিরাট এই সমাবেশের প্রধান আকর্ষণে পরিণত হতে পারলো না! আহা, মানুষের উড়ন্ত চুলের ঢেউয়ে সাঁতরাবার কি সুযোগ সে হারালো।—তবে এই ক্ষোভ তার স্থায়ী হয়েছিলো মাত্র ১টি মুহূর্তের জন্য। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে মাইকে হঠাৎ বিকট স্বরে টাঁ টাঁ আওয়াজ হয়, এই আওয়াজে তার মগ্নতা ভাঙে এবং মনে হয়, আহা! একটুর জন্য সে বেঁচে গেছে। নইলে এই সমাবেশ, শহীদদের প্রতি সম্মান দ্যাখাবার জন্য মানুষের এই আকুলতা—কিছুই দ্যাখা হতো না। সে যে বেঁচে গেছে এবং বেঁচে আছে—এই বোধ চাঙা হয়ে ওঠায় ভিড় ঠেলে ওসমান এদিক ওদিক ঘোরে। ভিড়ের মধ্যে পান বিড়ি সিগ্রেটওয়ালারা; হাতে লোহার চুলায় কেতলি নিয়ে চা বিক্রি করে এক ছোকরা। এমন কি স্টেডিয়ামের গেটে চটপটি ফুচকার ঠেলাগাড়ি। ১প্লেট চটপটি ও ৪টে ফুচকা খেয়ে ওসমান চা খেলো। খালি পেটে তেঁতুল-গোলা পানিতে চোবানো ফুচকা খেয়েও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

কালো কাপড়ে ঢাকা নিহত মকবুলার রহমান ও রুস্তম আলি যেদিক দিয়ে এসেছিলো সেই গেট দিয়েই ফের উড়ে গেলো আজিমপুরের দিকে। সেদিকে না গিয়ে ওসমান চললো বাঁদিকে, মতিঝিলের দিক থেকে অনেক লোক ছুটে আসে, অনেকে ঐদিকেই যেতে শুরু করে। লোকজন যারা আসছে এবং যাচ্ছে সকলেরই হন্তদন্ত ভাব। মাথার উপর হালকা কালো রঙের ধোঁয়া। সম্প্রসারণমাণ একটি ছাদের মতো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত মতিঝিলে। একটু এগিয়ে গেলে দ্যাখা যায় মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন জ্বলছে। অফিসের সামনে জ্বলন্ত ২টো গাড়ি। এর মধ্যে উত্তেজিত মানুষের স্লোগান, 'আইয়ুবের দালাল, আইয়ুবের দালাল'—'হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার!' অফিসের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় ওসমানের গায়ে আগুনের তাপ লাগে, তার শরীর নিসপিস করে, সে কি কোনোভাবেই এই কর্মযজ্ঞে একটু অংশ নিতে পারে না? এর মধ্যে দপ করে জ্বলে ওঠে ন্যাশনাল কোচিং সেন্টারের উল্টোদিকের ১টি বাড়িতে। এখানে আগুন লাগানো হলো কেন? একটু এগিয়ে যেতে শোনা যায় যে এটা মুসলিম লীগের ১ এমএনএ-র বাড়ি। লোকজন মন্তব্য করে, 'চুতমারানি, চুরি চামারি কইরা কি মহল বানাইছে একখান, ল, অহন ল! বইয়া বইয়া খা!'

চারদিকের আগুনের ধোঁয়ায় শীতকালের সন্ধ্যা নামে আরো তাড়াতাড়ি। কিন্তু লোকজন কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে না, মনে হয় আরো অনেক কিছু পোড়াবার

দায়িত্ব সবার ঘাড়ে, দাঁড়াবার সময় তো নাই। অজস্র মানুষের সঙ্গে ওসমান গড়িয়ে পড়ে জিন্না এ্যাভেন্যুর বড়ো প্রবাহে। দোকানপাট সব বন্ধ, কিন্তু রাস্তা তাতে স্থগিত থাকেনি। রাস্তার ২দিকে আলো জ্বলছে। রাস্তা এখানে চওড়া বলে জনস্রোত একটু পাতলা। ইপিআরটিসি টার্মিনালের সামনে জটলা, টার্মিনালের গেটের পিলার ২টোর গোল গোল সিমেন্টের মাথা হাতুড়ি দিয়ে ভাঙছে ২জন শ্রমিক যুবক, লোকজন চিৎকার করে তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। এই টার্মিনালের পেছনে গভর্নর হাউস এখন পর্যন্ত অক্ষত। এই বাড়িটা জালানো খুব দরকার। কিন্তু ওসমান একা একা কি করে যায়? একা তার কিছু করবারই নাই, সে হলো এই বিশাল জনস্রোতের ১টি ঢেউ, ধাক্কায় ধাক্কায় গড়িয়ে চলেছে সামনের দিকে।

জিন্না এ্যাভেন্যু পার হবার আগেই নবাবপুর রোডে ২ পাশে আলো নিভে গেলো। নবাবপুর ১টা ল্যাম্পোস্টের ঘিঞ্জি মাথার জটায় আগুন লেগেছে। ওসমানের পাশে কে যেন বলে, 'ওদিকে যাবেন না, ইলেকট্রিক তারে আগুন ধরেছে আরজু হোটেলে। নিচে রেস্টুরেন্টের মস্ত দরজায় আগুন জ্বলছে, দোতলাতেও আগুন। উল্টোদিকের আমজাদিয়া হোটেল থেকে চেয়ার টেবিল এনে তাও কিছু কিছু পোড়ানো হচ্ছে। তাদের আড্ডার কেন্দ্রেও ক্ষত বিক্ষত দেখে ওসমানের একটু খারাপ লাগে বৈ কি! কিন্তু কারেন্ট চলে যাওয়ায় অন্ধকার নবাবপুরে এই ১টি মাত্র জায়গায় আলো জ্বলছে, লেলিহান উর্ধ্বমুখ শিখা ভালো করে দ্যাখার জন্য জুত করে দাঁড়াবে বলে ওসমান ১টা জায়গা খোঁজে। অন্ধকারে লোকজনকে সব ছায়া ছায়া মনে হচ্ছে। এই ছায়াসমূহের মধ্যে আগুনের শিখায় দপ করে ওঠে হাড়ডি খিজিরের ভাঙাচোরা গাল। তার ১টি হাতে রয়েছে প্লায়ার। ব্যাটা বোধহয় গ্যারেজে কাজ করতে করতে হঠাৎ চলে এসেছে, জিনিসটা রেখে আসতে মনে ছিলো না। তার অন্য হাতটি ওপরে তুলে ধরা। এখান থেকে তার ভাঙা গালের উঁচু হাড়গুলো আগুনের আভায় লাল দ্যাখাচ্ছে, তাকে হঠাৎ খুব বিশিষ্ট বলে মনে হয়। খিজিরকে ডাকার জন্য ওসমান একটু এগিয়ে যায়, ভিড়ের মধ্যে যতোটা এগোনো সম্ভব। কিন্তু ওসমানের ডাক তার কানে পৌঁছুচ্ছে না। অগ্নিকাণ্ডে সে মহা মগ্ন; মনে হয়, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে সে-ই। এখন দগ্ধ বাড়িঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পরবর্তী কর্মসূচী দেওয়ার কথা ভাবছে।

এর মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, 'কারফ্যু, কারফ্যু দিছে।' 'সাড়ে সাতটা থাইকা কারফ্যু। বাড়ি যান, সবাই তাড়াতাড়ি বাড়ি যান।' আবার কে যেন চিৎকার করে বলে, 'কারফ্যুর মারে বাপ! আমরা কারফ্যু মানি না!' অন্ধকার নবাবপুর জুড়ে স্লোগান ওঠে, 'আইয়ুব শাহী'—'ধ্বংস হোক!'

লোকজন কিন্তু কমতে শুরু করে। কোন ১টি ট্রানজিস্টর সেট থেকে শোনা যায়, সাড়ে সাতটা থেকে শহরে কারফ্যু জারি হয়েছে। কতিপয় দুষ্কৃতিকারী শহরে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে, সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট করা হচ্ছে। আইন রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে ও নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। রাস্তায় কাউকে দ্যাখামাত্র সেনাবাহিনীর লোক সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করবে। এর পর লোকজন দ্রুত হাঁটতে থাকে। ১টি গুলির আওয়াজ আসে, একটু বিরতি দিয়ে আরো কয়েকবার গুলি চলে। কয়েকটি লোক গুলিস্তানের দিকে ছুটতে ছুটতে বলে, 'বড়োকাটরায় পাবলিকে মুসলিম লীগ অফিসে আগুন দিছে। পুলিস গুলি করতাছে!'

খিজিরের সঙ্গে কথা না বলে ওসমান ভালোই করেছে। একবার দেখতে পারলে ওর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া মুশকিল হতো। ঠিক এই সময় খিজির এসে দাঁড়ায় তার পাশে, 'আপনে? চলেন!'

'চলো!' ওসমান কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। এখানে থাকার জন্যে অনুরোধ করার কোনো সুযোগই খিজিরকে দেবে না। 'তাড়াতাড়ি চলো। সাড়ে সাতটা থেকে কারফ্যু, সোয়া সাতটা বোধহয় বাজে।'

'চলেন।'

খিজির কি ভয় পেয়েছে? তাহলে অন্ধকারে আগুনের আঁচে লাল মুখটা কি ওসমান ভুল দেখলো?

হাঁটতে হাঁটতে খিজির বলে, 'চলেন ঠাটারি বাজার দিয়া বারাই। দেইখেন, দেইখা পাও ফালায়েন, তারতুর ব্যাক পইড়া রইছে!'

বাঁদিকের রাস্তার মাথায় লম্বা লম্বা ইলেকট্রিক তার পড়ে রয়েছে মুখ থুবড়ে, বিদ্যুৎহীন তারগুলো নিস্পন্দ পড়ে থাকে মরা সাপের মতো। খিজির ভয় পেয়েছে ভেবে ওসমান স্বস্তি পায়, ওসমানের পদক্ষেপ তাই বেশ দৃপ্ত।

ওসমান জিগ্যেস করে, 'হোটেলে আগুন লাগাবার মানে কি? এটা কি গভমেন্টের বাড়ি?'

'লাগাইবো না?' খিজির খুব উত্তেজিত, 'মিছিল যায় আর হোটেলের মালিক হালায় উপর থাইক্যা দুইটা পানিভরা ঠিলা ফালাইয়া দেয়! এতোগুলি মানুষরে বেইজ্জত করে, হালাগো হিম্মতটা দেখছেন? বুঝলেন না? সইবার পারে না! গরীব মানুষ সিনা ফুলাইয়া রাস্তার মইদ্যে নাড়া লাগায়া হাঁটে, হালাগো কইলজা এক্কেরে ফালা হইয়া যায়! এতোগুলা মাইনষেরে তরা বেইজ্জত করস, পাবলিকে উংলি চুষবো?' ওরা দুজন হাঁটছিলো বিসিসি রোড ধরে, তাদের পাশে আগুন ধরা হোটেলের দেওয়ালে। কথা বলতে বলতে খিজির হঠাৎ থামে। কি হলো? খুব মোটা-সোটা ১টা লোক হোটেলের পেছন দিয়ে বেরিয়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। তার পাশ দিয়ে লোকজন ছুটে যাচ্ছে হনহন করে। খিজির ফিসফিস করে, 'ফ্যাটি সোহরাব মালুম হয়! হায় হায়! চাল্লি হালায় বহুত মুসিবতে পড়েছে!' ১ ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'হ্যাঁ, হোটেলে ছিলো। আগুন লাগার পর বেরোতে গিয়ে হয়তো পড়ে গেছে!' লোকটি চলে যায়, আরেকজন গতি কমিয়ে বলে, 'ঐ বডি নিয়ে এখন যাবে কি করে?' সে-ও চলে যায়।

খিজির বলে, 'খাড়ান!'

মোটা লোকটির দিকে তাকিয়ে ওসমানের হাসি পায়। চলচ্চিত্রের ক্লাউন হয়ে লোকটা তার উপযুক্ত পেশা বেছে নিয়েছে। এতো বেঢপ মোটা যে কোনোরকম অভিনয় না করলেও তার চলে, তাকে দ্যাখামাত্র দর্শক হাসতে শুরু করে। কিন্তু তার দিকে ভালো করে তাকাবার পর ওসমানের হাসি মুছে যায়। তার ডান পায়ের পাতা আগুনে অনেকটা ঝলসে গেছে, পোড়া প্যান্টের ফাঁক দিয়ে পায়ের ওপর ১টা ফোস্কা দ্যাখা যাচ্ছে, ফোস্কাটা মনে হয় বেশ বড়ো, তার শরীরের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়েছে। ব্যাটা কি পরিমাণে মদ টেনে ঘুমিয়েছিলো, এ্যাঁ? ঠাটারি বাজার, আলু বাজার এমনকি এদিকে সিদ্দিক বাজারের মানুষ পর্যন্ত এই আগুন-লাগা দেখে ছোটাছুটি করছে, আর সে কি-না তার বিশাল শরীরটাকে বিশালতর প্যান্টশার্টের ভেতর গুঁজে নিশ্চিন্তে ঘুমায়? আহা, বেচারা এখন যায় কোথায়? শরীর দেখে মনে হয় সুস্থ অবস্থাতেই সে ঠিকমতো হাঁটতে পারে না, আর এখন তো রীতিমতো আহত।

ফ্যাটি সোহরাবের হাত ধরে খিজির বলে, 'হায় হায়! আপ কেতনা মাল পিয়া থা ওস্তাদ? তামাম দুনিয়াকা আদমি হালা হাউকাউ কর রাহা, আওর আপ আরামসে নিদ রাহা?' তারপর তার পিঠে হাত রেখে বলে, 'মেরা হাত পাকড়িয়ে!' কৌতুক-অভিনেতা ফ্যাটি সোহরাব কোঁকাতে কোঁকাতে জানায় যে আলুবাজারে লুৎফর রহমান লেনে তার বন্ধু থাকে, একটা রিকশায় উঠিয়ে দিলে সে সেখানে যেতে পারে। খিজির ফের হাসে, 'রিকশা কাঁহা ওস্তাদ? আজ ইস্ট্রাইক নেহি?' তার হাসি আর থামে না, হাসতে হাসতে কোনো চলচ্চিত্রে এই অভিনেতার ১টি সংলাপ আওড়ায়, 'আরে বেগমসাব, তড়পাতে কিঁউ? ফিকির মত কিজিয়ে! আগর আপ গির যায়ে তো ম্যায় খামোশ বয়ঠে ক্যায়সে? ইস দরিয়া মে দোনো কে লিয়ে কাফি জায়গা নেহি মিলেগা?' ওসমান বলে, 'বাদ দাও খিজির, তাড়াতাড়ি চলো।' খিজিরটা কি গাধা নাকি? এ কি রঙ্গতামাসার সময়? আর আহত মানুষটাকে নিয়ে সে কি শুরু করলো? খিজিরের কি দয়ামায়া নাই? খুব বিরক্ত হয়ে খিজিরকে সে ধমকায়, 'ভদ্রলোককে ছেড়ে দাও খিজির! চলো, তাড়াতাড়ি চলো!' চাল্লি-সম্বন্ধে ভদ্রলোক বলায় খিজির ফের একচোট হাসে, তারপর বলে, 'ছাড়লে যাইবো কৈ? পায়ের মইদ্যে বহুত চোট পাইছে! দেখছেন?' বলতে বলতে তার হাসির নতুন দমক ওঠে, 'ওস্তাদ, "ডাকু লড়কি" মে আপ ক্যায়সা করকে গিরা থা, ইয়াদ হ্যায়?'

ওসমান স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, লোকটার কি কিছুমাত্র বিবেচনা বোধ নাই? একটু আগেই না এর রাগী ও ভাঙ্গাচোরা গাল গরম লোহার মতো ভয়ানক দ্যাখাচ্ছিলো! অথচ কিছুক্ষণ যেতে না যেতে তার এ কি তামাশা? খিজির বলে, 'চলিয়ে ওস্তাদ, আপকো আলুবাজার পৌঁছা দে!' তারপর সেই বিশাল মোটা দেহটি তার হাড়গিলা গতর দিয়ে ঠেক, দিয়ে সামনে যেতে যেতে ওসমানকে বলে, 'আপনে যান গিয়া! ইনারে দোস্তের বাড়ি দিয়া আহি!'

ওসমান অস্থির হয়ে বলে, 'কারফ্যু আরম্ভ হয়ে গেছে। তুমি ফিরবে কিভাবে?' ফ্যাটি সোহরাবের শরীরের দিকে তাকিয়ে খিজিরের বোধহয় আরো ফিল্মের কথা মনে পড়ে, কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে বলে, 'কি করুম? মোটা মানুষ, পাও একখান তো গেছে, একলা যাইবো ক্যামনে?'

আবার কোত্থেকে স্লোগান ও গুলিবর্ষণের আওয়াজ আসে! লোকটিকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে যেতে যেতে খিজির বলে, 'বহুত ভারি মাল! দশখান মাইনষের লাশ মালুম লয় পাকিন কইরা ফালাইয়া রাখছে!' ফ্যাটি সোহরাবকে ধরে এগোতে এগোতে খিজির একবার পেছনে তাকায়, 'আপনে যান গিয়া!'

১টি কথা না বলে ওসমান হন হন করে উল্টোদিকে হাঁটে। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটেও কারেন্ট নাই। অন্ধকার বাড়ির সামনে জটলা করে লোকজন ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়ে। ফাঁকা হয়ে আসছে। ওদিকে কোথায় গুলি হচ্ছে তো হচ্ছেই। কারফ্যু শুরু হয়ে গেছে, কখন মিলিটারির লরি এসে ব্রাশ-ফায়ার শুরু করবে! বনগ্রামের মাথায় কয়েকজন লোক দেখে সে ঐ রাস্তাতেই ঢোকে এবং বনগ্রাম লেন হয়ে হেয়ার স্ট্রিটের এপারে ও ওপারের মুচিপাড়া পেরিয়ে পৌঁছে যায় গোপীকিষণ লেনে। এখানটা ঘোরতর অন্ধকার ও সাঙ্ঘাতিক নির্জন। এখন এই রাস্তার শেষে টিপু সুলতান রোড ধরে গেলে তার আর রক্ষা নাই, ঐ রাস্তাটা একেবারে খোলা, নারিন্দা বা নবাবপুর যে কোনো দিক থেকে আর্মির গাড়ি আসতে পারে। সে তাই নবাব

স্ট্রিটে পা দিয়ে ফের র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের দিকে রওয়ানা হলো। অন্ধকার ও ছমছমে নির্জন রাস্তা! কারফ্যু আর আর্মি! আর্মি আর কার্ফ্যু! উদ্বেগ ও ভয়ে ওসমান খুব তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করে। কিন্তু তার গন্তব্য ও হাঁটবার উদ্দেশ্য হঠাৎ ঝাপশা হয়ে আসে। বুকের টিপ টিপ আওয়াজ কানে বাজে প্রায় ঘণ্টাধ্বনির মতো। এতো জোরে ঘণ্টা বাজায় কোন দপ্তরি? রঞ্জুর কি স্কুল ছুটি হলো? স্কুল ছুটির পর ক্যাপ্টেনের পেছনে সে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন শালা আছে শঙ্করের সঙ্গে কেটে পড়ার তালে। যাক ওরা যেখানে খুশি যাক, রঞ্জু একা একা তাঁতী বাজারে গিয়ে আরতির সঙ্গে একটু গল্প করবে। ক্যাপ্টেন জানতেও পারবে না। কোত্থেকে একটা ঘর্ঘর আওয়াজ এসে তাকে চমকে দিলো, একি, ক্যাপ্টেনকে গুলি করে মেরে ফেললো নাকি?—আওয়াজটা আসছে ওপর থেকে। ওপরের দিকে ঘাড় তুলে ওসমান দ্যাখে একটু দূরে 'দৈনিক পয়গাম' অফিসের ছাদে জলপাই রঙের পোষাক ও হেলমেট পরা আর্মির লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে সার বেঁধে। ওখান থেকেই মাইকে কারফ্যু জারি ও কারফ্যু অমান্যকারীদের শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। ঐসব লোকের হাতে অটোমেটিক ফায়ার আর্মস। তাহলে ক্যাপ্টেন আসে কি করে? সমস্ত ব্যাপাটা বড়ো রহস্যময় ঠেকে। হয়তো এই রহস্যময় ও অলৌকিক দৃশ্যের তাড়ায় তার পা ২টো পরিণত হয় ডানায় এবং সে প্রায় উড়ে চলে। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের টিপু সুলতান রোড ক্রস করে ওসমান পৌঁছে যায় ভজহরি সাহা স্ট্রিটে। পদ্মনিধি লেন পার হয়ে পুকুরের ধার দিয়ে হেঁটে দোলাই খালের ওপর এবড়োখেবড়ো-করে-ফেলা নতুন মাটির স্তূপ ডিঙিয়ে কলতাবাজারে পৌঁছেও তার ভয় কাটে না। এদিক কম হলেও লোকজন চলাচল করছে। এদের মধ্যে নিহত ক্যাপ্টেন শালাও থাকতে পারে। আর্মির সঙ্গে একজোট হয়ে ও কি তাকে তাড়া করছে? বাড়িতে যেতে হলে লক্ষ্মীবাজারের সদর রাস্তা দিয়ে ঢুকতে হয়। তবে এমন সব গলি উপগলি আছে যেগুলো তাকে প্রায় কোলে করে নিয়ে আস্তে রেখে দেয় এমন জায়গায় যেখান থেকে ঠিক ৫টা ৬টা স্টেপ পার হলেই বাড়িতে ঢোকার দরজা। ভেজানো দরজা ঠেলতেই খুলে গেলো। তবু বলা যায় না! আর্মির গাড়ি কিংবা নিহত কাপ্টেন তার পিঠ তাক করে ট্রিগার ছুঁড়লেই সিঁড়ি থেকে সে গড়িয়ে পড়বে নিচে। না, তা হতে দেওয়া যায় না। এতো জনাকীর্ণ রাস্তাঘাট, এতো মিছিল, এই রাগী শহর,—সব, সবই অব্যাহত চলবে, আর সেই কেবল মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে এই সিঁড়ির নিচে? অতো সোজা?

ওসমান লাফিয়ে ওপরে উঠছিলো। দোতলা অতিক্রম করে গেলে পেছন থেকে তীব্রগতিতে এসে বিদ্ধ করে ২টো শব্দ, 'এতোক্ষণে আসলেন?' আরো ২টো ৩টে ধাপ পেরিয়ে ওসমান পেছনে তাকায়। রানুকে সম্পূর্ণ দেখতে না দেখতে তার চোখজোড়া শ্রান্তিতে বুঁজে আসে। রানুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরের রেশ তার কানে গুনগুন করে। ওসমান খুব ক্লান্ত পায়ে এবার আস্তে আস্তে আরো ২টো ধাপ ওঠে, রানুর শুকনা গলার ফ্যাসফেসে ধ্বনিও তার সঙ্গে ওপরে ওঠতে থাকে। এবার সে নামে, ঘুরে দাঁড়িয়ে সরাসরি রানুর দিকে তাকায়। ঘোলাটে আলোতে তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই রানু নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো।

কয়েক পলক দাঁড়িয়ে ওসমান ফের নেমে এসে ধাক্কা দেয় রঞ্জুদের দরজায়, ডাকে, 'রানু রানু।' এই দরজায় এসে সে রানুকে কখনো ডাকেনি। এখানে এলে রঞ্জু বলে ডাকতে তার ভালো লাগে এবং এই নামটা বেশ মোলায়েম ও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা যায়। আজ কিন্তু রানুকে ডাকতে তার একটুও সঙ্কোচ হলো না।

দরজা খুললো রঞ্জু। খুলেই বলে, 'আপনে গেছিলেন কৈ কন তো? সন্ধ্যাবেলা না কারফ্যু দিছে! আমি ভাবলাম উনি হয়তো আর্মির হাতে গুলি টুলি খাইছেন? গুলি লাগলে আর আসতেন ক্যামনে?'

ওসমানের একটু খারাপ লাগে। রঞ্জু কি ওসমানের মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলো না? দ্যাখা হওয়া দরকার রানুর সঙ্গে। রানু কোথায় গেলো? রঞ্জুকে পাত্তা না দেওয়ার জন্যেই সে জোরে জোরে জিগ্যেস করে, 'রানু কোথায়?'

'জানেন, আজ কতো জায়গায় আগুন দিছে? পাবলিকে মিলিটারি টিলিটারি কিছু মানে না!' দরজায় দাঁড়িয়ে রঞ্জু এক নাগাড়ে কথা বলে। ছেলেটার এই ১টা দোষ! রানু কিন্তু এরকম নয়। রানু বরং তার কথাই শুনবে। ওসমানের এখন ১জন শ্রোতা চাই। তা রানু ছাড়া তার কথা আর শুনবে কে? দরজায় দাঁড়িয়েই সে উঁচু গলায় বলে, 'আরে আমি তো বাইরেই ছিলাম। দুপরবেলা সেক্রেটারিয়েটের সামনে আগুন জ্বালানো হলো আমার সামনে। মর্নিং নিউজ অফিস পোড়ানো হলো আমার সামনে। তারপর, আরজু হোটেল চেনো? আমার সামনে আগুন জ্বালালো। বড়ো কাটরায় মুসলিম লীগ অফিস পুড়ে শেষ। গভর্নর হাউসে গেলাম, মোনেম খান কোনদিক দিয়ে পালিয়ে গেছে, না হলে ব্যাটা পুড়ে মরতো!' তার কথার সবটা সত্যি নয়, কিন্তু বলতে বলতে কোনটা ঘটেছে আর কোনটি ঘটেনি ওসমান নিজেই বুঝতে পারে না।

তার কথা শুনে দরজায় চলে এসেছে মকবুল হোসেন, 'ভেতরে আসেন, ভেতরে আসেন। বসেন। আপনে সারাটা দিন আছিলেন কৈ, কন তো? রানু বললো আপনে ঘরে ফেরেন নাই। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। বসেন।' ঘরে একটা ভাঙা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলো ওসমান। মকবুল হোসেন একেবারে হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'আরে এই চেয়ারে বসেন। এখানে বসেন।'

ওসমান বিনা দ্বিধায় এই সম্মান গ্রহণ করে এবং হাতল ছাড়া ভালো চেয়ারটিতে বসে সারা দিনের দীর্ঘ প্রতিবেদন ছাড়ে।

মকবুল হোসেন বলে, 'যাই কন, এইগুলি বাড়াবাড়ি। শৃঙ্খলা না থাকলে মানুষ সুখে থাকে ক্যামনে, কন? গভমেন্ট খারাপ, তো এ্যারে সরাইয়া অন্য গভমেন্ট বসাও। কিন্তু এইরকম হট্টগোল কইরা, জ্বালাইয়া পুড়াইয়া লাভ কি?'

ওসমান বেশ জোর গলায় জবাব দেয়, 'বাড়াবাড়ি করছে কে? কথা বললেই গুলি, টিয়ার গ্যাস! মানুষের মিনিমাম রাইট নেই। গভমেন্ট বাড়াবাড়ি করলে পাবলিক এ ছাড়া কি করতে পারে?'

রানু আসে চা ও টোস্ট বিস্কুট নিয়ে। সরকারের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষে জনতার কার্যকলাপে সে ঘোরতর সমর্থন জানায়, 'মানুষ খালি বইসা মার খাবে? পুলিশ মিলিটারি যদি গুণ্ডার মতো হয় তো মানুষ কি করতে পারে?'

রানুর মন্তব্যে অভিভূত ওসমান কোনো কথা বলতে পারে না। তখন ভেতর থেকে আসে রানুর মায়ের একটানা কান্নার শব্দ। বাইরে আজ কোথায় কোথায় গুলিবর্ষণের খবর শোনবার পর থেকে মহিলা এভাবে কেঁদেই চলেছে। ওসমানের মনে হয় আজকের সব ঘটনার এতোটা বর্ণনা সে না দিলেই পারতো। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়, 'যাই ঘরে যাই। রাত হলো!'

'আপনে তো খান, নাই? রাত্রে খাবেন কোথায়?' রানুর এই কথায় মকবুল হোসেন মহা হৈ চৈ করে। তাইতো, কারফ্যুর ভেতর ওসমান আবার খেতে যাবে কি করে? ওসমান এদের সঙ্গে খেতে রাজি হলে মকবুল হোসেন ভেতরে গেলো।

রানু বলে, 'ঠিক আছে, আপনে যান। হাতমুখ ধুইয়া বিশ্রাম করেন। রঞ্জু ভাত দিয়া আসবে।'

ওসমান তার দিকে সরাসরি তাকায়, 'তুমি যাবে না? বলেই ফের যোগ করে, 'তোমার পড়াশোনা কি মাথায় উঠলো?'

ভাত তরকারি নিয়ে এসেছিলো মকবুল হোসেন। বেশ স্বাভাবিক গলায় ওসমান বলে, 'কাল বোধহয় অফিস টফিস হবে না। রানুকে বইপত্র নিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। পরীক্ষা তো এসে গেলো।'

খাওয়ার পর ওসমান সটান শুয়ে পড়ে। এক নাগাড়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা রানুর 'এতোক্ষণে আসলেন'—শব্দ দুটোর রেশ কানে গুনগুন করলে তার ঘুম ভেঙে যায়। সে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বসলো! না, রানু কোথায়? মাথার ওপর এক ঝাঁক মশার বিরতিহীন গুঞ্জন। লেপের বাইরে বেরিয়ে-পড়া পায়ের পাতায় এখনো শুঁড় আটকে রয়েছে বেশ কয়েকটা মশা। মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়লে ঘুম আর ভালো করে জমে না। সিঁড়ির দিককার দরজায় হাল্কা পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে কি? রানু কি পা টিপে পা টিপে ওর কাছে আসছে? রানু যদি এসে ওর পাশে বসে, যদি বলে, 'মশা খাইয়া একেবারে শেষ কইরা ফালাইলো!'—দূর! তাই কি হয়? কয়দিন আগে অফিসের বস ১৯৬৯ সালের ১টা ডায়েরি দিয়েছে, কাল রানু পড়তে এলে ওটা ওকে দিয়ে দেবে। রানু কি বিছানায় ওর পাশে বসবে? সেই সময় ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওকে পাশে শুইয়ে দেওয়া যায় না?—দূর। এই মেয়েটার ভাবনা তার ঘুমটা নষ্ট করে দিলো। ছাদে একটু পায়চারি করে আসবে নাকি? গা থেকে লেপ সরিয়ে ওসমান একবার ওঠার উদ্যোগ নিলো। না, ঠাণ্ডা লাগছে। লেপটা গায়ে দিতেও ইচ্ছা করে না। এর মধ্যে ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসে। কিন্তু মতিঝিল কি নবাবপুরের আগুনের আঁচে বারবার ঘুম ভেঙে যায়। পাতলা ঘুম কি তন্দ্রায় আগুনের শিখার পাশে দ্যাখা যায় হাজার হাজার মানুষের লালচে শক্ত মুখ। কিন্তু ওসমান নিজেকে কোথাও খুঁজে পায় না। স্বপ্নে মানুষের ভিড়ে নিজের চেহারা ঠাহর করতে গিয়ে তার চোখ খচখচ করে। একবার খিজিরের মতো কাউকে দ্যাখা গেলো। হ্যাঁ, খিজিরই তো। ঐতো ১ হাতে প্লায়ার, অন্য হাতে কেরোসিন তেলের গ্যালন ভরা টিন। স্বপ্নের মধ্যেই মনে হয়, খিজিরের হাতে তো টিন ছিলো না। তাহলে ওটা কে? ১বার দ্যাখে খিজির তার লাল রেখা-উপরেখা খচিত চোখে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আগুনের শিখায় অতো দ্যাখার বস্তু কি আছে? খিজির মনে হয় শিখার ভেতরকার শাঁস দেখে নেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। স্বপ্নে দ্যাখা এই আগুনের ওমে ভোরের দিকে ওসমান গড়িয়ে পড়ে গভীর ঘুমের ভেতর।

২৪

খিজিরকে নিয়ে রহমতউল্লার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলে। ছেলেবেলা থেকে সে তার কাছেই মানুষ হলো, অথচ তার বেয়াদবি এখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তার বস্তি থেকে তাকে উঠিয়ে দেওয়া দরকার। তবে ন্যায়নিষ্ঠার খাতিরে বাড়িওয়ালা জুম্মনের মাকে থাকতে দেবে। কারণ, 'শয়তানি করবো একজন আর তার গুণাগারি দিবো আরেকজনে? হাজব্যান্ডের লাইগা তো ওয়াইফরে পানিশমেন্ট দিবার পারি না!'

খিজিরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর রহমতউল্লা তার বাড়ির বাইরের বারান্দায় ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে গা এলিয়ে অপরাধ ও শাস্তি সম্বন্ধে তার মতামত ব্যক্ত করছিলো। বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'ঐ হালায় একটা নিমকহারাম, জাউরা চোদা, অর খাচরামির লাইগা অর বৌরে খ্যাদাইমু ক্যান? অরে অর্ডার দিছি, তুই একলাই ভাগ!' তার মুখে পানের পিক। আজকাল জর্দা-দেওয়া পানের পিক গিললে মাথাটা কেমন চক্কর দেয়, ঘাড়ের রগ টনটন করে। কথা বন্ধ করে রহমতউল্লা পিকদান নিয়ে আসার জন্য কাকে ইশারা করে। ছোকরামতো এক চাকর পিকদান আনতে গেলে তার কথা স্থগিত থাকে। এই নীরবতার প্রথম ২০/৩০ সেকেন্ড সবাই চুপচাপ ছিলো, কিন্তু এরপর সমবেত মানুষের মধ্যে গুঞ্জন শোনা যায়। কে যেন বলে, 'অর বৌ একলা থাকবো ক্যামনে?'

'আরে অর আবার বৌ?' বজলুর ভাঙা গলা ঘর্ঘর করে ওঠে, 'জাউরা হালার আবার বাপই কি আর বিবিই কি?'

আলাউদ্দিন মিয়ার ১জন রিকশাওয়ালা বলে, 'উই গেলে কি আর বৌরে রাইখা যাইবো? বৌ ভি অর লগেই যাইবো!'

রহমতউল্লার ১ রাজমিস্ত্রী মনিবের মতে সায় দেয়, 'বৌরে তো মাহাজনে বাইন্ধ্যা রাখবো না! মাহাজনের কথা হইলো, চোরের লাইগা চোরের বিবিরে তো ধরা যায় না!'

'আরে মিয়া রাখো!' মহাজনের সমর্থককেও বজলু কথা বলতে দেবে না। ওর মেজাজটা আজ চড়া। ম্যাটিনি-শোর আগে বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেলো। গুলিস্তানে আজ নীলো-ওয়াহিদ মুরাদের নতুন ছবি ছাড়লো, বেলা সাড়ে দশটা থেকে হলের সামনে 'হাউস ফুল' ঝুলছে। 'হাউস ফুল' অবশ্য বজলুরাই করে রাখে। তা ম্যাটিনিতে ভিড়ও হয়েছিলো খুব। ম্যানেজার ও দারোয়ানকে খাজনা দেওয়ার পর কম করে হলেও ২০টা টাকা ওর হাতে থাকতো, কিন্তু শালার পাবলিক হঠাৎ খুব গরম হয়ে উঠলো। 'রিয়ার স্টল ডিসি, রিয়ার স্টল ডিসি' বলতে বলতে হলের সামনে রেলিঙের ধার ঘেঁষে বজলু ঘোরাঘুরি করছে, হঠাৎ একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো কমসে কম ১০/১৫ জন লোক। সঙ্গে এলোপাথাড়ি কিলঘুষি ও গালাগালি, 'শালা ব্ল্যাক করো, না? দাঁড়া শালা, তোদের ব্ল্যাক করা দেখিয়ে দিচ্ছি!' এদের বেশির ভাগই কলেজ ইউনিভারসিটির ছাত্র, এককেটা নম্বরি বিচ্ছু। তার পিঠের বাঁ দিকটা এখনো টনটন করছে, সোজা হয়ে বসে থাকতে পাচ্ছে না। আলাউদ্দিন মিয়ার রিকশাওয়ালাকে সে জোরে ধমক দেয়, 'চুপ মার রে, তুই জানস কি? কামরুদ্দিনের বৌরে ভাগাইয়া লইয়া আনছে। অর আবার বৌ ক্যাঠা? কামরুদ্দিনে মনে করলে নিজে বৌ লইয়া ঘর করবো, কার কি?'

এর মধ্যে পিকদানী এসে যায়, শ্লেষ্মা কফসহ অনেকটা পিক ফেলে রহমতউল্লা হাতের তেলোয় ঠোঁটের কোণ মোছে। কফমুক্ত গলায় রহমতউল্লা দ্বিধাহীন ও স্পষ্ট বাণী ছাড়ে, 'কামরুদ্দিনে তো অর পোলারে লইয়া আলাদা থাকে। আমি কই মায়েরে ছাইড়া পোলায় থাকে ক্যামনে? এই নিমকহারাম কি কামরুদ্দিনের পোলারে দেখবো, কও?'

'খিজিরে তো জুম্মনরে লগে রাখবার চায়। উই তো না করে নাই।' রহমতউল্লাহর গ্যারেজের আরেক রিকশাওয়ালা এই মন্তব্য করলে বজলু তার পিঠের ব্যথা অস্বীকার করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'তুই হইলি বাঙ্গুচোদা একখান! খিজিয়া হালায় নিমকহারামের পয়দা নিমকহারাম! ঘরের মইদ্যে মাহাজন অরে থাকবার দিছে, অর মায়েরে ভি থাকবার দিছিলো, অর খাওয়াইয়া বড়ো করছে, বিয়া দিছে, কাম দিছে। অহন মালিকের গিবত কইরা বেড়ায়, মিটিঙের মইদ্যে ফাল পাড়ে! ঐ হালায় মাইনষের পোলারে রাখবো নিজের কাছে?'

রহমতউল্লার উত্তেজনা বোঝা যায় না। ডাক্তার তাকে উত্তেজিত হতে না করেছে। তার ব্লাড প্রেশার আজকাল বেশ বেশি, ওপরে ২০০ এবং নিচে ১০০/১১০ এমনকি ১২০ পর্যন্ত ওঠে। কপাল কুঁচকে সামনের দিকে তাকিয়ে সে বজলুর কথা শোনে।

সেদিন রাত্রে বস্তির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে বজলু। সঙ্গে আরো কয়েকজন, এসব ব্যাপারে অন্তত ৩ জন না হলে কাজ হয় না। খিজিরকে বস্তিতে ঢুকতে দেখে বজলু বলে, 'খিজির্যা, তর লগে কথা আছে?'

'কি?'

কিন্তু বজলু কথাটা বলে না। তার সঙ্গীরা সব তাকিয়ে থাকে অন্যদিকে। কিছুক্ষণ পর খিজির বলে 'সর,ঘরে যাই।'

অপমানিত হওয়ার মতো ভঙ্গি করে বজলু, 'কইলাম না কথা আছে।'

'কি কথা জলদি ক।'

স্বর একটু নামিয়ে বজলু বলে, 'কাউলকা তুই এই ঘর ছাইড়া দিবি! মাহাজনের হুকুম!'

খিজির এবার সোজাসুজি বজলুর চোখের দিকে তাকায়। রাস্তার ল্যাম্পেপাস্টে বাল্ব আজ কয়েকদিন জ্বলছে না, জায়গাটা এমনিতে অন্ধকার, এর ওপর খিজিরের গলার ছায়া পড়ায় বজলুর মুখের কোনো অংশই বিশেষভাবে দ্যাখা যায় না। অন্ধকার বজলুর দিকে দেখতে দেখতে খিজির বলে, 'মাহাজনে আমারে কইলেই পারে! তরে পাঠাইছে ক্যালায়? আমি ভাড়া দেই তরে?'

খিজিরের এই বিরক্তি ওদের বেশ সুযোগ করে দিলো। বজলুর এক সঙ্গী বলে, 'হাড়ডির মনে লয় নয়া নয়া পালিশ লাগতাছে। বহুত গিরিজ মালুম হয়!'

লোকটিকে খিজির ভালো করে দ্যাখে। এ লোকটিও রিকশাওয়ালা, গোপীবাগ না টিকাটুলির দিকের ১ গ্যারেজ থেকে রিকশা নেয়। আর যে লোকটি চুপ করে আছে সে হলো বজলুর সিনেমা হলের সহকর্মী, মধুমিতার পেছনে ১টি দেওয়ালের এপাশে ওপাশে ওদের ভালো ১টা আড্ডা আছে, খিজির কয়েক বার এদের কাছ থেকে টিকেট কিনেছে। বজলুর এই সহকর্মী এবার প্রায় আপন মনে বলে, 'যার খায় যার পরে, তারেই ধইরা হোগা মারে?' লোকটির ছন্দোবদ্ধ বাক্যের জবাবে খিজির ব্যবহার করে সরল গদ্য, 'মাগনা খাই না, খাইটা খাই। মাগনা থাকি না, ভাড়া দিয়া থাকি।'

বজলু বলে, 'কাম তো করে তর বৌ। মাহাজনের বাড়ির মইদ্যে তারে নাম ল্যাখাইয়া তুমি হালায় তামান দিন বাউলি মারো! অহন আবার মাহাজনেরে বেইজ্জত করবার চাস, না? মাহাজনের বালটা ছিঁড়বার পারবি?'

বজলুর সিনেমা হলের সঙ্গী এগিয়ে আসে, 'ফালতু কথা, আজাইরা বাতচিত কইরা লাভ কি? তোমারে খবর দিয়া গেলাম, তুমি মাহাজনের ঘর ছাড়বা।'

'ছাড়ুম'। বলতে বলতে খিজির বস্তির ভেতর ঢোকে, 'মগর মাহাজনে আমারে কইবো না? ভাড়া বাকি রাখছি? কইলো আর উঠলাম? আমার বৌ-পোলা আছে না? অগো দরিয়ার মইদ্যে ভাসাইয়া দিমু?'

বজলুর ঘরের ভেতর থেকে খিলখিল করে হেসে ওঠে ওরা বৌ, হাসির সঙ্গতে তার এইসব কথা শুরু হয়, 'হ, পোলাপান দিয়া ঘর এক্কেরে ভরাইয়া দিছে। আঁটকুইড়া, আঁটকুইড়ার বাচ্চা আঁটকুইড়া, অর আবার পোলাপানের হাউস!'

বজলুর সিনেমার সহকর্মী লোকটি হো হো করে হাসে, 'আরে আঁটকুইড়ার বাপে আঁটকুইড়া হয় ক্যামনে? বাপে পয়দা না করলে আঁটকুইড়া হালায় দুনিয়ার মইদ্যে আইবার পারে?'

বজলুর বৌ বাইরে এসে দাঁড়ায়, তার গলায় খিলখিল হাসির রেশ রয়েই গেছে 'হয়, হয়! কতো কি হইতে পারে। বুইড়া একদিন যার লগে হুইছে অহন ধরছে তার পোলার বৌরে! দুইদিন বাদে আবার এই মাগীর পোলারে দিয়া গতর টিপাইয়া লইবো! কতো দেখলাম! আরো কতো দেখুম!'

বজলুর সহকর্মী ফের হাসে। এই হাসাহাসিতে চটে গিয়ে বজলু ধমক দেয়, 'চুপ কর! তুই এখানে কি করবি? ঘরে যা!'

বজলুর বৌ তবু দাঁড়িয়ে রইলো দেখে বজলু তাড়া দেয়, 'মাগী গেলি?'

'কি হইছে? তুমি একলাই চিল্লাইবার পারো, আমাগো মুখ নাই?'

বজলু এবার তারস্বরে চ্যাঁচায়, 'রাইত বাজে বারোটা না একটা, মরদ মানুষ দেইখা খানকি মাগীর খাউজানি উঠেছে, না? যা!'

'তুমি তো পট্টির মইদ্যে গতরখান ঝাইড়া আইলা, নিজের বিবিরে খানকি কইতে শরম করে না?' বজলুর বৌ অবিরাম কথা বলে, 'কেমুন মরদ, এ্যাঁ? মাহাজনে তরে জুম্মনের মায়ের চুচির ধামাটা হাতের মইদ্যে তুইলা দিবো? রাইত একটার সময় নিজের বৌ পোলারে রাইখা মাহাজনের ভাউরামি করো কোন আক্কেলে, এ্যাঁ? আরে বেজাতের পয়দা, ঐ মাগীর উংলিটা কি ধরবার দিবো তরে?' বজলুর বৌয়ের চিৎকারে রহমতউল্লার ছোটো উপনিবেশটিতে কারো কারো ঘুম ভাঙে, কেউ ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরে। ১টা ঝামেলার সম্ভাবনা আঁচ করে বজলুর রিকশাওয়ালা সঙ্গী খিজিরকে বলে, 'তুমি মিয়া রংবাজি ছাড়ো। কাউলকা তুমি এই ঘর ছাড়বা। তোমার বৌ মাহাজনের বাড়ি কাম করে, মাহাজনে তারেই খালি থাকবার অর্ডার দিছে।'

খিজির বলে, 'ঠিক আছে! মাহাজনের লগে কথা কই! তোমরা কি মাহাজনের মানিজার?' ঠোঁটের দুই কোণ বাঁকা করে সে ফের বলে, 'ভাড়া দেই মাহাজনের হাতে, কথা কইলে তার লগেই কমু। মাহাজনে যুদিল ভাড়া উড়া বাড়াইতে চায় তে খোলাসা কইরা কইলেই পারে!'

খিজিরের এরকম ভদ্রলোক ধরনের চিবিয়ে চিবিয়ে বলা কথায় লোকটি জড়সড় হয়ে তাকে দ্যাখে। এমন কি এই কথার তোড়ে জুম্মনের মা পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বস্তি মাত করে স্বামীকে বকে, 'এই ত্যারা কথা কইয়াই তো মরলা। থাকার মইদ্যে আছে কি? না, ঐ চোপাখান! গতরের মইদ্যে নাই আধপোয়া গোশতো, পাদ দিলে খটখটাইয়া বাজে, তার চোপাখান দ্যাখো?'

জুম্মনের মায়ের এই সংলাপে বস্তি বেশ গুলজার হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি নিজের বৌয়ের চুল ধরে টানছে বজলু। এখানে আসার আগে ৩জনে পাঁইট তিনেক মাল টেনে এসেছে, তাতে পিঠের ব্যথা বোঝা যাচ্ছিলো না। ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠলো, ওদিকে হাতের কবজিতে জোর কম। গালাগালি করার শক্তিও তার প্রায় নিঃশেষিত, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বৌকে মারা ও গাল দেওয়া—এই ২টো কাজ একসঙ্গে করা একটু কঠিন। তার নীরবতার সুযোগে 'আমার গতরে হাত দিবি না কইলাম! খানকি পট্টির মইদ্যে গিয়া তর মায়েরে বইনেরে চুল ধইরা টান, বাল ধইরা টান'—এই বাক্যসমূহের পুনরাবৃত্তি করে চলেছে বজলুর বৌ। ১বার বজলুর হ্যাঁচকা টানে তার মাথাটা স্বামীর বুকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মাথা দিয়েই সে এমন গুঁতো দেয় যে লোকটা দড়াম করে পড়ে যায় ছোট্টো উঠানের এপাশ ওপাশ জুড়ে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বীরত্বের অবসান ঘটে এবং প্রায় কাঁদা কাঁদো গলায় বলে, 'আমারে ম্যাইরা ফালাইলো, খানকি মাগি আমারে খতম কইরা দিলো!'

রিকশাওয়ালা সঙ্গী তাকে তুলতে গেলে তার শরীরের ভারে নিজেই পড়ো পড়ো হয়ে কোনোরকমে সামলে ওঠে। তখন বজলুর দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে সবাই জুম্মনের মায়ের আক্ষেপ শুনতে শুনতে তার মুখ ও বুক দেখতে শুরু করে।

'আমি কই, মাহাজনের কাছে যাও। গিয়া কও, ভুল ১টা হইয়া গেছে, এইসব মাপ কইরা দেন!' জুম্মনের মায়ের গলার স্বর এখন অনেকটা নিচু। গলা আরো নামিয়ে সে বলে, 'গিয়া কও আপনার ভাইগ্নার কাম করি, মহল্লায় তার মিটিঙের মইদ্যে না থাকলে চাকরি থাকবো?' আসলে এইভাবে সে মহাজনের বিরুদ্ধে খিজিরের কথিত তৎপরতার একটি কৈফিয়ৎ দাঁড় করাতে চায়। কিন্তু খিজির বলে, 'আরে তুই চুপ কর না! মিটিঙে যাই কি আলাউদ্দিন মিয়ার লাইগা? তামাম ঢাকার মানুষ মিটিং করে না? মানুষ চেতছে, তর মাহাজনের বাপের বাপ, দাদার দাদা, আইয়ুব খানের দিন বলে খতম হইয়া আইতাছে, তার হোগার মইদ্যে আড়াই ইঞ্চি মোটা পাইপ ঢোকে, তার ফাল-পাড়া দ্যাখে ক্যাঠায়? আর তর মাহাজনের পাছা খাউজায়, না? আরো তর মাহাজনে তো কীড়ার ভি অধম!'

বজলু চিৎপটাং হয়ে শুয়ে রয়েছে ছোট্টো সরু উঠানে, ১টা পা তার নিজের ঘরের দরজায় কাছে। তার বড়ো বড়ো নিশ্বাসের আওয়াজে মনে হয় লোকটা গভীর ঘুমে অচেতন। এদিকে খিজিরের চটাং চটাং কথা শুনে বজলুর সঙ্গীরা একটু ঘাবড়ে গেছে। কিংবা বজলুকে ছাড়া চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ঘুম থেকে উঠে এসেছে বস্তির কয়েকজন পুরুষ। এতো রাত্রে বজলুদের এই অভিযানে ওদের সায় না-ও থাকতে পারে। সিনেমার সহকর্মী বজলুর বৌকে বলে, 'ঐটারে ভিতরে ঢুকাইয়া দেই?'

'থাউক না!'

ফজলুকে ঐ অবস্থায় রেখে বাইরে চলে যেতে যেতে বজলুর এক সঙ্গী খিজিরকে বলে, 'খিজির্যা, লেকচার রাখ! লেকচারের মায়রে বাপ! কাউলকা ঘর খালি করবি, বুঝলি? কামরুদ্দিনে এই ঘর ভাড়া লইবো, বৌ-পোলা লইয়া থাকবো!'

সবাই যার যার ঘরে চলে যাওয়ার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে মানুষের ঘুমের গম্ভীর ও একটানা আওয়াজ সমস্ত বস্তি জুড়ে সরব কুয়াশার মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে ফেরে। এমনকি মেঝেতে শুয়ে থাকা খিজিরের কাঁথা-মোড়ানো অন্ধকার কাঠামো দেখে জুম্মনের মা বোঝে সেও ঘুমিয়ে পড়েছে। কবরেও এর চেয়ে চঞ্চলতা থাকে। থাকে না? মরা মানুষের গোর-আজাব নাই? এই লোকটা কি মরার চেয়েও অসার?—আরে, কাল রাত্রে কোথায় থাকবি, কোথায় থাকবে তোর রোয়াবি? মাটিতে শুলেও মাথার ওপর ১টা ছাদ আছে, এখানে থেকে বার হয়ে ছাদ পাবি?—ফালতু ফুটানি জুম্মনের মায়ের দুই চোক্ষের বিষ? এই হাডডিসার মানুষটার আছে কি যে দিনরাত খালি বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে গোলমাল করবে? এমনিতে তো লোকটা খারাপ ছিলো না। বস্তির আর সকলের মতো দিনরাত কথায় কথায় বৌয়ের গায়ে হাত তোলে না। কখনো কখনো মদ খেয়ে এসে কোনো কারণে মেজাজ চড়ে গেলে চড়টা চাপড়টা দেয় বটে, কিন্তু প্রথম কয়েকটা লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে খিজিরের সরু ও শক্ত আঙুলগুলো আপনিই সিঁটকে আসে, হাত ২টোই যেন কুঁকড়ে যায়, সে তখন নিজের ১ হাত অন্য হাতের ওপর ঘষতে থাকে। এরকম ঘষতে কিছুই না বলে হঠাৎ বাইরে চলে যায় এবং সেদিন ফেরে একেবারে গভীর রাতে, আরো ১টা পাঁইট গিলে। আজকাল অবশ্য গায়ে হাত তোলে আরো কম। তা জুম্মনের মায়ের ওপর তার রাগ করার সময়ই বা কোথায়? আলাউদ্দিন মিয়ার গ্যারেজের কাজের সঙ্গে তার নতুন চাকরি জুটেছে: রাজ্যের মানুষ জুটিয়ে মিছিল করা আর মিটিং করা আর নামী মানী মানুষের হোগায় উংলিবাজি করা। এভাবে কতোদিন চালাবে? জুম্মনের মা কি ততোদিন পর্যন্ত বসে থাকবে? কিসের গরজ তার? আবার সে কি ইচ্ছা করলেই হাড়ডি খিজিরের মতিবদলের জন্যে বসে থাকতে পারে? এর মধ্যে কামরুদ্দিন এসে তার ছেলেসুদ্ধ তাকে দখল করে নেবে না? মহাজন কামরুদ্দিনকে প্রায় প্রতিদিন খবর পাঠচ্ছে, দোলাই খালের ওপর রাস্তা তৈরির কাজে তাকে দরকার। অথচ দ্যাখো, এই মহাজনই কিছুদিন আগে প্রচার করেছিলো যে ভারা থেকে পড়ে গিয়ে কামরুদ্দিনের হাত পা ভেঙে গেছে, জোগানদারের কাজ করার ক্ষমতা তার চিরকালের জন্য শেষ। মহাজনের এখন দরকার, এখন শোন যাচ্ছে তার মতো মিস্ত্রি এই এলাকায় ১টাও নাই। একবার জুম্মনের মাকে খিজিরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মহাজন যে ছ্যাঁকটা তাকে দিয়েছে কামরুদ্দিন কি সহজে আসে? পুরনো বৌ ও ছেলের সঙ্গে থাকার সুযোগ করে দেওয়ার টোপ দেখিয়ে তাকে পটাবার চেষ্টা চলছে।—নাকি খিজিরকে চিরকালের জন্যে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে তাকে কামরুদ্দিনের সঙ্গে সেঁটে দেওয়ার মতলব করে মহাজন? —কামরুদ্দিনের ঠ্যাং ভাঙার গল্প সত্যি হলেই বরং ভালো হতো।—নাঃ! তা কেন? কামরুদ্দিনের সঙ্গে থাকলে জুম্মনের একটা গতি হয়। পোলার দিকে ওস্তাগারের খুব টান! জুম্মনের জন্মের পর বাচ্চার জন্যে কতো জিনিস যে সে নিয়ে এসেছিলো তার লেখাজোকা নাই। ঐ খুশিতে বৌয়ের জন্যেও কামরুদ্দিন টেবিলিন না কেরিলিনের শাড়ি নিয়ে আসে। ওস্তাগার তখন কাজ করে র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের মস্ত এক বাড়িতে, পুরনো বড়ো বাড়ি, সারা বছর ধরে টুকটাক মেরামত, ছোটোখাটো নতুন কাজ লেগেই থাকতো। বৌকে নতুন শাড়ি পরিয়ে, ৪২ দিনের বাচ্চাকে নিয়ে কামরুদ্দিন গেলো মনিবের বাড়ি। মনিবের বৌ বাচ্চার হাতে ৫টা টাকা দেয় আর জুম্মনের মায়ের পরনের শাড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে। মনিবের বড়ো বেটার বৌ বলে, 'ও আম্মা, নতুন একটা শাড়ি উঠলে তা পরার জো নেই! মিস্ত্রি

জোগানদান দারোয়ান ড্রাইভারের বৌ-ঝি সবাই যদি এই শাড়ি পরে তো আমরা কি করি?' শাশুড়ি মাগী অ্যাবার ঠেস দিয়ে বলে, 'কি জানি বাপু, চলনসই একটা কাপড় নিতে আমাদের পাছা ফাটে, এদের এতো পয়সা যে কোত্থেকে জোটে? তোমার শ্বশুর সাদাসিধে মানুষ, রড সিমেন্টের কি দশা হচ্ছে, কোনো খোঁজ রাখে?'—মনিবের বেটার বৌয়ের কথা শুনে জুম্মনের মা খুব খুশি, এতে বড়ো ঘরের বৌ,—সেও কিনা জুম্মনের মায়ের শাড়ি দেখে হিংসায় মরে! রাত্রিবেলা রসিয়ে রসিয়ে এসব গল্প করলে কামরুদ্দিন একেবারে উঠে বসলো, 'সোহরাব সাবের বিবি এই কথা কইছে? ঐ কাপড় পিন্দন বাদ দে।'

জুম্মনের মা অবাক। কেন? কামরুদ্দিন ধমক দেয়, 'আবার কথা? কইলাম পিন্দিস না!' পরে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলে, 'মালিকের লগে পাল্লা দেওন ভালো না, বুঝলি? যার নেমক খাই তার উপরে টেক্কা মারতে গেলে খোদায় ভি গোস্বা হয়। গজব পড়ে, রোজগারপাতি পাইড়া যায়।' জুম্মনের মা মন খারাপ করে পাশ ফিরে শোয়। তা মন খারাপ হলেই কি রাগ কমে? 'আর বিবিসাব যে তোমারে চোর কইলো, তুমি রড-সিমেন্ট সরাও!'

'চোর? কইছে তা কি হইছে? মায়ের লাহান বুড়া মানুষ, একটা কথা কইছে তো তাই লইয়া মাতম করতে হইবে?'

দেদারসে রড-সিমেন্ট সরালেও কামরুদ্দিন মালিককে ভক্তি করতো খুব। চুরি-ছ্যাঁচরামি একটু আধটু না করলে কি সংসার চলে? তাই নিয়ে মালিক তো কথা বলবেই। মালিকের বড়ো ধরনের লোকসান না করে এদিক ওদিক করার মধ্যে কোনো দোষ নাই। তবে হ্যাঁ, মালিকের সঙ্গে বেয়াদবি করা কি মালিকের মনে কষ্ট দেওয়া গুনা। মালিকের উন্নতি মানে তার উন্নতি, মালিক বড়ো হলে সেও বড়ো হবে। বেশির ভাগ কন্ট্রাক্টর তো আগে ওস্তাগর ছিলো, বড়ো জোর এজি অফিসের কেরানী বা ওয়াপদার ওয়ার্ক সুপার-ভাইজার। পয়সাকড়ি চালাচালি করে আর আল্লারসুল গওসল আজমের দোয়ার বরকতে তারা আজ বড়ো বড়ো কন্ট্রাক্টর সাপ্লায়ার। মালিক হলো বাপমা; খাওয়া বলো পরা বলো, আরাম বলো ফুর্তি বলো, সবই মালিকের বরকতে। মালিক যদি চড়টা চটকানাটা দেয় তো মাথা পেতে নাও। কেন, বাপমা ছেলেমেয়েকে মারে না? এই বিবেচনা না থাকলে উন্নতি করা যায়?—আর খিজির? —খিজিরের ওপর জুম্মনের মা ভরসা করবে কোন আক্কেলে?—তুই হইলি পাছাফুটা জাহেল, তুই যাস মাহাজনের পিছে লাগতে?—ভিক্টোরিয়া পার্কে সেদিন খিজিরের কারবারটার বৃত্তান্ত শুনে রহমতউল্লার হাঁপানি-পোষা, কোনেদিকে-না-তাকানো বিবিটা নতুন করে হাঁসফাঁস করে আর বলে, 'খানকির পুতে এইগুলি করে কি? অতোগুলো মানুষের সামনে মাহাজনের গীবত করছে। দিনকাল খারাপ, পাবলিকে যুদিল চেইতা এই বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিতো!' শুনে জুম্মনের মা ভয়ে বাঁচে না! এই যে চারদিকে নাকি সব আগুন লাগানো শুরু হয়েছে, আমাদের মহাজনের বাড়িতে যদি আগুন লাগায়! আর পাবলিক কি খালি আগুন লাগিয়েই ক্ষান্ত দেবে? মহাজনকে চুল ধরে বাইরে টেনে আনবে না? তারপর ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে নিয়ে মারধোর করে যদি! রাস্তায় রিকশা, স্কুটার, ট্রাক, বাস সব জাম, রিকশাওয়ালা রিকশা ছেড়ে, স্কুটার ড্রাইভার স্কুটার ছেড়ে, ট্রাক ড্রাইভার ট্রাক রেখে এসে এলোপাথাড়ি কিলঘুষি চালাতো মহাজনের ওপর।—বস্তির অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে জুম্মনের মায়ের ভয় জ্বলে ওঠে উত্তেজনা হয়ে, সে ছটফট করে। কেন? না, পাবলিক এসে মহাজনের চোখ দুটো উপড়ে নিচ্ছে, বলছে, 'হালায় অজাতের পয়দা, তরে আউজকা জানে খতম

করুম!' চোখজোড়া গেলে এই বুড়ো কি সময় অসময়ে তার দিকে তাকাতে পারবে?—বুইড়া হালার হাউস কতো! ঘরে তর বিবি আছে, একটা বিবি তো মরছে, পোলায় বাঁইচা থাকলে তার পোলাপানের ভি বিয়ার বয়স হইতো!—আর তুই কিনা ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া তর কামের মাতারির সিনা দ্যাখস! তর মুখের মইদ্যে ম্যাচবাত্তি জ্বালাইয়া দিলে খিজিরে কি বেইনসাফির কামটা করতো? তর গুনাগারি দিতে হইবো না? আল্লার দুনিয়ার বিচার নাই? বেলাহাজ, বেশরম বুইড়া মরদ!—আল্লার বিচারের ওপর ভরসা করেও জুম্মনের মায়ের উত্তেজনা কমে না। কিন্তু বেশি উত্তেজনা তার সহ্য হয় না! সারাদিন একটানা কাজ করেও তার শরীর এলিয়ে পড়েনি, বরং রহমতউল্লা মহাজনের জ্বলন্ত মুখের কথা ভেবে উত্তেজনায় তার গা মাথা হাত পা হি হি করে কাঁপে। খিজিরের পাশ ফেরার সঙ্গে হঠাৎ-নিশ্বাসের আওয়াজে তার ছটফট-করা শরীরে উস্কে ওঠে নতুন স্বস্তি: এই বুইড়াই তো মাথার উপরে একখান ছাদ দিয়া রাখছে।—মহাজনের বস্তিতে ভাড়া হয়তো একটু বেশি, কিন্তু এরকম নিশ্চিন্ত কাজের সুযোগ সে পাবে কোথায়? আবার সুবিধা কতো!—বিবিসায়েব বারোমাস বিছানায়, একমাত্র মেয়ে থাকে স্নো-পাউডার-লিপস্টিক আর রেডিও নিয়ে। কাজের মাতারির সঙ্গে খ্যাচাখেচি করার কেউ নাই। প্রতিদিন ইচ্ছামতো কাজ করো, এটা সেটা মুখে দাও, ঘরে ফেরার সময় গামলা ঠেসে ভাত নাও, আর সুযোগ বুঝে মেয়েটার ড্রেসিং টেবিল থেকে স্নো পাউডার হাতাও। এরকম আর কোথায় পারে? তার দিকে বুড়োর হোঁদলকুতকুতে চোখজোড়া না থাকলে কি এতো সুখ তার কপালে জোটে? যতোই হোক, বুড়ো কিন্তু এ পর্যন্ত বাড়াবাড়ি কিছু করেনি। করার লোভ যে ১৬ আনার জায়গায় ১৮ আনা তা তার বুকের দিকে বুড়োর আঠালো চাউনি দেখেই বোঝা যায়। এই লোভটা থাকলেই জুম্মনের মা এই বাড়িতে টিকে যাবে। তা যাই বলো, জোয়ান মনিবও ২/৪টা তার দ্যাখা আছে, ওগুলোকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। একদিন সম্বন্ধীর গায়ে-হলুদের উৎসব কি শালীর ছেলের পানচিনিতে বৌকে পাঠিয়ে দিয়ে কাজের মাতারির হাতে ৫টা টাকা গুঁজে পাশে নিয়ে শুয়ে পড়বে। তাও কিন্তু বিছানায় নয়। শোবার ঘর তাদের মসজিদ, সব সময় পাক সাফ রাখা চাই। ভাঁড়ার ঘর কি রান্নাঘর, এমনকি বাথরুমেও কারবার সারতে তাদের আপত্তি নাই। এরকম ২দিন, ৩দিন, বড়োজোর ৪ দিন করলেই সায়েবদের সখ মিটে যায়। তারপর নিজের নিজের পটের-বিবি মার্কা বৌদের ওপর মোহাব্বত উথলে ওঠে তাদের। সায়েব মানুষরা সব কতো ঢঙ জানে, কয়েকদিন একটু চোর চোর ভাব করে থাকবে। তারপর নিজেদের অপকর্মের জন্যে তার রাগ ঝাড়বে চাকরানীর ওপর। তাকে বিদায় করতে পারলে তখন বাঁচে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করো তো এই বুড়োর কাছে একেবারে নিশ্চিন্ত। বুড়োর দৌড় যে কতোদূর তা ঈদের আগের রাত্রেই বেশ বোঝা গেছে। হাত ধরার বেশি ক্ষমতা তার নাই। এর বিনিময়ে জুম্মনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। খিজিরের ওপর ভরসা করলে কি ছেলে তার বড়ো হতে পারবে? ভ্যাদাইমা খিজিরের কি বুদ্ধিশুদ্ধি কোনোদিন হবে? নিমকহারামটা, তুই আছস মাহাজনের খতম করার তালে! আরে, আমাগো মাহাজন তো তর একরকম বাপই লাগে। তর মায়ের লগে মাহাজনে কি করছে না করছে এই মহল্লার মইদ্যে ঐ খবর জানে না ক্যাঠায়? আরে তর যে আলাউদ্দিন মিয়া—এতো সভা মিটিং করে আর লেকচার ঝাড়ে, মাইনষে কয় স্যায় মন্ত্রী ভি হইবার পারে—তো আলাউদ্দিন মিয়া ভি দেহি একদিন বাদে বাদে মাহাজনের বাড়ি গিয়া তার মাইয়ার লগে ফাসুর ফুসুর করে, মাহাজনরে দেখলে

'সালামালেকুম মামুজান, শরীর কেমুন? বেলাড প্রেশারটা রেগুলার দেইখেন' কইয়া খাড়া হয়, আর তুই কোন বান্দির বাচ্চা তার নামে দুনিয়া গুইদ্যা গিবত কইরা বেড়াস! জিন্দেগীতে তর কিছু হইবো?—রাগে জুম্মনের মায়ের সমস্ত গা নতুন করে কাঁপে। কিন্তু এইসব কথা তার মাথা জুড়ে বলকায়, মুখ দিয়ে বেরোয় না। মুখ দিয়ে এর বদলে বেরিয়ে আসে রাত্রে খাওয়া কাচকি মাছের দোপেঁয়াজি দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা ভাতের গন্ধওয়ালা পানি। কিন্তু খিজিরের শরীর ডিঙিয়ে যাওয়াও তো সম্ভব নয়। তাই বমির অনেকটা গড়িয়ে পড়ে খিজিরের গায়ের কাঁথায়। খিজির উঠে বসলে জুম্মনের মা দরজায় বসে ওয়াক ওয়াক করে বমি করে। ছোট্টো উঠানে বজলুর শরীরটা এখন নাই, নইলে বমিতে সেটা ভেসে যেতো।

জুম্মনের মা তক্তপোষে এসে বসলে খিজির বলে, 'কি হইছে? কাঁথার বমি-লাগা অংশটা পায়ের কাছে দিয়ে শুতে শুতে খিজির জিগ্যেস করে, 'মাহাজনে মনে লয় ঠাইসা খাওয়াইছে? কি দিয়া হান্দাইয়া দিলো?'

এখন জুম্মনের মায়ের কোনো রাগ নাই। তার সমস্ত বুক ও মাথা জুড়ে উদ্বেগ। ৮ বছর আগেকার চেনা অনুভূতির আঁচ পাওয়া যাচ্ছে সমস্ত শরীর জুড়ে। ঐ সময় গা এইভাবে গোলাতো! তাইতো! গত ২/৩ মাস তার নিয়মিত শরীর খারাপটা হয়নি। আজ দুপুরে মহাজনের বাড়িতে রান্না করতে করতে চুলার পাড় ভেঙে একটু পোড়ামাটি মুখে দিয়েছিলো। কালকেও খেয়েছে। পরশু? বোধহয়। তার আগের দিন? কি জানি!—এখন তাহলে কি হবে?

খিজির ফের ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল যাকে ঘর ছাড়তে হবে, বৌ থাকে কি না থাকে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই, সেই মানুষ এভাবে শুয়ে থাকে কি করে?—কাল থেকে হয়তো এই লোকটিকে নাও দ্যাখা যেতে পারে।—দেহি তো হাড্ডি চোদায় ক্যামনে ঘুমায়!—খিজিরের মুখ দ্যাখার জন্য জুম্মনের মা আড়চোখে নিচের দিকে তাকায়। আড়চোখে দ্যাখার দরকার ছিলো না। ইচ্ছা করলেও খিজির তাকে দেখতে পারতো না। আবার খিজিরের মুখ দ্যাখাও জুম্মনের মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ঘরে ঘনঘোট অন্ধকার। বাইরে রাস্তার ল্যাম্পোস্টে বাল্বটা নষ্ট। খিজিরের কালো মুখ কাঁথায় ঢাকা।

২৫

বস্তির ঘর কিন্তু খিজির ছাড়লো না। রহমতউল্লা তাকে ডেকে পাঠায় না, আবার মহাজনের সঙ্গে দ্যাখা করার মতো সময় কোথায় খিজিরের? প্যাসেঞ্জারবিহীন খালি রিকশা নিয়ে রিকশাওয়ালাদের মিছিল বার হবে, সেই ব্যাপারে সে খুব ব্যস্ত। আলাউদ্দিন মিয়ার ঘরে ঘন ঘন মিটিং হচ্ছে। ইউনিয়নের লোকজন আসছে, ছাত্ররা আসছে, আলাউদ্দিন মিয়ার দলের লোকজনও এই ব্যাপারে আজকাল খুব তৎপর। দাবী-দাওয়া কি কি পেশ করা হবে তাই নিয়ে ৩/৪দিন ধরে খুব হাউকাউ চললো। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবের মুক্তি, ছাত্রদের এগারো দফা, আইয়ুব খান ও মোনেম খানের পদত্যাগ,—এসবের সঙ্গে টায়ার-

টিউবের দাম বাড়ার অজুহাতে রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকে মহাজনদের বেশি ভাড়া নেওয়া বন্ধ করা, ইচ্ছামতো রিকশাওয়ালা বদলানো বন্ধ করা, এ্যাক্সিডেন্ট হলে রিকশার ক্ষয়ক্ষতির ভার মহাজনের ওপর আরেকটু বর্তানো—এসব দাবীও ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কথা ছিলো বেলা ২টার দিকে রিকশাওয়ালারা খালি রিকশা নিয়ে হাজির হবে বায়তুল মোকাররম। মিটিং সেরে খালি রিকশার মিছিল। কিন্তু ঘাপলা শুরু হলো সেদিন সকালবেলা। গ্যারেজে এতো রিকশাওয়ালা দেখে খিজির অবাক, 'আরে, মিছিল বারাইবো দুইটো বাজে, রাইত না পোয়াইতে তোমরা আইছো?'

১ রিকশাওয়ালা বলে, 'এই বেলা গাড়ি চালাইলে মিছিলের লোকসান কি?' আলাউদ্দিন মিয়ারও সেই মত, সকাল থেকে গাড়ি বন্ধ থাকবে কেন? গরিব লোকজন ১ বেলা গাড়ি চালিয়ে ২টো পয়সা রোজগার করবে না?

খিজিরের চিন্তা, 'গাড়ি একবার বারাইয়া পড়লে কহন আহে কিছু ঠিক নাই। আমাগো আবার পরথম যাইতে হইবো ভিক্টোরিয়া পার্ক। দ্যাড়টার মইদ্যে না গেলে দুইটা বাজলে বায়তুল মোকাররম যাইবার পারুম? মিছিল আরম্ভ করতে দেরি হইয়া যাইবো না?'

আলাউদ্দিন মিয়া ঠোঁট থাকায়, 'মিছিলের গরজ মনে লয় আমার থাইকা তরই বেশি?'

রিকশাওয়ালা হাসে। কারো কোনো সন্দেহ নাই যে মিটিং বলো, মিছিল বলো, আন্দোলন বলো, সংগ্রাম বলো—এসব ব্যাপারে মহল্লায় আলাউদ্দিন মিয়া ১ নম্বর। আস্তে অস্তে সে জানায়, গরিব মানুষের দেশ, তাদের ভালোমন্দ না দেখলে কি চলে? 'তোমরা অহন গাড়ি লইয়া যাও। বারোটার মইদ্যে ফেরত আইবা। তাইলে খাওন দাওন সাইরা দুইটার মইদ্যে বারাইতে কেউরো দেরি হইবো না।'

কিন্তু বিকালে যাদের রিকশা নেওয়ার কথা এই সিদ্ধান্ত তাদের সায় নাই, 'আমরা তাইলে কি গুনা করলাম? আমাগো রোজগারপাতি হইবো না, আমরা খালি প্যাট বাজাইতে বাজাইতে মিছিল করুম?'

'খালি মালপানির ধান্দা করলে আন্দোলন চলবো?'—আলাউদ্দিন মিয়া প্রায় রাগ করে বেরিয়ে যায়। এই ব্যাপারে খিজির তার সায়েবের সঙ্গে একমত। কিন্তু এসব কথাই আবার খিজিরের মুখে শুনে সবাই হাসে। হাসাহাসি শেষ হলে ধমক দেয়, 'চাপাবাজি রাখ বে! প্যাট খালি রাখলে কাম হইবো?'

কিছুক্ষণ পর আলাউদ্দিন মিয়া ফিরে এসে ফের প্রথম থেকে সব শোনে এবং মন্তব্য করে যে পেটের ধান্দা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ দূর করতে না পারলে পেটের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্ন আদায় করা অসম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানের। ৭ কোটি মানুষের বাঁচার স্বার্থে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর লোকটা বক্তৃতা ঝাড়ে ৫টা মিনিট ধরে। তার বলার ঢঙ এতো ভালো যে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারো হয় না। এমনকি সকালে রিকশা চালাবার সুযোগ-পাওয়া ১ রিকশাওয়ালা আজ বায়তুল মোকাররমে তাকে বক্তৃতা করার জন্যে অনুরোধ পর্যন্ত করে। —আজ বাদে কাল পার্টির সিটি কমিটির এ্যাসিস্ট্যান্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হতে যাচ্ছে আলাউদ্দিন মিয়া; বায়তুল মোকাররম কেন, পল্টন ময়দানেই বক্তৃতা করার কতো সুযোগ পাবে। এ জন্যে কোনো রিকশাওয়ালার সুপারিশ দরকার হবে না।

বেলা সাড়ে বারোটায় ইউনিয়নের ২ জন লোক এসে রাগ করে, 'আপনারা এই বেলা গাড়ি চালাতে দিলেন কেন? বাসাবো, মুগদাপাড়া, খিলগাঁও, মালিবাগে কোনো রিকশা বেরোয়নি। গুলিস্তানে এসে দেখি চারদিকে রিকশা!'

'আরে ভাই, না ছাড়লে কি করি?' আলাউদ্দিন মিয়া কৈফিয়ৎ দেয়, 'গরিব্‌ মানুষ, অগো রোজগার করতে দিবেন না?'

পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলার পরা লোকটি তবু মানতে চায় না, 'না ঠিক করেননি। যাদের বিকালে রিকশা চালাবার কথা তারা হয়তো রাগ করে আসবে না। আবার যারা রিকশা চালিয়ে ফিরবে তারা টায়ার্ড হয়ে যাবে না। মিছিলে যাবে কি করে? বিশ্রাম নেবে না তারা?

১টা রিকশার চেসিসের সঙ্গে ফ্রকের যোগাযোগ স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে টাইট করতে করতে খিজির বলে, 'মিছিলে যাইবো তার আবার আরাম করতে হইবো ক্যালায়?'

'সব মানুষেরই বিশ্রাম চাই ভাই! রিকশাওয়ালাও মানুষ!'

'মানুষ' কথাটির ওপর জোর দিয়ে ইউনিয়নের নেতা রিকশাওয়ালাদের উন্নত পর্যায়ে ঠেলে তুলতে চায়। এই নিয়ে সে আরো কিছু ভালো ভালো কথা বলে, পুরু ঠোঁট ফাঁক করে খিজির সব শোনে। হাজার হলেও এরা লেখাপড়া জানা মানুষ,—ভদ্রলোকের ছেলে, আবার রিকশাওয়ালাদের জন্যে কতো কাজ করছে! এরা যা বোঝে তা খিজিরের মাথায় ঢুকবে কোত্থেকে?

বেলা দেড়টার দিকে রিকশাওয়ালারা সব রিকশা নিয়ে ফিরতে শুরু করে। উদ্বিগ্ন খিজির উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, 'আর একটা ঘণ্টা খ্যাপ মাইরা আইলেই পারতি!'

রিকশাওয়ালা চটে যায়, 'মাহাজনে ভাড়া লইবো পুরাটা, আর আমরা চালাইলেই দোষ?'

'আজাইরা প্যাচাল পাড়িস না! আউজকা ভাড়া লইবো ক্যাঠায়?'

'ভাড়ার কথা কইয়া গাড়ি দিছে! মাহাজনরে জিগা না!'

জিগ্যেস করার সুযোগ পাওয়া যায় না। ২টে বাজতে আলাউদ্দিন মিয়া এসে হন্তদন্ত হয়ে ভাড়া চেয়ে নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চ্যাচায়, 'ব্যাক গাড়ি আইছে? কেউরে বাড়ি যাইতে দিবি না। ঐ দোকানে ডালপুরি ভাজতে কইছি, বেশি কইরা ভাজবো! খাইয়া মিছিলে চলো। মহল্লা থাইকা মানুষ কম হইলে বেইজ্জত হইতে হইবো!'

রহমতউল্লার চায়ের দোকানে দারুণ ভিড়, ২জন লোক ডালপুরি ভাজতে ও পয়সা নিতে হিমসিম খাচ্ছে। আলাউদ্দিন মিয়া ঐ দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে ইউনিয়নের নেতার সঙ্গে চা খায় আর একবার একে ধমকায়, একবার ওকে ধমকায়, এতোক্ষণ ধইরা খাইলে চলবো? যা না, মহল্লার মইদ্যে যতোগুলি গ্যারেজ আছে, একটা ঘূর্ণা দিয়ে আয়। ব্যাকটি ডেরাইভাররে লইয়া আইবি।' ইউনিয়নের পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলারওয়ালাকে বলে, 'কি ভাই? কইছিলাম না? ডাক দিলে মানুষের অভাব হইবো না। দেরি দেইখা ঘাবড়ান, আমরা অতো জলদি ঘাবড়াই না! পলিটিক্স করি বিশ বচ্ছরের উপরে—।' আলাউদ্দিন মিয়া একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে, তার পরনে খদ্দরের পাটভাঙা পাঞ্জাবি, ঘাড়ের ওপর ভাঁজ করা খদ্দরের চাদর। ১টা মিটিং তার খুব দরকার।

মিটিং মিছিলের জন্য খিজির আলিও উদগ্রীব। রিকশা-মিছিলের জন্যে সে বেছে রেখেছে আলাউদ্দিন মিয়ার নতুন গাড়িটা! মাহুতটুলির ফকির মোহাম্মদ মিস্ত্রীর তৈরি,—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। হুডের সঙ্গে লাগানো নানারকম ঝালর, হুডের সামনের দিকটায় পর্দার মতো

গুটিয়ে রাখা গোলাপি রঙের পাতলা নাইলন। ২দিকে ঝুলছে প্লাস্টিকের লিচু ও আঙুরের গুচ্ছ। রিকশার পেছনে টিনের বোর্ড লাগানো। বোর্ডে আঁকা বহুবর্ণ ছবি। লাল-সবুজ পাহাড়ের উপত্যকায় নীল-হলুদ দোতলা প্রাসাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে লাল টকটকে মোটরগাড়ি। একটু দূরে পাহাড়ি নদী, নদীর ব্রিজের ওপর চলছে ট্রেন, ট্রেনের ওপরে উড়ন্ত এ্যারোপ্লেন। নীল-হলুদ প্রাসাদের সামনে গিটার হাতে ত্রিভঙ্গমূর্তি যুবক, তাকে ঘিরে অপূর্ব ভঙ্গিতে নাচে কয়েকটা ডানাকাটা পরী। আহা, এই রিকশার প্যাডেলে পা ছোঁয়ালেই দুলদুল ঘোড়ার মতো উড়াল যা দেবে একখানা!—রাস্তার সমস্ত গাড়ি,—ট্রাক, বাস, বেবি ট্যাকসি, পেরাইভেট—সব ওভারটেক করে ছুটে যাবে সবচেয়ে আগে।

'এইটা রাখ!' আলাউদ্দিন মিয়া রিকশার হ্যান্ডেলে হাত দিলো।

'আমার নিজের হাতে রাখুম! কিছু হইবো না!'

'দরকার নাই। গোলমালের টাইম। নয়া গাড়ি বাইর করনের কাম নাই।'

পুরানো ১টি রিকশা নিতে বলা হয় তাকে, ওটার বেল ঠিকমতো বাজে না। খিজির স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে বেলের ঢাকনি লাগাচ্ছে, বাইরে একটি উত্তেজিত সরব জটলা ক্রমে উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে। রহমতউল্লাহ মহাজনের গ্যারেজে আবার কি হলো?

নিজের গ্যারেজের দরজায় সমবেত রিকশাওয়ালা এবং ইউনিয়নের লোকজনের উদ্দেশে রহমতউল্লা ক্রমাগত হাত ও মুখ নাড়াচ্ছে, 'মিটিং করো, মিছিল করো, নাচো, গাও—যা খুশি করবা। মগর আমার গাড়ি লইয়া ফুর্তি করবার দিমু না! আমি রিকশা করছি কি ঐগুলি লইয়া রোডের মইদ্যে ফুর্তি করনের লাইগা?'

'সব মাহাজনে দিতাছে, আপনে দিবেন না ক্যালায়?'

যাগো গরজ আছে তারা দিবো! আমার গরজ নাই!'

পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলার এসে দাঁড়ায় তার সামনে, 'সবাই তো দিচ্ছে। আপনাকেও দিতে হবে।'

'আপনার হুকুমে? মনে লয় ওয়ারেন্ট লইয়া আইছেন?'

'গাড়ি দিতে হইবো!' রিকশাওয়ালাদের গুনগুন পরিণত হয় গর্জনে, 'গাড়ি দিতে হইবো!'

'একটা বেলা গাড়ি দিবার চায় না! মাহাজনে কতো খাইবো?'

'আপনারা চুপ করেন! আমাকে বলতে দিন!' পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলার চিৎকার করে সবাইকে থামিয়ে রহমতউল্লার জন্যে গলাটা একটু নামায়, 'দ্যাখেন, এরা রোজ আপনার রিকশা চালায়। আপনাকে বোনাস দিতে হয় না, বেতন বাড়াবার তো প্রশ্নই ওঠে না। আপনি বরং এদের কাছ থেকে পয়সা পান, নগদ পয়সা! আপনার ইন্ডাস্ট্রি থাকলে হরতাল হতো, ছুটি চাইতো, বেতন বাড়াবার দাবী করতো। আমার রিকশাওয়ালা ভাইয়েরা কোনো দাবী করে না। আজ, শুধু একবেলার জন্যে আপনার রিকশাগুলো চায়, প্যাসেঞ্জার নেবে না, পয়সা কামাবে না। আপনার দিতে আপত্তি কি?'

রহমতউল্লা ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকায়, 'ঐগুলি লেকচার পল্টন ময়দানে দিয়েন। আমার সাফ কথা, রিকশা ভাড়া দিয়া খাই, রিকশা লইয়া ফুর্তি আমি করবার দিমু না! গাড়ি লইলে ভাড়া দিতে হইবো।' ইউনিয়নের আরেকজন এগিয়ে আসে, 'ঠিক আছে। আপনার রিকশা আপনি রেখে দিন। আমাদের কিছু করার নেই। আপনার রিকশা যারা চালায় তারাই

যা করার করবে। আমাদের সঙ্গে কো-অপারেশন আপনি যখন করবেন না তখন আমরাও আপনাকে কোনোভাবে হেল্প করতে পারবো না।'

'আপনাগো কাছে আমি হেল্প চাইমু ক্যান? আরে, আমার মহল্লায় আইয়া আপনেরা হেল্প করবেন আমারে?' রহমতউল্লা একবার পেছনে তাকাতে বজলু এসে হাজির হয় একেবারে সামনে। তার আশেপাশে কয়েকজন লোকও যে তার সঙ্গী তা বোঝা যাচ্ছে তাদের দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে।

'রিকশা তো আমরাই চালাই।' বজলুর রাত-জাগা গলা খনখন করে ওঠে, 'আমাগো মহল্লার মইদ্যে আইয়া গরম দ্যাহায় ক্যাঠা? রিকশা তো আমরা ভি চালাই। আমাগো মাহাজনেরে গরম দ্যাহায় ক্যাঠায়?'

পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলার বজলুর কথার তোড়ে একটু পিছিয়ে আসে, 'কি গরম দ্যাখালাম?

'তো এইগুলি কি কইতাছেন? গাড়ি আপনারা জোর কইরা লইবেন।' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আলাউদ্দিন মিয়া ধমক দেয়, 'বজলু থামলি?'

'তুই ফাল পাড়স ক্যালায়?' রহমতউল্লাও বজলুকে থামতে বলে আলাউদ্দিন মিয়াকে উদ্দেশ করে অভিযোগ করে, 'তোমার মানুষজন কি আরম্ভ করছে? রিকশা কি জোর কইরা দখল করবো? ডাকাইত আইলে আমার মানষে ঠ্যাকাইবো না? ব্যাকটি কি নিমকহারাম হইয়া গেছে?'

খিজির আলি জিভের কাঁপন আর ধরে রাখতে পারে না, 'ঐ সায়েবে বেইনসাফি কথাটা কইছে কি? মাহাজন, আপনের গাড়ি চাইয়া আমরা কি গুনা করছি?'

জবাব দেয় বজলু, 'খানকির বাচ্চা, মাহাজনের খাইয়া মানুষ হইলি, অহন মাহাজনের লগে গাদ্দারি করস? তর গাদ্দারির মায়েরে বাপ! হাড্ডি হালায় চোপা মারে কতো? তর চোপারে টিকটিকি দিয়া চোদাই!'

বাঁ হাতে প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভার এবং ডান হাতটি মুষ্টিবদ্ধ করে বজলুর দিকে এগিয়ে আসে খিজির, 'গুলিস্তান, মধুমিতা আর অভিসারের কাউন্টারের মইদ্যে তর মায়েরে চোদা পুলিশের লাঠি দিয়া। আয়, এই প্লাসখান দিয়া তর বিচি দুইখান ছেঁইচা পাঙখাবরফ বানাইয়া দেই!' কিন্তু খিজিরের এই ঘোষণার সঙ্গে তার কাজের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে না, বজলুর নিম্নাঙ্গ বাদ দিয়ে প্লায়ার দিয়ে সে আঘাত করে বসে বজলুর কপালে! আর বজলু করলো কি, খুব জোরে একটা ঘুষি লাগালো খিজিরের বুকে। তার লক্ষ্য ছিলো খিজিরের মুখ। কিন্তু খিজির বেশ লম্বা বলে বজলুর ঘুষি অতোদূর পৌঁছতেও পারে না। বজলুর ডান হাতের মধ্যমায় ছুঁচলো লোহা আটকানো আংটি খিজিরের হাড্ডিসার বুকে লেগে ঠন করে আওয়াজ করে, তার সমস্ত শরীর নড়ে ওঠে দারুণভাবে। পরের ঘুষিটি লাগে তার কোমরে। সঙ্গে সঙ্গে বজলুর সিনেমা হলের এক সহকর্মীর এক থাপ্পড় লাগে তার পিঠে এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। তবে হঠাৎ করে দেলোয়ারের হাতে বজলুকে মার খেতে দেখে খিজির সামলে নেয় এবং পেটের নিচে একটি ঘুষি খেতে সে তার প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভার-ধরা হাত দিয়ে দারুণ জোরে আঘাত করে বজলুর ঘাড়ে। বজলু মাথা তুলতে না তুলতে খিজিরের ঐ হাত আছড়ে পড়ে ওর পিঠে ও কোমরে। বজলুর সঙ্গী ২জন কিন্তু খিজিরের পেটে ও হাঁটুতে মেরেই চলেছে। তবে বজলুর পতনে তারা একটু দিশেহারা।

মারামারি চলছে, 'এদিকে মার হালার মাহাজানের দালালরে মার!' চুতমারানিরে উপ্তা কইরা ফালাইয়া খানকির বাচ্চার হোগার মইদ্যে ইস্পোক হান্দাইয়া দে!'—প্রভৃতি সংকল্প ঘোষণা করতে করতে বেশ কিছু লোক ঢুকে পড়েছে রহমতউল্লার গ্যারেজের ভেতর। 'চল, চল, গাড়ি লইয়া বারাইয়া পড়', 'গাড়ি দিবো না কইলেই হইলো?' এইসব কথা বলছে আর টানাটানি করছে রহমতউল্লার রিকশা নিয়ে। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে এককেটি গাড়ির পেছনে ৩/৪ জন লোক। শুরু হয় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, 'কি মিয়া, তোমারে তো এই মাহাজনের গাড়ি চালাইতে দেহি নাই!'

'আমি গাড়ি চালাই না তো কি করি? তুই ক্যাঠ্যায়?' এই কথা বলায় অপরিচিত লোকটি ১ রিকশাওয়ালার ঘুষি খায়, তার পক্ষে আরেকজন জেনুইন রিকশাওয়ালা তেড়ে এলে মারামারি জমে ওঠে। এই অবস্থায় আসল হোক, নকল হোক—রিকশাওয়ালারা রিকশা নিয়ে রাস্তায় নামে কি করে?

রহমতউল্লা প্রাণপণে চ্যাঁচায়, 'আরে আমার বজলুটারে মাইরা ফালাইলো রে! ধর না, অরে ধর না!' তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কে ১জন বজলুকে-প্রহাররত কোনো রিকশাওয়ালার কোমরে লাথি মারে, সে পড়ে যায় খিজিরের পিঠে, খিজির পড়তে পড়তে টান দেয় বজলুর শার্টের কলার ধরে। শার্টের কলার ও পিঠ সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেলো। তার জামার নিচে গেঞ্জি নাই। সে যে এতোটা রোগা তা কিন্তু তার ১মাত্র খাকি শার্ট-ঢাকা অবস্থায় কখনো বোঝা যায়নি। তার পিঠের এপাশ-ওপাশে জুড়ে একটা কাটা দাগ, এ দাগটা পুরনো, কিন্তু নিচের রক্ত চিহ্নগুলো টাটকা। বজলু পড়ে গিয়ে মার খেয়েই ভেতর থেকে কে একজন এসে খিজিরের কোমরে কষে লাথি লাগালে সে নিচে পড়ে যায়। তখন তার ওপর ঘুষি পড়তে থাকে বৃষ্টির মতো।

গ্যারেজের ভেতরেও মারামারি। আলাউদ্দিন মিয়া আহত লোকটিকে টেনে বাইরে এনে হুঙ্কার ছাড়ে, 'শুওরের বাচ্চারা, থামলি?' নিজের শরীরটা সে গলিয়ে দেয় ভিড়ের ভেতর এবং খিজিরের হাত ধরে বলে, 'ওঠ! গতরের মইদ্যে নাই এক ছটাক গোসতো, হাড্ডির উপরে আর কতো মাইর খাইবি?' বজলুর সঙ্গী তখন সরে যায়, কিন্তু কয়েকজন রিকশাওয়ালা তাকে ধরে দমাদম মারতে শুরু করে।

'আমার মানুষগুলিরে কেমুন মারতাছে, তোমার নজরে পড়ে না।' রহমতউল্লার অভিযোগের জবাবে আলাউদ্দিন মিয়া সমান উত্তেজনায় তাকে সতর্ক করে দেয়, 'আপনের ভাড়াইটা গুণ্ডাগুলিরে সামলান। নাইলে পাবলিকে আপনার গাড়িগুড়ি আমান রাখবো না কইলাম!'

'আমার ভাড়াইটা মানুষ লাগে না! আমার বালা-মুসিবত দেখলে মহল্লার ব্যাকটি মানুষ ঝাঁপাইয়া পড়বো, বুঝলা?'

কিন্তু বজলু ছাড়া রহমতউল্লার লোকজন সবাই দেখতে দেখতে কেটে পড়ে। রক্তাক্ত শরীরে চিৎপটাং শুয়ে রয়েছে বজলু, তার পাশে তার ১ সঙ্গী, সে-ও বোধ হয় অজ্ঞান, কিংবা অজ্ঞান হওয়ার ভাণ করছে। টলতে টলতে খিজির ঢুকে পড়েছে রহমতউল্লার গ্যারেজে, মেঝেতে রাখা রিকশার একটা সিটে ধপ করে বসে সে ঢালাও হুকুম ছাড়ে, 'গাড়ি লইয়া বারাইয়া পড়ো, মিটিঙের টাইম যায় গিয়া!' সত্যি সত্যি রিকশাগুলো বেরিয়ে যেতে থাকে। আলাউদ্দিন মিয়া চোখ ছোটো করে তাকিয়ে থাকে রহমতউল্লার দিকে। সঙ্কুচিত চোখজোড়ায়

তার আগুন জ্বলে; রুই কাতলারা বলে হাঁসফাঁস করছে, আর কোথাকার কোন মহাজন এখন পর্যন্ত দাপট দ্যাখাতে সাহস পায় এখানে!—তার ব্লাড প্রেসার হয়তো বেড়ে গেছে, কিংবা পরিস্থিতি প্রতিকূল—যে কোনো কারণে রহমতউল্লার জেদি মুখে পড়ে কালো ছায়া, সেই মুখ একদিকে যেমন অসহায় তেমনি বিরক্ত, সেখানে ঝাপশা হয়ে ফোটে সিতারার মুখ। আলাউদ্দিন মিয়া চোখ ফেরায় গ্যারেজের দিকে। আরে, মামুর গ্যারেজ তো সাফ হয়ে যাচ্ছে। তার চোখ যেমন জ্বলে উঠেছিলো, তেমনি নিভেও যায় দপ করে।

যারা রিকশা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের বেশির ভাগ লোক অপরিচিত। আর এই রিকশাওয়ালা জাতটাকে সে ভালোভাবে চেনে, এদের ওপর বিশ্বাস রাখা কঠিন। এরা আন্দোলনের কি বোঝে? রাজনীতির কি বোঝে? আইয়ুব খানের দালালের গ্যারেজ সাফ করে এদের মাথায় কি খেয়াল চাপে, কে জানে? এদের ছাড়া আন্দোলন হয় না, কিন্তু এদের হাতে আন্দোলন চলে গেলে মুশকিল! রহমতউল্লার গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে সব যাচ্ছে হাফিজ মিয়ার গ্যারেজের দিকে। পাতলা খান লেনের সবগুলো গ্যারেজের মালিকরা আলাউদ্দিন মিয়াদের দলের লোক। কিন্তু মূর্খগুলোর কি দলমত জ্ঞান কিছু আছে?—কি করা যায়?—ইউনিয়নের লোকজন শালারা কেটে পড়লো কোথায়? শালাদের খালি লম্বা লম্বা পাঞ্জাবি আর আরো লম্বা কথাবার্তা। খালি চাপাবাজি!—স্টেজে উঠে মাইক সামনে পেলেই খালি মেহনতি মানুষ আর শোষণ আর বিপ্লবের ওপর বাখোয়াজি!—এখন সব গেলো কোথায়?—অস্থির হয়ে আলাউদ্দিন মিয়া রাস্তার দিকে যাচ্ছে, এমন সময় চলে আসে ইউনিয়নের কয়েকজন লোক। সঙ্গে আলতাফ ও ইউনিভারসিটির ৫/৬ জন ছাত্র।

আলতাফ বলে, 'খুব মারামারি করলেন। চলেন।'

ছেলেরা খুব খুশি, 'দালালরা খুব টাইট হয়েছে, না?'

আলাউদ্দিন মিয়া গম্ভীর হয়ে গেছে, 'পাবলিকে বহুত রাউডি ব্যবহার করতাছে!'

'করুক না! রিকশা দিতে দালালদের এতো আপত্তি কেন?'

'আরে মিয়া রাখেন!' আলাউদ্দিন মিয়া রাগে ফেটে পড়ে, 'নীলখেতে বইয়া দ্যাশ চালাইতে চান? নেতা হইয়া বইছেন! জানেন এদিককার বেশির ভাগ রিকশার গ্যারেজের মালিক আমাগো মানুষ! কলুটোলার হাফিজ মিয়ার গ্যারেজে গিয়া তার পোলারে মাইর দিছে, খবর পাইছেন? এইগুলি সামলাইতে পারবেন?'

রিকশাগুলো বড়ো রাস্তায় উঠে চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোলাহল বেশ স্পষ্ট। কে যেন বলছে, 'কিয়ের মাহাজন? গাড়ি চালাই আমরা, একটা দিন গাড়ি লইয়া মিছিল করবার দিবো না?'

'চল না বে! দেহি চুতমারানি গাড়ি ফেরত পায় ক্যামনে, দেখুম!'

ইউনিয়নের লোকজন, ছাত্রনেতৃবৃন্দ ও আলতাফের সঙ্গে আলাউদ্দিন মিয়া হাজির হয় বড়ো রাস্তার মোড়ে। যতোটা সম্ভব গম্ভীর ও যতোটা সম্ভব মিষ্টি গলা তৈরি করার অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে সে, 'কি পাগলামো করস? মাহাজনরে কইয়া গাড়ি লইবি না?'

'আউজকা মাহাজন নাই।'

'আরে পাগলা! মাহাজন তো থাকবোই।' আলাউদ্দিন মিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় হাসে, 'তরা ভি মাহাজন হইবার পারস একদিন! তহন তগো গাড়ি না কইয়া বাইর করতে দিবি?'

আলাউদ্দিন মিয়ার কথায় কাজ হয় না। রিকশা নিয়ে গ্যারেজে ফেরত যেতে কেউ রাজি নয়। রিকশা যারা পায়নি তারা রওয়ানা হয় অন্য কোনো গ্যারেজের দিকে। বোঝা যাচ্ছে, কুঞ্জবাবু লেনের আলম মেম্বারের গ্যারেজ এদের গন্তব্য। এখন আলাউদ্দিন মিয়া কি করতে পারে? ইউনিয়নের আরো লোক এসে জানায় যে শহরের অন্যান্য জায়গা থেকেও এরকম আসছে, গ্যারেজের মালিকরা রিকশা দিতে রাজি নয়।

আলাউদ্দিন মিয়া দোষ দেয় ইউনিয়নের লোকদের, 'এইগুলি প্রোগ্রাম করনের আগে আপনারা মাহাজনগো লগে আলাপ করবেন না?'

ইউনিয়নের লোক চার্জ করে ছাত্রনেতাদের, 'কথা ছিলো বিকালবেলা হরতাল, রিকশা স্ট্রাইক, বায়তুল মোকাররমে সমাবেশের পর মিছিল। রিকশা নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম আপনাদের।'

ছাত্রনেতা কৈফিয়ৎ দেয়, 'কেন, আমরা তো ইউনিয়নকে ইনফর্ম করেছি!'

'পরে করেছেন। ডিসিশন নিয়ে, কাগজে খবর পাঠিয়ে তারপর আমাদের জানিয়েছেন। এরকম করলে মুভমেন্ট চলে?'

কুঞ্জবাবু লেনের ওদিক থেকে স্লোগান শোনা যাচ্ছে, 'মাহাজনের গদিতে'—'আগুন জ্বালো একসাথে'।

এসব স্লোগান আলাউদ্দিন মিয়া কম শোনেনি। সে নিজেও অনেক মিটিঙে মিছিলে গেছে যেখানে এইসব স্লোগান দেওয়া হয়; এখন কিন্তু এই কথাগুলো বড়ো অস্বস্তিকর। সবাইকে হঠাৎ সে তাড়া দেয়, 'চলেন, চলেন। আলম মেম্বারের গ্যারেজের কিছু হইলে বহুত মুসিবত হইবো!' আলম মেম্বারের চাঁদা ছাড়া এই মহল্লায় একটা মিটিং পর্যন্ত আয়োজন করা মুশকিল। এদিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে পড়েছে খিজির। পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলারওয়ালা নেতা তাকে অনুরোধ করে, 'ভাই তুমি গিয়ে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

'আপনার মাথা খারাপ?' আলাউদ্দিন মিয়া তাকে থামিয়ে দেয়, 'অরে দেখলে রিকশাঅলারা আরো চেতবো। কইবো মাহাজনের গুণ্ডারা অরে মাইর দিছে, আমরা ভি মাহাজনগো ছাড়ুম না! মাহাজনগো মইদ্যে ভি আমাগো মানুষ বহুত, জাহেলগুলি কি এইটা বুঝবো?'

আলম মেম্বারের তালা-লাগানো গ্যারেজের বাঁশের দরশা ভেঙে কয়েকজন ততোক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ইউনিয়নের নেতার পিঠে হাতের চাপ দিয়ে আলাউদ্দিন মিয়া ফিসফিস করে, 'সামলাইতে পারবে?' দরজা ভাঙা গ্যারেজের উল্টোদিকে একটি বাড়ির ঝুলন্ত সিমেন্টের পাদানীতে দাঁড়িয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলার সবার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে, 'ভাইসব! আমাদের, আজ আমাদের যে আন্দোলন চলছে, আমাদের লুণ্ঠিত গণতান্ত্রিক অধিকার, মেহনতি মানুষের বাঁচার অধিকার ও আমাদের জাতিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য একটি গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের ভেতর অনুপ্রবেশকারী একদল হঠকারী লোক—।'

'প্যাচাল পাড়েন ক্যান? কামের কথা কন!' হাঁটুতে আলাউদ্দিন মিয়ার খোঁচা খেয়ে লোকটি চ্যাঁচায়, 'ভাইসব, আমাদের রিকশাচালক ইউনিয়নের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে আপনারা মহাজনদের রিকশা ফেরত দিয়ে মিছিলে আসুন। মহাজনদের মধ্যে যারা দালাল তাদের আমরা সমুচিত শাস্তি দেওয়ায় ব্যবস্থা করবো।'

কিন্তু তার বক্তৃতায় কারো মনোযোগ নাই। গ্যারেজ থেকে রিকশার পর রিকশা বেরিয়ে আসছে। পাজামা-পাঞ্জাবি-মাফলারকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সিমেন্টে ঝুলন্ত পাদানী দখল করে আলতাফ। এলোমোলো চুলের আলতাফকে লাল পুলওভারে চমৎকার মানিয়েছে। গড়গড় করে সে আওড়ায়, 'ভাইসব! গত বাইশ বছর ধরে বাঙালির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র চলে আসছে। পশ্চিম পাকিস্তানের এই শোষণ আমরা অনেক সহ্য করেছি, আজ আমরা সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি! বাঙালির স্বার্থরক্ষার দাবি জোরদার করে তোলার জন্যে আমাদের জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আজ মিথ্যা ষড়যন্ত্র মামলার শিকার। তাঁর ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্যে আমাদের মরণপণ সংগ্রাম চলছে। কোনোরকম হঠকারিতার সুযোগ দিয়ে এই আন্দোলন যেন বানচাল না হয় সেজন্যে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শুধু ভাঙাচোরা আর জ্বালানো পোড়ানোর কথা বলে আমরা যেন বাঙালির মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি না করি সেজন্যে—।'

ছাত্রদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। আলতাফের বক্তৃতার মাঝে মাঝে তারা স্লোগান দেয়, 'ছয় দফার সংগ্রাম'—'চলবেই চলবে।' 'তোমার আমার ঠিকানা'—'পদ্মা মেঘনা যমুনা।' আরো ছাত্র আসে এবং এইসব স্লোগান গোটা মহল্লা গমগম করে।

সিমেন্টের ঝুলন্ত পাদানী থেকে নেমে এসে আলতাফ সবাইকে আহ্বান জানায়, 'এখন এইসব গোলমাল ছেড়ে মিটিঙে চলেন। তাড়াতাড়ি চলেন।'

আলাউদ্দিন মিয়া কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে রিকশাওয়ালাদের কাছে গিয়ে বলে, 'গাড়ি রাইখা যা?' ছাত্রদেরও অভিন্ন মত, 'তাড়াতাড়ি চলেন ভাই। মানুষ যাবে হেঁটে আর আপনারা যাবেন রিকশা চালিয়ে, এটা কেমন দ্যাখাবে?'

রিকশা কেউ ফেরত দেয় না। তবে রিকশা যারা পায়নি সেইসব রিকশাওয়ালা আর কোনো গ্যারেজে না গিয়ে রওয়ানা হয় সোজা বড়ো রাস্তার দিকে। খিজির আলির সঙ্গেও রিকশা নাই, হাঁটতে হাঁটতে সে টের পায় যে বজলু তার বাঁ পায়ের হাঁটুটা বেশ ভালোরকম জখম করে দিয়েছে।

বায়তুল মোকাররমের সমাবেশের পরও আলতাফ কিন্তু তার কথা ভোলেনি। বেবি ট্যাক্সি করে তাকে নিয়ে গিয়েছে মেডিক্যাল কলেজ। ছোকরা ডাক্তারদের অনেকে আলতাফকে চেনে, মানেও খুব। খিজিরের পায়ে, হাতে ও ঘাড়ে ব্যান্ডেজ করা হলো, ইঞ্জেকশন দিলো গোটা দুয়েক। এমনকি ফেরার সময় আলতাফ সায়েব তাকে একটা রিকশায় পর্যন্ত উঠিয়ে দিলো। বারবার বললো, 'তুমি অন্তত সপ্তাহখানেক বিশ্রাম নিও। আলাউদ্দিন ভাইকে আমি বলেছি, উনি ছুটি দেবেন।'

আলাউদ্দিন মিয়া কিন্তু সত্যি তাকে কয়েকদিন কাজ করা থেকে অব্যাহতি দিলো, 'কয়টা দিন কাম করনের দরকার নাই। মামুর বস্তি থাইকা চইলা আয়। আমার গ্যারেজের মইদ্যে থাকবি। মামুরে যা চেতাইয়া রাখছস! আবার কেউরে দিয়া মামু তরে এমুন জখম করাইবো কি এক্কেরে খতম হইয়া যাইবি!'

২৬

৪/৫ দিনের মধ্যে খিজির আলি মোটামুটি সেরে ওঠে। হাঁটুর ব্যথাটা কমতেই সে যায় বস্তিতে তার নিজের ঘরে। রাত তখন ৯টা হবে, জুম্মনের মা ফেরেনি। স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার ছাড়াও খিজিরের হাতে সাইকেলের নতুন ১টা চেন। সেদিন গোলমালের সুযোগে রহমতউল্লার গ্যারেজ থেকে হাতানো। নতুন মাল—অন্ধকারেও চকচক করছে।—একদিন চানস্ মেলা তো একটা দিয়া চুতমারানি বজলুটারে চাবকাইয়া এক্কেরে ফিনিস কইরা ফালান যায়!—এখন এই জিনিসগুলো একটু আড়ালে রাখা দরকার। খিজির ঘরের ভেতর নিভৃত ১টি কোণ খোঁজে। কিন্তু দ্যাখো, এইটুকু ঘর, তার ভেতর মাল-সামান কতো! মাটির হাঁড়ি ৩টে, ৩টে সরা, এ্যালুমিনিয়ামের বাটি ১টা, টিনের থাল মগ এমনকি কাঁচের গ্লাস পর্যন্ত আছে। আবার দ্যাখো, রুটি বেলার বেলুন। পিঁড়ি নাই তো বেলুন দিয়ে হবে কি?—মহাজনের বাড়ি থেকে হাতাবার সময় জুম্মনের মায়ের হুঁশজ্ঞান লোপ পায়। আরে এটা কি?—হাত ঝুলিয়ে ঠাহর করতে না পেরে খিজির হাতড়ে হাতড়ে কুপি বার করে জ্বালায়। আরে বাবা! এ তো চাবি-লাগানো খেলনা-গাড়ি! জুম্মন আলির আবির্ভাবের পর মহাজনের বাড়ি থেকে জুম্মনের মা তাহলে দামী দামী খেলনাও সরাতে শুরু করেছে। মোটর গাড়িটা একবার চালিয়ে দেখলে হতো!—না থাক। কোনো রকমে তার নিজের ৩টে জিনিস লুকিয়ে রেখে কেটে পড়তে হবে। বজলু শালা ভাঙা হাতপা নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে, মহাজনের লোকবলের কি কোনো ঘাটতি আছে?—কিন্তু এগুলো সে রাখে কোথায়? তক্তপোষের নিচে স্প্রিংওয়ালায় মোটরগাড়ির পাশে ২টো ইটের ওপর রাখা কাঠের টুকরা, শবনম ও সাবিহার রঙিন ছবিওয়ালা কাগজে ঢাকা এই কাঠের ওপর স্নো, পাউডার, নারকেল তেল, লিপস্টিক, এমনকি শ্যাম্পুর খালি বোতল। সবগুলো রহমতউল্লার মেয়ের ড্রেসিং টেবিলের মাল। খিজির উপুড় হয়ে জোরে নিশ্বাস নিলে ঘরের অক্সিজেনের-অভাবে-রুগ্ন বাতাস তার নাকের সামনে পাকা সিকনির মতো ঝোলে। নাকের তেজি একটা ফুঁয়ে খিজির সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু তা না করে সেটাকে সে ঝুলতে দেয়। স্নো-পাউডারের গন্ধে বস্তির জলহাওয়ার আঁটোসাঁটো মরা গেরো খুলে যাচ্ছে, সবকিছু বেশ হালকা হয়ে আসছে। এই স্নো-পাউডার-লিপস্টিক-নেল পালিশ-নারকেল তেল রাখার কাঠের টুকরার নিচে রেখে দেয় তার স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার। সাইকেলের চেন বিছিয়ে রাখে একেবারে পেছনে, যক্ষের সাপ হয়ে সেটা আগলে রাখবে তার স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ারকে। যাক বাঞ্চোতগুলি এট্টু আরাম করুক! সেদিন খুব কাজ করেছে ব্যাটারা, বজলুদের মার যা সামলানো গেছে তা এদের জন্যেই। আবার এর মধ্যেই এদের খাটনি শুরু হবে, যাক কয়েকটা দিন আরাম করুক। স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লায়ার ও চেনের ওপর বাৎসল্যে খিজির বড়ো বড়ো করে কয়েকটা নিশ্বাস ছাড়ে। এই সরব নিশ্বাসের জবাব আসে পাশ থেকে, জড়ানো এঁ এঁ ধ্বনি শুনে সে চমকে ওঠে।—কে?—বস্তির ভারি গন্ধে মাথার ভেতর সব এলোমেলো হয়ে যায় এবং কুপিটা তুলে খিজির দ্যাখে তক্তপোষের ওপর ঘুমিয়ে রয়েছে জুম্মন আলি। তার গায়ের কাঁথা ঝুলে পড়েছে একদিকে, তার বুকের সবটাই কাঁথার বাইরে। জুম্মনের গায়ে কাঁথা ভালো করে টেনে দিতে দিতে খিজির তার মুখটা ভালো করে দ্যাখে। বসন্ত হওয়ার আগে জুম্মনের মায়ের মুখটাও হয়তো এমনি পিছলা লাগতো। জুম্মনের মায়ের

অনেক আগেকার, তার সঙ্গে দ্যাখা হওয়ারও আগেকার চেহারা ভালো করে ঠাহর করার জন্য বাঁ হাতের আঙুলগুলো খিজির আলগোছে রাখে জুম্মনের গালে। জুম্মনের চোখজোড়া সম্পূর্ণ খুলে যায় এবং 'ফুফু' বলে সে ২বার ডাকে। তার গালে ও লালচে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে খিজির বলে, 'ডরাস না! তুই কহন আইলি?' জুম্মনের ঘুম একেবারে ভেঙে গেলে ভীতু চোখে সে খিজিরকে দ্যাখে এবং দরজার দিকে সেই চোখজোড়া ফিরিয়ে ভয়-পাওয়া গলায় বলে, 'মা!'

দরজায় সত্যি সত্যি জুম্মনের মা! ৫ দিন পর স্বামীকে দেখে তার প্রতিক্রিয়া কি হলো বোঝা কঠিন। ঝাপশা আলোতে তার মুখের ভাঁজ, গর্ত ও বসন্তের দাগ সব সমান। মাকে দেখে জুম্মন ফের ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু একটু আগে তার ভয় পাওয়াটা ধাক্কা দেয় খিজিরকে। বেদম মার-খাওয়া বুকে ও পিঠে নতুন ব্যথা চিনচিন করে; আমার খায়, আমার ভাড়া করা ঘরের মইদ্যে আমার খ্যাতার নিচে নিন্দ পাড়ে, আবার নবাবের বাচ্চা আমারে দেইখ্যা কেমুন নাখোশ হইয়া মায়েরে ডাকে! আমি কি কুত্তা না মিলিটারি? পুলিশ না মাহাজন? আমারে দেইখা ডরাইবো ক্যালায়? খিজিরের ইচ্ছা করে পাছায় ২টো লাথি দিয়ে খানকির বাচ্চাকে পাঠিয়ে দেয় মালিবাগ কি নাজিমুদ্দিন রোডের রেল লাইনের ধারে।

মেঝেতে বসে জুম্মনের মা গামছার গেরো খুলে এ্যালুমিনিয়ামের গামলা ধার করে টিনের থালায় ভাত বাড়ে, থালাটা এগিয়ে দেয় খিজিরের দিকে, 'লও। গোরুর গোশতের ভুনা পাকাইয়াছিলাম।'

'মাহাজনরে কয়বার মারা দিয়া গোশতো লইয়া আইলি? খানকি মাগীর কামাই আমার বালে ভি খায় না!'

আরেকটি থালে জুম্মনের মা ভাত তরকারি সাজায়, 'রাইতে এইগুলি ভালো লাগে না!' মেয়েটা নিস্তেজ হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে সে প্রায় কাতরায়, 'তোমার ত্যাজেই তোমারে খাইছে! গরিব মানুষের এমুন ত্যাজ খোদা সইজ্য করে না! ' বলতে বলতে সে ভাত খায়। ২/৩ গ্রাস মুখে তোলার পর তার গ্রাসের পরিমাণ ও খাওয়ার গতি বাড়ে। খিদে যেরকম পেয়েছে, সব ভাত আবার খেয়ে না ফেলে! থালার ভাত আঙুলের দাগে বিভক্ত করতে করতে ছেলেকে ডাকে, 'এই জুম্মন, ওঠ! ভাত খাইবি তে ওঠ!' কিন্তু জুম্মনের ওঠবার কোনো লক্ষণ নাই। জুম্মনের মা ফের বিড়বিড় করে জানায় যে বিবিসায়েব আর সিতারাকে পটিয়ে মহাজনকে দিয়ে খিজিরের উচ্ছেদ সে প্রায় ঠেকিয়ে এনেছিলো। কিন্তু নিজের ভালো না চাইলে কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে? সেদিন দুপুরে খিজির যে কাণ্ডটা করলো, এরপর কোন মানুষটা তাকে তার বাড়িতে ভাড়াটে হিসাবে থাকতে দেবে—এইসব বলার ফাঁকে ছেলেকে সে ফের ডাকে, 'শুওরের বাচ্চা, উঠলি? গোশতো ফুরাইয়া গেলে ঘ্যানঘ্যান করবার পারবি না কইলাম!' এই সতর্কবাণীতে কাজ হয়। বিছানা থেকে উঠে মেঝেতে বসে জুম্মন মায়ের পাত থেকে ঘন সুরুয়া মাখা ভাত খায়। শুকনা শক্ত হাড় নিয়ে ঘুম-জড়ানো গলায় সে প্যান প্যান করে, 'গোশতো কই? খালি হাড্ডি লইয়া আইছো!'

'তর বাপে তরে ডুমা ডুমা গোশতো পাকাইয়া পাঠাইয়া দিছে, না? খা হারামজাদা! খাইলে খা, নাইলে উইঠা যা!' গলা ও চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করা সে অব্যাহত রাখে, 'যার ঘরে থাকবা, যার খাইয়া মানুষ হইলা, তারই মাল সামান লুট করবার চাও! তার গ্যারেজ খালি করনের লাইগা চোরচোট্টো লইয়া দল পাকাও! বিবিসাবে ভি চেতছে, কয় আগিলা

জামানা হইলে মাহাজনে তোমারে জানে খতম কইরা গতরখান নর্দমার মইদ্যে ফালাইয়া দিতো! অহন—।' খিজির নিজেও ভাত খেতে শুরু করেছে, গোশ্‌তের টুকরাগুলো সব তার পাতেই, গোশ্‌ত মুখে সে জবাব দেয়, 'তার মাহাজনের ভাউরা চুতমারানি বজলুটারে মাইরা লাশ বানাইয়া দিলাম হেই কথা মাহাজনেরে মনে করাইয়া দিস! ঐটারে বহাইয়া দিছি, এ্যার বাদে ধরুম মাহাজনেরে! আরে, পাবলিকে তো মাহাজনের গ্যারেজ উরেজ, বাড়িঘর ব্যাকটি জ্বালাইয়া দিতো, আমার লাইগা বাঁইচা গেছে!'

কথাটা সে শুনেছে আলতাফের মুখে। ঐদিন তাকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে ডাক্তার বন্ধুদের সামনে আলতাফ বলছিলো, 'সিচুয়েশন এমন টাফ হয়ে গিয়েছিলো যে এই লোকটা বললেই সব রিকশাওয়ালা একজোট হয়ে রিকশামালিকদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতো!' তখন কিন্তু খিজির খুব খেয়াল করেনি, জুম্মনের মায়ের বিলাপ শুনে সেদিনকার কথাটা খুব দামী হয়ে ওঠে, 'বুঝলি? ইউনিভারসিটির মইদ্যে, মেডিকেলের মইদ্যে ব্যাকটির খালি এক কথা, খিজির আলি কইলেই রিকশাআলারা মাহাজনের গ্যারাজ উরাজ পুড়াইয়া দিতো!'

'তুমি আগুন দিবার মানা করছিলা?' জুম্মনের মায়ের ডান হাত থমকে থাকে তার পাতের ওপর, এই সুযোগে সপাসপ গ্রাস মুখে তোলে জুম্মন, ভাতের মাঝখানে মায়ের আঙুলে চিহ্নিত সীমারেখার ওপার থেকেও সে অকাতরে ভাত টানে। জুম্মনের ভাত খাওয়ার চপচপ আওয়াজ ছাপিয়ে ওঠে জুম্মনের মায়ের উত্তেজিত ও রাগী গলা, 'ক্যালায়? তুমি আগুন দিবার দিলা না ক্যালায়? মাইনষে যে কয় মাহাজনে তোমার বাপ লাগে, মিছা কয় না! পাবলিকে মাহাজনরে জ্বালাইয়া দিবো, পুড়াইয়া মারবো, খতম করবো,—তোমার কি? তুমি ক্যাঠা? —আমি জিগাই, তুমি গ্যারেজের মইদ্যে আগুন দিবার দিলা না ক্যালায়?'

ভাতের শেষ গ্রাসটি থালা ও মুখের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখে খিজির বৌয়ের দ্রুত ও উত্তেজিত সংলাপ শোনে। মেয়েটা খেপে গেলো নাকি? কুপির কালচে হলদে আগুন কি দপ করে জ্বলে উঠলো তার মাথার চুলে?

'কথা কও না ক্যান? মাহাজনের বাড়ির মইদ্যে তুমি আগুন জ্বালাইবার দিলা না ক্যালায়?' বলতে বলতে এঁটো হাতে জুম্মনের মা খিজিরের বুকের ওপর জামা খামচে ধরে। খিজির এর জবার দেবে কি?—আগুন কি খিজির ইচ্ছা করলেই লাগাতে পারে?—এতনা আসানি নেহি হ্যায় রে মাগী! আলাউদ্দিন মিয়ার হুকুম ছাড়া খিজির কি করবে? ইউনিয়নের পাজামা-পাঞ্জাবি-চশমারা কতো এলেমদার লোক, তারা না চাইলে সে আগুন জ্বালায় কি করে?—সেদিনকার কথা ভাবতে ভাবতে কুপির শিখাটিকে সে স্বচ্ছ হতে দ্যাখে। নাঃ! এখন যাওয়ার দরকার। উঠতে গেলে হাঁটু খচখচ করে।

এদিকে জুম্মনের মা কি যেন বলতে চায়। শুরু করে মাঝপথে থেমে ফের বলে, 'গতরের মইদ্যে বহুত চোট পাইছো, না? মেডিকলের ডাক্তারে কি কইছে?'

'কিয়ের চোট? তগো বজলুরে কেমুন কিমা বানাইয়া দিছি দ্যাহস নাই?'

'একটা খবর তো জানো না?'

'কি?' খিজির এবার বসে পড়ে তক্তপোষের এক ধারে।

জবাব না দিয়ে জুম্মনের মা এঁটো থালাবাসন গুছিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত হলে খিজির আরাম পায়। বৌয়ের কথা শোনার অজুহাতে আরো কিছুক্ষণ সে এখানে বসে থাকতে পারে। তবে জুম্মনের মা ফের তার হাঁটুর ব্যথার কথা তুললে খিজির একটু খিচড়ে যায়,

'সোয়াগ থো! কি কথা কইলি না? মালপানি লাগবো?' মালপানি চাইলেই বা সে দেবে কোত্থেকে? অথচ ঝাঁঝালো করে বলে, 'কতো লাগবো?'

'না।'

'তাইলে?' খিজির অসহিষ্ণু ওয়ে ওঠে, 'কইবি তো ক! নাইলে আমি যাই গিয়া!'

এরপরেও একটু সময় নিয়ে জুম্মনের মা মিনমিন করে কি যে বলে খিজিরের মাথায় ঢোকে না, 'কি কইলি?'

জুম্মনের মা তার বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলে খিজির চিৎকার করে ওঠে, 'কি? কি কইলি?' তারপর একটু আস্তে জিগ্যেস করে, 'ক্যাঠায় কইলো?' জুম্মনের মা ছেলের গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দেয়। খিজির বলে, 'হাচা কস?'

'তাইলে কি?'

'ঈমানে?'

'ঈমানে!'

'বুঝলি ক্যামনে? ক্যাঠায় কইলো?'

'কইবো ক্যাঠায়?' খিজিরের প্রতি বাৎসল্য ও কৌতুকে জুম্মনের মায়ের কালো মুখে হাসি উপচে পড়ে, তার বসন্তের দাগগুলো প্রসারিত হয়, 'পোয়াতি হইলাম আমি, আর আমি বুঝুম না?'

হাঁটুর ব্যথা খিজির এখন বিশেষভাবে বুঝতে পাচ্ছে না। সারা শরীর জুড়ে নতুন ধরনের স্পন্দন। এই নতুন ছটফটানি তার অপরিচিত। মাথার ভেতরকার একটা জাম যেন কেটে যাচ্ছে, রিকশার প্যাডেলে দাঁড়িয়ে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, সামনের মাল বোঝাই ট্রাক তার রিকশাকে সাইড দেওয়ার জন্যে রাস্তার ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু সামনের রাস্তা বড়ো ফাঁকা, এই মস্ত রাস্তায় কি তার রিকশা ছাড়া কোনো গাড়ি নাই? এই খাঁ খাঁ রাস্তায় রিকশা চালাবার সুযোগ পেয়ে সে একটু বিচলিত হয়। নতুন অর্পিত দায়িত্বভারে তার হাড়সর্বস্ব বুক চওড়া হতে থাকে।—দুত্তোরি শালা! তার কাজের কি শেষ আছে? এর ওপর এই খানকি মাগীটা কি-না তার বীজ বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে!—আহা! এই নিয়ে মাগীটাকে মশলা বাটতে হয়, কাপড় কাচতে হয়, রান্না করতে হয়! আর মাহাজনের যা খাসলত,—একটা আমান খচ্চর, জাউরার পয়দা জাউরা—তার ঘরে জুম্মনের মাকে সে রাখে কি করে?—এই সময় কুপির লালচে হলুদ আলো মেঝেতে গড়িয়ে পড়লো তরল লাল আগুন হয়ে। সমস্ত ঘর ভাসে লাল রক্তে, রক্তের ভেতর শুয়ে থাকে ন্যাংটা মেয়েমানুষ।—বস্তির কাঁচা ও ভ্যাপসা ঘর দুলতে থাকে পাকা দোতলা বাড়ির সিঁড়ির নিচে। দোলে, দোলে! মায়ের রক্তাক্ত ন্যাংটা গতর থেকে চোখ ফেরাবার জন্য তাকে মাথা ঘোরাতে হলো। সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ করে নর্দমা থেকে পাওয়া গুমুতের গন্ধের ১টি ঝাপটায় মাথা ফের ফিরে আসে তার নিজের নিয়ন্ত্রণে। সে তোলে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ, 'মনে লয় হাঁটুখান খাম কইরা দিছে!'

জুম্মনের মা তার পাশে বসে স্বামীর হাঁটুতে হাত রাখে, 'পাওখান গরম ঠ্যাহে!'

খিজির সেই হাত সরিয়ে দেয় না, বলে, 'তুই মাহাজনের ঘরেই কাম করবি? এই বস্তির মইদ্যেই থাকবি?'

বৌয়ের মুখে 'হ্যাঁ' শোনবার আগেই তাড়াহুড়া করে খিজির হুকুম ছাড়ে, 'থাক! এখানেই থাক! আমি কৈ থাকি ঠিক নাই। অহন আমার বহুত কাম! মাস মাস ভাড়া পাঠাইয়া দিমু!

তর পয়সাকড়ি লাগলে জুম্মনরে দিয়া খবর দিস!' খিজির উঠে দাঁড়ালে জুম্মনের মা বলে, 'আউজকা না হয় তুমি এহানেই থাকো।'

'না যাই। সায়েবের গ্যারেজে থাকতে হইবো।' বললেও বৌয়ের আরেকটি অনুরোধের আশায় খিজির দাঁড়িয়ে থাকে। 'রাইতটা থাকো না! আমি না হয় বিবিসায়েবরে দিয়া মাহাজনরে কওয়ামু, তোমার শরীলটা খারাপ। দুই চাইরটা দিন না হয় থাকলা!'

'মাহাজনেরে কি কইবি মাগী?' খিজির ফের চটে যায়, 'তর মাহাজনে জান লইয়া মহল্লা থাইকা ফোটনের তালে মালসামান বান্দে, হেই খবর রাখস?'

এরপর নরম করে কথা বলা তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। দরজায় পা দিয়ে জুম্মনের মায়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সে তাকে সাবধান করে দেয়, 'হুশিয়ার থাকবি! তুই খানকিটা জিন্দা থাকস আর নাই থাকস, তর প্যাটেরটার কোন জখম উখম হইলে তরে এক্কেরে জানে মাইরা ফালামু, কইয়া দিলাম!'

২৭

'জুম্মনের মা, এইগুলি কি শুনি? কয়মাস চলে?' কামরুদ্দিনের প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে ভয় পেয়ে জুম্মনের মা সত্যি কথাটাই বলে। জবাব শুনে কামরুদ্দিন স্বস্তি পায়, 'তাইলে চিন্তা নাই। দুই চাইর দিনের মইদ্যে প্যাট খসাইয়া ফালা!'

জুম্মনের মা উসখুস করে। গতকাল সন্ধ্যায় ঘরে ডেকে নিয়ে কামরুদ্দিনকে মহাজন তাহলে পটিয়ে ফেলেছে।

কামরুদ্দিনের অসন্তুষ্ট চেহারা দেখে রহমতউল্লা কাল খুব হাসছিলো। পরিণত ও অভিজ্ঞ বয়স্ক মানুষের সস্নেহ হাসি, তাতে প্রশ্রয় মেশানো। কামরুদ্দিন হলো বড়ো ঘরের ছেলে, তার পূর্বপুরুষরা সব কীর্তিমান রাজমিস্ত্রি, নবাব বাড়ির গম্বুজটা তার দাদার বাপের তৈরি। আর সে কি-না নিকা করবে যে মেয়েমানুষকে তার পেটে এখন ছোটোলোকের সন্তান? না, না, কামরুদ্দিন তো বটেই, রহমতউল্লাও এটা বরদাশত করে কি করে?—তবে এটা কি কোনো সমস্যা হলো? কতো উপায় বেরিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ক্লিনিক। ২/৩ মাসের পোয়াতি হলে তো কথাই নাই, ক্লিনিকে একবার নিতে পারলেই হয়! 'আধা ঘণ্টা ভি লাগবো না, খালাস কইরা দিবো। জুম্মনের মায়েরে শাড়ি দিবো একখান, নগদ টাকা দিবো কুড়িটা।' দেশে অবাঞ্ছিত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে রহমতউল্লা বড়ো উদ্বিগ্ন। এই যে সরকারের উন্নয়নের তোড়, ১০ বছরের ডেভেলপমেন্ট, সব ব্যর্থ হবে লোকে যদি সন্তান জন্ম দেওয়ার কাজে একটু ঢিলা দিতে না পারে।

মহাজনের শিখিয়ে দেওয়া পরিকল্পনার কথা কামরুদ্দিনের মুখে শুনে জুম্মনের মা হেসে গড়িয়ে পড়ে, 'কি যে কন! আপনে অহনতরি পোলাপানই রইলেন।'

'ক্যামনে?'

'ডর কি?' এইটা কি পুরান বাড়ির ছাদ পাইলেন? লোহার একটা বাড়ি মাইরা পলেস্তারা খসাইয়া ছাদ ফালাইয়া নয়া ঢালাই আরম্ভ করলেন!' জুম্মনের মা বানানো হাসিটাকে কষ্ট করে টিকিয়ে রাখে, 'পয়দা হওনের আগে জানটারে কবচ করবার চান?'

পরপর কয়েকদিন একইভাবে হেসে আর কথা বলে জুম্মনের মা কামরুদ্দিনকে একটুও ভেজাতে পারলো না। আবার মহাজনের ভাতের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ার পরিকল্পনাতেও জুম্মনের মা রাজি হয় না। কামরুদ্দিন একদিন চটে যায়, 'ঠিক আছে। ঐ ভ্যাদাইমার লগে পইড়া থাক! জুম্মনরে আমার কাছে পাঠাইয়া দিস!'

জুম্মনের ব্যাপারে জুম্মনের মা কামরুদ্দিনের ওপরেই বা ভরসা করে কিভাবে? মহাজন তার জন্যে বর্ণমালা এনে দিয়েছে, কাল পয়সা দিলো আদর্শ লিপি কিনতে। স্কুলে ভর্তি হলে সব খরচ জোগাবে মহাজন। মহাজন যদি সাহায্য করে তো আল্লার মেহেরবানীতে জুম্মন এমনকি ম্যাট্রিক পাস করতে পারে একদিন! মহাজন যদি ১টা রিকশা কিনে দেয়, রিকশার ভাড়া যদি দিতে না হয় তো সেটা চালিয়ে জুম্মন তার নিজেই একদিন কতো রিকশার মালিক হবে। বেবি ট্যাকসি একটা কিনতে তখন কতোক্ষণ?—খিজিরের সঙ্গে থাকলে?—অসম্ভব! পেটেরটা দুনিয়ার মুখ দ্যাখার পর খিজির তো জুম্মনকে সহ্যই করতে পারবে না।

এর মধ্যে খিজির একদিন এসেছিলো। তখন অনেক রাত, মহাজনের বাড়ি থেকে ফিরে জুম্মনের মা কেবল খেতে বসেছে। খিজিরকে দেখে খাওয়া দাওয়া তার মাথায় উঠলো। 'চোরের লাহান কি করতে আইছো? বাপ হওনের হাউস করো, পোলারে খাওয়াইতে পারবা? পরাইতে পারবা? বাপ হইবার চাও!—হায়রে মরদ!'

খিজির বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি! বজলু শালার ঘরে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু বস্তি ছাড়লে কি হয়, এই মহল্লা খিজির ছাড়বে না। জুম্মনের মাকে পাহারা দেওয়ার জন্য কাছাকাছি থাকা দরকার। আলাউদ্দিন মিয়া অবশ্য কথা দিয়েছে, খিজিরকে যে করে হোক এই এলাকাতেই থাকার বন্দোবস্ত করে দেবে। মহাজনের বস্তিতে কামরুদ্দিনের বসবাসের সম্ভাবনার কথা শুনে আলাউদ্দিন মিয়া একটু ভাবনায় পড়েছে। রহমতউল্লা তাহলে মহল্লায় নিজের শক্তিবৃদ্ধির আয়োজন করছে? কামরুদ্দিন এসে পড়লে খিজিরকে আলাউদ্দিন মিয়ার দরকার হবে আরো বেশি। বড়ো কথা, খিজিরের মতো এরকম জেনুইন ওয়ার্কার পাবে কোথায়? মামুজান অবশ্য কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, মহল্লার নেতৃত্ব তার হাত থেকে প্রায় যায় যায়। সেদিনকার পোলাপান—এখনো হাফপ্যান্ট পরে—তারা কিনা রহমতউল্লার বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসঙ্গে চিৎকার করে, 'আইয়ুব খানের দালালরা' —'ভুট্টা দিয়া ছাতু খা!' মুশকিল হয় সিতারাকে নিয়ে। আলাউদ্দিন তাকে অনেকটা হাত করে এনেছে, তবে বাপের সম্বন্ধে এইসব টিটকিরি তার গায়ে লাগে, আলাউদ্দিন মিয়া গেলেই প্যানপ্যান করে, 'আপনেরা আব্বার লগে কি শুরু করছেন?'

'আরে পোলাপানের কথা ছাড়ো!'

'পোলাপানে তো আপনারই সাগরেদ! খিজিরটারে আব্বায় খেদাইয়া দিলো, অরে জায়গা দিলেন আপনে! আব্বায় কয়, ভাইগ্না কুনোদিন আপন হইতে পারে না!' এখন মামুজানের মেয়েটিও যদি তাকে আপন করে নিতে অস্বীকার করে এই ভাবনায় আলাউদ্দিন মিয়ার প্রেমগদগদ বুক নেতিয়ে পড়ে। খিজিরকে ডেকে বলে, 'দ্যাখ, মামু বুইড়া মানুষ,

তারে ইজ্জত করতে হয়। তুই আমার গ্যারেজের মইদ্যে থাকস, মামুজানে কয়, ভাইগ্না আমারে বেইজ্জত করবার লাইগা অরে রাখছে!'

এই মহল্লা ছেড়ে খিজির এখন কোথাও যেতে পারবে না। এই ব্যাপারে আলাউদ্দিন মিয়া তার সঙ্গে একমত। কিন্তু জুম্মনের মায়ের পেটে গচ্ছিত তার সন্তানের নিরাপত্তার জন্যে খিজিরের উদ্বেগ দেখে আলাউদ্দিন মিয়া অবাক, 'তুই হালায় আদমি না পায়জামা? আরে আউজকা বাদে কাউলকা ঐ মাগী বলে নিকা বইবো কামরুদ্দিনের লগে, তার প্যাটের বাচ্চার লাইগা তুই দিওয়ানা হইয়া গেলি?' খিজির এই ধিক্কারে কোনো সাড়া না দেওয়ায় আলাউদ্দিন তার পরিকল্পনার কথা ফিসফিস করে জানায়, 'শোন। মামানীরে আমি হিন্ট দিয়া রাখছি, জুম্মনের মায়ের ক্যারেক্টার খারাপ, অরে রাইখা ঘরের বদনাম হইতাছে। দুইটা দিন যাইতে দে না! কামরুদ্দিনের লগে নিকা বইবো তো, দুইটারে একলগে খেদাইমু! মহল্লার ধারে কাছে ভি আইবার পারবো না!'

রাত ১টার দিকে রিকশা নিয়ে এসে খিজির দ্যাখে গ্যারেজে ১০০ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে ৪টে। কাল ভোরবেলা থেকে পরশু বিকালের জনসভা সার্থক করার প্রস্তুতি শুরু হবে। এখন সেই প্রস্তুতির প্রস্তুতি। ছাত্রকর্মীদের কেউ কেউ বসে পোস্টার লিখছে, চাটাইয়ের সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হচ্ছে বড়ো বড়ো পোস্টার। ১টি পোস্টারে ১জন সৈন্যের ছবি। তার মাথায় হেলমেট, কোমরে ফিট করা পিস্তল, হাতে রাইফেল। তাক-করা রাইফেলের সামনে হাজার হাজার মানুষের মিছিল। সৈন্যের চোখ দুটো কালো কাপড়ে ঢাকা। এর মানে কি? যে ছেলেটি ছবি আঁকছিলো সে বুঝিয়ে বলে যে মিলিটারির লোকজন অন্ধের মতো মানুষ হত্যা করে চলেছে।—কেন, মিলিটারির লোক কি কানা?—ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বলে, 'কানাই তো। কানা বলেই নির্বিচারে নরহত্যা চালাতে পারে।'

কি জানি? খিজিরের কিন্তু মনে হয় না। আইয়ুব খান কি অন্ধ? শয়তানের চোখ বরং সংখ্যায় অনেক বেশি, আগে পিছে সে অনেক কিছু দেখতে পায়। তার হাত থেকে বাঁচতে হলে তার চোখগুলো চিরকালের জন্য অন্ধ করে দেওয়া দরকার। কথাটা ভাবতে ভাবতে খিজির গ্যারেজের ১ কোণে বিছানা পাতার উদ্যোগ নেয়। ১টি ছেলে বলে, 'আজ এখানে শোবে কোথায়? আমরা আজ গোটা ঘর দখল করেছি।'

তাদের পোস্টারের রঙ এখনো কাঁচা, পোস্টার মেলে রাখতে না পারলে ছবি লেপ্টে যাবে। অনেক জায়গা দরকার, আরেকটি ছেলে বলে, 'আলাউদ্দিন ভাই বলছিলো তুমি নাকি আজ ওসমান সায়েবের ঘরে শোবে।'

এতো রাতেও ওসমান সায়েবের ঘরে আলো জ্বলছে। ওসমান বলে, 'থাকো না? দাঁড়াও, মেঝেতে একটা সতরঞ্চি পেতে দিই!'

খিজির আসায় ওসমান বেশ খুশি। আনোয়ারকে চিঠি লেখার পর কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিলো। খিজিরকে পেয়ে মাথাটাকে ব্যস্ত রাখা যাবে। ওসমান একটা কিং স্টর্ক এগিয়ে দিলে খিজির বলে, 'আমার বিড়ি আছিলো!'

'থাক না। তুমি তো এই সিগ্রেটই খাও দেখি।'

'কয়দিন হইলো বিড়ি ধরছি। সিগারেটে জুত পাই না। বিড়িটা ধরাইয়া দুইটা টান দিলে শরীলটা গরম হইয়া ওঠে!'

কিন্তু ওসমানের দেওয়া কিং স্টর্কে তার প্রাণপণে টান দেওয়া দেখে মনে হয় না যে সিগ্রেটে তার কিছুমাত্র অরুচি ধরেছে।

২৮

ওসমানের ঐ চিঠি আনোয়ার পায়নি। এর ১টি কারণ এই হতে পারে যে চিঠিটা শেষ পর্যন্ত ডাকবাক্সে ফেলা হয়নি। ডাকে ফেললেও আনোয়ার ওটা সময়মতো পেতো কি-না সন্দেহ। আনোয়ার তখন ধারাবর্ষা চরে।

হোসেন আলি ফকির বসেছিলো হাতলওয়ালা ১টা চেয়ারে, হাঁটু-গোটানো পাজোড়া তার চেয়ারের ওপর ওঠানো। আনোয়ার বসেছে তার সামনে ১টি টুলে। খালি বেঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে করমালি। লম্বা চওড়া দশাসই ১ জোয়ান চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে হোসেন আলির ঘাড় ও পিঠ দলাইমলাই করে। হোসেন আলির মুখ থেকে মাঝে মাঝে সুখের ধ্বনি বেরোয়, 'আঃ। আস্তে! শালার হাত কিবা! মোষের পাও এ্যার চায়া নরম হয়।'

হোসেন আলির চোখের সামনে বিশাল চর। কালচে হলুদ জ্যোৎস্নায় নিকানো। আর আনোয়ারের পিঠ ফেরানো রয়েছে চরের দিকে, তার সামনে যমুনা। খুব উঁচু পাড় থেকে খাড়া মাটি লাফিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে নদীর স্রোতে। শীতকালের নিরীহ নদীর চলাচলও এই নির্জন জায়গায় ছলাৎ ছলাৎ করে প্রতিধ্বনিত হয়। নদীর ওপার দ্যাখা যায় না। মনে হয় নদী হঠাৎ করে ঢুকে পড়েছে কুয়াশার খাপের মধ্যে।

ওরা বসেছিলো ঘরের পাশে। চালের পুরু খড়ের প্রসারিত ভাগ ওদের মাথার ওপর। মানুষের হাতে ছাওয়া হলে কি হবে, চাঁদের আলোয় খড়ের চাল বড়ো নির্লিপ্ত ও আদিম। যমুনার পানিহাওয়ায় হোসেন আলি ফকিরের স্বর মোটা ও ভারি। সে একনাগাড়ে কথা বলায় যমুনার পাশাপাশি আরেকটি ধ্বনিস্রোত বয়ে চলেছে। আনোয়ারের আবেদন শোনার পর সে জানায় যে, খয়বার গাজীর ১টা চিরকুট নিয়ে এলে ভালো হতো। খোঁয়াড়ের আসল পরিচালক তো খয়বার গাজী, শুধু তদারক করার কাজটা দেওয়া হয়েছে তাকে।

'খোঁয়াড়? এখানে খোঁয়াড় আছে নাকি?' আনোয়ার অবাক হলে হোসেন আলি জানায় যে খয়বার গাজীর মস্ত বাথানের সঙ্গে ডাকাত-মারা চরে একটা খোঁয়াড় করা হয়েছে। সরকারী আইন অনুসারে করা, সরকারের লাইসেন্সপ্রাপ্ত খোঁয়াড়। খোঁয়াড় তো আসলে সরকারের সম্পত্তি, পয়সা দিয়ে খয়বার গাজী কয়েক বছরের জন্য ডেকে নিয়েছে।—তা খোঁয়াড় কেন?—অসাবধান, দায়িত্বহীন ও পরিশ্রীকাতর লোকজন নিজেদের গোরুবাছুর দিয়ে অন্যের জমির ফসল নষ্ট করে, জমির মালিক সেগুলো ধরে নিয়ে আসে এখানে। উপযুক্ত জরিমানা দিয়ে প্রকৃত মালিক নিজেদের গোরুবাছুর খালাস করে নেয়। খয়বার

গাজীর অনুরোধে তাকে খোঁয়াড়ের তদারক করতে হয়, নইলে এসব কাজ করতে তার ভালো লাগে না।

'আমি নিজেই এসেছি, খয়বার গাজী সায়েব জানেন না যে আমি এখানে আসবো।' আনোয়ার এই কথা বললে হোসেন আলি অন্য প্রসঙ্গ তোলে। খয়বার গাজীর কথা বাদ দিয়ে সে তখন বলে নিজের কথা। প্রথম কথা, বাঁচতে তার আর ভালো লাগে না। ৩ কুড়ির ওপর বয়স হলো, সংসার ও পৃথিবীতে অরুচি ধরে গেছে। যমুনা ১৭ বার তার ঘর ভেঙেছে। এই শালার নদী, শালী বেশ্যার অধম। কারো প্রতি তার মায়ামোহাব্বত নাই। ঘর ভাঙতে ভাঙতে হোসেন আলির এমন অবস্থা যে জীবনের বিভিন্ন সময়ে বসবাস-করা চরসমূহের কালানুক্রমিক তালিকাও সে দিতে পারে না। বাপজানের কাছে শুনেছে, তার জন্ম হয় যে চরে সেটা ছিলো মাদারগঞ্জ থানায়। হ্যাঁ, পুব পাড়ে। মাদারগঞ্জ থানা, জামালপুর মহকুমা, ময়মনসিং জেলা। তার ছেলেবেলায় চর-দখল নিয়ে মারামারি হলে বাপজানকে পুলিশ ধরে নিয়ে আটকে রাখে সিরাজগঞ্জ জেল হাজতে, পাবনা জেলায়। যৌবনকালে মামলা করতে তাকে যেতে হতো গাইবান্ধা শহরে, জেলা রংপুর। তখন তারা চর হাসুয়ার বাসিন্দা। বছর সাতেক হলো বসবাস করছে এই ধারাবর্ষায়, ভেবেছিলো বাকি জীবনটা এখানেই কাটাবে। তা আর হলো কৈ?—কেন? এই চরে পলি পড়ছে পুবদিকে, ভাঙন শুরু হয়েছে পশ্চিমে। এই যে নদী, কয়েক বছর আগে ছিলো আরো পোয়া মাইল পশ্চিমে। গত বর্ষায় পোয়া মাইল ভেঙেছে, আরেকটা ছোবল দিলেই খড়ের এই চারচালা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই ভাঙাগড়া আর মারামারি আর ভালো লাগে না। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন শান্তিতে থাকবে বলে খোঁয়াড় তদারকির নিরিবিলি কাজটা সে নিয়েছিলো। তখন কি জানে যে এখানেও এতো ঝামেলা, এতো ঝঞ্ঝাট? হিংসুটে লোকের কি অভাব? কার কাছে কিসব উল্টাপাল্টা খবর পেয়ে পুলিশ এসেছিলো, ধকল সামলাতে হয়েছে হোসেন আলিকেই। পুলিশ তো পুলিশ, পুলিশের বাপ এসে কি করবে তার? খোদ এমএনএ সায়েবের শেয়ার আছে খোঁয়াড়ের ব্যবসায়, গতবার ইলেকশনে এই এলাকার বিডি মেম্বারের ভোট জোগাড় করে তাকে পাস করিয়ে দিলো কে?—হোসেন আলি ছাড়া আবার কে? এমএনএ সায়েবের ওঠাবসা মন্ত্রী-গবর্নরের সঙ্গে, এবার কেউ গোলমাল করলে টাইট করার জন্যে দরকার হলে মিলিটারি নিয়ে আসবে। মিলিটারির ডাণ্ডা না পড়লে মানুষ ঠিক পথে চলে না। হোসেন আলি আক্ষেপ করে, মানুষ কি আর সেই আগের মানুষ আছে? আল্লারসুল মানে না, মানীকে সম্মান করে না, ভদ্রলোকের ইজ্জত দেয় না। এই যমুনা পার হলে পূবে মাদারগঞ্জ থানা, সেখানে মানুষ চরম বেয়াদব হয়ে উঠেছে, খাজনা বন্ধ করার পাঁয়তারা করছে। কোন বিডি মেম্বারের ধানের গোলা লুট করেছে, তহশীলদারের অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চোর-ডাকাতের রাজত্ব শুরু হয়ে যাচ্ছে। আরে, সার্কেল অফিসার উচ্চশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত ভদ্রলোক,—তার বাড়ি ঘেরাও করে চাষারা তার বৌ-ঝির হাত ধরে টানাটানি করে। এই জাতের ওপর গজব পড়বে না তো কি আল্লার রহমত নাজেল হবে?

'না সরকার, মেয়ামানুষের গাওত হাত তোলা হয় নাই!' করমালির কথায় হোসেন ফকিরের দীর্ঘ ও একটানা বাক্যস্রোত বাধা পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফের উপচে ওঠে, 'মিছা কথা কল্যাম? একটা অফিসারের বাড়ির মদ্দে চাষাভুষারা ঢুক্যা পড়ে, এটা জুলুম হলো না?' ফুঁসে উঠতে উঠতে হোসেন আলি হঠাৎ নিভে যায়। আনোয়ার কিন্তু একটু ভয়ই পেয়েছিলো,

করমালির উদ্ধত বাক্যে হোসেন আলি চট করে ১টা কিছু করে না ফেলে! এর মধ্যেই হোসেন আলির জীবনের অনেক বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী শোনা হয়েছে। তার শতকরা ৫০ ভাগ সত্যি হলেও সে ভয়াবহ বিপজ্জনক চরিত্র। হাসিয়া, বর্শা ও বল্লা নিয়ে বাপজানের সঙ্গে সে যে কতো জায়গায় কাজিয়া করতে গেছে তার হিসাবনিকাস নাই। এই হাতে সে খুন করেছে অন্তত ১৪জন মানুষ। আবার কোর্টকাচারি করতেও তার জুড়ি মেলা ভার। ফৌজদারী আইনে তার দখল দেখে বাঘা বাঘা উকিল মোক্তার থ হয়ে গেছে। কামিনীবাবু, গাইবন্ধার বাঘা উকিল কামিনী চক্রবর্তী পর্যন্ত বলেছিলো, 'হোসেন, ল্যাখাপড়া করলে বড়ো ব্যারিস্টার হইতে পারতিস!' এ কথা কেন বলেছিলো?—হোসেন আলি একটুখানি হেসে বয়ান করে 'উগল্যান কি আজকার কথা বাপু?'—সেবার খুব মজা হয়। সদ্য জেগে-ওঠা বাঘুরিয়া চরে হোসেন তখন সবে ঘরদোর তুলে বাস করার আয়োজন করছিলো। শিমুলবাড়ির তালুকদাররা যায় সেই চর দখল করতে। তাদের লাঠিয়াল ছিলো কাগমারীর, কাগমারীর লাঠিয়ালদের তখন খুব নাম। তাদের সঙ্গে পারা কঠিন। অনিবার্য পরাজয় বুঝতে পেরে হোসেন আলি ছিপনৌকা করে চম্পট দিলো সোজা সিরাজগঞ্জের দিকে। তবে পালাবার ঠিক আগের মুহূর্তে নিজের দুজন কিষানকে তার গোয়ালঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেয়। সিরাজগঞ্জ কোর্টে মামলা ঠুকে দিলো, তালুকদারেরা তার বাড়িতে চড়াও হয়ে তার খাস ২জন কামলাকে পুড়িয়ে মেরেছে। এই ১ বুদ্ধির জোরে তালুকদারদের ৪ লাঠিয়ালের যাবজ্জীবন।—তো সেটা বৃটিশ আমল বাপু, তখন যে সে লোক হাকিম হতে পারতো না, চাষাভূষার বেটারা সব পায়ের তলায় পড়ে থাকতো। তা, এখন কি অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো নাকি যে করমালির কথায় হোসেন আলি সেভাবে জ্বলে উঠলো না? করমালির কথার জবাবে সে কেবল বিড়বিড় করে, 'বেশি কথা কস না!' কিন্তু তার এই আদেশ তেমন শোনা যায় না, তার গলায় ঘন শ্লেষ্ম।

সের দেড়েক মোষের দুধ দিয়ে প্রায় ঐ পরিমাণ ভাত খেয়ে করমালি চলে যায় ঘাটে, সে রাত্রি কাটাবে নৌকায়, পচার বাপের সঙ্গে। ভদ্রতাবোধ থেকে হতে পারে, আবার ভয়েও হতে পারে,—আনোয়ার হোসেন আলির আতিথ্য গ্রহণ করে। মোষের দুধ দিয়ে ভাত খেয়ে সে শুয়ে পড়ে হোসেন আলির অড়বিহীন লেপের নিচে। তার জন্য নিজের বিছানা ছেড়ে হোসেন আলি শুয়েছে মস্ত একটা কাঠের বাক্সের ওপর। শোবার পরও তার কথা শেষ হয় না: এই ভদ্রলোক-বিবর্জিত চরে আনোয়ারকে উপযুক্ত আদর যত্ন করতে না পেরে সে মরমে মরে যাচ্ছে। এখানে কি মানুষ থাকতে পারে? মেঘনা কি রমনা সিগ্রেট কিনতে হলেও ২ ঘণ্টার পথ ধরে নৌকায় যেতে হয় চালুয়াবাড়ি। এদিকে চরের পশ্চিমে ভাঙন শুরু হওয়ায় হোসেন আলি তার ৩টে বৌয়ের সবকটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে পুবে। তাদের বাথান বলো, খোঁয়াড় বলো সব ঐদিকেই। ওদিকটায় চর পড়ছে, ডাকাত-মারা চরের সঙ্গে এই ধারাবর্ষা এক হয়ে গেলে সেখানে হোসেন আলি স্থায়ীভাবে বাস করবে। টিনের আটচালা ঘর তুলবে, আম কাঁঠালের গাছ লাগাবে।

এতো কথা বলে, কিন্তু কাজের কথা তুললেই বাক্য হয়ে আসে সংক্ষিপ্ত। যেমন, 'গোরু কার? আপনাগোরে তো নয়?'

'করমালির গোরু, ওর জ্যাঠা পচার বাপের গোরু।'

'দ্যাখা যাক।' হোসেন আলি সশব্দে হাই তোলে। আনোয়ারেরও চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

ঘণ্টা দুয়েক পর পেটে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা শুরু হলে আনোয়ারের ঘুম ভাঙে। ঘর অন্ধকার। কিন্তু ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে দেড় ইঞ্চি চওড়া আলোর রেখা ভেতরে এসেছে। আনোয়ার উঠে দরজা সম্পূর্ণ খুললে জ্যোৎস্নার আলো ঘর জুড়ে থইথই করে। হোসেন আলি ফকিরের বিছানা ফাঁকা। দরজার পাশে রাখা পানি ভরা বদনাটা হাতে তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তলপেটের বেগ তীব্র হয়ে ওঠে। বাইরে বেরিয়ে আনোয়ার এদিক ওদিক তাকাতেই লোহার শাবল লাগানো বাঁশ হাতে এগিয়ে আসে মস্ত এক জোয়ান। আঙুল দিয়ে লোকটা সামনের দিক নির্দেশ করে, 'ঐ জায়গাত বসেন।'

'কোথায়? পায়খানা কোথায়?'

'ঐ সোঁতার ধারত বসেন।'

মোষের দুধ খাওয়ার ফল প্রায় হাতে হাতে পাওয়া গেলো। এর ওপর নদীর পানিতে এরা এক দানা ফিটকিরি পর্যন্ত দেয় না। আমাশার আর দোষ কি? পায়খানা করে হোসেন আলির ঘরে ফিরতে দরজার সামনে বল্লমধারী ঐ যুবককে দেখে আনোয়ার এবার ভয় পায়। পেটের ব্যথাটা তখন খুব মোচড় দিচ্ছিলো বলে ভয় পাওয়ার সুযোগ ঘটেনি। দশাসই চেহারার তরুণ মেয়েলি ভঙ্গিতে হাসে, 'যান, আপনে নিন্দ পাড়েন। আত এখনো মেলা আছে।'

সে তো ঘড়ি দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু হোসেন আলি কোথায়?

লোকটা পায়চারি করে, হাঁটতে হাঁটতে জবাব দেয়, 'তাঁই গেছে বাথানের দিকে।'

'কেন? হঠাৎ এতো রাত্রে?'

'পুব পাড় থ্যাকা মানুষ আসছে। গোরুবাছুর ডাকাতি করব্যার আসছে!' লোকটির বিশাল শরীর অচঞ্চল, মুখের হাসি হাসি ভাব অবিকৃত। এমনকি বাথান আক্রমণের খবর দেওয়ার সময়ও তার কোনো পরিবর্তন ঘটে না। পূর্ব দিক থেকে দুর্বৃত্তের দল এসেছে লাঠিসোটা নিয়ে। হোসেন আলির লোকজনও প্রস্তুত। ওখানে সুবিধা করতে না পেরে ডাকাতরা আবার নৌকা নিয়ে পশ্চিমদিকে এসে হোসেন আলির বাড়িতে হামলা চালাতে পারে, তাই বল্লম ও হাঁসুয়াধারী কয়েকজন লোককে এখানে মোতায়েন করা হয়েছে। তবে গত বর্ষায় ভাঙন হয়েছে বলে এদিককার পাড় খুব খাড়া, নৌকা ভেড়ানো কঠিন। নৌকা থেকে অস্ত্র ছুঁড়ে মারলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বারো আনা। লোকটি অকারণে ফিসফিস করে কথা বলে, 'ভনল্যাম বাথানের একটা জুলঙ্গি শালারা নিয়া গেছে।'

গোরু বহন করার বড়ো বড়ো জলঙ্গি নৌকা না দেখলেও জিনিসটা সম্বন্ধে আনোয়ার মেলা কথা শুনেছে। ৫০/৬০ হাত লম্বা এইসব নৌকায় কাঠের ঘের দেওয়া ঘর থাকে, ঘরের ভেতর চোখে খুলি-আঁটা গেরুবাছুর থাকার ব্যবস্থা। সংগঠিত লোকজন না হলে হোসেন আলির বাথান থেকে জলঙ্গি নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এতো সাহস কাদের?

কিন্তু এতো সব কথা এই লোকটি হয়তো জানে না। এদিকে আনোয়ারের তলপেটে ফের প্রবল বেগ শুরু হয়। আরো ২বার পায়খানা করলে ব্যথা থিতিয়ে আসে, তখন ঘুম পায়।

সকালবেলা দলবল নিয়ে হোসেন আলি ঘরে ফেরে এবং সকলের কোলাহলে আনোয়ার ঘুম থেকে উঠে পড়ে। সকলেই দাবী করে যে আক্রমণকারীদের সফলভাবে হটানো গেছে এবং ১টি জলঙ্গি নৌকা নিয়ে গেলেও দুর্বৃত্তরা ১৫/২০ টির বেশি গোরু তুলতে পারেনি। তাদের সর্দার আলিবক্সের ডান হাতে বর্শা বেঁধানো হয়েছে, এ সম্বন্ধে এরা সবাই নিশ্চিত।

এছাড়া আরো কয়েকজন জখম হয়েছে। এদের পক্ষে আহতের সংখ্যা মাত্র ৪, এবং এদের আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। ২ জনের ১টা করে চোখ নষ্ট হয়েছে, ১ জনের উরু বোধহয় আর কোনো কাজে লাগবে না।

'চুপ কর শালা মাগীমানষের দল! দুটা চারটা জান নিবার পারলা না তো কিসের বাল ছেঁড়ো হে? পারো খালি আড়াই সের তিন সের চালের ভাত খাবার আর নিন্দ পাড়বার, না? আলিবক্স শালার লাশ আনবার পারলু না তো কিসের মর্দানি দ্যাখাস?' হোসেন আলি তার লোকজনের তৎপরতায় সন্তুষ্ট নয়, 'এই চরুয়াগুলা, বুঝলেন?' আনোয়ারের মনোযোগ আকর্ষণ করে সে, 'শালারা একোটা বেজম্মার পয়দা বেজম্মা! শালারা খালি ভাত খাবো আর মাগীর ঠ্যাঙোতে ঠ্যাং থুয়া নিন্দ পাড়বো! হামার বলে গোয়ার মদ্যে নোয়ার কাটি ঘোরে, শালারা দিশা পায় না!' আলিবক্সকে হাতের ভেতর না পেয়ে লোকটা ঘর তোলপাড় করে, 'শালা বলে রাজা হবার চায়! শালা বেন্নার ব্যাটা, কলেজেত পড়্যা হালুয়া চাষার ব্যাটা আজ ধরাক সরা জ্ঞান করে!' এটা কোন আলিবক্স? চেংটু যার কথা বলেছিলো এ কি সেই লোক? করমালিকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারবে। এই সময় পচার বাপকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হয় করমালি। এদের দেখে হোসেন আলির লাফালাফি আরো বাড়ে, 'গোরু নিব্যা তো হামার কাছে আসছো কিসক? যাও, আলিবক্সের সাথে জোট পাকাও!'

পচার বাপ হাত জোড় করে দাঁড়ায়, 'উগল্যান কথা কয়েন না সরকার! ইবলিসের নেঙ্গুড় ধরমু হামরা? হামাগোরে আখেরাত নাই?'

আলিবক্সকে সরাসরি শয়তানের সঙ্গে তুলনা করায় হোসেন আলির ছটফটানি কমে। কাঠের লম্বা সিন্দুকে স্থির হয়ে বসে আস্তে আস্তে পা নাচায়। 'তোমাগোরে গোরু নিব্যা তো বাথানে যাও। ওটি মানুষজন আছে, হিসাব নিকাশ করা নাগবো না?'

ধপ করে মেঝেতে বসে পচার বাপ হোসেন আলির পা চেপে ধরে। 'হুজুর, আপনে হামার ধর্মের বাপ! হামি বেন্ন্যা মানুষ আট শতাংশ জমিও নাই বাবা! আর বছর খরার সময় দশ শতাংশ জমি বেচ্যা খালাম। গোরু না থাকলে হামাক জমি বর্গা দিবো কেটা? উপাস কর্যা মরমু বাপ, পরিবার ছেলেপোল নিয়া উপাস করা লাগবো! হামার গোরুবাছুর, বলদটা না পালে হামি মর্যা যামু বাপো!'

জ্যাঠার এইসব কাকুতি মিনতি করমালি চুপচাপ দেখছিলো। হঠাৎ সে করলো কি, ২ হাত জ্যাঠার ২ বগলের নিচে রেখে হ্যাঁচকা টানে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলো। পায়ের ওপর থেকে পচার বাপের জোড়াহাত সরে যাওয়ায় হোসেন আলির শরীরের ওজন একটু কমে এবং ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় বসে বসেই সে একটু টাল খায়। অপেক্ষাকৃত হাল্কা শরীরে পচার বাপকে সে বকে, 'তোমরা কোটে কোটে গোরু ছ্যাড়া দিয়া রাখো, কার ভিউ খিলাও, মানষে ত্যক্ত হয়া গোরু নিয়া এটি দিয়া গেছে। সরকারী খোঁয়াড়, সরকারেক ট্যাকসো দিয়া তোমরা গোরু নিয়া যাও, কান্দাকাটি করো কিসক? পচার বাপ এখন ফ্যাচফ্যাচ করে কাঁদে, 'না সরকার! গোরু বাছুর হামার গোলের মদ্যে বান্দা আছিলো। ধুনট হাটোত থ্যাকা হামি লিজে শিকল কিন্যা লিয়া আসছিলাম বাপো, আতোত শিকল খুল্যা গোরু নিয়া আসছে! হামার গোরু—।'

রাগে হোসেন আলি উঠে দাঁড়ায়, 'জমিত মুখ না দিলে মানষে খালি খালি তোমার গোরু নিয়া খোঁয়াড়ত দিবো? হামি মানুষ পাঠায়া তোর গোরু চুরি কর্যা নিয়া আসছি? মুখ স্যামলা কথা কস, শালা শয়তান বুড়ো!'

'না হুজুর! হামি ঐ কথা কই নাই।' দ্বিগুণ বেগে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করতে করতে পচার বাপ তার বিবৃতি সংশোধন করে, 'না হুজুর! হামি বুড়া মানুষ, মুখ্যু জাহেল মানুষ, বেন্না মানুষ—কথা কবার পারি না হুজুর! হামাক মাপ করেন!'

শিথিল কথাবার্তা বলার পক্ষে তার বার্ধক্য বা মূর্খতা বা অন্ত্যজ শ্রেণীতে তার অবস্থানের কৈফিয়ৎ হোসেন আলি গ্রাহ্য করে না। এই অবিশ্বাস জানাবার উদ্দেশ্যে সে বিকটভাবে চ্যাচায়, 'বুড়া, এক পাও তোর কবরের মদ্যে, তাও তুই মিছা কথা কস! তোর আল্লা-রসুলের ভয় নাই? তোর আখেরাত নাই?' আল্লা, রসুল ও আখেরাতের প্রসঙ্গ এনে হোসেন আলি নিজেই একটু নরম হয় এবং হঠাৎ করে বলে, 'চলো বাথান মুখে চলো। দ্যাখা যাবো কার গোরু এটি কিসক আসে!

২৯

'দ্যাখেন, লোকটা খুব গরিব। গোরু না পেলে একেবারে পথে বসবে। বেচারার গোরুগুলো'—আনোয়ারের অনুরোধ শেষ হতে না হতে হোসেন আলি রাজি হয়, 'গোরু তো তাঁই পারেই। তা ধরেন আইন একটা আছে, জরিমানা দিয়া খোঁয়াড় থ্যাকা গোরু খালাস করা লাগে।'

'জরিমানা?'

'সরকারী আইন। জরিমানার আট আনা গওরমেন্টের। আর আট আনার দুই আনা যাঁই গোরু নিয়া আসে তার। তারপরে ধরেন—।'

'জরিমানার ভাগ গভমেন্টকে দিতে হয়?'

'তো কি? আনোয়ারের অজ্ঞতা দেখে হোসেন আলি অবাক, 'মানুষ খাজনা দেয়, ট্যাকসো দেয়, জরিমানা দেয়, দণ্ড দেয়,—তবে না গওরমেন্ট চলে। শিক্ষিত মানুষ হয়া আপনে বোঝেন না?'

পচার বাপ, করমালি ও ফকিরের লোকজন আসছে ওদের পেছনে পেছনে। পচার বাপের ফোঁৎ ফোঁৎ কান্না কখনো বাড়ে, কখনো কমে। ওদের বাঁদিকে এবার মস্ত গমের জমি। গমগাছের বাড়ন দেখে পচার বাপ ও করমালি মুগ্ধ। অভিভূত পচার বাপের কান্নার স্বস্তিকর বিরতি ঘটে। রাত্রে ভালো করে বুঝতে পারেনি, আনোয়ার এখন চরটা ভালো করে দেখে নিচ্ছে। লোকবসতি খুব কম, বেশির ভাগ ফসলের জমি। কোথাও কোথাও ধান কাটা হয়ে গেছে, কিছু কিছু লোক ইঁদুরের গর্তে হাত দিয়ে ধান সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত, গর্তে হাত রেখে তারা আনোয়ারকে দ্যাখে। হাঁটতে হাঁটতে নদী হঠাৎ আড়ালে পড়ে যায়, নদী তখন হাজিরা জানান দেয় স্রোতের কলরবে। আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর জমি নেমে গেছে বেশ নিচুতে। এখানে ভেরেণ্ডা গাছ ও জিগাগাছের লম্বা সারি। নিচে নামবার সময় আনোয়ার প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো, হোসেন আলি ওর হাত ধরে সামলে নেয়। নিচে কেবলি বালু, মাটি এখনো

জমাট বাঁধেনি, বহুকাল মাটির নিচে ডুবে থাকার পর বছর দুয়েক হলো চরটা গতর তুলেছে। কোনো কোনো জায়গায় বালুর ওপর পানির ঢেউয়ের দাগ এখনো মুছে যায়নি। অনেক দূর পর্যন্ত গাছপালা নাই, ধু ধু করে বালু দূরে দূরে কাঁটাওয়ালা ঝাউগাছ মানুষের কোমর পর্যন্ত মাথা তুলেছে। এখান থেকে ডাকাত-মারা চর দ্যাখা যাচ্ছে, উঁচু জমির ওপর ফের ভেরেণ্ডা ও জিগাগাছের সারি দিয়ে শুরু হয়েছে ঐ চরের সীমানা। হোসেন আলির এক সঙ্গী বলে, 'আর তিন চারটা বর্ষা গাঙ যদি টাল্টিবাল্টি না করে তো ধারাবর্ষার সাথে ডাকাত-মারা চর একত্তর হয়া যাবো।'

হোসেন আলি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুমোদন করে, 'এখনি তো একটা চরই ঠেকে। সাত আট বছর আগেও এই জায়গাত জাহাজের খাটাল আছিলো কেউ বুঝবার পারবো?'

পচার বাপ পা ফেলছে খুব জোরে জোরে। বালুর ওপর হাঁটা কঠিন, লোকটা তবু অনেকটা সামনে চলে গেছে। ডাকাত-মারা চরের বাথান দ্যাখা যাচ্ছে, খড়ের চালার নিচে সারি সারি গোরু, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা! পুরনো চরের শক্ত মাটিতে উঠলে আনোয়ার গোরু বাছুরের গায়ের গন্ধ পায়। হোসেন আলি পচার বাপকে ডাকে, 'এই বুড়ার ব্যাটা, এক কাম করো। তোমার গোরু আগে খুঁজ্যা বাইর করো, না পারো তো ঐ যে খোঁয়াড়ের সরকার আছে তার কাছে পুছ করো। জরিমানা যা হয় দিয়া গোরু নিয়া যাও।'

পচার বাপ নতুন উদ্যমে কাঁদে, 'ট্যাকা তো দিব্যার পারমু না বাপ! আপনাগোরে পায়ের তলাত পড়্যা আছি, দয়া হামাক করাই নাগবো!' কাঁদুক আর কথা বলুক, পচার বাপের পায়ের গতি কিন্তু অব্যাহত থাকে।

আনোয়ার এবার একটু শক্ত করে বলে, 'টাকা নিলে এদের ওপর জুলুম করা হবে।'

'আপনার তো গাঁওত বাস করেন নাই। ইগল্যান বেন্ন্যা জাতের স্বভাব জানেন না। মাথার উপরে লাঠির ডাং না মারলে শালারা কোমরের গেরো খুলবো না। আপনার দাদা, আপনার বাপের দাদা হলে ঠিকই বুঝলোনি। না হলে তারা সম্পত্তি করব্যার পারে? ধারাবর্ষার অর্ধেক আছিলো আপনার দাদার জোত, আপনার লাকান ভালো মানুষ হলে তাঁই কিছু করব্যার পারলোনি?'

সুযোগ পেয়ে হোসেন আলি তাকে ভালোই ল্যাং মারলো। গ্রামের এইসব নিমভদ্দর লোকের বাঁকাচোরা কথার জবার দেওয়া আনোয়ারের পক্ষে অসম্ভব। আবার দ্যাখো, কথাটা বলেই হোসেন আলি লম্বা লম্বা পা ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেলো। করমালি পাশে দাঁড়িয়ে আনোয়ারের কানে প্রায় ফিসফিস করে, 'ভাইজান, হামার জ্যাঠোর মাথা খারাপ হছে। একলা গোরু লিয়া গেলে জ্যাঠোক গাঁয়ের মদ্যে ঢাকব্যার দিবো? ঘাটার উপরে গাবগাছতলাত চেংটু খাড়া হয়া থাকবো না? গোরু জ্যাঠো একলাই নিবো? হামরা?'

বাথানের বাইরে নদীর ধারে বেঞ্চ পেতে আনোয়ারকে বসতে দিয়ে হোসেন আলি বেশ উদার হয়ে যায়, 'বুড়ো মানুষ, আবার আপনে সাথে আসছেন, এখন কি করি, কন তো? আপনের বাপ-দাদা হামাগোরে জন্যে কি না করছে? আপনাকে হামি না করি কেমন কর্যা?' কিন্তু আইনের বরখেলাপ সে করতে পারে না, সেজন্যই তো এতো সমস্যা, 'এখন গওরমেন্টের খোঁয়াড়, জরিমানা না নিয়া গোরু দিলে হামার মুসিবত। দেখি, কিছু মাপসাপ করব্যার পারি নাকি!'

আনোয়ারকে বসিয়ে রেখে হোসেন আলি বাথানে ঢোকে, সঙ্গে পচার বাপ। আনোয়ারও সঙ্গে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলো, হোসেন আলি বাধা দেয়, 'আপনে বসেন। বাথানের মদ্যে খালি গোবর আর চোনা, হাঁটবার পারবেন না।' তার লোকজন এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে আনোয়ারের পক্ষে ভেতরে যাওয়া অসম্ভব। করমালি এর মধ্যে কোত্থেকে ঘুরে এসে বসে পড়ে আনোয়ারের পাশে। নিজেদের গ্রামে হলে তার পাশে করমালি কিন্তু কিছুতেই বসতে পারতো না। আনোয়ার আরো অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করে, 'কি মনে হচ্ছে?'

'জ্যাঠোর জরিমানা হবো মেলা। তিনটা গোরু—দ্যাড়শো ট্যাকা, আবার শিকল দিয়া ব্যান্দ্যা থুছিলো, তার জরিমানা পনরো ট্যাকা, তালা লাগাছিলো, তার দশ টাকা। কতো হলো? দুইশো ট্যাকার উপরে হলো না?'

'না। পৌনে দুশো। শিকল-তালা লাগাবার জন্য আবার আলাদা জরিমানা?'

পচার বাপের সঙ্গে হোসেন আলি এসে পড়লে করমালি উঠে দাঁড়ায়। হোসেন আলি পাশে বসতে বসতে বলে, 'দণ্ড হছে পুরা একশো পঁচিশ টাকা।'

পচার বাপ এবার হামলে কাঁদছে, গোরু ওর পাওয়া গেছে ২টো, বকনাটার কোনো পাত্তা নাই। কি সুন্দর বকনাটা তার, আর কটা মাস গেলে গাভীন হতো। আল্লা! তার একি বিপদ! 'আল্লা! আল্লাগো!'

'তা গোরু তুমি সামলাবার পারো না, কান্দো কিসক? তা একদিক থ্যাকা ভালোই হছে', হোসেন আলি সান্ত্বনা দেয়, 'ঐ গোরুটা থাকলে তো পঞ্চাশ ট্যাকা বেশি দণ্ড দেওয়া লাগতো।'

'দুটো গোরুর জন্য আপনার হিসাবে জরিমানা হয় একশো টাকা। আর পঁচিশ টাকা কিসের?' আনোয়ার প্রায় চার্জ করার মতো করে বললে হোসেন আলি কৈফিয়ৎ দেয়, 'যার জমির ফসল গিলছে তাক ক্ষতিপূরণ দেওয়া লাগবো!'

'জমির ফসল খেলো কার? এ তো আপনারা ওর তালা আর শিকলের জরিমানা ধরেছেন।'

আনোয়ার এই নিয়ে ঝামেলা বাধাতে পারে ভেবে পচার বাপ এবার তার হাত চেপে ধরে, 'এটি বিবাদ করেন না বাবা! হামার গোরু বড়ো বজ্জাত। কার ভিউয়েত মুখ দিয়ে, কার কতো লোকসান করছে আল্লাই জানে!' কোমরে বাঁধা লাল রঙের কাপড়ের থলি বার করে ১ টাকার ১৪টা নোট ও কিছু রেজকি হাতে ঢেলে সে হোসেন আলির হাতে দেওয়ার চেষ্টা করে, 'ট্যাকা পনেরোটা নিয়া হামার গোরু নিয়া দেন বাবা!'

ঐ টাকা হোসেন আলি ছুঁয়েও দ্যাখে না, 'শোনো, পুরাপুরি একশো ট্যাকা দিয়া গোরু নিয়া যাও। এই চ্যাংড়াক নিয়া আসছো। মানী মানষের ব্যাটা, মানী মানষের ভাইগ্না, পঁচিশ ট্যাকা মাপ কর্যা দিলাম।'

১০০ টাকার কথায় পচার বাপ আর্তস্বরে কাঁদে, কাঁদতে কাঁদতেই সে জানায় যে তার সারা জীবনের সঞ্চয় সে নিয়ে এসেছে, ২০ টাকার বেশি ১টি পয়সাও তার কাছে নাই। হোসেন আলি পরামর্শ দেয়, তাহলে ঐ ২০ টাকা নিয়ে সে বাড়ি চলে যাক, ৮৫ টাকার কমে গোরু দেওয়া যাবে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে নানারকম কান্নাকাটি, গালাগালি ও টানাহ্যাঁচড়া চলে। আনোয়ার বিরক্ত হয়ে নিচে নতুন চরে এসে নদী দ্যাখে। পচার বাপ শেষ পর্যন্ত ৬৭ টাকা দিয়ে তার বলদ ও গাইয়ের দড়ি হাতে পায়। আনোয়ারকে ডেকে হোসেন আলি বলে,

'আপনে সাথে আসছেন, লোকসান কর্যা গোরু দিলাম।' করমালিকে সে মাত্র ৪০ টাকার বিনিময়ে তার গোরু দেওয়ার প্রস্তাব করে। 'তুইও গোরু নিয়া যা। না হয় ৩৫ ট্যাকাই দে। বড়ো মানষের ব্যাটাক সাথ কর্যা আসছস, কি করি? দেওয়াই লাগে। কিন্তু রশিদ দিবার পারমু না। সরকারী আইন, কড়ায়গণ্ডায় ট্যাকা পরিশোধ না করলে রশিদ দেওয়া হবো না।'

করমালির প্রতিক্রিয়া বড়ো উদ্ধত, 'ট্যাকা কোটে সরকার? ট্যাকা নাই।' তার রাগ ঝাড়ে সে পচার বাপের ওপর, 'যাও, গোরু লিয়া বাড়ি বিলা ঘাটা ধরো। ট্যাকা লিয়া তুমি গোরু লিছো, হামাগোরে সাথে তোমার সাথ কি?'

গোরু ২টো পেয়ে পচার বাপ তার বকনা ও ৬৭ টাকার শোক ভুলে যায়, একবার সে হাত বুলায় তার বলদের গায়ে, মুখে ও মাথায়, একবার সে এঁটুলি বেছে দেয় তার গাইয়ের পিঠ থেকে। তার ধৈর্য ছিলো না। নদীর কিনার ধরে সে রওয়ানা হলো বাড়ির দিকে। হেঁটে হেঁটে একেকটা চর পাড়ি দেবে, মাঝে মাঝে নদী পার হবে খেয়ানৌকায়। বেলা থাকতে রওয়ানা হলো, আগামীকাল দুপুরবেলার আগেই গাইবলদ নিয়ে বাড়ি পৌঁছবে।

আনোয়ার পড়ে গেছে মহা ফ্যাসাদে। নৌকায় আর কতোদিন? ৩দিন তো হয়েই গেলো। এখানে বাস করাটা কাজে লাগলেও না হয় কথা ছিলো। লাভটা হচ্ছে কি? করমালির মাথায় কি করে ঢুকেছে যে টাকা পয়সা না দিয়েই সে গোরু নিয়ে যেতে পারবে। তার গোরু তো বটেই, গ্রামের সকলের গোরু এই হোসেন ফকিরের নৌকায় ভরেই সে নিয়ে যাবে। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে সে নোতুন খবর আনে, 'পুবের দিকে খালি এক কথা। —শালা হোসেন ফকিরেক জবো করো। বোঝেন না, শালা টাসকা ম্যারা গেছে। হামাক কিছু করার পারে না, আপনে আছেন তো! উঁই মনে করছে, বিপদ এ্যাটা হলে আপনেক ধর্যা উঁই পার হবো! শালা মানুষ চেনে নাই! আনোয়ার একটু আঁচ করে বৈ কি? সেদিন মূলবাড়ি ঘাট থেকে নৌকায় ধারাবর্ষা চরে আসার সময় কোনো কোনো চরে বা খেয়ানৌকায় গোরু নিয়ে অনেককে যেতে দ্যাখা গেছে। জরিমানা ট্যাক্স দিয়ে নিজের গোরু নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলো। পরদিন থেকে এদের সংখ্যা বেশ কম। পরশু তবু কয়েকজন গেলো, কাল গোরু নিয়ে কাউকেই যেতে দ্যাখা যায়নি। করমালি এর কারণ ব্যাখ্যা করে, 'দুইটা দিন দ্যাখেন না! আলিবক্স ভাই ঢোল দিছে, হোসেন আলিক জরিমানা দিলে তার পরিণতি ভালো হবো না!'

সেদিন সন্ধ্যার আগে ঘাটে এলো হোসেন ফকির নিজেই। হাতে গামছা-বাঁধা বাটি। ইয়াসিন সায়েবের ভাগ্নে, আকবর সায়েবের ছেলে, সর্বোপরি তার এককালের মুরুব্বি বড়োমিয়ার মেজোনাতি এখানে এসে নৌকায় বাস করে, এই দুঃখে সে কাতর। পাঙাস মাছের ঝোল ও পাবদা মাছের চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেতে খেতে আনোয়ার তার আক্ষেপ শোনে। ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা একটু একটু দোলে, আনোয়ার ভাত খায় আর হোসেন আলির মুখে তার বাবার গল্প শোনে। আজ থেকে ৩০ বছর আগে তার বাবা এখানে এসেছিলো রেডক্রসের সাহায্য বিলি করতে, আনোয়ারের তখন জন্মই হয়নি, তার বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দুধ, কাপড়, দেশলাই—এইসব বিতরণ করেছিলো এই হোসেন আলি ফকির। বাবার এই ধরনের জনসেবামূলক তৎপরতার কথা আনোয়ার কোনোদিন শোনেনি। মনোযোগ দিয়ে এইসব শুনতে শুনতে হোসেন আলির ওপর বিরাগে একটু নরম প্রলেপ পড়ে। সেইসব দিন আর নাই, সেইসব মানুষই বা কোথায়?—হোসেন আলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,

এখন হলো চোর ডাকাতের রাজত্ব। আগের রাত্রে ডাকাত-মারা চরে বাথানের উত্তরপ্রান্তে কারা এসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ডাকাতদের অবশ্য হটানো গেছে। কিন্তু পালাবার মুহূর্তে বাথানের একদিকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ায় ৮/১০টা গোরু পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। তবে হোসেন বীরদর্পে জানায় যে, সে একটুও ঘাবড়ায়নি। খয়বার গাজীর কাছে লোক পাঠানো হয়েছে, এমএনএ সায়েবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। গওরমেন্টের খোঁয়াড়—এর লাভের ভাগ মন্ত্রী গবর্নর পর্যন্ত ভোগ করে।—এখানে আগুন লাগাবার পরিণতি যে কি ভয়াবহ হবে শালারা বুঝতে পাচ্ছে না। এমএনএ কি মন্ত্রী যদি মিলিটারি পাঠিয়ে দেয় তো পুবপাড়ের ঐসব ডাকাতদের লাশে যমুনায় স্রোত মন্থর হয়ে উঠবে।—তবে তার দুঃখ ঐ গোরুগুলোর জন্য। আল্লার অবলা জীব, ঘরে আগুন লাগলে দড়ি কি শিকল ছিঁড়ে পালাবার উপায় নাই যাদের, তাদের যারা পুড়িয়ে মারে, আল্লার গজব থেকে তাদের রেহাই নাই।—এই আক্ষেপ শুনে আনোয়ারের মাথা দপ করে জ্বলে ওঠে। শালার ভণ্ডামির সীমা নাই। বদমাইসটার মুখের ওপর পাঙাস মাছের ঝোল-মাখা ভাত উগরে দিতে পারলে আনোয়ারের মাথার আগুনটা নেভে। তা আর হয়ে ওঠে না। কয়েক বেলা ধরে করমালির রান্না করা ছোটো মাছের প্রচণ্ড ঝাল চচ্চড়িতে-ঝলসানো জিভে পাঙাস মাছের ঝোল মোলায়েম প্রলেপ দিয়ে আরামে গলা দিয়ে নেমে যায়। খালি বাটি নিয়ে হোসেন আলি চলে গেলে করমালি বলে, 'শালা ফকিরের ব্যাটার জান সিটক্যা গেছে! মনে করছে আলিবক্স ভায়ের সাথে আপনের সাঁট থাকবার পারে। তাই আপনেক এতো খাতির করব্যা নাগছে!'

আনোয়ার ভাবে আলিবক্সের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা কল্পনা করে বলে হোসেন আলি তাকে সমীহ করে কেন? হোসেন আলি ফকিরকে অনুরোধ করে এবং ভয় দেখিয়ে গ্রামের গোরুগুলো উদ্ধার করার জন্য তার উদ্যোগ কি সাহসের পরিচয় নাই?—লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আনোয়ার নৌকার নিচে পানির ছলাৎ ছলাৎ স্রোত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার স্রোতের আওয়াজেই তার ঘুম ভাঙে, নৌকা মনে হয় চলতে শুরু করেছে, নিচের ঢেউ সে বুঝতে পাচ্ছে সারা শরীর জুড়ে। আনোয়ার উঠে বসে, 'করমালি, কি ব্যাপার?'

'ভাইজান, ভয় পায়েন না। ঘোড়ার ডাক শোনেন? ভাটি বিল্যা মেলা করছি, বাথান পার হয়া জাহাজের খাটাল ধর্যা গেলে রাত এক পহর থাকতে পুবপাড় পৌঁছা যামু।'

'তুমি যাচ্ছো কোথায়?'

'পুব পাড়। নদীতে বান আলে সিন্দুরিয়া চরত ওঠা যাবো।'

'বান আসবে কেন? নাকি হোসেন আলির লোক ধরতে আসছে?'

'কোটে হোসেন আলি? ঘোড়ার ডাক শুন্যা ব্যামাক মানুষ ঘরের মদ্যে সান্দাছে!'

ব্যাপারটা কি? গোরুর দুঃখে পাগল হয়ে করমালি কি ঘোড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছে? করমালির ব্যাখ্যা আরো বিভ্রান্তিকর; নদীর অনেক ভেতর থেকে সমবেত ঘোড়ার ডাক শোনা যাচ্ছে। সে তার বাপদাদার কাছে শুনেছে যে, নদীতে ভয়ঙ্কর বান ডাকার আগে যমুনা নদীর ঘোড়ার পাল উচ্চরবে হ্রেষাধ্বনি দিয়ে সবাইকে জানান দিয়ে যায়। করমালির কানের বিভ্রম দেখে আনোয়ার কঠিন গলায় নির্দেশ দেয়, 'পাগলামি করো না। নৌকা তীরে ভেড়াও।'

দেখতে দেখতে নৌকা চলে এসেছে বাথানের ধারে। বাধান পেরিয়ে যাবার পর দ্যাখা গেলো আরেকটি ছিপ নৌকা আসছে তাদের দিকে। ঐ নৌকা থেকে কে ডাকে, 'করমালি!'

করমালি সাড়া দিলে ফের শোনা যায়, 'আনোয়ার ভাই আছে? ঘোড়ার ডাক শুন্যা ভয় পাবার মানা কর।'

করমালি আস্তে করে বলে, 'আলিবক্স ভাই আসছে। আপনের সাথে কথা কবো।' ছিপনৌকা কাছাকাছি আসতে আনোয়ারদের নৌকা প্রবলভাবে দুলে ওঠে। আনোয়ার 'আরে গেলো! গেলো!' বলে চিৎকার করে ওঠে, ছিপনৌকা থেকে তাদের নৌকায় লাফিয়ে-পড়া লোকটি ২ পায়ের ভার এদিক ওদিক করে ব্যালান্স সামলে নিলো। লুঙি-পরা ও চাদর-জড়ানো যুবকের কালো মুখে চাঁদের হলদে আলোর আভা, কিন্তু তার চেহারা অস্পষ্ট। আনোয়ারের সারা শরীর টলে ওঠে: হোসেন আলির আতিথেয়তা গ্রহণের অপরাধে করমালি কি তাকে সমর্পণ করছে আলিবক্সের হাতে? আলিবক্স কি তাকে শ্রেণীশত্রু হিসাবে চিহ্নিত করবে?

ছইয়ের ভেতর ঢোকার আগেই আলিবক্স বলে, 'করমালি, নাও ফেরা, ধারাবর্ষা মুখে চল।' নৌকা উল্টোদিকে চলতে শুরু করে, কিন্তু করমালি খুব উদ্বিগ্ন, 'ভাইজান, বান আসলে পরে নাও ভাসায়া নিবো। ধারাবর্ষাত গেলে তখন হোসেন ফকিরের বাড়িত ওঠা ছাড়া আর বুদ্ধি থাকবে না। ঐ বাড়িত গেলে আপনের জান থাকবো?'

'আরে বলদ, মাঘ মাসোত নদীত বান আসে? তুমিও কি টাউনের ভদ্দরনোক হয়া গেলা?'

'ঘোড়ার ডাক শোনেন নাই? নদীর মদ্যে কতো ঘোড়া ডাক পাড়ে শুনছেন?'

'আমাক ঠসা ঠাওরাস? তামাম নদীর মদ্যে ঘোড়া খালি তড়পাতিছে। বিপদ দেখলে যমুনার ঘোড়া ডাকে। বিপদ কি যমুনা একলাই করে? মানুষ মানুষের মুসিবত করে না?'

আনোয়ারের পাশে বসে বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বিড়ির গোড়াটা এগিয়ে ধরে করমালির দিকে। তারপর বলে, 'কালই আপনার সাথে কথাবার্তা কওয়ার নিয়ত করছিলাম। শালা হোসেন ফকিরের মানুষ এমন করয়া ধাওয়া করলো, আগে আমরা অগো বলটা বুঝবার পারি নাই। পরে এমন অবস্থা হলো কি বাথানেত আগুন দিবার না পারলে আমরা আর পলাবার পারি না।' আনোয়ার একটা সিগ্রেট দিলে সেটা ধরিয়ে আলিবক্স তার আসার উদ্দেশ্য জানায়, 'আজ আপনের সাথে নিরিবিলি কথা কওয়া যাবো। ঘোড়ার ডাক শুনছে, হোসেন ফকিরের বাপের ক্ষমতা হবো না যে বার হয়া আমাক ধরব্যার আসে! ব্যামাক মানুষ আজ ঘরের মদ্যে!'

আলিবক্সের মুখেও যমুনার গভীর ভেতর থেকে ঘোড়ার ডাক শোনার কথা শুনে আনোয়ার বিগড়ে যায়, হায়রে, এই আমাদের বাম রাজনৈতিক কর্মী। এর সঙ্গে নিরিবিলি কি পরামর্শ করবে? জিগ্যেস করে, 'আপনি মাদারগঞ্জ কলেজের ছাত্র?'

'হ্যাঁ। তা শোনেন—।'

'বি এসসি পড়েন না? সায়েন্স পড়েন, লেফট পলিটিক্স করেন আর এইসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন?'

'বিএ পড়ি। এইচ এছ ছি পাস করছিলাম সাইন্স নিয়া। মাদরগঞ্জ কলেজে বি এছছি নাই, তাই বিএ পড়তিছি?'

তার আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গেলো বলে নয়, এইচ এস সি ও বি এসসি কথাগুলো আলিবক্স যথাক্রমে এইচ এছ ছি ও বি এছছি উচ্চারণ করায় আনোয়ারের কান শিরশির করে। তার

মূল প্রশ্ন বা কান শিরশির করাকে আলিবক্স তোয়াক্কা করে না। 'আপনারা ঢাকাত বস্যা বড়ো বড়ো কথা কন আর পার্টি ভাঙেন। মতিন ভাই আমাগোরে এলাকায় আসলো, দল থ্যাকা ভালো ভালো কয়েকটা কর্মী আলাদা হয়া গেলো। এরকম করলে কাম হয়? জনগণতান্ত্রিক কন আর স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক কন, উপনিবেশ কন আর আধা উপনিবেশ কন, গাঁয়ের মদ্যেকার শয়তানগুলাক শ্যাষ করবার না পারলে কোনো কাম হবো না।

'সে তো বটেই। কিন্তু এইসব শয়তানের মুরুব্বিরা তো থাকে ঢাকা ইসলামাবাদ।'

'গাঁয়ের মানুষ তো অগোরে চেনে না। আর এই শয়তানগুলা শ্যাষ হলে মুরুব্বিরা খাড়াবো কোন জমির উপরে? আমরা পুবের চর এলাকাত সব একসাথে শয়তান খতমের কামে নামছি!'

'পার্টি ভাগ হলো তো একসঙ্গে কাজ করছেন কি করে?'

'একজোট না হয়া আমাগোরে পথ আছিলো না ভাইজান। সার্কেল অফিসার আর তশীলদার,—এই দুই শয়তান মানুষের জীবন অতিষ্ঠ কর্যা তুলছিলো। এটার মদ্যে খাজনা বসায়, এই মানষেক জমি থ্যাকা ভিটা থ্যাকা উচ্ছেদ করে, এ্যাক ধর্যা থানাত দেয়, অক ধর্যা বেগার খাটায়। তশীলদার চাকরি করতিছে ছয় বছর, এর মদ্যে জমি করছে একুশ বিঘা, পুকুর নিছে দুইটা। মানষে একজোট হয়া এমন দাবাড় দিছে যে দোনো শয়তান পাছার কাপড় তুল্যা দৌড় মারছে ময়মনসিং মুখে!'

'এরা তো আবার ফিরে আসবে। দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে আসবে। পুলিশ ব্যাটালিয়ন নিয়ে আসবে। তখন?'

'তা আসবো। মিলিটারিও আনবার পারে। তা এই সার্কেল অফিসার কন আর তশীলদার কন আর এমএনএ মন্ত্রী যাই কন না এদের ভরসা হলো আপনাগোরে ওটি খয়বার গাজী, আমাগোর এলাকাত হামিদ তালুকদার, মাদারী আখন্দ। আবার খয়বার গাজীর বারো আনা ভরসা হোসেন ফকিরের উপরে! এই শয়তানগুলাক শ্যাষ করবার পারলে এমএনএ, মন্ত্রী কারো ক্ষমতা নাই যে এই এলাকায় যমুনার পুব পশ্চিম কন্ট্রোল করে!'

'তখন পুলিস মিলিটারি ক্যাম্প করবে আপনার পাশের এলাকায়, না হলে পাশের জেলায়!'

'তা ঠিক।' আলিবক্স আনোয়ারের সঙ্গে একমত হয়েও হতাশ হয় না, 'তাই তো কই কি সোগলি যার যার এলাকায় কাম করলে শয়তানগুলাক শ্যাষ করা যায়, তখন পুলিস মিলিটারি পাত্তা পাবো কোটে?'

আলিবক্স বেশি সরলীকরণ করছে, আনোয়ার এ ব্যাপারে নিশ্চিত। কিন্তু ঠিক কিভাবে ওর যুক্তি খণ্ডন করবে তাও বুঝতে পারে না। শ্রেণীশত্রু খতম করার প্রোগ্রাম তো ওদেরও আছে, কিন্তু গ্রামে কিছু লোক মেরে ফেললেই কি রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে পড়বে? এদের দাপট যতোদিন থাকবে এই রাষ্ট্র কাঠামোতে ততোদিন কোনো চিড় ধরানো অসম্ভব। কিন্তু— আনোয়ার কিছু বলার আগেই আলিবক্স প্রস্তাব করে 'আনোয়ার ভাই, আপনে আজই বাড়িমুখে রওয়ানা হন। কাল সকালবেলা পৌছবেন! তালপোঁতাত করমালির বাড়িত যারা চেংটু, বান্দু শেখ, করমালি—এদের সাথে কথাবার্তা কন। অন্তত পঞ্চাশ ষাটজন মানুষ সাথে কর্যা চেংটুক আপনে কালই ধারাবর্ষা মুখে পাঠায়া দেন। পশ্চিম থ্যাকা আসবো অরা, পুব থ্যাকা আসবো আমরা। হোসেন আলির বাথান পরশু রাতের মদ্যেই আমরা দখল কর্যা

শালাক বক্তা কবর দেমো!' তার ওপর এতোটা আস্থা স্থাপন করায় কৃতজ্ঞতায় আনোয়ার অবিরাম কথা বলতে শুরু করে, 'আমাদের পশ্চিম পাড়ে মানুষ নিজেরাই স্পনটেনিয়াসলি এগিয়ে আসছে। দলের জন্য অপেক্ষা করেনি—।'

'পার্টি না থাকলে মানুষের উৎসাহ শেষ পর্যন্ত থাকবো না। আপনে আজই মেলা করেন, রাতে রাতে নাও বায়া যাবো করমালি। যমুনার মদ্যে ঘোড়ার ডাক শুন্যা মানুষ খুব পাইছে। আসলে এটা বানের নিশানা নয়, শীতের সময় বান হবে কেন? বিপদ তো মানুষও করবার পার, এখন সকলের একজোট হওয়া দরকার। মানষেক এইভাবে কওয়া লাগবে।'

'ঘোড়ার ডাক আপনি শুনলেন কোথায়?' আলিবক্সের আস্থাভাজন হওয়ায় আনোয়ার তাকে সরাসরি জিগ্যেস করে, 'মানুষ কি বলে, কি শোনে, আপনি পার্টির লোক হয়ে চট করে তা মেনে নেন কি করে?' মানুষের কুসংস্কার বাড়তে সাহায্য করলে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় কাদের? রিঅ্যাকশনারিয়া তো এইসব ক্যাপিটাল করে এক্সপ্লয়েট করে।'

'কি যে কন!' আনোয়ারের অবিশ্বাসে আলিবক্স ক্ষুব্ধ হলো, 'শোনেন! যমুনার ভেতর অনেকদিন বাদে বাদে ঘোড়ার ডাক শোনা যায়। তাহলে বুঝবেন চর এলাকায় বড়ো কোনো বালা মুসিবত আছে।

আমার বাপদাদারা আছিলো শঙ্করপুরের মানুষ।—কায়েমি চর আছিলো গো! হাই ইসকুল, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, সাহাদের টিনের গুদাম, গাছগাছালিসব আছিলো। সেই চর যেদিন ভাঙা শুরু হলো তার দিন পনেরো ষোলো আগে নদীর মধ্যে কম কর্যা হলেও দুইশো আড়াইশো ঘোড়া একসাথে উরুজোগার দিয়া ডাকছে।'

'আপনি জানলেন কি করে? আপনি শুনেছেন?'

'আমার বাপে কছে, দাদায় কছে। চাষা মানুষ হলে কি হয়, বাপ আমার পাঁচ ওকতো নামাজ পড়ছে! তাঁই মিছা কথা কওয়ার মানুষ আছিলো না!' নামাজ পড়ার সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ হওয়ার সম্পর্ক কি? নামাজ পড়তে পড়তে খয়বার গাজীর কপালে কড়া পড়ে গেছে, মিথ্যা কথা বলা তার স্বভাব। তাহলে?—কিন্তু তর্ক করার সময় পাওয়া যায় না। 'ভাইজান, বাথানের গোরুবাছুর ঘোড়ার ডাক শুনবার পাছে!' করমালি ভয়ে চিৎকার করে উঠলে বিপুল সংখ্যক গোরুবাছুরের সমবেত ও এলোমেলো হাম্বা রব শুতে পায় সবাই। আনোয়ার পর্যন্ত ভয় পায়, 'কি ব্যাপার, বাথানে কি আগুন টাগুন লাগলো?'

'আরে নাঃ। শোনেন না? হাজার ঘোড়া ডাক পাড়ে। গোরুবাছুর ভয় পাবো না? করমালিকে নৌকা ভেড়াতে বলে আলিবক্স লাফিয়ে ডাঙায় নামে, রওয়ানা হয় উল্টোদিকে, যেতে যেতে করমালিকে তাড়া দেয়, 'তরা কর্যা যা। কাল ব্যায়না চেংটুর সাথে কথা কয়া পাছাবেলার মদ্যে মানুষজন নিয়া মেলা করবু।'

'আরে আপনি এখানে নামছেন কেন?' আনায়ার চিৎকার করে, 'এখানে নামছেন কেন? হোসেন ফকিরের মানুষ টের পেলে—।'

একটু এগিয়ে আলিবক্স তার ছিপনৌকায় উঠতে উঠতে চিৎকার করে, 'করমালি, কিনার দিয়া যাস। ভয় করিস না, কিছু হবো না।' আলিবক্সের ছিপনৌকা মেঘের ছায়ার মতো নদীর আড়াআড়ি গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেলো।

ধারাবর্ষার চরও দেখতে দেখতে সরে যাচ্ছে। হোসেন আলির বাড়ির দিক থেকে কে যেন চিৎকার করে আজান দিচ্ছে। আবার কোত্থেকে ভেসে আসছে হাঁস-মুরগির আতঙ্কিত

ডাক। ব্যাপার কি? চরের সবাই কি ঘোড়ার ডাক শুনতে পাচ্ছে? নদীর পানির দিকে কান পেতে আনোয়ার ঘোড়ার ডাক শোনার জন্য একাগ্রচিত্ত হয়। নাঃ! শীতকালের যমুনা ছলাৎ ছলাৎ করে বয়ে চলে। এমনকি ডাঙার শঙ্কা ও আর্তরব নদীকে এতোটুকু স্পর্শ করতে পাচ্ছে না।

করমালি দাঁড় বাইতেই থাকে। ডাঙা থেকে ভেসে আসা দূরের আওয়াজ, 'ক-র-মা-লি, নাও ভিড়াও! চরের পশ্চিম মুড়াত নদীর মদ্যে ঘোড়ার ডাক শোনা যায়। হোসেন ফকির খবর দিছে, আকবর সায়েবের ব্যাটাক তার ঘরত যাবার কছে! বান আলে বিপদ হবো। ও ক-র-মা-লি!'

আনোয়ার স্থির গলায় নির্দেশ দেয়, 'করমালি, তাড়াতাড়ি চলো। সকালের আগেই মূলবাড়ি ঘাটে পৌঁছা চাই।'

৩০

এখন পর্যন্ত পচার বাপের কোনো খবর নাই। গোরু নিয়ে হেঁটে রওয়ানা হলেও ৪টে চর ও ৩টে খেয়ানৌকা পার হতে দেড় দিনের বেশি সময় লাগার কথা নয়।

জালাল মাস্টার বলে, 'তোমরা রাস্তায় তাকে দ্যাখো নাই?'

না। আনোয়ার ও করমালি তো এসেছে রাত্রে, রাত্রিবেলা কি দেখবে? তাদের রাস্তাও ছিলো আলাদা। হঠাৎ মুখ খোলে নবেজউদ্দিন, 'চাচামিয়াকে অরা অশিদ দিছিলো?' কিসের রশিদ?—নবেজউদ্দিন কথা বলে কম, এতো লোকের সামনে কিছু বলা তার পক্ষে আরো কঠিন। সবাই মিলে তার ওপর হামলে পড়লে সে জানাতে বাধ্য হয় যে জরিমানা নিয়ে গোরু ফেরত দেওয়ার সময় হোসেন ফকির একটা কাগজে সই করে, সেই কাগজে কিসব লেখা থাকে। সেটাই হলো হোসেন আলির দেওয়া ছাড়পত্র। চরের মাঝে মাঝে কয়েকটা চেক-পোস্ট বসানো হয়েছে, পশ্চিমে আসার পথে প্রধান চেকপোস্টটি চালুয়াবাড়ি খেয়া-ঘাটের পোয়া মাইল দক্ষিণে। রশিদ দ্যাখাতে না পারলে ওরা ধরে নেয় যে এই গোরু হোসেন আলির বাথান থেকে চুরি-করা। গোরু কেড়ে নিয়ে তখন ওদের নিয়ম মতো শাস্তি দেয়।

আনোয়ারের মনে পড়ে, 'তাইতো!' হোসেন ফকির বলছিলো সম্পূর্ণ জরিমানা না দিলে রশিদ দেওয়া হয় না। তবে পচার বাপ রশিদ নিলো কি-না খেয়াল করিনি।'

নবেজউদ্দিন অবাক হয়, 'জরিমানা ব্যামাক না নিয়াই গোরু দিলো?' জালাল মাস্টার মাথা নাড়ে, 'রশিদ নেওয়া উচিত ছিলো।'

'কিসের রশিদ?' করমালি তার বাড়ির ভেতর থেকে পান এনে সকলের সামনে রাখে। 'শালা মনে হয় তশীলদার হছে। গোরুচোরের অশিদ নেওয়া লাগবো কিসক? পুবের মানুষ সব খাড়া হয়া আছে, পশ্চিম থ্যাকা হামরা একবার যাই তো পুবের মানষের সাথে একত্তর হয়া হোসেন ফকিরের গুষ্টি সাফ করা হবো। কি কন আনোয়ার ভাই?'

কিন্তু কথাটা আনোয়ার কিভাবে পাড়বে বুঝতে পাচ্ছে না। ভোরবেলা বাড়ি পৌঁছে চেংটুকে সব বলা হয়েছে, মনে হয় তার কাছে আলিবক্স খবর পাঠিয়েছে আগেই। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর করমালির বাড়ির সামনে জালাল মাস্টারের চাষের জমিতে মিলিত হওয়ার বুদ্ধি চেংটুর, এখানে প্রায় ২৫/৩০ জন লোক এসেছে তারই কথায়। কিন্তু জালালউদ্দিনকে আসতে বললো কেন? আজ রাত্রে এতোগুলো মানুষের ধারাবর্ষা যাত্রার প্রস্তাব জালাল মাস্টার নাকচ করলে এদের সবাইকে রাজি করানো মুশকিল হবে। লোকটাকে এরা সবাই মানে।

'হামরা ইগল্যান বুঝি।' হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ায় বান্দু শেখ, 'তাঁই পাদে, তাঁই কোতে, গু ছিটায় কলাপাতে।' প্রবাদটি ব্যাখ্যাও করে সে, 'হাগে খয়বার গাজী, গু ছিটায় হোসেন আলি। ধরলে দুয়োটাকই ধরা লাগে।'

নাদু পরামাণিক প্রতিবাদ করে, 'খয়বার গাজী থাকে এটি, আর চর হলো তোমার পাঁচ ছয় কোশ ভাটিত। আসুন্দ্যা কথা কস কিসক?'

এই সময় কাঁদতে কাঁদতে আসে ১১/১২ বছরের ১টি ছেলে। ময়লা গেঞ্জি গায়ে, গেঞ্জিটা তার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সের লোক পরলে ফিট করতো। ছেলেটির সবুজ ডোরা-কাটা লুঙি হাঁটুর কাছে তোলা। চোখের পানিতে তার খড়ি-ওঠা কালো গালে কাদার পলেস্তারা পড়েছে। এ হলো পচার বাপের নাতি, পচার ৩ কি ৪ নম্বর পয়দা। নোনা পানিতে জড়ানো বিলাপ থেকে তার দুঃখের কারণ বোঝা কঠিন। মনোযোগ দিয়ে তার বিলাপ ও বাক্য শুনে করমালি চিৎকার করে, 'কি কস? কেডা কলো? তাঁই কোটে?' করমালি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে পচার বাপের বাড়ির দিকে যায় এবং তাকে অনুসরণ করে জমায়েতের আর্ধেক লোক। কয়েক মিনিটের মধ্যে চেংটু গিয়ে তাকে নিয়ে আসে। কি খবর?— পচার সম্বন্ধী তার জামাইকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে যে চালুয়াবাড়ি চরে কাশবনের ভেতর পড়ে রয়েছে পচার বাপের লাশ। পচার সম্বন্ধীর জামাইকেও চেংটু ধরে এনেছে। এতোগুলো মানুষের সমবেত জেরার জবাবে সে জানায় যে গতকাল তার শ্বশুর গিয়েছিলো চালুয়াবাড়ি হাট, নৌকা থেকে পচার বাপের লাশ দেখে ভয়ে বাড়ি ফিরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

করমালি কাঁদে আর হায় হায় করে, পচার বাপের বাড়িতে সাবালক পুরুষমানুষ কেউ নাই। পচা তার জোয়ান ছেলেকে নিয়ে গেছে পশ্চিমে, খিয়ার অঞ্চলে। সে কি এখানে? বাঙালি নদী পেরিয়ে ৭ ক্রোশ পথ হেঁটে করতোয়া, করতোয়ার ওপার বগুড়া থেকে ট্রেন চেপে যেতে হয়। তালোড়াও যেতে পারে, কাহালুও যেতে পারে। এমন কি দুপচাচিয়া আদমদিঘিও হতে পারে। খিয়ার এলাকায় এখন ধান কাটার ধুম। ১০/১৫ দিন আগে তার গ্রামে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নাই। এখন খরচাপাতি করে কে? করমালির ঘরে কাল সকালের ভাত পর্যন্ত নাই। বাঁশের খুঁটি কেটে পচার বাপ তার সারা জীবনের সঞ্চয় সব নিয়ে গেলো গোরু খালাস করতে। তার পয়সা বেশির ভাগই বেঁচে গেলো, কিন্তু ভোগে লাগলো না। কোমরের টাকার খুতি কি লাশের সঙ্গে গাঁথা থাকবে?

'অতো চিন্তা করিস কেন?' জালাল মাস্টার ধরা গলায় আশ্বাস দেয়, 'আমরা কি জীবিত নাই? পচার বাপ তোর জ্যাঠা হয়, আমার কি কেউ নয়? সে কি দীর্ঘকাল আমার জমি বর্গাচাষ করে নাই? এখন লাশ আনার বন্দোবস্ত করা লাগে। মোসলমানের লাশ, মাটির মধ্যে না যাওয়া পর্যন্ত তার উপরে আজাব হবো।' জালালউদ্দিনের আশ্বাসবাণী শুনে করমালি

গলা ছেড়ে কাঁদে, 'ও জ্যাটো! জ্যাটো গো! ডাকাতগোরে ঘর থ্যাকা তুমি গোরু আনবার গেলা কিসক গো?' তার এই প্রশ্নবোধক বিলাপে ওদিকে তার বাপের ঘর ও পচার ঘরে প্রবলরকম কোলাহল শুরু হয়। হাত ও পাছায় ভর করে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে, প্রায় গড়িয়ে চলে আসে করমালির বাপ। বাতে পঙ্গু লোকটি খুব শব্দ করে কাঁদতেও পারে না, কেবল ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করে। নিহত ভাইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেকদিন থেকে খারাপ। তার বিলাপেও এই তথ্য উপস্থিত। যেমন তাদের বাপ মরলে তার জমির ১০ আনা ভাগ দখল করে নেয় পচার বাপ। এই নিয়ে মামলা করতে গিয়ে তার ২১ শতাংশ জমি বিক্রি করে করমালির বাপ আজ নিঃস্ব চাষা। নামমাত্র দামে তার সব জমি কিনে নিলো আফসার গাজী। আবার মামলায় পচার বাপকে সাহায্য করে খয়বার গাজী। বগুড়ার হামিদ মুক্তারের কাছে এমনকি চিঠিও নাকি দিয়েছিলো পচার বাপের কাছ থেকে কম পয়সা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। ফ্যাসফ্যাসে গলায় করমালির বাপ বিলাপ করে, 'মিয়াভাই গো! খয়বার গাজীর বুদ্ধি নিয়া হামার সব্বোনাশ করল্যা, আবার তারই মানষের হাতোত তুমি জান দিলা গো!' আনোয়ার উসখুস করে, আজকের দিনটা করমালির বাপ এইসব প্রসঙ্গ না তুললেই পারে। আবার দ্যাখো, করমালির মামা মন্তাজ কানা সায় দেয় ভগ্নীপতির কথায়, 'মানুষটা বড়ো ভয়পাদুরা আছিলো গো। গাজীগোরে কাকো দেখলে তাই ভয়ে সিটকা লাগছে, আবার তাঁই মরে খয়বার গাজীর ইশারায়!' এই ধরনের কথাবার্তা জালালউদ্দিন পছন্দ করে না, 'আন্দাজে কথা কওয়া কি ভালো? খয়বার মিয়ার হাত আছে, তুমি জানো?' সে পরামর্শ দেয়, 'থানায় একটা এজাহার করা লাগে, আজই করলে ভালো হয়।'

'থানা পুলিস সব খয়বার গাজীর খুতির মদ্যে।' বান্দু শেখ পুলিস সম্বন্ধে তার মতামত জানালে জালালউদ্দিন নতুন পথ খোঁজে, 'তাহলে ডিসি সায়েবের বরাবর একটা পিটিশন করা হোক। পিটিশনের কপি দেওয়া লাগবো এসপি সায়েবের কাছে। এসপি সায়েবের অফিসের হেড ক্লার্ক আফাজ মিয়া আমার ছাত্র না হলেও তমিজের ভায়রা ভাই। তমিজ আমার সাক্ষাৎ ছাত্র, এখনো দ্যাখা হলে পায়ে হাত দিয়া সালাম করে।'

প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে জালালউদ্দিনের প্রভাব প্রতিপত্তির বর্ণনা থামিয়ে দেয় কানা মন্তাজ, 'উগলান সবই খয়বার গাজীর কেনা।'

'মারলে খয়বার গাজীর মানষেই মারছে। হোসেন অলিও তো তারই চাকরি করে।' চেংটুর কথা থেকে মনে হয় এই ব্যাপারে সে একেবারে নিশ্চিত, 'এখন সোগলির যাওয়া লাগে চালুয়াবাড়ি। সোগলি না গেলে চাচার লাশ দিবো না'

'চলো, আর বুদ্ধি নাই, চলো।'

চেংটু হাত তুলে সবাইকে থামায়, 'পদুমশহর, কর্ণিবাড়ি, দরগাতলাত খবর দেওয়া হছে। জোড়গাছাত খবর দিবো বান্দু, ঘাটাল থ্যাকা নাও নিয়া আসবো কাবেজ। পচার বাপের লাশ না পাওয়া গেলে যাওয়া লাগবো ধারাবর্ষা। হোসেন ফকিরের সাথে বোঝপড়া হবো। চলো!'

সবাই হৈ চৈ করে ওটে, 'চলো। লাঠি সড়কি নেওয়া লাগবো না?'

'লাগবো না? দাও কুড়াল লাঠি সড়কি বল্লা বঁটি—যাঁই যা পারো ন্যাও।'

'হোসেন ফকিরেব নিব্বংশ করো!'

উত্তেজিত শব্দমালা ক্রমেই তেজী ও দ্রুত হয়। জালালউদ্দিন ভয় পায়, এই মূর্খদের কাণ্ডজ্ঞানের বড়ো অভাব। হোসেন ফকিরের গায়ে হাত তোলার পরিণতি কি হতে পারে এরা

কি আন্দাজ করতে পারছে? আনোয়ারের বিবেচনাবোধে তার আস্থা একটু বেশি, 'আনোয়ার, এতো তাড়াতাড়ি ধৈর্যচ্যুতি ঘটা কি ভালো?'

'কি করবে বলেন? নিরীহ বুড়ো মানুষটাকে মেরে ফেললো, ধৈর্য থাকে কি করে!'

'ভাইজান, আপনের সাথে আলিবক্স ভায়ের কথাবার্তা তো হয়াই গেছে!'

করমালি সামনে এসে বলে, 'আপনে থাকলে হামরা হিরদয়ে বল পাই।'

আনোয়ার দেখছিলো, এতো সিরিয়াস ১টা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, তাকে ১ বার কেউ জিগ্যেসও করলো না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তার কোনো ভূমিকাই নাই। সুতরাং এর পরিণতিতেও তার দায়িত্ব থাকার কথা নয়। দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আনোয়ার লঘুভার হয় বটে, কিন্তু নিজের ভার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের নিচের মাটিও ঝুরঝুর করে সরে পড়ে। করমালির অনুরোধে দাঁড়াবার জায়গাটি ফের জমে শক্ত হয়।

বান্দু শেখ এসে বলে, 'ভাইজান, আপনেক যাওয়াই লাগবো।'

'গেলে তাড়াতাড়ি চলো। তোমার তৈরি হয়ে নাও! রাত হচ্ছে কিন্তু।'

আনোয়ার শুনতে পাচ্ছে যে হোসেন আলি ফকির ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের মেরে পচার বাপের মৃতদেহ ছিনিয়ে আনার সমবেত সংকল্প ঘোষণার চিৎকার বটগাছের শিশির-ভেজা পাতায় সপসপ এবং নিচের শুকনা পাতায় সরসর সাড়া তুলছে। চাঁদের অল্প আলোয় দ্যাখা যায় যে গোটা বটগাছ তার ডালপালা, পাতার বহর, ঝুড়ি, থাম, শিকড় ও ছাদ নিয়ে তিরতির করে কাঁপছে। আর ঐ জীন? না, বটগাছের পুরনো বাসিন্দার কোনো সাড়া নাই, মানুষের সমবেত আওয়াজে টিকতে না পেরে সে শালা নতুন করে উড়াল দিয়েছে অন্য কোথাও। মাটিতে বসে থেকেও আনোয়ারের পা কাঁপে। এটা আর কতোক্ষণ? সকলের সঙ্গে একবার রওয়ানা হলে পায়ের কাঁপন, বুকের কাঁপন কোথায় যাবে! এরকম সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ জীবনে কবার আসে? এইতো, রাত থাকতে থাকতে ৫০/৬০ জন মানুষের সঙ্গে সে রওয়ানা হবে চালুয়াবাড়ি। পচার বাপের হত্যাকারীদের খতম করে যমুনা পার হয়ে ধারাবর্ষা। হোসেন আলিকে ধরে নিয়ে সোজা ডাকাত-মারা চর। বাথানের সব গোরু খুলে দাও, খতম করো হোসেন আলি ফকিরকে!—মনে পড়ে?—একবার নিজের কিষানকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মেরেছিলি, মনে আছে?—এইবার বুঝবি মানুষের হাতে মরতে কেমন লাগে। ধারাবর্ষা থেকে ফিরে এসে ধরে খয়রার গাজীকে। ব্যাটা এখান থেকে কলকাঠি নাড়ো, মানুষের গোরু চুরি করে তার কাছ থেকেই আদায় করো। কারো জমিতে তারা বর্গা করতে না পারে সেই ফন্দি আঁটো? সবাই এসে তোমার পায়ে পড়ুক, তুমি ইচ্ছামতো মানুষের ভিটাটুকু পর্যন্ত কব্জা করে তাকে তোমার গোলাম বানাও!—এইবার? এইতো ভেতর থেকে ভাঙতে শুরু করেছে, ওপরটা আপনাআপনি ধসে পড়তে আর কতোক্ষণ?

'না, আনোয়ারের যায়া কাম নাই।' জালালউদ্দিনের অভিভাবকসুলভ নির্দেশে আনোয়ার এমন ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকায় যে, লোকটা এই আবছা আলোতেও তার তীব্রতা আঁচ করে মুখ ফেরায়। আরো ঠাণ্ডা বাক্যে আনোয়ার তার সিদ্ধান্ত জানায়, 'আমি তো যাবোই।'

চেংটু বলে, 'ভাইজান আপনের যাওয়া হবে না। গোলমাল তো ভালোমতোই হবো, কার বাঁশের ডাং যে কার উপরে পড়বো দিশা পাওয়া যাবো না। ঘাটাও আপনে ভালো কর্যা চেনেন না!'

চেংটুর ওপর সরাসরি রাগ করা যায় না। আনোয়ারের মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়। 'আমি কি বাচ্চা ছেলে? না একটা গাধা যে গোলমাল হলে সামলাতে পারবো না? পথঘাট চিনতে পারবো না কেন?' আনোয়ারের উত্তেজনা চাপা থাকে না, 'তোমাদের বুকে সাহস আছে, আর আমার বুক হলো হাড়ডিমাংসের পিণ্ড?'

'না না ভাইজান! হামি সেই কথা কই নাই। আপনে গেলে আপনাক মানা করে কেটা? আপনে থাকলে হামরা থাকমু আপনার পাছে। আপনে যা করেন, যা হুকুম করবেন, উরুজোগার দিয়া হামরা তাই করমু!'

আনোয়ার বড়ো কাচুমাচু হয়। ছি, ছি! সে কি নেতৃত্বের জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে? চেংটু তাকে ভাবলো কি? সে যা বলবে এরা তাই করবে—সে এরকম চাইবে কেন? এ পর্যন্ত এদের কোনো নির্দেশই তো সে দেয়নি। সে শুধু ওদের সঙ্গে থাকবে, সহকর্মী হয়ে তাদের কাজে অংশ নেবে। এতে চেংটু আপত্তি করে কেন?

চেংটু তার হাত ধরে একরকম হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় করমালির ঘরের সামনে গোরুর জাবনা খাওয়ার গামলার পাশে। মোলায়েম ও নিচু গলায় সে মিনতি করে, 'আপনে এটি থাকলে হামাগোরে একটা কাজ হয় ভাইজান! আর কেউ ঐ কাম পারবো না। আলিবক্স ভাইও কয়া দিছে, আপনি ছাড়া আর কারো উপরে ঐ কামের ভার যেন না দেই!'

তাকে তাহলে থাকতে হচ্ছে আলিবক্সের নির্দেশে?—আনোয়ারের বুক একটু সঙ্কুচিত হয়, সেখানে জানান দিয়ে যায় চিনচিন ব্যথা। এর চেয়ে চেংটুর নির্দেশ মানা অনেক সহজ। তবে এখানে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের কথা শুনে আনোয়ার আর কথা বলতে পারে না। কি?—না, সবাই চরের দিকে চলে গেলে আনোয়ার যেন খয়বার গাজীর ওপর চোখ রাখে। ওরা যে অনেক শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে এ ব্যাপারে চেংটু নিঃসন্দেহ। এসে ধরা হবে খয়বার গাজীকে। এবার তার চূড়ান্ত বিচারের পালা। আনোয়ার লক্ষ্য রাখবে, খয়বার গাজী যেন গ্রাম ছেড়ে পালাতে না পারে। কিভাবে?—চেংটু ভয়ে ভয়ে হাসে, 'ধরেন আপনেও বড়োলোকের ঘরের ছেলে, তাঁইও বড়োলোক!' চেংটুর কথাটা বুঝতে পারায় তাকে বড়োলোক বলা সত্ত্বেও আনোয়ার রাগ করে না। ২জনেই ভদ্দরলোক বলে আনোয়ারের পক্ষে খয়বারের গতিবিধি অনুসরণ করা একটু সহজ। তার গতিবিধি সন্দেহজনক হলে আনোয়ার তাকে ফুসলে ফাসলে, মিথ্যা কথা বলে, দরকার হলে নিজেদের বাড়িতে রেখে দেবে। খয়বার গাজীর বিচার করতে পারলে একটা কাজের মতো কাজ হয়। এর অনেকটা নির্ভর করছে আনোয়ারের ওপর।

৩১

সকাল বেলা আনোয়ার মন্তাজ কানার কাছে প্রতিদিন খবর পায়, খয়বার গাজী বহাল তবিয়তে আছে। তবে পরশু থেকে বিকালবেলা বৈঠকখানার উঁচু বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে

সূর্যাস্ত দ্যাখা স্থগিত রেখেছে। আজ সন্ধ্যায় করমালির ঘরের সামনে মন্তাজ কানার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আনোয়ারের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিলো, বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত ৮টা বাজলো। এসে দ্যাখে ভেতর-বাড়ির চওড়া বারান্দায় বসে খয়বার গাজী ও জালালউদ্দিন সেমাই খাচ্ছে। আনোয়ারকে দেখে খয়বার গাজী মুখ ভরে হাসে, 'বাবাজী, আমার ওদিক আর গেলা না তো! চরের মধ্যে গেছিলা শুনলাম। আমি জানলে আফসারকে সাথে দিতাম, এখন হাঁসের মৌসুম, আফসারের হাতের টিপ খুব ভালো।' চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সে তোলে আনোয়ারদের চর এলাকার জমিজমার কথা, 'জমাজমির তদবির করা্যা আসলা? নিজে না দেখলে জমি বেহাত হয়ে যায় বাবা। আকবর ভায়েক কত কছি, চরের মধ্যে আপনাদের জমি উঠতিছে, দাখিলা দ্যাখেন, খতিয়ান দ্যাখেন। আকবর ভাই গাও করে নাই। তা তুমি জমি দ্যাখাশোনা করতিছ, জালাল মিয়া কলো। ভালো। করাই লাগবো। দিন কি সবসময় একরকম যায়?'

সম্পত্তির প্রতি আনোয়ারের আকর্ষণের দিকে লোকটা বিশ্রী ইঙ্গিত দিলো। ব্যক্তি-মালিকানার প্রতি মোহ আনোয়ারের কাছে অরুচিকর ও নিচু ধরনের প্রবৃত্তি বলে মনে হয়। তবে রুচির চেয়েও জরুরি দরকার থাকে। আনোয়ারের কোনো কথা কি আচরণে খয়বার যেন সন্দেহ করতে না পারে। এখন তার কোনো কথার প্রতিবাদ করা ঠিক নয়। মন্তাজ কাল খবর দিলো যে চেংটু, বান্দু শেখ, করমালিরা চালুয়াবাড়ি হয়ে ধারাবর্ষা ও ডাকাত-মারা চর পৌঁছতে পৌঁছতে শখানেকের বেশি লোক তাদের সঙ্গী জুটে গেছে।

আবার বড়োচাচীর সঙ্গে দ্যাখা করার জন্য খয়বার ভেতরের ঘরে গেলে জালাল মাস্টার আনোয়ারের কানের কাছে মুখ এনে তার ভয়ের কথা জানায়, 'সমাচার খুব খারাপ। ডাকাত-মারার চরের বাথান শুনলাম লুটপাট হছে। হোসেন আলির বাড়িত নাকি আগুন ধরায়া দিছে। কও তো বাপু, এটা কি মনুষ্যত্ব?'

'হোসেন আলিও শুনি লুটপাট চুরিচামারি করেই গোরুর বাথান করেছে!'

'আস্তে বাবা, আস্তে। খয়বার ভাই শুনবো। এতো বড়ো নামী মানুষটা। কাল থ্যাকা চিন্তায় চিন্তায় শরীরখান অর্ধেক করা্যা ফালালো!'

জালালউদ্দিনের কাছেও আনোয়ার সাবধান হওয়ার চেষ্টা করে, 'খয়বার চাচার ভয় কি?'

'আমিও তো সেই কথা কলাম।' জালাল মাস্টার হাই তোলে, হাই তুলতে তুলতে কথা বলায় তার শব্দ বাঁকা হয়ে যায়, 'তবে ধরো বিষয় সম্পত্তিআলা মানুষ তো, ওদিককার চরের দশ আনার মালিক তাঁই নিজে, দুশ্চিন্তা একটু হবোই।'

ঘুমে তার চোখ ঢুলে আসছিলো, এমন সময় খয়বার গাজী 'জালাল মিয়া, শুনছেন?' বলে এই ঘরে ঢুকলে জালালউদ্দিন সোজা হয়ে বসে।

'ধারাবর্ষার দুই পাশেই নদীর মধ্যে ঘোড়ার ডাক শোনা গেছে। কন তো কি বিপদের কথা!'

আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'আপনি কোনোদিন ঘোড়ার ডাক শুনেছেন?'

'না বাবা। চরের দিকে আমরা যাইই না, আগে যখন বয়স আছিলো তখন শিকার টিকার করবার গেছি। তাও বছরের মধ্যে ঐ একবারই। গত দশ বছর ওদিক যাওয়া হয় নাই।' সে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, 'কি মুসিবতের কথা কন তো? তা এখন কি বান হবার পারে?'

তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে জালালউদ্দিন, 'বান কোনো কথা নয়। বড়ো ধরনের বালা মুসিবত, সংকট, বিপদ, আপদ, দুর্যোগ, বিপর্যয় সামনে থাকলে যমুনার মধ্যে দেড়শো দুইশো ঘোড়া সংকেত দেয়।' আনোয়ারের আস্থা অর্জনের জন্যে জালালউদ্দিন প্রস্তুতি নেয়, 'ইতিহাসে আছে—।'

ইতিহাস ভূগোলের চর্চা আঁচ করে খয়বার গাজী ফের বড়োচাচার ঘরে চলে গেলে আনোয়ার বলে, 'নদীর ভেতর ঘোড়া চরে বেড়ায়, এ কথা ইতিহাসে থাকবে কেন?'

'অরে নদী ছিলো কোথায়?' ইতিহাস চর্চার উৎসাহে জালালউদ্দিনের চোখ থেকে ঘুম চলে যায় কোথায়, 'দেড়শো পোনে দুইশো বছর আগে ওখানে গভীর অরণ্য। যমুনা তখন একটা খাল, কোম্পানীর ম্যাপে পাবা যমুনা ক্যানেল।'

'বেশ তো, ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের কোর্স চেঞ্জ হলে যমুনা নদী বড়ো হলো। কিন্তু এর সঙ্গে ঘোড়ার ডাকের সম্পর্ক কি?' আনোয়ারের সংশয় জালালউদ্দিনকে অনুপ্রেরিত করে তোলে। সে তখন যমুনা নদীর ভেতরকার হ্রেষাধ্বনির ঐতিহাসিক সূত্র বিশ্লেষণ করে। কিরকম?—ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে মজনু শাহের অনুসারীদের অনেকেই আশ্রয় নেয় যমুনা খালের পশ্চিমে। আহত মজনু শাহ গঙ্গা পার হয়ে পালাবার সময় মারা যায় বিহারের কোনো গ্রামে। তার মৃত্যুর মুহূর্তে সমস্ত ঘোড়া একসঙ্গে চিৎকার করে চরম অশুভ সংবাদটি তার অনুসারীদের জানাবার চেষ্টা করেছিলো।

'কোথায় বিহার, কোথায় মজনু শাহ্, আর এখানে তার অশ্ববাহিনী তা আঁচ করে কিভাবে?' আনোয়ারের সংশয়ে জালালউদ্দিন আরো মরিয়া হয়ে উঠে, 'আরে বাবা, সায়েন্সেই তো বলে, ইতর প্রাণীর কোনো কোনো বোধ মানুষের অপেক্ষা বহুগুণ প্রবল।' শক্ত শক্ত কথায় যমুনার ভেতর হ্রেষাধ্বনির ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে জালালউদ্দিনের উৎসাহ দেখে আনোয়ারের চোখের পলক পড়ে না।

খয়বার গাজী খাবে বলে মুরগি জবাই করা হয়েছিলো। রান্নাবান্না শেষ হলে খেতে খেতে রাত ১১টা। জালালউদ্দিন অবশ্য বিদায় হয়েছে আগেই। খাওয়ার পর খয়বার গাজী বেরিয়ে তার বাড়ির দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে যাত্রা করায় আনোয়ারের খটকা লাগে; লোকটা কি পালাবার তালে আছে? খয়বার গাজীর পাশে লাঠি হাতে ২ জন লম্বা চওড়া কিষাণ। পেছনে জবুথবু নাদু পরমাণিক।

'চাচা, কোথায় যাচ্ছেন?' আনোয়ারের ডাকে খয়বার চমকে উঠে। মাথার ওপর কাঁঠালগাছের প্রসারিত ডাল। বাঁদিকে ভাঙা দালানের স্তূপ। দালানের পাশে খড়ের গাদার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ১টা সাদা গোরু। তার ল্যাজ নাড়ার আওয়াজ ঝাপশা হয়ে কানে আসে, সেই মৃদু আওয়াজে নীরবতা আরো গাঢ় হয়। আবার কাঁঠালগাছে কোনো দোয়েলের ছোট্টো ডানার ঝাপটানি প্রতিধ্বনিত হয় প্রতিটি কাঁঠাল পাতায়। ঝটপট ও শিরশির ধ্বনিতে জায়গাটির পরিধি কমে।

'তুমি?' খয়বার গাজী তার দিকে ভালো করে তাকায়, 'যাই বাবা, একটু হাঁটাহাঁটি কর‍্যা আসি।'

গ্রামের প্রান্তে গাবগাছতলায় পাহারা দিচ্ছে বান্দু শেখ। তবে এই বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পালাতে পারলে সে পৌঁছে যাবে পদুমশহরে তার ছেলের খালু-শ্বশুরের বাড়ি। ভোরবেলা উঠে ভাগবে বগুড়ায়। না, তাকে পালাবার সুযোগ দেওয়া হবে না। কাল পরশুর

মধ্যে চেংটু, আলিবক্স, করমালি, বান্দু শেখ ফিরে না আসা পর্যন্ত এই দায়িত্ব থেকে আনোয়ারের মুক্তি নাই।

ইঙ্গিতে খয়বার গাজীকে একটু আড়ালে নিয়ে আনোয়ার নিচু গলায় বলে, 'আপনি আজ কোথাও যাবেন না। আমাদের বাড়িতেই থাকেন।'

'কেন?' ১টি মাত্র শব্দে খয়বার গাজী সারা জীবনের আতঙ্ক শতকরা ১০০ ভাগ প্রকাশিত হয়। তার মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে কাগজের মতো। তার চোখ থেকে প্রাণ উধাও হয়, নিশ্বাসের জরদার গন্ধ পরিণত হয় কর্পূরের গন্ধে।

আপনি যাবেন না, এখানেই থাকেন। অবস্থা ভালো না।'

'তুমি জানো?'

আনোয়ার কিছুই না বললে হঠাৎ করে খয়বার তার হাত ধরে ফেলে, 'বাবা, এই বেন্ন্যার বাচ্চারা গাঁয়ের মধ্যে ভদ্দরলোক থাকবার দিবো না। আজ লাগছে আমরা পিছনে, কাল ধরবো তোমার চাচাক, পরশুদিন তোমাকেও ছাড়বো না।'

খয়বার গাজীর সঙ্গে ঘরে ফিরে দ্যাখা গেলো বড়োচাচা আনোয়ারের ঘরেই আরেকটি পালঙ এনে বিছানা করার জন্যে মন্টুকে নির্দেশ দিচ্ছে। তার মানে খয়বার যে রাতটা এখানেই কাটাবে তা আগেই ঠিক করা হয়েছে। কাঁঠালতলায় কিন্তু লোকটা এমন একটা ভাব করলো যে আনোয়ারের পরামর্শেই সে এই বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। এর মানে কি? আনোয়ার আরো সতর্ক হয়। খয়বার আলাদা বিছানা করতে দেবে না, 'না না ভাইজান এতো রাতে ঝামেলা করবেন না। এতো বড়ো পালঙ, আমি এর এক কিনারে পড়্যা থাকমু। আমার আবার শোয়ার সাথে সাথে ঘুম, এক ঘুমে ফজর।'

বড়োচাচা, আনোয়ার, এমনকি মন্টুও বুঝতে পারে, খয়বার গাজী একা এক বিছানায় শুতে সাহস পাচ্ছে না। এমন হতে পারে যে, আনোয়ারের ওপর তার ভরসা হয়েছে, দরকার হলে তাকে জড়িয়ে ঘুমাবে। আবার আনোয়ারকে যদি প্রতিপক্ষের লোক বলে ধরে নিয়ে থাকে তাহলেও অনোয়ারের আড়ালে থেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে পারবে।

ইজি চেয়ারে বসে বড়োচাচা হাই তোলে। মন্টু এসে পরিষ্কার অড় লাগানো বালিস ও লেপ নিয়ে এলে বড়োচাচা উঠে দাঁড়ায়, 'রাত মেলা হছে। শুয়া পড়ো।'

৩২

বিপুল সংখ্যক ঘোড়ার সমবেত ডাক শুনে আনোয়ারের ঘুম ভাঙে, মনে হয় নৌকার ওপর সে শুয়ে রয়েছে, নদীর ভেতরকার অপরিচিত কোনো আওয়াজে নৌকা দুলছে। ভালোভাবে চোখ মেললে ভুলটা ভাঙে। কোথায় যেন অনেক লোক একসঙ্গে কথা বলছে। কারা? বেলা কি অনেক হয়ে গেছে? মন্টু আজ আগেই উঠে পড়েছে, হঠাৎ ওর এতো সুমতি? আনোয়ার

বরং আরেকটু ঘুমিয়ে নেবে। চোখ বন্ধ করতে না করতে একটা মোটা গলা সশব্দ ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ে কানের ওপর, 'আরে আছে, এটি আছে! নিজের বাড়ি বাদ দিলে তামাম গাঁওয়ের মদ্যে তার থাকার জায়গা এই বাড়ি ছাড়া আর কোটে আছে গো?'

আনোয়ারের মাথা থেকে ঘুমের শেষ তলানিটুকু পর্যন্ত উবে যায়। বুক ধক করে ওঠে, খয়বার গাজী কোথায়?—পাশে চাদর ঠাণ্ডা, পায়ের কাছে এলোমেলো গোটানো লেপ, সেটাও ঠাণ্ডা। মানে অনেকক্ষণ আগেই সে চলে গেছে। টেবিলে হ্যারিকেন নেভানো। বাইরের দিককার দরজা বন্ধ। ভেতরের বারান্দায় যাবার দরজা দ্যাখার জন্য আনোয়ার উঠে বসলো। দরজা খোলা। কখন খুললো?—শকুনটা এই দরজা দিয়ে উড়ে গেছে! আনোয়ারের এভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা মোটেই ঠিক হয়নি। চেংটু, করমালি, বান্দু শেখ, কানা মন্তাজ—এদের কাছে সে কি কৈফিয়ৎ দেবে? আলিবক্স তো মনে হয় তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনবে।

'খয়বার গাজীক বার কর্যা দ্যাও।' বাইরের সমবেত মানুষের চিৎকার ক্রমে স্পষ্ট হয়, 'কুত্তার বাচ্চা এটি আছে!'

'বার হ শালা, গোরুচোরের সর্দার বার হয়া আয়! তোর গোয়ার মদ্যে আছেলা বাঁশ সান্দায়া দেওয়া হবো, বারা!'

আনোয়ার হয়তো এরকমই চাইছিলো। কিন্তু সত্যি সত্যি এরকম হলে তার করার কি আছে তা বুঝতে পাচ্ছে না।

বড়োচাচা এসে বসলো আনোয়ারের খাটে। চোখেমুখ নিদ্রাহীনতার ছাপ। এলোমেলো চুল। চাপা গলায় বলে, 'অনেক মানুষ। একশো দেড়শোর কম নয়। সব চরের মানুষ। চরুয়ারা ডাকাতি ছাড়া কিছু বোঝে না। ফেরোশাস পিপল! কি করি এখন?'

আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'খয়বার চাচা কোথায়?'

'কি জানি?'

'বড়োচাচা, খয়বার গাজী সায়েবকে না পেলে এরা যাবে না। কোথায় গেছে?'

'জানি না বাবা।'

'ঘর থেকে বেরিয়েছে ভেতরের দরজা খুলে। আপনি বুঝতেই পারলেন না?' আনোয়ারের কথার আঁচে বড়োচাচাও উত্তপ্ত হয়, 'তোমার পাশেই তো শুয়ে ছিলো, তুমি টের পেলে না?'

এই বাড়ির লোকজনের সাহায্য ছাড়া খয়বার গাজী বেরুতেই পারে না। তার মানে আনোয়ারের ওপর এদের আস্থা নাই; থাকলে তাকে না জানিয়ে খয়বারকে পার করে দেয়? এদের অবিশ্বাস অর্জনকে কৃতিত্ব বলে ধরে নিয়ে আনোয়ার তৃপ্তি পায়; এরা বুঝতে পেরেছে যে আনোয়ার আসলে এদের লোক নয়, সে আছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে। এই তৃপ্তি তার রাগের উত্তেজিত স্তরটাকে মুছে ফেলে, পরিণত ও অভিজ্ঞ স্বরে সে জানতে চায়, 'লোকজন বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লে কি করবেন?'

'ঢুকলে তো কাউকে রেহাই দেবে না' বড়োচাচা ভয়ে কাঁপছে, কাঁপুনির ফলে তার কথা সোজাসুজি বেরুতে পারে না।

ওদিকে সমবেত ধ্বনি ক্রমে উচ্চকণ্ঠ হয়। বড়োচাচার সঙ্গে আনোয়ার নাশতা খাচ্ছে, মন্টু এসে বলে ২৫/৩০ জন লোক ভাঙা দালানের স্তূপে ওঠার চেষ্টা করায় ইট চুন সুরকি

সব গড়িয়ে নিচে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি ওখান থেকে গড়িয়ে পড়ায় একজনের পা পর্যন্ত ভেঙে গেছে। কয়েকজন এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে খরগাদার সামনে। আনোয়ার অবাক হয়ে ভাবে লোকজন এখন পর্যন্ত ভেতরে হামলা করে না কেন? একি তাদের ভয়? না বিবেচনাবোধ?

ধীর লয়ে ও নিচু গলায় বড়োচাচী অভিযোগ করে, 'খয়বার মিয়া মানুষ সোজা নয়। গোলপুকুরের বারো আনা মাছ যায় রশিদের ভোগে। রশিদকে উস্কানি দেয় কে? খয়বার গাজী নিজে।' মহিলার মৃদুস্বরের বিলাপ অব্যাহত থাকে। আনোয়ারের বাপচাচার আপন চাচাতো ভাই এই রশিদ মিয়া। তার বাপ মরেছে তার দাদা বেঁচে থাকতে। সে সম্পত্তি পায় কোন আইনে? অথচ, খয়বারের প্ররোচনায় পড়ে নিজের রক্তের সম্পর্কের ভাইদের হেনস্থা করার মতো ফন্দিই সে করে।—'দ্যাখো না বাবা, এই খয়বার মিয়ার জন্যে চর এলাকায় আমাদের কোনো জমি উঠলে আমরা তার দখল পাই না, যমুনার মদ্যে কোনো জমি উঠলেই ভোগ করবে খয়বার মিয়া!' জমি দখলের ব্যাপারটা আগে একচেটিয়া ছিলো আনোয়ারের দাদা এবং দাদার বাপের। শ্বশুরবংশের হাত থেকে কাজটা ফসকে গেছে বলে বড়োচাচীর আক্ষেপের আর শেষ নাই। বড়োচাচীর চরিত্র বিশ্লেষণ অবশ্য বস্তুনিষ্ঠ। খয়বার গাজীর ভালো দিকটাও তার ক্ষোভের অন্তর্গত হয়। যেমন, 'মানুষটার একটা বড়ো গুণ, আত্মীয়স্বজন কারো অসুখবিসুখ হলে জান দিয়া খাটে। তোমার বড়োচাচার যেবার নিমুনিয়া হলো, ডাক্তার ডাকা, ওষুধ নিয়া আসা থ্যাকা শুরু কর্যা ঘড়ি ঘড়ি অ্যাসা ওষুধ-পত্র খিলান—সব করছে এই খয়বার মিয়া।' এরই মধ্যে বেলীকে দিয়ে বড়োচাচী হামানদিস্তায় পান ছেঁচে নেয়, পান খায় এবং আঙুলে চুন নিয়ে জিভে ঘষে। 'আত্মীয়স্বজনের মদ্যে তাঁই সহ্য করবার পারে না খালি জালাল মিয়াক। তাঁই সামনে না থাকলে তাক কয় ঘর-জামাই। আর সামনে থাকলে খালি ঠ্যাঙামারা কথা। আবার দ্যাখো, আল্লার কি কাম, জালাল মিয়া না হলে এতোক্ষণ তার জান থাকে? রাতে জালাল মিয়া না আসলে—।'

আনোয়ার এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারে। 'জালাল ফুপা এসেছিলেন? কখন? কতো রাত্রে?'

'ফজরের আজান পড়ার আগেই আসছিলো। নাদুর কাছে খবর পায়া নিজে আসছে।'

বাইরে যাবার জন্যে আনোয়ার এবার উঠে পড়ে। বড়োচাচা আস্তে করে ডাকে, 'আনু, বাবা, খয়বার গাজী হাজার হলেও এই এলাকার একটা মাথা। আমাদের আত্মীয়। তোমার বাপের খুব বাল্যকালের বন্ধু। কথাটা মনে রাখবা। শোনো—।'

আনোয়ার আর দাঁড়ায় না।

বাইরে এতো লোক! আনোয়ারের পা একটু কাঁপে, এরা তাকেও তো ধরতে পারে। ভাঙা দালানের স্তূপের সামনে সে পৌঁছতে কয়েকজন এসে তাকে ঘিরে দাঁড়ায়, 'ক্যাগো? বড়োমানষের ব্যাটা! আসামী কোটে? তার কোটে নুক্যা থুছেন?'

'সরো, সরো! তোমরা কার সাথে কি কও?' কানা মন্তাজ দৌড়ে এসে সবাইকে সরিয়ে দেয়, 'মানুষ না চিন্যা আও করো? হামাগোরে নিজেগোরে মানুষ!' কানা মন্তাজ তাকে নিজেদের মানুষ বলে পরিচিত করায় আনোয়ার অভিভূত হয়ে তার পিঠে হাত রেখে তাকে কাছে টেনে দেয়, 'চেংটু কোথায়? করমালি কোথায়?'

'চেংটু একটা খাঁচা নিয়া গেছে চন্দনদহ বাজার। খাঁচার মদ্যে আফসার গাজীকে ধর্যা আনবো। অনেক মানুষ গেলো, চেংটু কয়, হামি না থাকলে শালাক বস্তাই কব্বার দিবো।' করমালি সম্বন্ধে খবর দেওয়ার আগেই ওরা এসে পড়ে করমালির সামনে। করমালি বসেছিলো কাঁঠালতলায়, মাটির সঙ্গে বাঁশের খুঁটি দিয়ে গাঁথা কাঠের বেঞ্চ, বেঞ্চের ঠিক পাশে, খুঁটির সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে। তার বাঁ পা ভাঁজ করা, ডান পা মাটিতে ছড়ানো। ডান পায়ের লুঙ্গি উরু পর্যন্ত গোটানো। ঐ পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বড়ো বড়ো ৩/৪ টে ফোস্কা, কয়েকটা জায়গায় ফোস্কা ফেটে লাল দগদগে ঘা।

'এ কি? করমালি! পা পুড়ে গেছে?'

'পুড়্যা গেলো ভাইজান!' বড়ো বড়ো দাঁতে করমালি হাসতে চেষ্টা করলেও লাল লাল চোখ ও দাঁত-চাপা ঠোঁটের বেড়িয়ে-পড়া অংশে তার কষ্ট আড়াল করতে পারে না। বান্দু শেখ বলে, 'হোসেন ফকির ধাক্কা দিয়া আগুনের মদ্যে ফালায়া দিছিলো!'

'হামিও ছাড়ি নাই।' করমালি হাত দিয়ে তার পা দ্যাখায়, 'এই পাও দিয়াই শালাক লাথি দিয়া আগুনের মদ্যে ফালায়া দিছি। তারপরে সোগলি মিল্যা বাঁশ দিয়া কোবান দিতে দিতে শালার জান কবচ করা হলো।'

করমালির গোঙানি চলতে থাকে, কয়েকজন চিৎকার করে, কৈ? ঐ খানদানি শয়তান কোটে? শালা কোটে সটকালো?'

'আপনারা কয়েকজন আমার সঙ্গে আসেন।' আনোয়ার এদিক ওদিন তাকিয়ে কানা মন্তাজকে ডাকে, 'মন্তাজ এসো, বান্দু চলো। করমালি তুমি বরং বাড়ি যাও, এই পা নিয়ে ঘোরাঘুরি করো না।' একটু থেমে শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সবাইকে নির্দেশ দেয়, 'চলেন। বেশি চ্যাঁচাবেন না। খয়বার গাজী আছে জালাল মাস্টার সায়েবের বাড়ি।'

করমালি চমকে ওঠে, 'মাস্টার সায়েবের বাড়ি?' মনে হচ্ছে তার জ্যাঠার মৃতদেহ দেখতে না পারার বেদনা বা তার পায়ের আঙুল থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুড়ে যাওয়ার কষ্ট ম্লান হয়ে গেছে, 'না ভাইজান, তার বাড়িতে যাওয়া যাবো না।'

সমবেত মানুষ গর্জন করে, 'কিসক?'

করমালি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আনোয়ার বলে, 'কেন?'

'না, তাঁই মানুষটা বড়ো সিধা গো! বিপদে আপদে হামাগোরে সাথে সাথে থাকে। তার বাড়িতে যায়া হামলা করাটা—।'

'জালাল মাস্টার সায়েব কেমন লোক সেটা আমাদের দ্যাখার কথা নয়। তাঁর বাড়িতে এক শয়তানকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন, সুতরাং—।' আনোয়ারের এই কথা ছাপিয়ে ওঠে একটি ভাঙা গলার বাক্য, 'আমরা তো তার কোনো লোকসান করতিছি না। খয়বার মিয়াক নিয়া আমরা চল্যা আসমু। না কি কন আনোয়ার ভাই?'

আলিবক্সকে সামনে রেখে এসে কথা বলতে দেখে আনোয়ারের বুকে ছোট্টো ১টি কাঁটা বাঁধে, এখন বোঝা যাচ্ছে যে এই লোকটির জন্যই এতোগুলো মানুষ সংগঠিতভাবে ঘোরফেরা করছে, হঠাৎ খেপে গিয়ে আনোয়ারদের বাড়ির ভেতর হামলা করেনি। এখন আনোয়ারের বিশেষ কি আর করার রইলো? তবে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা হাল্কা হয়, আলিবক্স থাকলে ঝামেলা অনেক এড়ানো যায়।

'আনোয়ার, বাবা তুমি আকবর ভাইজানের পুত্র হয়া, নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত সুবিবেচক অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও নিজের মানুষের সর্বনাশ করতে আসছো?' জালালউদ্দিনের মিনতির জবাবে একটি নির্লিপ্ত চেহারা তৈরি করার জন্যে আনোয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করে, 'আমার নিজের মানুষ কে? চোর-ডাকাত-রক্ত-চোষারা আমার নিজের মানুষ হতে পারে না।'

খয়বার গাজী বসেছিলো মাথা নিচু করে। তার হাতের সিগ্রেটের মাথায় ছাই জমেছে আধ ইঞ্চিরও বেশি, যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। আনোয়ারের জবাব শুনে ছাই ঝেড়ে সিগ্রেটে সে খুব জোরে টান দেয়, সিগ্রেটের আগুনে আঁচ তার চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠে। কিন্তু তার কথায় সেই আঁচ টের পাওয়া যায় না 'বাবা, যারা নিজেদের মানুষ, তারা নিজেদেরই থাকে। বাপদাদার রক্ত শরীর থ্যাকা বার কর্যা দিবার পারো?' আনোয়ার জানে বাপদাদার রক্ত শরীর থেকে নিষ্কাশন করা অসম্ভব। কিন্তু খয়বার গাজী বলো আর তার নিজের বাপদাদা বলো—, তারা কতোদিন আগে কিভাবে স্বতন্ত্র রক্তপ্রবাহ তৈরি করলা? একটি প্রবল ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের মূল গতিপ্রবাহ পরিবর্তিত হয়। সবার থেকে আলাদা হওয়ার জন্যে তাদের ভূমিকম্পটা ঘটলো কবে?—এসব কথা বলার সময় এখানে নাই। আনোয়ার আরো কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে, 'আপনি হুকুম দিয়ে কতো মানুষ মেরে ফেলেছেন তার হিসাব এই এলাকার অনেকেই জানে। আপনি কয়েক হাজার গোরু চুরি করিয়ে বাথান বানিয়ে রেখেছেন। জমির লোভে আপনি কতো লোককে পথে বসিয়েছেন। আপনি—।'

'জমি থাকলেই জমির সখ থাকে বাবা। তোমার বড়োচাচাক জিগ্যাস কর্যা দেখো, তোমার দাদা পরদাদার জমির হাউস কিরকম আছিলো।' সিগ্রেট হাতে খয়বার গাজী উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালে আলিবক্স বলে, 'গাজীসায়েব, পলাবার চেষ্টা করলে কিন্তু আপনারই লোকসান! এই বাড়ির চার দিকে মানুষ মোতায়েন করা আছে।'

'উনাকে নিয়ে আপনারা কোথায় যাত্রা করবেন?' জালাল মাস্টার জানতে চাইলে আলিবক্স হাসিমুখে জবাব দেয়, 'আপনিও সঙ্গে চলেন না। কাছেই, আপনাগোরে এলাকার মধ্যেই।'

খয়বার গাজী কিন্তু আলিবক্সের দিকে ফিরেও দ্যাখে না। সে সম্বোধন করে জালালউদ্দিনকে, 'আমি ভয় পাই না। আনোয়ার আছে, যতোই পাগলামি করুক, রক্তের সম্পর্ক তো একটা আছে। ভদ্দরলোকের ঘরের শিক্ষিত ছেলে, চাচার সাথে কতো পাষাণ হবার পারে? জীবনে অন্যায় করি নাই। আমার আল্লা ভরসা।'

দরজার বাইরে এসে খয়বার গাজী থমকে দাঁড়ায়। আনোয়ার কিংবা আল্লার শরণাপন্ন হওয়া থেকে বিরত হয়ে সে তাকায় আলিবক্সের দিকে, 'বাবা আমি কি দোষ করলাম? চরের মধ্যে কে কি করে, আমার কি দোষ? বুড়া বয়সে আমাক বেইজ্জত করেন কেন?'

আলিবক্স আস্তে করে হাত রেখে খয়বারের পিঠে, 'ভয় পান কেন? আজ আপনার বিচার হবো। বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে আপনাক আমরা ইজ্জত কর্যা বাড়ি পৌঁছাইয়া দিমু।' সে ডান হাত দিয়ে খয়বারের বাম হাত ধরে সামনে পা বাড়ায়।

জালালউদ্দিনের বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে মস্ত বড়ো একটা বাঁশের খাঁচা। এটা কখন এলো? আলিবক্স বলে, 'আফসার গাজীকে পাওয়া যায় নাই।'

এর মধ্যে জালাল মাস্টারের বাড়ির সামনে লোকজনের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। খয়বার গাজীকে দেখে সবাই হঠাৎ চুপ করে। তাকে নিয়ে রাস্তায় নামলে কে যেন চিৎকার করে উঠে, 'শালাক ঐ খাঁচার মধ্যে তোলো।

চারদিক থেকে এই সমর্থন পাওয়া যায়, 'তোলো! তোলো!'

'শালা খানদানী শয়তান গো! খাঁচার মধ্যে তুল্যা জুতা দিয়া সালাম করো!'

আলিবক্স হাত তোলে, 'দরকার নাই। গাজী সায়েবের বিচার হবো। এখন ইনার শরীলে কেউ হাত দিবা না কলাম।—কৈ চেংটু কৈ?'

'চেংটু গেছে বৈরাগীর ভিটা। জায়গা ঠিক করবার গেছে। বিচার হবো বটগাছের নিচে।'

'খাঁচাটা পেলেন কোথায়?' আনোয়ারের কৌতূহল দেখে আলিবক্স হাসে, 'আর বলবেন না, আমাগোরে গাঁয়ের চ্যাংড়াপ্যাংড়ার বুদ্ধি। এর মধ্যে সিন্দুরিয়ার বিডি মেম্বর কাদের মণ্ডলেক ধর্‍্যা নিয়া আসছে!'

'খাচার ভেতর?'

'হুঁ!' আলিবক্স হাসতে হাসতে বলে যে সিন্দুরিয়ার মৌলিক গণতন্ত্রী আবদুল কাদের মণ্ডল মাদারগঞ্জ থানার গোরুচুরির ব্যাপারে হোসেন আলির প্রধান প্রতিনিধি। এ ছাড়া গত আকালের সময় সে এবং তার ছেলে একেকজন চাষাকে ২০ সের ৩০ সের ধান দিয়ে তাদের সর্বস্ব লিখিয়ে নিয়েছে। পরে এই নিয়ে একটু কথাবার্তা বললে ২জনকে সে মেরেও ফেলেছে। তা এইবার লোকটা পড়েছে বেকায়দায়। এই খাঁচায় করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ডাকাত-মারা চরে। খাঁচা দেখে চেংটু আবদার করে, এই খাঁচা তাদের চাই, এর ভেতর ঢোকানো হবে আফসার গাজীকে।

'তা আপনাদের ঐ মেম্বরের কি হলো?'

আনোয়ারের প্রশ্নের দিকে আলিবক্সের মনোযোগ নাই, 'আফসার গাজী মনে হয় পলায়া বগুড়ার দিকে গেছে।'

'ঐ মেম্বরের কি হলো, বললেন না?'

'আফসার গাজীকে ধরব্যার পারলে কাম হতো! ঐটা ধুরন্ধর শয়তান। বগুড়া থ্যাকা ঢাকাত যাবো, ঢাকাত যায়া একটা ষড়যন্ত্র পাকায়া আসবো।'

আনোয়ার এবার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, 'আরে, সিন্দুরিয়ার মেম্বরকে নিয়ে কি করলেন?'

'ও হ্যাঁ!' আলিবক্সের হঠাৎ মনে পড়ে, 'সিন্দুরিয়া প্রাইমারী ইস্কুলের মাঠে গণ-আদালতে কাদের মণ্ডলের মৃত্যু হইলো। খাঁচার মধ্যে ভইরা ঐটারে নিয়া গেলাম ডাকাত-মারা চর। ঐ আদালতের রায়ে হোসেন আলিরও মৃত্যুদণ্ড হয়। হোসেন আলির বাথানে আগুন ধরাইয়া দুইটারে একসাথে ফালাইয়া দেওয়া হইলো।'

'মরে গেছে?'

'মরবো না? আগুনের মধ্যে ফালায়া চার ঘণ্টা বাদে দুইজনেক আলাদা চেনা যায় না। পুড়্যা অঙ্গার!' ধ্যাবড়া পায়ে জোরে জোরে কদম ফেলে আলিবক্স, 'তাড়াতাড়ি করেন।' সমান তালে পা ফেলতে খয়বার গাজীকে একটু বেগ পেতে হয়। গ্রামের রাস্তায় অনভ্যস্ত পায়ে জোর কদম ফেলতে আনোয়ারেরও একটু অসুবিধা হয় বৈ কি! তবে একটু চেষ্টা করে সে বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটে। তার সামনে ও পেছনে অনেক মানুষ।

৩৩

মঞ্চ ছিলো পল্টন ময়দানের শেষ মাথায়। এদিকে স্টেডিয়ামের বারান্দায় পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ধরাবার জন্য দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠি ঠুকলো ওসমান, সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের নিচে, ৫ কি ৬ হাত সামনে দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো। ভারি চমৎকার তো! কি করে হলো? সিগ্রেট ফেলে দিয়ে ওসমান ছুটে চললো অগ্নিকুণ্ডের দিকে। তার জ্বালানো কাঠি থেকে অতোদূরে আগুন জ্বলবে, আর সে কি-না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ফুঁকবে এখানে? পায়ের আঙুলে চাপ দিয়ে একটু উঁচু হয়ে ওসমান দেখলো মঞ্চ থেকে আইয়ুব খানের বিশাল বপুটাকে ধরে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে আগুনের কুণ্ডে। ভিড়ের ভেতর এগিয়ে যাওয়ার কায়দা ওসমানের বেশ রপ্ত করা আছে। এর কনুইতে একটু ধাক্কা দিয়ে, ওর পিঠ একটুখানি ঠেলে,আবার কখনো মঞ্চের দিকে প্রবাহিত কোনো জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ২/৩ মিনিটের মধ্যে সে পৌঁছে যায় মঞ্চের সামনে। তার গায়ে আগুনের আঁচ লাগছে, কিন্তু আইয়ুব খানের দাহ দ্যাখার স্পৃহায় সেটুকু সহ্য করতেই হবে। কিন্তু তার ভাগ্যটা খারাপ, আগুনে মুখ থুবড়ে-পড়া আইয়ুব খানের শরীর দেখতে পারলো কেবল পলকের জন্য। মঞ্চের ওপর থেকে এবং মঞ্চের পেছনে গ্যালারি থেকে ছুঁড়ে-ফেলা মোহাম্মদ আইয়ুব খানের 'ফ্রেণ্ডস নট মাস্টার্স' বইয়ের ইংরেজি ও বাঙলা সংস্করণ শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে তার রচয়িতার পিঠের ওপর। নিজের লেখা বইয়ের। অজস্র কপির আড়ালে আইয়ুব খান অদৃশ্য হয়ে যায়। 'ফ্রেণ্ডস নট মাস্টার্স'-এর সবুজ ও সাদা মলাট আইয়ুব খানের অগ্নিশয্যায় পাকিস্তানী পতাকার বিভ্রম তৈরি করে ডানা ঝাপটায়। তারপর প্রেসিডেন্টের বপুর সঙ্গে চড়চড় আওয়াজ করে পোড়ে। বই ছাড়াও কাগজ, ছেঁড়া কাপড়, পুরনো টায়ার, টুকরা কাঠ ও জুতাস্যাণ্ডেলের জ্বালানির নিচে ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ক্ষীণ কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করে। কিন্তু তাকে দ্যাখা যায় না। দগ্ধ প্রেসিডেন্টকে এক নজর দ্যাখার আশায় ওসমান এদিক ওদিক থেকে ঝোঁকে, ওদিক থেকে ঝোঁকে। ১বার তার পায়ের পাতার একটুখানি দ্যাখা গেলো। আরেকটু ঘুরে সামনে গেলে আরো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। কিন্তু এই সময় তার পিঠে হাত পড়ে আলতাফের, 'এই ওসমান, ওসমান। আরে এতো কাছে চলে এসেছো? আগুন ছড়িয়ে পড়লে মারা পড়বে।'

'আগুন আর ছড়াবে কি করে? আইয়ুব খান পুড়ে শেষ। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালাম কিন্তু আমি।'

'তাই নাকি? প্রথমে মশাল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।' আলতাফ তার হাত ধরে, 'চলো, মিটিং শেষ। চা খাবো।'

অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে স্টেডিয়ামের বারান্দায় পৌঁছে ফের ভিড় ঠেলতে হয়। ইসলামিয়া রেস্টুরেন্টের মস্ত বড়ো ঘরটা লোকে ঠাসা। টেবিল ১টাও খালি নাই। যতো লোক বসে রয়েছে তার প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে চেয়ার খালি হওয়ার অপেক্ষায়। মাঝামাঝি ১টা টেবিল থেকে সিকানদার ডাকে, 'এই যে আলতাফ।'

সিকানদারের সঙ্গে আলতাফ এবং ইফতিখারের সঙ্গে ওসমান চেয়ার ভাগাভাগি করে বসে। ওসমান বসেই খবর দেয়, 'আইয়ুব খানের ক্রিমেশন দেখলে না? এখন প্রেসিডেন্ট হবে কে?'

আলতাফ রায় দিলো, 'পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের সম্পূর্ণ পতন হয়ে গেছে। ওর বই বোধহয় আর একটাও থাকলো না।'

'বই কি বলছো? পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ জড়িয়ে ওকে পোড়ানো হলো। কেউ কেঁউ করে গোঙাচ্ছিলো।'

শওকত হেসে ফেলে, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে হি হ্যাজ ফিজিক্যালি বিন বার্নট টু এ্যাশেস।'

'আরে তাই তো হলো! পুড়ে ছাই হবে না তো সোনার মূর্তিতে পরিণত হবে?' আইয়ুব খানের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পোড়াবার বিবরণ দেওয়ার উপক্রম করলে ওসমানকে থামিয়ে দেয় শওকত, 'আইয়ুব খানের বই পোড়াবার দরকার কি? হিজ বুক ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট হিম। হি ইজ এ সাব-লিটারেট জেনর্য্যাল লাইক এনি অফ হিজ সাবঅর্ডিনেন্টস ইন দি আর্মি। বই লেখা তার কাজ নয়, এই বই লিখেছে আলতাফ গওহর।'

আলতাফ সায় দিলে শওকত বলে, 'সিভিল সার্ভিসের লোকজন সব সময় ডিক্টেটরদের ডোমেস্টিক সার্ভেন্টের সার্ভিস দেয়। খোঁজ নিয়ে দ্যাখেন আইয়ুব খান হাগলে ছুচে দেয় কারা? আবার তাদের নিজেদের হোগাও সবসময় ক্লিন করে রাখতে হয়—।'

'কেন?' সকলের হাসির হুল্লোড়ে সিকানদার এই প্রশ্ন করে। হাসে না কেবল ওসমান। পুড়িয়ে ফেলার পর আইয়ুব খানের মলত্যাগ এবং সিভিল সার্ভেন্টদের দিয়ে শৌচকার্য করিয়ে নেওয়া তার কাছে বাহুল্য মনে হয়। মহা উৎসাহে সিকানদারের প্রশ্নের জবাব দেয় শওকত, 'দে হ্যাভ টু রিমেইন অলওয়েজ প্রিপেয়ারড টু গেট ফাক্‌ড বাই দেয়ার মাস্টার এ্যাণ্ড দ্য মাস্টার মে রিফিউজ এ ডার্টি এ্যানাস!'

সবাই দ্বিগুণ তিনগুণ বেগে হাসে। শওকত হাসতে হাসতেই আলতাফকে বলে, 'যেসব বাঙালি ব্যুরোক্র্যাটের ওপর আপনারা ডিপেন্ড করছেন তারাও কিন্তু একসেপশন নয়।'

'আমরা নির্ভর করি পিপলের ওপর, সব বাঙালি আমাদের সঙ্গে আছে।'

'বিশেষভাবে বাঙালি সার্ভেন্টরা, আর্মির প্রোমোশন-না পাওয়া—।'

'সবাই। শোষিত বাঙালি মাত্রেই আমাদের সঙ্গে থাকবে। আগরতলা মামলা সাজিয়ে আইয়ুব খান বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে সিভিল সার্ভিস, আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্সের লোকজন—সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করলো। এই মামলা উইথড্র করতেই হবে, তখন কি নেতাকে এরা অস্বীকার করতে পারবে?'

'আগরতলা উইথড্র করা অসম্ভব। আর্মি টলারেট করবে না।'

'আর্মির চেয়ে পিপল অনেক শক্তিশালী।'

'আগরতলা উইথড্র করলে আর্মি আইয়ুব খানকে সরিয়ে দেবে। ওসমান এই সুযোগটা নেয়, 'আরে আইয়ুব খানকে তো পুড়িয়ে মারা হলো।' কিন্তু তার বিবৃতিতে পাত্তা না দিয়ে আলতাফ জবাব দেয় শওকতের কথার, 'মানুষ যেভাবে আগুন হয়ে আছে তাতে শেখ সাহেবকে রিলিজ না করলে সিচুয়েশন নর্মাল করা অসম্ভব।'

'তাহলে তাকে রিলিজ করে মানুষকে ঠাণ্ডা করে মার্শাল ল ইমপোজ করতে পারে। আর্মি তখন আগরতলা উইথড্রলের কমপেনসেশন করবে ইন দেয়ার ওন ওয়ে। তখন রেসিস্ট করতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই। শেখ সাহেব বেরিয়ে এলে আন্দোলন আরো স্পষ্ট পথে, স্পষ্ট গন্তব্য ধরে চলবে। শুধু এজিটেটরদের দিয়ে আন্দোলন চলে না। নেতার হাতেই আন্দোলন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে চলতে পারে।'

'শোনেন আলতাফ, শেখ সাহেব সবচেয়ে পপুলার নেতা, দেয়ার ইজ নো ডাউট এ্যাবাউট ইট। কিন্তু তাঁর যে ধরনের পার্সোনালিটি, যে ধরনের পলিটিক্যাল ফেইথ এ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড,—তা কি এই মুভমেন্টের লিডারশিপের জন্য এ্যাডেকুয়েট?'

'সংগঠন আছে না? আমাদের মতো সংগঠন আর কি আছে, বলেন?'

'কিন্তু আপনাদের সংগঠনের ক্যারেক্টার আর এই মুভমেন্টের ক্যারেক্টার আলাদা।'

'দ্যাখা যাক। পিপল শেষ পর্যন্ত কাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়। দেখবেন শেষ পর্যন্ত কে টেকে!'

'আপনারা যদি টেকেন তো ওনলি এ্যাট দ্য কস্ট অব দ্য মুভমেন্ট। মুভমেন্টটাও নষ্ট হবে, আর্মি তখন আপনাদের শেষ করবে।'

'অতো সোজা?' এবার ওসমান তার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করার জন্য আরেকটি উদ্যোগ নেয়, 'আইয়ুব খানকে যেভাবে জ্যান্ত পোড়ানো হলো তাতে এই আন্দোলন নষ্ট করা—।'

'আরে রাখেন!' শওকত বিরক্ত হয়ে বলে, 'কয়েকটা বই পোড়ালে আইয়ুব খান মরে না। আইয়ুব খান গেলে আরেক আইয়ুব খান আসবে। ওয়েস্ট পাকিস্তানের সব আইয়ুব খানকে শেষ করলে বাঙালিদের মধ্যে নতুন আইয়ুব খান এমার্জ করবে।'

অফিসে পরদিন কামালকে একা পেয়ে ওসমান কথাটা তুলতে গেলো, 'কাল পল্টনের মিটিঙে গেলেন না? স্টেজের সামনে আইয়ুব খানকে পোড়ানো হলো, দেখতে পারলেন না? আমি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালাম—।' কামালের সামনে খবরের কাগজ, কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা ছবি দেখিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, ফ্রেণ্ডস নট মাস্টার্সের মেলা কপি পোড়ানো হলো। আগে থেকে জানলে অফিসের কপিগুলো নিয়ে যেতাম। গতবার অফিসে পঞ্চাশ কপি কেনা হলো না?'

'আরে না! বই না! আমি নিজে দেখলাম পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ জড়িয়ে আইয়ুব খানের বডি আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হলো।'

কামাল তার পাশে এসে দাঁড়ায়, 'আপনার শরীর খারাপ? আপনার চোখ এতো লাল কেন? রাত্রে ঘুম হয়নি?'

ওসমান গতকালের দৃশ্য আরো বিশদ ব্যাখ্যা করতো, কিন্তু এর মধ্যে বসের ঘর থেকে কামালের ডাক আসে।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ঘরে ফেরার কিছুক্ষণ পর আসে রানু। আইয়ুব খানের খবরটা রানু বোধহয় জানে না। ওসমান কিছু বলার আগেই রানু জানায় যে সে ২টো খবর দিতে এসেছে। 'কাল বিকালবেলা বাড়িঅলা আসছিলো। আপনারে দ্যাখা করতে বলছে।'

'কি খবর বলো তো? কাল রাত্রে ফেরার সময় রাস্তায় তোতামিয়াও বললো। ব্যাপার কি?'

রানু এবার দ্বিতীয় খবরটি বলে, 'আর ঐ যে আপনার সঙ্গে থাকে, রিকশাআলা, সে বইলা গেলো আজ বিকালে নাকি মিটিং। পাকিস্তান মাঠে মিটিং? পাকিস্তান মাঠ কোথায়?

আলাউদ্দিন মিয়া নাকি আপনারে মিটিঙে যাইতে বলছে। কিসের মিটিং? আচ্ছা পাকিস্তান মাঠ আর্মানিটোলায় না?'

'পাকিস্তান মাঠ আগা সাদেক রোডে। মিটিঙের কথা অবশ্য আলতাফও বলেছিলো—।'

কিন্তু মিটিং সম্বন্ধে রানুর আগ্রহ নাই। সে নতুন প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, ঐ লোকটা, খিজির না মিজির, ও কি আপনার সঙ্গে সবসময় থাকবে?'

'কেন?' খিজির সম্বন্ধে রানুর ওরকম তুচ্ছ করে কথা বলা ওসমানের কানে লাগে, 'কেন? ও তোমার কি ক্ষতি করলো?'

'আমার কি করবে? কিন্তু বাড়িআলা দেখলাম ওর উপরে খুব চেতা। ও নাকি পাকা চোর? বাড়িআলার গ্যারেজে কাজ করতো, রিকশার পার্টস চুরি করলে বাড়িআলা ওকে বার কইরা দিছে তো উঠছে আলাউদ্দিন মিয়ার গ্যারেজে। আবার আলাউদ্দিন মিয়ার স্কুটার বলে কারে বেইচা দিছে, তার ওখান থাইকা উঠছে আপনার ঘরে! বাড়িআলা বলে—।'

'বাড়িওয়ালা কি আমাকে ওয়ার্নিং দিতে এসেছিলো? শোনো, বাড়িওয়ালার তেজ আর বেশিদিন নেই। বাড়িওয়ালার যে বাপ, আরে বাপ কি?—বাপের বাপ, বাপের বাপের বাপ,—' এই মেয়েটির কাছে আইয়ুব খানকে জীবন্ত দগ্ধ করার বিবরণ দিতে পারলে ভালো হয়, ঘটনাটিকে সে রূপক হিসাবে নেবে না, জলজ্যান্ত ঘটনা বলে বিশ্বাস করবে, 'গতকাল পল্টনের মিটিঙে আইয়ুব খানকে জ্যান্ত ধরে আগুনে পোড়ানো হলো। একেবারে ছাই হয়ে গেছে। আইয়ুব খানের দাহ আজ উদযাপন করা হবে পাকিস্তান মাঠে।'

রানু তার বিবৃতিকে রূপক অর্থে নেয় না, আবার কোনো গুরুত্বও দেয় না। 'আঃ! আপনি চটেন কেন? আপনার সম্বন্ধে বরং ভালো ভালো কথা বললো, বলে, ওসমান সায়েব খুব ভদ্রলোক মানুষ, খিজিররে তাই না করতে পারে নাই। আমি শুইনা মনে মনে হাসি।'

ওসমান খুব ভদ্রলোক—এই কথায় রানু হাসে কেন? ওসমানের কোনো আচরণে কি কোনোদিন অশোভন কোনো কিছু সে লক্ষ করেছে? নাকি তার ধারণা যে ওসমান ভদ্রতার ভাণ করে, আসলে সে পাকা শয়তান? ওসমানের স্বভাবে হিপক্র্যাসির আবিষ্কার কি রানুর মনে মনে হাসার কারণ?

'বাড়িওয়ালা তোমাদের বাসায় এসেছিলো কেন? ভাড়া বাড়াতে চায় নাকি?'

'না, না। এই প্রথম দেখলাম বাড়ি ভাড়ার তুলনায় মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স বেশি বইলা হায় হায় করলো না। রাত্রে স্বপ্নে নাকি ভাইয়ারে দেখছে! তাই আব্বার সঙ্গে দ্যাখা করতে আসছিলো। কয়, কয়টা অসৎ লিডারের পাল্লায় পইড়া দেশের জুয়েল জুয়েল ছেলেগুলি স্পয়েল হইতাছে। কয়, দ্যাখেন মরেও ভালোগুলি। কয়, চালাকগুলি মিটিঙে যায়, মিছিলে যায়, কিন্তু সেইগুলি মরে না। তাদের কিছু হয় না। ভাইয়ার কথা কয়, মরে খালি তালেবের মতো নিরীহ সাদাসিধা পোলাপান।'

ওসমান আড়চোখে রানুর মুখ দ্যাখে। কথাগুলো কি বাড়িওয়ালার? নাকি ওসমান সম্বন্ধে নিজের মন্তব্য রানু সেট করে দিচ্ছে রহমতউল্লার মুখে। রানু কি তাকে খুব সতর্ক ও ভীতু গোছের মানুষ বলে গণ্য করে?—আজ, আজ নয় কাল—নাকি পরশু?—ওসমান যে দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করলো, সেখানে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে,—সে কথা রানুকে বিশ্বাস করাবে সে কি করে? অকপটতা, মনোবল ও আন্তরিকতাকে আবু তালেবের মৃত্যুর কারণ ভেবে রানু তার

সঙ্গে তুলনা করছে ওসমানের। ওসমান জানে যে তার মুখ দেখে রানু এইসব ভুল ধারণা করে বসে আছে। নাকি এটাই ঠিক? তার স্বভাবে তেজের অভাব বোধহয় তার মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠে। তাহলে আইয়ুব খানকে জ্যান্ত পোড়াবার অগ্নিকুণ্ডে সে প্রথম কাঠিটি ছুঁড়লো কি করে? সে বোধহয় ছোঁড়েনি। তাহলে কে ছুঁড়লো। ঠিক খবরটা দিতে পারবে কে? শওকত ছিলো, আলতাফ ছিলো, ইফতিখার ছিলো, সিকানদার ছিলো,—এদের কারো সঙ্গে দ্যাখা হলে জিগ্যেস করলেই তারা আসল তথ্য জানিয়ে দেবে। তাহলে তো একবার বাইরে যাওয়া দরকার। ঠিকঠাক জেনে এসে রানুকে বেশ বুক ফুলিয়ে বলা যায়, 'আইয়ুব খানকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার মূলে কে, বলোতো রানু?'—রানু বিবেচনা করে দেখতে পারে, পুলিসের গুলিতে নিহত হলেই কেউ উন্নত স্তরের জীবে রূপান্তরিত হয় না। তালেব কি খুব বীরপুরুষ ছিলো? দূর! সে মিছিলে গেছে হুজুগে মেতে! নীলখেতের মোড়ে গুলিবর্ষণ শুরু হলে বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছে। তালেব তো কিছুদিন পাগলও ছিলো। অস্বাভাবিক প্রকৃতির বিকৃতমস্তিষ্ক এক যুবক প্রকৃত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ায় পুলিসের হাতে মারা পড়েছে; এতে তার ছোটবোনের গর্ব করার কি হলো?—আবু তালেবকে পাগল বিবেচনা করে একটু চাঙা হতে না হতেই ওসমানের ভুলটা ভাঙে। নাঃ! পাগল হলে তালেব ওয়াপদায় চাকরি করতো কি করে? অবশ্য চাকরি ও মানসিক সুস্থতা অবিচ্ছেদ্য নয়, মানসিক সুস্থতা চাকরির কোনো শর্ত নয়। তবে পাড়ার লোকে কেউ বলেনি যে তালেবের কোনোরকম অস্বাভাবিকতা কোনোদিন লক্ষ করা গেছে। নাঃ! ওসমান একটি দীর্ঘশ্বাস চাপে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আবু তালেব সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ ছিলো। কিন্তু যাই হোক না কেন, রানু কি তার নিহত ভাইকে সামনে রেখে পৃথিবীর যাবতীয় পুরুষমানুষকে বিচার করবে? তাহলে তো শহীদ ছাড়া কাউকে তার পছন্দ হবে না। পুলিস-মিলিটারির গুলিতে শহীদের বৌ হিসাবে নিজেকে কল্পনা করে রানু কি খুব সুখ পায়?—ওসমান হেসে ফেললে রানু বলে, 'কি, হাসেন কেন?'

'এমনি।'

'বাড়িআলা প্রশংসা করছে শুইনা খুব খুশি, না?' রানুও হাসে, 'যান, বাড়িআলার সাথে আজ দ্যাখা করেন। কয়, আপনে নাকি রাগ করতে জানেন না? মুরুব্বি দেখলেই সালাম দেন, মাথা নিচা কইরা হাঁটেন! দেখবেন, চোখ নিচের দিকে থাকলে সামনে কিছু দেখতে পারবেন না, কোনদিন গাড়ির তলায় চাপা পড়বেন!'

রানুর এই বিরামহীন সংলাপ হাসির কুচিতে খচখচ করে। প্রত্যেকটি কুচি ওসমানের কানে বেঁধে এবং তা অনূদিত হয় এইভাবে: তুমি শালা একটা মেরুদণ্ডহীন হিপক্র্যাট! তোমার উচিত বাড়িওয়ালার সঙ্গে লাইন করা! রানু বলে, 'আপনারে যেমন পছন্দ, মনে হয় বাড়িআলা আপনের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চায়!'

'সম্বন্ধ? কিসের সম্বন্ধ?'

'সম্বন্ধ বোঝেন না? ঢঙ করেন, না? বাড়িআলার মেয়ে আছে না একটা? খুব সুন্দর! গাড়ি পাইবেন, টেলিভিশন পাইবেন। বাড়ি তো আছেই!'

'রাজত্ব ও রাজকন্যা একসঙ্গে?'

'তো কি? ছেলেরা আবার কি চায়? গাড়ি না দেয়, রিকশা তো আছে! রিকশা ভরা গ্যারেজ পাইবেন!' রানুর ঠোঁটের দুই কোণ সঙ্কুচিত হয়, রিকশার কথা বলার সময় জিভের

তেতো ধাক্কায় শব্দগুলো বেশিরকম স্পষ্ট। ওসমান বলতে চাইলো, অনিশ্চিত রাজকন্যার আশায় থেকে নিশ্চিত রাজকন্যাটিকে সে হারাতে রাজি নয়।—কিন্তু ডায়ালগটি কিভাবে ছাড়বে তাই ঠিক করার আগেই রানু হঠাৎ দাঁড়ায় এবং তার চোখে চোখ রেখে বলে, 'আপনারা, আপনারা, আপনারা না'—বাক্য স্থগিত রেখে সে মুখ ফেরায় অন্যদিকে। ফলে দ্যাখা যাচ্ছে তার প্রোফাইল। প্রোফাইলে রানু সবসময় বেটার, কিন্তু এখন তাকে অপরিচিত কোনো মেয়ের মতো লাগছে। ওসমানের খুব পিপাসা পায়, কিন্তু রানুর ঠোঁটের ওপরকার ভাঁজ ও নাকের ডগায় ঘামের বিন্দু এক ফোঁটা জমেনি। পিপাসায় ওসমানের গলা শুকিয়ে আসে, ভাবে কুঁজো থেকে পানি ঢেলে খেয়ে নেবে। কিন্তু রানুকে ডিঙিয়ে যায় কিভাবে? বিশেষ করে রানুর ঠোঁটজোড়া যেভাবে কাঁপছে তাতে একটা দুর্ঘটনা পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। তার সেকেন্ড ব্র্যাকেট মার্কা ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে হাল্কা বেগুনি থেকে গাঢ় বেগুনি হয়। রানুর ডান চোখের কোণে পানির ফোঁটা টলটল করে। নুন মেশানো হাল্কা ঘোলাটে পানির বিন্দুটা পড়ে গেলে মুখের ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে,—ওসমান এরকম ভয় করতে করতে রানু তার বাক্য সম্পূর্ণ করে, 'আপনারা না সব পারেন! সব পারেন!' চোখের নোনতা শিশিরবিন্দু তার টলে পড়েছে, ডান গালে সরু রেখায় প্রবাহিত হয়ে মিলিত হয়েছে চিবুকের ডৌলে। নোনতা ও ঈষৎ ঘোলা শিশিরের রোগা স্রোতে চুমুক দেওয়ার জন্য ওসমানের খটখটে ঠোঁট, জিভ ও টাকরা তিরতির করে কাঁপে। ওসমান হঠাৎ করে নিশ্চিত হলো যে আইয়ুব খানকে দগ্ধ করার জন্য তৈরি অগ্নিকুণ্ডে সে একটি জ্বলন্ত কাঠি ফেলেছিলো। খবরটা রানুকে এক্ষুনি দেওয়া দরকার। ওসমান দাঁড়িয়ে রানুর মাথার ওপর ও ঘাড়ে তার হাত রাখলো হাল্কা করে। কথা বলার আগে রানুকে আরেকটু কাছে টানে, একটি তীব্র চুমুতে তার গালের চোখের ও চিবুকের নোনা পানি সবটা শুষে নেবে। কিন্তু রানুর মাথার চুলের কাঁটা ওসমানের বুকের বাঁদিকে একটু একটু খোঁচা দিচ্ছে। এটা আবার অ্যাসিডিটির ব্যথা নয় তো? দুপুরবেলা খালি পেটে কাপের পর কাপ চা এবং ১টির পর ১টি সিগ্রেট খেলে এই জায়গাটার নিচে চিনচিন করে ব্যথা করে। ঘণ্টাখানেক আগে ভরপেট খেয়ে এসেছে বলে সেই ব্যথা কি আরো ওপরে উঠে এলো? ঘরে অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট নাই, বেরিয়েই দুটো মেরে দেবে। কিন্তু তার নিজের ঘর থেকে তাকে এখন উদ্ধার করে কে? সে বিড়বিড় করে, 'একেবারে পাগল! ভাইটা ছিলো আস্ত পাগল, বোনটাও তাই!'

আবু তালেবকে ঘোরতর উন্মাদ বলে ঘোষণা করে ওসমান লঘুভার হয়। নিশ্চিন্ত মনে রানুকে চুমু খাবে বলে ওর গোটা মুখ জড়িয়ে ধরার জন্য ওসমান নিজের আঙুলগুলোকে তৈরি করতে করতেই তার হাতের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে রানু ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়।

৩৪

হাতের ফাঁক দিয়ে রানু বেরিয়ে গেলে মনে হয় খুব শীতের মধ্যে তার হাতের গ্লাভস খুলে গেলো। হাতদুটো বড়ো ঠাণ্ডা। হাতে হাত ঘষে শীত কাটাবার চেষ্টা করলে সারা শরীর ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার অবস্থা হয়। কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুয়ে ওসমান লেপ টেনে নেয় গায়ে। লেপের কল্যাণে শরীরের তাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে, রানুকে ওসমান আর কোনোদিন এভাবে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে দেবে না। এই কয়েক মিনিট আগে ওসমান ওকে ১টা ২টো কেন, অনায়েসে ১০০/১৫০ চুমু খেতে পারতো। এতো দ্বিধা করার কোনো মানে হয়? দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ে যে কি-না আইয়ুব খানকে পুড়িয়ে মারার অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে, তার এতো দ্বিধা রানুকে চুমু খেতে?—ওসমানের শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে ওঠে। দূর! চুমু খেতে খেতেই তাকে নিয়ে দিব্যি শুয়ে পড়তো এই সরু তক্তপোষে। না, এমন কিছু সরু নয়, দুজনে দিব্যি শোয়া যায়। বিকালবেলা ওর ঘরে আসবে কে? সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো বেগুনি ঠোঁটে কয়েকটা গাঢ় চুমু পড়লে রানুর সমস্ত শরীর একেবারে এলিয়ে পড়বে ওসমানের ওপর। তারপর তাকে জড়িয়ে শ্যামবর্ণের নোনতা ঘাড়ে চুমু খেতে খেতে 'রানু! আমার রানু!' বলে ফিসফিস করে ডাকলে মেয়েটির সমস্ত শরীর সাড়া দিয়ে উঠবে। এই মুহূর্তে রানুর অশ্রু, ঘাম, রক্ত, মাংস, হাড় ও মজ্জায় ওসমান নিজেকে তীব্রভাবে অনুভব করছে। রানুকে চোখের সামনে এঁকে নিতে নিতে ওসমান লুঙির গেরো খুলে ফেললো। রানুর বুকে মুখ গুঁজে দেওয়ার জন্য বালিশটা উল্টিয়ে ঠেকিয়ে রাখলো নিজের গালের সঙ্গে। কাত হয়ে শুয়ে ওসমান বাম হাতটি রাখলো নিজের উরুসন্ধিতে। রানুর সঙ্গে একাকার হওয়ার সমস্ত উত্তেজনা সংহত হয়েছে ওখানেই। ওসমানের হাতে এখন তার ফেঁপে-ওঠা শিশ্ন; এই পাপের ভেতর দিয়ে সে ঢুকে পড়বে রানুর একান্ত ভেতরে। অন্য হাতে জড়িয়ে ধরবে তার পিঠ, বালিশটা যেভাবে আঁকড়ে ধরলে ঠিক সেইভাবে। রানুর ঠোঁটে ও গালে প্রবলভাবে চুমু খাওয়া সে অব্যাহত রেখেছে। বাঁ হাতে নিজের যৌনাঙ্গ ঝাঁকাচ্ছে; এইতো, এই পেরেক দিয়ে রানুকে গেঁথে নেবে নিজের সঙ্গে। এদিকে রানুর বুকে হাত দিতে গিয়ে দ্যাখে, সেখানে খয়েরি সুতার এম্ব্রয়ডারি করা প্যাগোডা আঁকা হাওয়াই শার্টের পকেট। তাইতো, রানুর ঠোঁট পরিণত হয়েছে রঞ্জুর ঠোঁটে। রঞ্জুকেই সে অবিরাম চুমু খেয়ে চলেছে। এটা হল কি করে? রঞ্জুকে নিয়ে সে করবেটা কি? তার চাই রানুকে। শীতের ময়লা বিকালে চোখ ভরা পানি নিয়ে মেয়েটি বেরিয়ে গেলো তার ঘর থেকে। নিজের তীব্র রক্তস্রোতের ঘন নির্যাস রানুকে সমর্পণ করে ওসমান তার চোখের পানি পুষিয়ে দেবে। কিন্তু একি বিপর্যয়? মাঝখানে কোত্থেকে এসে ঝামেলা বাধায় রঞ্জু। তাকে ঠেকানো খুব শক্ত। রঞ্জুর গালে কষে একটা চড় দিলে হয়। কিন্তু তার বদলে সে কি-না ওর গালে অবিরাম চুমু খেয়ে চলেছে। রানুকে রঞ্জু সম্পূর্ণ হটিয়ে দিয়েছে, রানুর চিহ্নমাত্র দ্যাখা যাচ্ছে না। ওসমান এখন কি করবে? রঞ্জুকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে ওসমান ওকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে সে বালিশের একটা কোণ খুব জোরে খামচে ধরে। কিন্তু নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে তার হাত শিথিল হয়ে আসে, আমার রঞ্জুরে মেরি ফেললে গো!' এ তো তার মায়ের গলা। —আম্মার ভুল উদ্বেগে ওসমানের হাসি পায়, আম্মা যে কাকে কি ভাবে? —'ওর জন্যে মাগুর মাছের ঝোল রাঁধলাম, জ্বর থেকে উঠি আজ পথ্যি করবে, ছেলেটা আমার এক লোকমা ভাত মুখে দিতি পারলে না গো!'—তাইতো! ওসমান বড়ো বিচলিত হয়। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে

ওসমান দেখতে পায়, যাকে সে এতোক্ষণ চুমু খেয়ে চলেছে এবং রানুর পুনর্বাসনের জন্য যার গলা টিপে ধরেছে সে বোধহয় রঞ্জু নয়, মানে রানুর ভাই রঞ্জু নয়।—তবে সে কে?—এতো সব ঝামেলার মধ্যেও ওসমানের বাম হাতের তৎপরতা কিন্তু একটুও থামেনি। হাতের ভেতর তীব্র ও দ্রুত স্পন্দন বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে তার লুঙি ভিজে যায় এবং হাত ও উরু চটচট করে। এতো দূর থেকে অন্য ১টি রাষ্ট্র থেকে তার মা এরকম বিলাপ করে কেন?—লুঙি গুছিয়ে পরতে পরতে ওসমান হাঁপায়। বুকে তার প্রবলরকম ওঠানামা চলে, ভয় হয় হার্টে আবার নতুন কোনো উপসর্গ দ্যাখা গেলো না তো? অনেক হার্টের রোগী আছে একটুখানি পরিশ্রমে হাঁসফাঁস করে। অনেকে বাথরুমে গিয়ে গুমুতের সঙ্গে প্রাণটিও ত্যাগ করে বসে। যৌন সঙ্গম করার সময়ও মানুষের মৃত্যু হতে পারে। এইভাবে কেউ মারা গেলে তার মৃত্যুর কারণ তার যৌনসঙ্গী ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। আর এই একা, কেবল নিজের হাত সম্বল করে যৌন কামনা মেটাতে গিয়ে ওসমান যদি মরে যায়, তাহলে? এভাবে মারা গেলে তার মৃত্যুর কারণ ভয়াবহভাবে অজ্ঞাত রয়ে যাবে।—এই ভাবনা ওসমানকে নিস্তেজ করে ফেলে, স্তিমিত রক্তপ্রবাহে টিপটিপ আওয়াজ ক্রমে ঝাপশা হয়ে আসে। নিশ্বাস আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হলে সে টলে পড়ে তন্দ্রায়। নিশ্বাসে নিশ্বাসে তন্দ্রা থেকে ঘুমের ভেতর গড়াতে গড়াতে ওসমান দ্যাখে যে রঞ্জুর মৃতদেহ পড়ে রয়েছে তার তক্তপোষ জুড়ে। রঞ্জুর গলায় ওসমানের আঙুলের দাগ নীল হয়ে বসেছে। তবে কি স্বপ্নে কি জাগরণে, হত্যাকারীর যে ভয় পাবার কথা, তা কিন্তু তার হয় না। সে বরং তারিয়ে তারিয়ে লাশটা দ্যাখে। তার দৃষ্টির ঘষায় রঞ্জুর গলার আঙুলের নীল মুছে যায় এবং এমন কি তার বয়সও বাড়তে থাকে। বয়সের সঙ্গে পাল্টায় চেহারা, শরীরের গড়ন। সেটা পরিণত হয় ওসমানের লাশে। একটুও চমকে না উঠে কিংবা দুঃখিত না হয়ে, এমনকি অবাক না হয়ে তক্তপোষে ঝুঁকে নিজের লাশে ওসমান বুলেট খুঁজতে থাকে। মিছিলে গুলি হলো, বুলেটটা শরীরের কোথায় লাগলো, এর মধ্যেই কি সে বেমালুম ভুলে গেলো? বুলেট না হোক, বুলেটের দাগ তো পাওয়া যাবে। ময়লা চাদর তুলে তন্ন তন্ন করে ওসমান গনি নিজের মৃতদেহে বুলেটের দাগ খোঁজে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে ওসমান মন খারাপ করে, আরেকটু সময় পেলে বুলেটটা সে ঠিকই বার করতে পারতো। তার ভাগ্যটা বরাবরই এমন, স্বপ্নে পরম কাম্য কিছু হাতের মুঠোয় আসার ঠিক আগের মুহূর্তে তার ঘুম ভেঙে যায়।

'মশারি টাঙান নাই? কহন ঘুমাইলেন?' ঘরে ঢোকে খিজির, 'মিটিঙে ভি গেলেন না? আমি বহুত বিচরাইলাম!'

বিছানায় বসে ওসমান সিগ্রেট ধরায়, 'পাকিস্তান মাঠে মিটিং কেমন হলো?'

'মিটিং আরম্ভ হইলো মাগরের বাদ, আগে খালি গ্যাঞ্জাম, খালি হাউকাউ।'

'কেন?'

'মহল্লার সর্দাররে দেইখা পাবলিকে চেইতা গেছে। জিগায়, অরে আইতে কইলো ক্যাঠায়?'

আলতাফ কিন্তু আগেই এরকম সম্ভাবনা আঁচ করেছিলো। আলতাফদের দলের ১টি ছেলেকে নিয়ে ঐ সর্দার সায়েব কয়েকদিন আগে আলাউদ্দিন মিয়ার সঙ্গে দ্যাখা করতে আসে। ছেলেটি তার ভাইপো, লতিফ সর্দার আবার রহমতউল্লার কিরকম আত্মীয়।

আলাউদ্দিন মিয়ার অফিসে বসে সে ছোটোখাটো ১টা বক্তৃতা ছাড়ে। লোকটার বয়স ৭০-এর কাছাকছি, এর বেশির ভাগ সময় কেটেছে নবাববাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে। হঠাৎ করে সে উপলব্ধি করেছে যে পাকিস্তান সরকার হলো ১ নম্বর গণবিরোধী শক্তি। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানের উদ্যোগে পাকিস্তানের পয়দা, বাঙলার মুসলমান ছিলো কায়েদে আজমের ১ নম্বর বাহু। অথচ, পূর্ব পাকিস্তানের ব্রিলিয়ান্ট ছেলেরা আজ চাকরি পায় না, পেলেও প্রমোশন হয় না, প্রমোশন পেলেও তাদের হাতে কোনো ক্ষমতা নাই। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের আর লাইসেন্স জোটে না, সব দখল করে নেয় পাঞ্জাবি হার্মাদরা। পাকিস্তান সরকারের এই শোষণমূলক নীতির প্রতিবাদে লতিফ সর্দার সায়েব মৌলিক গণতন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে এসে শামিল হবে বিরোধী দলের আন্দোলনে। গণবিরোধী সরকারকে উৎখাত করার জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে সে প্রস্তুত। এমন কি জনসেবার জন্যে সরকার তাকে 'তমঘায়ে খিদমত' খেতাব দিয়েছিলো, গভর্নর হাউসের অনুষ্ঠানে মোনেম খান নিজে তাকে মেডেল পরিয়ে দেয়, সেই খেতাব সে প্রত্যাখ্যান করবে এবং মেডেল বেচে টাকাটা দান করবে আন্দোলনের তহবিলে। তার এতোসব সংকল্পের কথা শুনেও কিন্তু আলতাফের মন টলেনি। আলাউদ্দিন মিয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর পরই আলতাফ ওর অবিশ্বাস ও অসন্তোষ দেখিয়েছিলো, 'লোকটা টাফ রি-এ্যাকশনারি! নবাববাড়ির বুটলিকার, মুসলিম লীগের মধ্যেও মুসলিম লীগার! এখন হাওয়া বুঝে এদিকে আসতে চাইছে। এদের নেওয়া মানে পার্টির ইমেজ নষ্ট করা, এরা পার্টির লায়াবিলিটি হবে!' আলাউদ্দিন মিয়া অবশ্য আলতাফের সঙ্গে একমত হয়নি, ধরেন, বেসিক ডেমোক্র্যাট খসাইতে পারলে গওর্মেন্টের একটা ইটা খইসা পড়ে, আইয়ুব খানেরে একটু জখম করতে পারেন। আরো দশটা বিডি উনারে ফলো করতে পারে, অন্তত ডরাইয়া যাইবো তো!' কিছুক্ষণ তর্ক করে আলতাফ বেরিয়ে ওসমানকে বলে, 'নিজের মহল্লায় লোকটা খুব আনপপুলার। ওখানে আমাদের পার্টি অফিসে সুবিধা করতে না পেরে এসেছে এখানে। আগেই খবর পেয়েছি, ইকবাল হলের সঙ্গেও লাইন করার চেষ্টা করছে। এখন এই লোককে আমাদের সঙ্গে দেখে ওদের মহল্লার লোক এ্যাডভার্সলি রি-এ্যাক্ট করতে পারে।' এখন খিজিরের কাছে একই ধরনের রিপোর্ট পেয়ে ওসমান জিগ্যেস করে, 'পাবলিক চটে গিয়েছিলো?'

'পাবলিকে কয়, সর্দার হালায় দশটা বচ্ছর মহল্লাটারে জ্বালায়া খাইছে। এ্যার দোকান দখল করে, অর দোকান উঠাইয়া নিজের বাইরে বহায়। একটা ইস্কুলের নামে সরকার জায়গা দিছিলো, সর্দার নিজে ঐ ইস্কুলের কমিটির পেসিডেন। ইস্কুল বাদ দিয়া ঐ জায়গার মইদ্যে মার্কেট বানাইয়া দিছে! পোলার নামে, বিবির নামে, ভাই ভাইসতার নামে মহল্লার ব্যাকটি র‍্যাশন দোকান রাইখা দিছে। আবার দোকানের মাল দিবো না, নিজের বাড়ির মইদ্যে মাল রাখে, কাস্টমারে গেলে কয়েলে কয়, মাল নাইক্কা। চিনি, গম, চাইল, ত্যাল ব্যাকটি বেলাকে বেচে।—পাবলিক এইগুলি লইয়া মিটিঙের মইধ্যে হাউকাউ করলো—!'

'আলতাফ কি বললো?'

'আলতাফ সাব যায় নাই। আমাগো আলাউদ্দিন সাব ভাষণ দিয়া বহুত কোশেশ করলো, মগর পাবলিকে শোনে না, কয়, লতিফ সর্দাররে বাইর কইরা না দিলে আমরা মিটিং ভাইঙ্গা দিমু!'

'তারপর?'

'আমাগো সাবে বুদ্ধি কইরা ইউনিভারসিটির মইদ্যে খবর পাঠাইলো, ছাত্র লিডাররা আইয়া মাইক লইলো। অরা ধরেন ল্যাখাপড়া করা মানুষ, প্যাটের মইদ্যে এলেম আছে। কয়, সর্দার সাবে নিজের ভুল বুইঝা আমাগো লগে আইছে, উনারে দেইখা আরো বহুত মানুষ আইবো। কয়দিন গেলে আইয়ুব খানে মালুম পাইবো কি তার লগে আর কেউ নাই, তখন গদ্দি ছাইড়া না দিয়া উই করবো কি? ঠিক কইছে না?' ওসমান কোনো মতামত না দিলে খিজির দেওয়ালে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে বিড়ি ধরায়। এরপরও ওসমান তার অপরিচিত ছাত্রনেতার বক্তব্য নিয়ে কোনো মন্তব্য করে না দেখে খিজির উসখুস করে। বিড়িতে লম্বা লম্বা টান দিয়ে বলে, 'মগর আমাগো মহল্লার মাহাজনে জিন্দেগিতে ঠিক হইবো না। অর কপালের মইদ্যে আল্লায় কি লেখছে আল্লাই জানে।'

'কেন? উনিও হয়তো ভুল বুঝতে পেরে—।'

'নাঃ! মাহাজনে মানুষের পয়দা না। দ্যাহেন না, আমি অর ঘর ছাড়লাম, আমাগো সাবের গ্যারেজ ভি ছাড়লাম, অহন তরি আমার লগে কি করতাছে! জুম্মনরে দিয়া মায়ে ঐদিন খবর পাঠাইলো—।'

'জুম্মন? জুম্মনের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে?'

'থাকবো না ক্যালায়?' ওসমানকে অবাক হতে দেখে খিজির আরো অবাক হয়, 'ডেলি ডেলি আমার কাছে আহে। জুম্মনে কয়, "মায়ে যাইতে কইছে। কিজানি হইছে।" তয় আমি গেছি পরে অর মায়ে কান্দে।'

'কাঁদে? তোমাকে দেখে কাঁদে?'

'হ। কান্দে আর কয় মাহাজনে কামরুদ্দিন ওস্তাগররে ফুসলাইয়া অরে হাসপাতাল পাঠাইবার চায়! উই তো যাইবো না, মহাজনে কইছে ঠিক আছে, দাওয়াই বহুত আছে, এমুন দাওয়াই দিমু, মাগী মালুম ভি করবার পারবো না, প্যাটপুট খইসা এক্কেরে সাফ হইয়া যাইবো।'

'তোমার বাচ্চার জন্যে জুম্মনের মায়ের অতোই টান তো তোমার সঙ্গে বেরিয়ে আসে না কেন?'

এবার খিজির দমে যায়। বিড়িতে ফের কয়েকটা টান দিয়ে বলে, 'জুম্মনরে মানুষ করবার চায়। বড়োলোকের বাড়ি কাম কইরা অর নজরখান হইছে বড়ো। খালি এক প্যাচাল পাড়ে, ল্যাহাপড়া শিখাইয়া জুম্মনরে বেবি ট্যাকসির মাহাজন বানাইবো!'

'তোমার সঙ্গে থাকলে জুম্মন মানুষ হবে না?'

এ ব্যাপারে খিজিরের সন্দেহ আছে! 'আমি একটা ভ্যাদাইমা মানুষ। কহন কৈ থাকি ঠিক নাই। পরের পোলারে হুদাহুদি লইয়া—।' বিড়ির ধোঁয়ায় হঠাৎ তার বেদম কাশি আসে, কাশতে কাশতে উঠে ছাদে গিয়ে কফ ফেলে। ওসমান মশারি টাঙায়, খিজিরের ওপর তার রাগ হয়, লোকটা একেবারে অপদার্থ। রানু একদিন ঠিকই বলেছিলো, সাহস থাকলে বৌটার চুলের গোছা ধরে টেনে আনতো।

ঘরে এসে খিজির ফের মেঝেতে বসে। 'আপনে অমাগো সায়েবরে এট্টু কইবার পারবেন?'

'আলাউদ্দিন মিয়াকে? কি?'

খিজির মেঝেতে নিজের জন্য বিছানা পাতে, ওসমানের দিকে তাকায় না, বিছানা পাতায় সমস্ত মনোযোগ দিয়ে বলে, 'আপনে কইবেন, খিজিরের তো পোলাপান নাই। অর বৌয়ের প্যাটের বাচ্চাটারে মাহাজন যানি নষ্ট না করে!'

'তারপর? বাচ্চা হলে তুমি কি করবে?'

'লইয়া আহুম। একটা বিয়া করুম। ঐ বৌ পোলারে মানুষ করবো।'

খিজিরের এতো সহজ সিদ্ধান্তে ওসমান থ হয়ে যায়। নিজের বিছানা ছেড়ে খিজির এসে বসে ওসমানের তক্তপোষের পা ঘেঁষে, 'বেশিদিন না। কয়টা দিন যুদিল অর মায়ের প্যাটের মইদ্যে বাচ্চাটার জান কবচ করা ঠেকাইতে পারি তয় আমার আর চিন্তা নাই।'

'কেন? মহাজন তো যে কোনো সময়—।'

'আরে না। আইয়ুব খানের দিন খতম হইয়া আইছে। বোঝেন না পাবলিকে কেমুন গরম! অর নিজের মানুষ ব্যাকটি অর পাট্টি ছাইড়া কাইটা পড়ে, আইয়ুব খানে থাকবার পারবো?'

'পারুম না? আইয়ুব খান মোনেম খানে খতম হইলে আমাগো মাহাজন হালার রোয়াবি থাকবো? তহন মহল্লা ছাইড়া হালায় কৈ পলাইবো দিশা পাইবো না। এই তো এই কয়টা দিন! আউজকা আমাগো আলাউদ্দিন সাবে কইলো, আবার ইউনিভারসিটির ছাত্র ভি ভাষণ করলো, আর কয়টা দিন গেলে পুরা পাকিস্তান গওরমেন্ট উল্টা হইয়া পড়বো।'

'তাহলে তুমি এতো ঘাবড়াচ্ছো কেন?'

'ঘাবড়াই না। তয় ধরেন আগেই যুদিল জুম্মনের মায়েরে কিছু করে, তাই হুঁশিয়ার থাকতে চাই। খালি এই কয়টা দিন।' খিজিরের কিং স্টর্ক সিগ্রেট ও বিড়ি খাওয়া এবং চিৎকার-করা গলা মিনতিতে খসখস করে, আপনে খালি কইয়েন, কয়টা দিন রাখতে পারলেই কাম হয়। মাহাজনের দিন এই খতম হইয়া আইলো!'

কিন্তু আলাউদ্দিন মিয়ার কাছে এই আবেদন নিয়ে ওসমান যায় কি করে? লোকটা কি ওসমানকে সহ্য করতে পারবে? রানু যা বললো তাতে মনে হয় রহমতউল্লা তার মেয়ের সঙ্গে ওসমানের বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারে। আলাউদ্দিন মিয়া তাহলে তো ওসমানের সঙ্গে কথাই বলবে না। রহমতউল্লার মেয়েটা দেখতে ভালো, ওসমান ২/৩ বার দেখেছে মেয়েটাও কি তাকে দেখেছে? ওসমানের প্রতি সিতারা কি দুর্বল? মেয়ের দুর্বলতা বুঝতে পেরে রহমতউল্লা হয়তো ওসমানকে ডেকে পাঠিয়েছে। রহমতউল্লার মেয়ে কি তাকে নিয়ে কখনো ভাবে? —মহাজনের মেয়ের ভাবনায় ওসমানের মাথায় বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে থাকে।

৩৫

'আরে আসেন, আসেন!' ওসমানকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আধশোয়া অবস্থা থেকে রহমতউল্লা ইজি চেয়ারের ক্যানভাসে একটু সোজা হয়ে বসলো, 'আপনার লগে আমার কথা

আছে, বসেন।' পাশেই হাতলওয়ালা চেয়ারে বসলো ওসমান, কিন্তু রহমতউল্লা কথা চালিয়ে যায় তার কয়েকজন মিস্ত্রীর সঙ্গে, দোলাই খালের উপর নির্মীয়মাণ রাস্তার কোনো অংশে সিমেন্টের অতিরিক্ত ব্যবহার হয়েছে বলে সে ঝাড়া ১০ মিনিট ধরে তাদের বকে। তারপর তাদের ছাঁটাই করার হুমকি দিয়ে রহমতউল্লাহ ইজি চেয়ারে আরাম করে ফিরে আসে তার প্রায় শোয়া অবস্থায়। ওসমানের মনে হয়, এতোক্ষণ বরং ভালো ছিলো। ওসমানকে এখন যদি সে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তো সে জবাবটা দেবে কি? এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করবে কিভাবে? বলা যায় যে, তার বাবা বা কোনো গুরুজন এখানে নাই, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে সে কিছুই করতে পারবে না। রহমতউল্লা বলবে, ওসমান তার বাবাকে চিঠি লিখুক। কিংবা ঠিকানা দিলে রহমতউল্লা নিজেই চিঠি লিখতে পারে।—ওসমানের বাড়িঘর নাই, সে বিয়ে করে কিভাবে?—রহমতউল্লা বলতে পারে, তাতে কি? তার নিজের মেলা বাড়ি আছে। না, রহমতউল্লার বাড়ি ওসমান কক্ষনো নিতে পারে না। তবে কি-না কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর এরকম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গি বিনীত হওয়া উচিত। রহমতউল্লার মেয়েকে সে কোনোভাবেই বিয়ে করতে যাচ্ছে না, সিতারার জন্য হন্যে হয়ে অপেক্ষা করছে আলাউদ্দিন মিয়া। কিন্তু মেয়েটো সম্বন্ধে একটু বিবেচনা থাকা ভালো। রানুর সঙ্গে মাখামাখিটা বড্ডো বেশি হয়ে যাচ্ছে। রানুর ভাবনা মাঝে মাঝে এমন করে বেঁধে যে এতোটা উত্তেজনা সহ্য করা কঠিন। এমন কি তার এ্যাসিডিটি বেড়ে যাচ্ছে, যখন তখন মাথাও ধরে। নোভালজিন আর এ্যান্টাসিডের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আর কতো সহ্য করা যায়?—বরং অন্য কেউ যদি তার মধ্যে একটু স্পন্দন তৈরি করতে পারে তো ১টা ব্যালান্স হয়, তখন এ্যান্টাসিড আর নোভালজিনের জায়গায় রানু আর রহমতউল্লার মেয়ে তার ভেতর সামঞ্জস্য বিধানের দায়িত্বটা পালন করতে পারে।

'আপনার লগে খিজিরে থাকে?' মহাজনের এই প্রশ্ন শুনে ওসমান ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। চায়ের পেয়ালায় সশব্দে চুমুক দিয়ে রহমতউল্লা বলে, ঐটারে তো চিনেন না! নেমকহারামের বাচ্চা নেমকহারাম! চুরি চামারি কইরা আমার গ্যারেজটারে পল্টনের ময়দান বানাইবার তালে আছিলো। মনে লয় শেখ মুজিবের মিটিং করনের জায়গা বানাইবার নিয়ত করছিলো। আলাউদ্দিনে ভি তারে রাখবার পারলো না! আপনারে কইয়া রাখলাম!'

'আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।' ওসমানের এরকম প্রতক্ষ্য প্রতিক্রিয়া শুনে রহমতউল্লা নড়ে চড়ে বসে। তা সে যতোই নড়ুক, ওসমান এখন অনেক কথা বলতে সক্ষম। মেয়ের সঙ্গে ওসমানের বিয়ে দেওয়া সম্পর্কে রহমতউল্লার সম্ভাব্য প্রস্তাবের কথা ভেবে সে একটু আগে মিষ্টি মিষ্টি লজ্জা পাচ্ছিলো—এই গ্লানিতে ওসমান বেপরোয়া হয়ে ওঠে, খিজিরকে আমার খারাপ লোক মনে হয় না।'

'আপনেরা কারে খারাপ কন, কারে ভালো কন, সেইটা আপনেগো ব্যাপার। মগর ঘর যহন ভাড়া লইলেন তহন একলা থাকনের কথাই তো কইছিলেন।'

'না আমি একা থাকবো এরকম কথা বলে ভাড়া নিইনি।'

'আহা, চ্যাতেন কেন?' রহমতউল্লা চটে না, 'আপনার ভালার লাইগাই কইছিলাম। হালায় চোর তো আছেই, আবার আকামকুকাম যা তা করবার পারে। শুওরের বাচ্চার চোখ দুইখান দেখেছেন? মানুষ ভি খুন করবার পারে, বোঝেন?'

'না, আমার মনে হয় না। খিজির আমার সঙ্গেই থাকবে। আপনার যদি আপত্তি থাকে তো আপনি আমাকে লিখিতভাবে জানাবেন। যদি আমাকে উচ্ছেদ করতে চান তো উকিলের নোটিস পাঠাতে হবে।' ওসমান উঠে দাঁড়ায়। এরপরও রহমতউল্লার কোনো বিকার নাই। চিৎকার করে কাজের লোককে পান আনতে বলে সে ওসমানকে হাত দিয়ে বসতে ইশারা করে, 'আরে বসেন। আপনার লগে কথা আছে কইলাম না?' ওসমান ফের বসে, কিন্তু বিরক্ত হয়, এতোক্ষণ তাহলে হলোটা কি?'

এর মধ্যে নারিন্দার মোড় থেকে কাঁঠালপাতার ঠোঙায় তেহারি এসে পড়লো। ২টো প্লেটে তেহারি সাজানো হলে 'খান' বলে রহমতউল্লা ধোঁয়া-ওঠা তেহারির ভেতর থেকে ছোটো ছোটো গোশতের টুকরা গুছিয়ে একদিকে রাখলো। খেতে খেতে তার গুরুত্বপূর্ণ কথাটি শুরু করলো, 'মকবুল সাবের মাইয়ারে তো আপনে পড়ান, না?'

টেবিলের নিচে ওসমানের পা দ্রুত নড়তে শুরু করে, প্লেটের কোণ থেকে সে পরপর ৩বার সালাদের গাজর ও টোম্যাটো খেয়ে ফেলে।

'মাইয়া তো মনে হয় ভালোই?'

ওসমান কিভাবে রহমতউল্লাকে প্রতিহত করবে মনে মনে তার প্ল্যান করতে চায়। কিন্তু হয় না। রানুর সঙ্গে ওসমানের মেলামেশার অছিলা তুলে বাড়িওয়ালা কি তাকে উচ্ছেদ করবে? কেন, ওসমান কি মাগনা থাকে?—খিজিরকে সহ্য করতে না পেরে আমাকে উচ্ছেদ করতে চাও এখন রানুর সঙ্গে আমার মেলামেশার অজুহাত ধরে! আর কাল যখন খিজির নিজেই এসে তোমার বাড়ি দখল করবে, তখন তাকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা তোমার হবে? তখন?—ওসমানের এইসব নীরব উত্তেজনা চিড় খায় রহমতউল্লার ঘর্ঘর গলার আওয়াজে, 'কইলেন না, মাইয়া কেমুন?'

'কেন?'

'একটা সম্বন্ধ করবার চাই।' খাওয়া শেষ করে রহমতউল্লা টেবিলে রাখা চিলমচিতে হাত ধোয়, কুলকুচো করে এবং মুখ মুছে খিলাল করে। 'এই লাইগা আপনারে ডাকছিলাম। আমার এক সাড়ু ভাই, তার পোলার লগে বিয়া দিবার চায়। আমার সাড়ুভাইয়ের—।'

'আপনার সাড়ুভাই?'

'হ। নবাবপুরে হার্ডওয়ারের দোকান আছে। নাজিরা বাজার আলাউদ্দিন রোডে সাইকেল পার্টসের দোকান। রেশন দোকান আছে কয়েকটা। আবার ওয়ার্ডের মেম্বার, বহুত পুরানা মেম্বার, নবাব সাবগো আমলে বাইশ পঞ্চায়েত আছিলো, নাম হুনছেন?—তহন থাইকাই ওরা—।' বলতে বলতে হঠাৎ তার মনে পড়ে, 'আরে আপনে দেখছেন তো! ঐদিন আইছিলো। এই পয়গাম ঠিক করতেই আমার কাছে আইছিলো। পরে আলাউদ্দিনের কাছে গেলো। শুনলাম আপনাগো সাথে জয়েন করবার কথা কইছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। পাকিস্তান মাঠে মিটিঙে বক্তৃতা করেছে। বিডি মেম্বার থেকে রিজাইন করলেন।'

'চিনছেন?' রহমতউল্লা উৎসাহিত হয়, 'উনির পোলা। উনির বিবি, মানি আমার বিবিসায়েবের বড়োবোন মাইয়ারে দেখছে, পোলায় ভি দেখছে। দোনোজনের পছন্দ। পোলায় আবার মায়েরে ছাড়া কিছু বোঝে না। তা ঐদিন আমি গিয়া মাইয়ারে ডাইকা

কথাবার্তা কইলাম। রংটা ময়লা। তা হোক। এমনিতে আদব কায়দা জানে। ভালো। মকবুল মিয়ারে আমি কইছি।'

'উনি কি বললেন?'

'কি কইবো? পোলার তো টাকাপয়সার অভাব নাই। দোকানপাট, তেজারতি তো আছেই, অর বাপে আবার মার্কেট বানাইতাছে।'

'ঐ যে স্কুল ভেঙে মার্কেট বানাচ্ছে?'

'আরে, ঐটা লইয়াই তো ভাইসাবে আমার ফাইসা গেছে। ইস্কুলের লগে জমিন অগো, এজমালি সম্পত্তি। ইস্কুল বিল্ডিং বহুত পুরানা, নবাব সলিমুল্লা সাবের ভি আগে আতিকুল্লা সাব কয়দিনের লাইগা নবাব হইছিলো, উনার জমানার ইস্কুল। ইস্কুল বিল্ডিং ধইসা পড়ে দেইখা ঐটা মেরামত করনের কন্ট্রাক্ট পাইছিলো ভাইসাবে। ঐ বিল্ডিং মেরামত কইরা ফায়দা নাই, আবার ভাইঙা পড়বো। ইস্কুল ভাইঙা তাই নিজের জমিনের লগে মিলাইয়া মার্কেট তুইলা দিছে। পাবলিকে বহুত চেতছে। ভাইসাবে আমার একবার এদিক ফাল পাড়ে, একবার ওদিক ফাল পাড়ে। অহন তাই আওয়ামী লীগের লগে লাইন দিবার চায়। আমারে কয়, আপনে ঠিকই আছেন, আপনে পুরানা দল লইয়া থাকেন, আমি যাই অগো লগে। আমি কই, ভাইসাব পুরানা চাল ভাতে বাড়ে। একবার যে মসজিদের মইদ্যে—।' এই দীর্ঘ সংলাপে ভায়রার বৈষয়িক ও রাজনৈতিক তৎপরতা সম্বন্ধে রহমতউল্লার মনোভাব বোঝা যায় না। এই নিয়ে ওসমানের মাথা ঘামাবার দরকার কি? রহমতউল্লার প্রস্তাবে মকবুল হোসেনের প্রতিক্রিয়া জানাটা বরং অনেক জরুরি। 'তা মকবুল সায়েব আপনাকে কি বললেন?'

'উনার কথা ক্লিয়ার না। কয়, মাইয়া নাকি ল্যাখাপড়া করতে চায়। আবার পোলায় বিএ পাশ নাকি এইটা জিগায়। আরে, বিএ এমএ রাস্তার মইদ্যে গড়াগড়ি যাইতাছে।'

'আমি কি করবো?'

'আপনে এট্টু কইবেন। আপনে কইলে মনে লয় মাইয়া না করবো না।'

রহমতউল্লাহ মিষ্টি করে হাসে, 'ভালো কইরা বুঝাইয়া কইয়েন। এমুন দুলা পাইবো কে? আপনেরে মনে হইলো অর বাপে ভি খুব মানে।'

তাই কি?—ঘরে ফিরে প্যান্ট শার্ট না খুলেই বিছানায় শুয়ে ওসমান এই সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। ঠিক সমস্যা নয়, প্রশ্ন বলা চলে।—রানুর বাবা মকবুল হোসেন তার ওপর কতোটা ভরসা করে? তা করে বৈ কি! কারফ্যুর সময় রাস্তায় কোনো আওয়াজ হলে ছুটে চলে আসে এই ঘরে। লোকটা বেশিরকম ভীতু, কোনো বিপদের আঁচ করলেই ওসমানের সঙ্গে তাই নিয়ে কথা বলে ভয়ের ধারটা ভোঁতা করে নেয়। মকবুল হোসেন এলে রহমতউল্লার প্রস্তাবটা সরাসরি বলা ঠিক হবে? লোকটা যাচ্ছেতাই রকম মেরুদণ্ডহীন। বাড়িওয়ালাকে স্পষ্ট ভাবে হ্যাঁ বলেনি কেন? মেয়ের বাপ হয়ে সে কি বুঝতে পাচ্ছে না যে

রানু ক্রমেই তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে? গতকাল, না পরশু? নাকি তার আগের দিন? কবে যেন বিকালবেলা, হ্যাঁ বিকালবেলাটা ঠিক মনে আছে, রানুকে দেখে ওসমানের মাথা ঝিমঝিম করছিলো। ওসমান তখন বাইরে থেকে ফিরছে, রাস্তা থেকে ওপরে চোখ মেলে দ্যাখে রানু শাড়ি তুলে নিচ্ছে রেলিঙ থেকে। তার চোখে হঠাৎ ফোকাস মারে রানুর চোখ। হ্যাঁ, রানুর চোখ আলোয় ঝকঝক করছে। এতো আলোয় ওসমানের চোখে ধাঁধা লাগে, অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে সিঁড়িতে বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে সে মনে করতে চেষ্টা করে, ঠিক এরকম ধারালো চোখ সে আর কোথায় দেখেছে? কোথায়? এক্ষুনি মনে পড়লো, হ্যাঁ, এই চোখ একদিন ঠিকরে পড়েছিলো রহমতউল্লার দিকে। রহমাতউল্লা ভাগ্যিস ঐ চোখে চোখ রাখেনি, নইলে শালা মহাজনের জং-ধরা চোখজোড়া পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। ঐ চোখজোড়া ছিলো রানুর বোবা বোনের। পরশু বিকালবেলা রানু কি তার চোখের কোটরে বোনের চোখের মণি সেট করে নিয়েছিলো? এটা যদি পার্মানেন্ট হয় তো মকবুল হোসেনের কপালে দুঃখ আছে।

'আপনের বই!' রঞ্জু খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে বসতে বসতে ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের পাতায় মোড়ানো একটা বই ওসমানের হাতে তুলে দেয়, আপাকে পড়তে দিছিলেন না? নেন।'

টেবিলে 'পথের পাঁচালী' রাখতে রাখতে ওসমান ওপরের মলাট দ্যাখে, বাঃ! খুব সুন্দর মলাট দিয়েছো তো?'

'আপা দিছে। বইটা খুইলা দ্যাখেন!'

'আজ তোমরা পড়তে এলে না যে?'

'আপনে তো ঘরেই ছিলেন না। আমি বই নিয়া দুইতিনবার আসলাম। খুইলা দ্যাখেন না!'

'কেন?'

'পাতা টাতা ছিঁড়তে পারে। আপায় বললো, বই ফেরত নেওয়ার সময় দেইখা নিতে হয়।'

করুণ চোখ করে ওসমান তাকায় রঞ্জুর দিকে। রানু তার সম্বন্ধে ভাবেটা কি? রানু যদি ওসমানের ১টি বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলে তো তাতে কি এসে যায়? রানুর কাছে ওসমান কি ১জন অতি সতর্ক, স্বার্থপর ও মালিকানা সচেতন ব্যক্তি?

'খোলেন না'! রঞ্জু অধৈর্য হয়ে নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানায় তার পাশে বসে পথের পাঁচালীর মাঝামাঝি খুলে ফেললে ওসমানের চোখে পড়ে রুলটানা কাগজের ছোটো ১টি টুকরা। সেখানে রানুর হাতের লেখা। ওসমান পর পর কয়েকটি ঢোঁক গেলে এবং হঠাৎ-ভয়-পাওয়া ছেলের মতো রানুর লেখা চিরকুট ওভারটেক করে চোখ গুঁজে দিলো চিরকুটের নিচে বইয়ের মুদ্রিত লাইনগুলোর ওপর: দুপুরে কেহ বাড়ি নাই, কৌটাটা হাতে লইয়া অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বৈশাখ দুপুরের তপ্ত রৌদ্রভরা নির্জনতায় বাঁশবনের শন্‌শন্‌ শব্দ অনেক দূরের বার্তার মত কানে আসে! আপন মনে বলিল—দিদি হতভাগী চুরি করে এনে ওই কলসীটার মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিইছিলো!

কিন্তু দুর্গার সিঁদুর কৌটা চুরি আবিষ্কারের গ্লানি ও দুঃখ ওসমানকে একটুও আড়াল দেয় না; দুর্গার মতো বোন তার কোনোদিন ছিলো না বলে তার অকালমৃত্যুর শোক থেকে সে

নিদারুণভাবে বঞ্চিত। রানুর চিরকুটটা তাকে পড়তেই হয়: বাড়িওয়ালা আজও এসেছিল। অঙ্কাকে দেখা করতে বলিয়াছে। আমার ভয় লাগে। কাহারও ইচ্ছা হইলে দায়িত্ব পালন করুক।—পড়া শেষ হতে না হতে ওসমানের শরীরের রক্ত সব মাথায় ওঠে, মাথার করোটি ভেদ করে উপচে ছলকে পড়ার উপক্রম হয়। হয়তো তাই সামলাবার জন্যে মনোযোগ দেয় রানুর বানান ভুলে। রানুর বাক্যবিন্যাসের সাধু ও চলিত রীতির গোলমাল বড়ো প্রকট। অঙ্ক করাবার ফাঁকে ফাঁকে রানুর বাঙলাটাও দ্যাখা দরকার। রানুর আঙুল ধরে ধরে তার বানান ঠিক করে দেবে। ওসমান এখনি নিজের হাতে রানুর কালো ও রোগা আঙুলের নরম স্পর্শ পাচ্ছে। শরীরের পুলকে এক পলকের জন্য চোখ বন্ধ করলে রানুর চোখের মণি ঝকঝক করে ওঠে। সেই ধারালো আভায় তার নিজের চোখের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে ভেবে সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে পাশে তাকায়, সেখানে রঞ্জুর মুখ। চট করে চোখ ফিরিয়ে নেয় রানুর চিঠিতে। ১বার ২বার ৩বার ৪বার ৫বার পড়তে পড়তে রানুর চোখ থেকে ধার-করা-আলোতে উদ্ভাসিত তার চোখ দিয়ে শুষে নেওয়া হয় চিঠির আভা। আভা মিলিয়ে গেলে পড়ে থাকে চিঠির ধড়, প্রাণহীন চিঠির লাশ বড়ো অস্বস্তিকর। রানুর এই চিঠি লেখার মানে কি? রানুকে তো ঘুণাক্ষরেও ওসমান কোনো দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলেনি। তাহলে? রানু কি চায় যে বাবাকে বলে হার্ডওয়্যার, রেশন দোকান ও স্কুল ভেঙে তৈরি মার্কেটের মালিকের সঙ্গে তার বিয়েটা ওসমান ঠেকিয়ে দিক? কোনো মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার আয়োজন প্রতিহত করতে ওসমান সবসময় প্রস্তুত। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি তার সাহায্য চায় তো কথাই নাই, তার নিরাপত্তার জন্যে এগিয়ে না যাওয়া আর রায়টের সময় আক্রান্ত কোনো মহিলার আর্তনাদে সাড়া না দেওয়া একই ধরনের অপরাধ। কিন্তু রানু এখানে গোটা ব্যাপারটাকে প্যাঁচালো ও গোলমেলে করে ফেলছে। রানু যে শুধু একা বাঁচাতে চাইছে তা নয়। ওসমানের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে। ওসমানকে সে পালাতে বাধ্য করতে চায়। ওসমান কোত্থেকে পালাবে?—কিংবা রানুকে নিয়ে কোথায় পালাবে? আর রানুকে নিয়ে পালাবে কিভাবে? সামনে, পেছনে, ডানদিকে সব গলি, সরু ও রোগা গলি। গলির মোড়ে মোড়ে ময়লা-উপচানো ডাস্টবিন, খোলা ম্যানহোল, নালায় থিকথিক করছে গুমুত; গলির মাথায় মাথায় জড়ানো জাপটানো তারের জটওয়ালা মাথার পোল থেকে ঝুলছে ইলেকট্রিসিটির ছেঁড়া তার। আবার দ্যাখো, বড়ো রাস্তায় ট্রাফিক জাম; রিকশায়, ট্রাকে, বাসে, স্কুটারে, ঠেলাগাড়িতে, কারে, হোণ্ডায়, সাইকেলে গেরো-লাগা জামের ভেতর চলা কি সোজা কাজ? আর শালা ট্রাফিক পুলিস কি-না তাকে দেখতে পেয়ে ট্রাফিক জাম ছাড়াবার কাজ বাদ দিয়ে, ট্রাক ড্রাইভারের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়া স্থগিত রেখে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। তার পিঠের ওপর রানুর জ্যান্ত ধড়, এই ধড় নিয়ে দৌড়াবার গতি পাওয়া যায় না। এই বিছানা, এই চিলেকোঠার ঘর, এই বাড়ি থেকে দৌড়ে পালাবার জন্যে ওসমানের পায়ের পাতা কাঁপে। ডান পা বিছানা থেকে নিচে নামিয়ে দিলে সেটা মেঝে স্পর্শ করে ও সেখানেই একটু একটু দোলে। পায়ের দুলুনি সাঁ সাঁ করে বাড়ে এবং ধাক্কা খায় রঞ্জুর বাঁ পায়ের সঙ্গে। এমনি সাদামাটা করে বললে, তার ডান পায়ে সে মৃদু লাথি দিতে থাকে রঞ্জুর বাঁ পায়ে। রঞ্জু একটু সরে বসেও রেহাই পায় না, কারণ ওসমানের পায়ের কাঁপন বেড়েই চলে। এখন নিজের বাঁ পাটি নামিয়ে দিলেই ওসমান ছুটে বেরিয়ে একটা দৌড় দিতে পারে বাইরে। রানু কিন্তু বুঝতেই পারবে না, ভোঁ দৌড়ে ওসমান

চলে যাবে, চলে যাবে তাদের কলপাড়ে। টিউবওয়েলের হ্যাণ্ডেল ধরে পাম্প করে কলসিতে পানি ভরছে আম্মা। কলপাড় পার হয়ে ছাইগাদার পাশে নেবুতলায় দাঁড়িয়ে সে ডাক শোনে, 'রঞ্জু! রঞ্জু' কিন্তু ওসমান দাঁড়াতে পাচ্ছে কৈ? তার পায়ে যেন পাল খাটানো হয়েছে, ডাঙার ওপর তরতর করে পা বেয়ে নিয়ে সে চলে বিলের কিনার ঘেঁষে, পার হয়ে যায় দীপচাঁদ মুচির বাড়ি; আরেকটু, আর একটুখানি গেলেই রেললাইন। রানু যে কখন খসে পড়েছে পিঠ থেকে ওসমান খেয়াল করেনি। দুর্গাটা থাকলে আজ একসঙ্গে রেলগাড়ি দ্যাখা যেতো! অনেক দূর থেকে দুর্গা তাকে ডাকে, 'রঞ্জু! রঞ্জু!'—দুর্গা? না আম্মা?—ওসমান বিড়বিড় করে সেই ঝাপশা ডাকের প্রতিধ্বনি করে, 'রঞ্জু! রঞ্জু!'

'জী?' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় রঞ্জু, ওসমানের দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকায়, 'কি হলো?'

ওসমানও উঠে দাঁড়ালে রঞ্জু সিঁড়ির দিকের দরজায় সরে যায়, 'আমি এখন যাই। আপনি কিছু লেইখা দিবেন?'

ওসমান হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ে, 'পরে। এ্যাঁ? পরে কেমন?'

'দরজা খুইলা ঘুমান?' খিজির আলি ঘরে ঢুকলে ওসমান শুয়ে শুয়েই হাই তোলে, 'না, ঘুমোলাম কোথায়? এতো রাত করলে যে?'

'পিয়ারু সর্দারের খবর জানেন?' খুশি হয়ে খিজির জানায় পোস্তগোলার পিয়ারু সর্দার, ৫০/৫৫টা রিকশার মালিক, আজ মৌলিক গণতন্ত্রী পদ থেকে রিজাইন দিয়েছে, পোস্তগোলার মাঠে আজ সে মিটিং করলো। আলাউদ্দিন মিয়াও মিটিঙে ছিলো, তাকে বেবি ট্যাকসি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো খিজির নিজে। এখন আইয়ুব খানের দালালীতে একনিষ্ঠভাবে লেগে রয়েছে পুলের ওপার হাবিব ফকির আর এদিকে রহমতউল্লা। তা এদের আর বেশি দিন টিকতে হবে না। রহমতউল্লার অবস্থা পাগলা কুত্তার মতো, লোকজন দেখলেই খালি ঘেউঘেউ করে, 'আরে মিয়া মিলিটারির তো ডাণ্ডা দ্যাহো নাই। মিলিটারি ভালো কইরা নামলে এইগুলি ফাল-পাড়া কৈ যাইবো, দেইখো!' আজ সন্ধ্যার পর তার ব্লাড প্রেশার খুব বেড়ে গিয়েছিলো, আলাউদ্দিন মিয়া খোঁজ নিতে গেলে তার সঙ্গে ভালো করে কথাও বলেনি। খিজির বুঝতে পারে না, ঐ ইবলিসটার জন্যে আলাউদ্দিন মিয়ার এতো মাথাব্যথা কিসের? মহাজনের মেয়ে সিতারা তো আলাউদ্দিন মিয়ার হাতে চলেই এসেছে। এখন তার আর ভাবনা কি?—এমনকি সেদিন খিজিরকে দিয়ে আলাউদ্দিন মিয়া 'হীরা আওর পাত্থর' ছবির টিকিট নিয়ে এলো। খিজির ছাড়া আর কেউ জানে না, ছবি দেখতে গিয়েছিলো আলাউদ্দিন মিয়া আর সিতারা। ওসমান কারো কাছে ফাঁস না করে তো খিজির একটা কথা বলে। কি? বেবি ট্যাক্সি চালিয়ে ওদের মধুমিতা সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলো খিজির নিজে। 'হীরা আওর পাত্থর' দ্যাখার মতো একটা বই বটে! জেবা-ওয়াহিদ মুরাদের অভিনয়, ৪বার দেখেও খিজিরের আশ মেটেনি।—ঐ ছবির কাহিনী বলতে বলতে খিজিরের স্বর ওঠানামা করে। হঠাৎ একেকটি রিকশা কি স্কুটর চলার আওয়াজে

রাত বাড়ে কয়েক ধাপ করে। জেবা ও ওয়াহিদ মুরাদের পরিণতি শোনাবার আগেই খিজির ঘুমিয়ে পড়ে। তার বিড়ির আগুন জ্বলে না, তার নিশ্বাসের বাজনা ছাপিয়ে ওঠে ঘরের নীরবতা। ওসমানের বুক কাঁপে: হাড়্ডি ব্যাটা কি ঘুমিয়ে পড়লো? এখন ছুটে বাইরে বেরুবার জন্য ওসমানের পাজোড়া যদি ফের কাঁপে তো কি হবে?

৩৬

'আজ তাড়াতাড়ি আসবেন। দুপুরে আপা পড়তে আসবে।' দরজায় তালা লাগাচ্ছিল ওসমান, সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে রঞ্জু বলে, 'তাড়াতাড়ি আসবেন।'

রঞ্জু ফিকফিক করে হাসলে ওসমানের মাথার ভেতর রক্ত ছলকে ওঠে, 'অফিস ছুটি না হলে আসবো কি করে?

'রবিবারে অফিস?'

'আজ সোমবার। অফিস করে খেয়েদেয়ে ফিরবো। দেরি হবে।'

'সার্জেন্ট জহুরের রক্ত'—'বৃথা যেতে দেবো না'; 'গোলটেবিল না রাজপথ'—'রাজপথ রাজপথ'; 'জেলের তালা ভাঙবো'—'শেখ মুজিবকে আনবো'।—ইত্তেফাকের সামনে ওসমানকে রিকশা ছেড়ে দিতে হলো। এখন প্রবলেম হলো,—মিছিল সম্পূর্ণ চলে যাওয়া পর্যন্ত ওসমান কি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে? নাকি মিছিলের ভেতর দিয়ে রাস্তা ক্রস করে অফিসে চলে যাবে? মিছিলে কামালকে দেখে ওসমান এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়, 'এই কামাল, অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছেন? অফিসে কি স্ট্রাইক নাকি?'

'আজ রোববার না?'

'আজ সোমবার।' ওসমান জোর দিয়ে বলে, 'মতিঝিলের সব অফিস থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছে।'

'আপনি কি পাগল হলেন নাকি? আজ রোববার।' কামাল এগিয়ে যায়।

ওসমান বিরক্ত হয়ে মিছিলের এক পাশে দাঁড়ায়, সোমবারকে বলার মধ্যে পাগলামির কি হলো?

'আরে ওসমান ভাই? আসেন, আসেন।' শাহাদতের আহ্বানে ওসমান ওর পাশে চলতে শুরু করে। সোমবারের ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে উদগ্রীব, 'আজ তো সোমবার, না? অফিসে বোধহয় স্ট্রাইক। কিন্তু রিকশা তো চলছে।'

এই ব্যাপারে শাহাদতের কোনো মতামত আছে বলে মনে হয় না, 'আপনার কথা একটু আগেই জিগ্যেস করছিলাম। ঐ যে আপনাদের পাড়ায় ঐ রিকশাওয়ালা—কি নাম যেন?—ওকে জিগ্যেস করলাম।'

'খিজির? খিজির এসেছে নাকি? মিছিলে আছে?'

'হ্যাঁ সামনের দিকে।' শাহাদতও জোর পা ফেলে সামনে চলে যায়, পেছনে চলে যায়, পেছনে কোনো কর্মীকে সে উপদেশ দেয়, 'প্রসেশনে ডেড-বডি আছে। পাবলিক যেন ওয়াইল্ড না হয়ে যায়!' ওসমান তখন পাশের লোককে জিগ্যেস করে, 'কার ডেড-বডি ভাই?'

লোকটি জবাব না দিলে পেছন থেকে কে যেন বলে, 'আপনি বোধ হয় পাকিস্তানের ইনফর্মেশন মিনিস্টার। আগরতলা মামলার আসামীকে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর গুলি করে মারে, আপনি খবর রাখেন না?'

এইবার হঠাৎ করে মনে পড়ে, এই হত্যার খবর ওসমান পেয়েছে কাল বিকালে, রেক্সে বসে চা খেতে খেতে। সেই বন্দি কি বুলেটে নিহত? ক্যান্টনমেন্টে আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আর কি ব্যবহার করবে? মিছিল চলছে, মিছিলের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওপরদিকে তাকালে চোখে পড়ে উড়ন্ত ইলেকট্রিক তার থেকে ঝোলে বুকে-বুলেট-বেঁধা লাশ। দেখতে দেখতে মৃতদেহের ২ হাত থেকে ঝোলে আরো ২টো বুলেট-বিদ্ধ লাশ। ২ জনের ৪ হাত থেকে আরো ৪ জনের লাশ। মিছিলের ভেতর দিয়ে সেই লাশের উল্লম্ব সারি চলে, মানুষের সঙ্গে যে কোনো মুহূর্তে তাদের ঠোকাঠুকি লাগতে পারে। সবাইকে সাবধান করা দরকার। কিন্তু কামাল কোথায়? শাহাদত কোথায়? খিজির কোথায়? ওদিকে বায়তুল মোকাররমের সামনে থেকে মাইকে দুর্বোধ্য ধ্বনি বেজে ওঠে, ওসমানের মাথা ঘুরে ওঠে বোঁ করে, দেখতে দেখতে মৃতদেহের সারির সঙ্গে সমস্ত মিছিল অদৃশ্য হয়ে যায়। টলোমলো পায়ে ওসমান ফিরে যায় নবাবপুরে, মোহাম্মদিয়া রেস্টুরেন্টে একটু বসে চা খায়। মনে হয় ওদিকে বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেলো। কি শেষ হলো সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা করতে না পেরে বাইরে এসে হাঁটতে থাকে নবাবপুর রোড ধরে। নবাবপুরে অজস্র মানুষ, প্রায় সবাই যাচ্ছে বায়তুল মোকাররমের দিকে। দক্ষিণে যাচ্ছে সে একা। দোকানপাট বেশির ভাগই বন্ধ, যানবাহন খুব কম। ওসমানের হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আজ বোধহয় গোটা ঢাকা শহর জুড়ে নবাবপুর প্রসারিত, এই রাস্তা আর শেষ হয় না।

ঘরে ঢুকে গ্লাস দুয়েক পানি খেলে গলার খটখটে ভাবটা কমে, কিন্তু পেটের ওপর দিকটা চিনচিন করে ওঠে। ভুল হয়ে গেলো, কোথাও খেয়ে নিলো ভালো হতো। রানু যদি অঙ্ক করতে আসে তো এই দারুণ খিদে নিয়ে অঙ্কের ভুলগুলো সনাক্ত করা কঠিন হবে। খিজির এলে ভালো হতো। খিজির ঘরে থাকলে রানুর অঙ্কে ভুল ধরার দায়িত্ব থেকে ওসমান অব্যাহতি পায়। আবার খিজিরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া যেতো যে ঐ বন্দির ঠিক কোন জায়গাটায় বুলেট বিদ্ধ হয়েছিলো। দরজা বন্ধ করে শুতে শুতে খিজিরের ওপর ওসমানের রাগ হয়: মিছিলের সামনে থেকে সে দিব্যি চলে গেলো, একবার খোঁজও করলো না, ওসমান মিছিল থেকে একরকম বহিষ্কৃত হয়ে একা একা এই দীর্ঘ পথ হেঁটে কি রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর রাস্তাও বটে একখানা। আজ কি নবাবপুরের ভীমরতি ধরেছিলো যে গোটা ঢাকা মহর জুড়ে শালা শুয়েছিলো গতর ছড়িয়ে? আর্মানিটোলা, পটুয়াটুলি, ইসলামপুর, তাঁতীবাজার সব কি সে দখল করে বসেছিলো আজ? নবাবপুর ধরে হাঁটতে হাঁটতে গরমে হাঁসফাঁস করে, এই হাঁটার মনে হয় আর কোনো শেষ নাই। এদিকে খিদেও পেয়েছে খুব। দূরসম্পর্কের চাচার বাড়ি থেকে পাওয়া যায় মোটে ২ আনা পয়সা, তা দিয়ে বাসে করে ঘরে

ফিরবে, না টিফিন পিরিওডে কিছু খাবে? কতোকাল আগেকার সেই ক্ষুধা মেশে আজকের খিদের সঙ্গে। মাথার ভেতর ভোঁতা ঠেকে, ভোঁতা মাথায় কি বর্তমান কি অতীত কাউকেই ভালো করে ধরা যায় না। মাথার ভেতরটা বড়ো দোলে, শুধু দোলে। এই দুলুনিতে ঘোড়ার গাড়ির গড়িয়ে চলাটা বেশ বোঝা যায়। সবেধন নীলমণি ২ আনা দিয়ে স্কুলের গেট থেকে আমড়া কি চালতার আচার খেয়ে ফেলেছে, এখন বাড়ি পর্যন্ত পাড়ি দিতে হবে হেঁটে। এতোটা পথ হাঁটা কি সোজা কথা? ওসমান তাই উঠে বসেছে একটা ঘোড়ার গাড়ির পেছনের পাদানিতে। কোচোয়ান টের না পাওয়া পর্যন্ত যতোদূর যাওয়া যায়! ঘোড়ার গাড়ি চলেছে, ঘোড়াজোড়া ছুটছে, গাড়ি গড়িয়ে যাচ্ছে, পেছনের পাদানিতে বসে দুলছে ওসমান। ভোঁতা ক্লান্তি ও একঘেয়ে দুলুনিতে তার ঘুম পায়। কোনো এক পিচ্চি কেটলিতে চা নিয়ে রাস্তা ক্রস করতে করতে চ্যাচায়, 'গাড়িকা পিছে মানু'। গোড়ার গাড়ির ছাদ থেকে কোচোয়ানের চাবুক এসে পড়ে তার মাথায় ও বুকে। গাড়ির পাদানি থেকে লাফিয়ে নামতে নামতে চাবুক উড়ে যায় সামনের দিকে। ঘোড়ার গতি বাড়ে। কোচোয়ান পলকের জন্য মুখ ফিরিয়েছিলো। আরে এ তো খিজির! খিজির তাকে চিনতে পারলে কি তার গাড়ি থেকে এভাবে নামিয়ে দেয়? 'খিজির! খিজির! আরে আমি। দাঁড়াও। আরে এই খিজির—।'

কিন্তু খিজির আলি ফিরেও তাকায় না। ঘোড়ার গাড়ি দেখতে দেখতে চলে যায় অনেক দূরে। ওসমান রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে, এমন সময় প্যাঁক প্যাঁক করে রবারের হর্ন বাজায় মুড়ির টিন মার্কা ঝরঝরে বাস। চমকে উঠে সরে দাঁড়ালে বাসের গায়ে কণ্ডাক্টর দমাদম বাড়ি মারে। বাসের প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজে অথবা বাসের গায়ে কণ্ডাক্টর দমাদম বাড়ি মারার ফলে ওসমান বিছানায় উঠে বসে। কিছুক্ষণ পর বোঝা যায় দরজায় কে যেন আস্তে আস্তে টোকা দিয়ে চলেছে।

'আপনের শরীর খারাপ? রানু একবার আসছিলো, রঞ্জু আসলো কয়েকবার। সারাদিন দরজা বন্ধ। কি হইছে?' মকবুল হোসেনের উদ্বেগ দেখে ওসমান হাসে, 'না এমনি।'

'অসময়ে ঘুমান? ভাত খাইছেন?'

ওসমান ঘড়ি দ্যাখে। 'একটু পর নিচে যাবো।'

'কারফ্যুর ভিতর কৈ যাইবেন?'

'কারফ্যু?'

বিছানায় বেশ জুত করে বসে মকবুল হোসেন, বসতে বসতে ওসমানকে ভালো করে দ্যাখে। 'আজ খুব গোলমাল হইছে, জানেন না?'

'হ্যাঁ ফেরার সময় রথখোলার মোড়ে লাল রায়ট কারটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। টিয়ার গ্যাস ছুঁড়লো। আনোয়ার আর আমি একসঙ্গে ফিরছিলাম।'

বলতে বলতে ওসমানের ভুল ভাঙে, রথখোলার মোড়ে রায়ট কার দ্যাখার ঘটনাটি বেশ কয়েকদিন আগেকার। ওটা কি রথখোলার মোড়ে দেখলো? নাকি জিপিওর সামনে? নাকি আর্মানিটোলা স্কুলের মাঠে? তবে আজ সে কি দেখলো? ঘোড়ার গাড়ির পেছনের পাদানি থেকে খিজির তাকে নামিয়ে দিলো কবে?—মাথার ভেতর একটার পর একটা মরা গেরো পড়ছে, সেগুলো খোলা কি সোজা?

মকবুল হোসেন বলে, 'কোন মিনিস্টারের বাড়ি নাকি আগুন লাগাইয়া দিছে। দ্যাখেন তো এরকম করলে দেশে ল এ্যাণ্ড অর্ডার থাকে?'

'কখন? কোন মিনিস্টারের বাড়ি?' মন্ত্রীর বাড়ির আগুনের শিখায় ওসমানের মাথার জট পুড়ে যায়, সবগুলো গেরো খুলে গেলে চেয়ারে বসে সে সিগ্রেট ধরায়।

'দ্যাখেন তো মিনিস্টারের বাড়ি পোড়াইলে লোকসান কার?' এই ঘটনায় মকবুল হোসেন বেশ অসন্তুষ্ট, 'গভর্মেন্ট প্রপার্টি মানে পাবলিক প্রপার্টি, তাই না?'

'হোস্টাইল আর এনিমি গভর্মেন্টের প্রপার্টিতে মানুষের রাইট কতোটা? এসব থাকলে মানুষের লাভ কি? নষ্ট হলেই বা কি?'

'কিন্তু বাড়াবাড়িটা কি ভালো? এই যে জ্বালানো পোড়ানো শুরু হইছে—।'

'গভমেন্ট এতোদিন ধরে, এতোকাল ধরে যে অত্যাচার চালাচ্ছে, তার তুলনায় এটা কি? মানুষ যদি এটুকু না করে তো নেতাদের আপোষ করার স্কোপ থাকে, বুঝলেন?' তার কথা মকবুল হোসেন বুঝলো কি-না পরোয়া না করে ওসমান বলে, 'জ্বালানো পোড়ানো এমন অবস্থায় এসেছে যে বড়ো বড়ো নেতারা ইচ্ছা করলেও আর পিছিয়ে যেতে পারবে না। ধরেন, ইচ্ছা থাকলেও শেখ সায়েব কি এখন প্যারোলে বেরিয়ে এসে রাউন্ড টেবলে যেতে পারবে?'

'না, এখন আর প্যারোলে আসে ক্যামনে?'

'আর দ্যাখেন, গভমেন্ট নিজেই আইন মানে না। কথায় কথায় গুলি করে, নিরীহ মানুষকে খুন করে তো পাবলিক সে তুলনায় কি করেছে, বলেন?'

'কি করছে?' প্রশ্নবোধক বাক্যটি দিয়ে মকবুল হোসেন ওসমানের ওপর আস্থা জানায়। তার নিজের বা পারিবারিক বা বড়োজোর পেশাগত ব্যাপারের বাইরে কোনো বিষয়ে মতামত পোষণ করার সুযোগ তার কোনোদিন হয়নি। ওসমানের মতামত সমর্থন জানাবার জন্য তাই সে ছটফট করে। 'আমার তালেবটারে দ্যাখেন না, কথা নাই বার্তা নাই—।' আবার আবু তালেব এবার গোটা ঘর জুড়ে ঝুলে থাকার আয়োজন করছে? ওসমান উঠে দাঁড়ায়, ছাদে যেতে যেতে আড়চোখে ঘরের ভেতরটা তদন্ত করে। না, ঘরের শূন্যতা একেবারে নিরাভরণ।

ছাদে পেচ্ছাব করে ঘরে ফিরতে ফিরতে সিঁড়ির কোনো ধাপ থেকে শোনা যায় রানুর গলা, 'আচ্ছা।' মকবুল হোসেন বলে, 'ভাত উপরে পাঠাইয়া দিস।'

সিঁড়ির দিকের দরজা দিয়ে ওসমান দ্যাখে রানু আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। এই ঘরের আলো একটু ময়লা হয়ে পড়েছে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ পর্যন্ত। রানুর পিঠ জুড়ে ছড়ানো চুল। চুলের ওপর পড়ে আলো একটু সাফসুতরো হয়েছে, চুলের রাশি তাই চিকচিক করে। ওসমান ওর চুল দেখতে দেখতে মেয়েটা সিঁড়ির বাঁক ঘুরলো। সেখানে অন্ধকার। রানুর ঠিক পেছনের ধাপে আবু তালেবের বুলেট-বিদ্ধ শরীর। ওসমান ঐ দরজার কাছে গেলে রানুকে সতর্ক করার জন্য ছোট্টো করে কাশলে রানু পেছনে তাকায়। তালেবের শরীর তখন সলিড আকার ধারণ করেছে। তাই দেখেও রানুর চেহারা অপরিবর্তিত রয়ে যায়। রানুর পেছনে তালেবও অন্ধকারে নিচে নেমে গেলে ওসমান দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে, নাঃ! মরে যাওয়ার পরও তালেব রানুর আস্থা এতটুকু হারায়নি।

চেয়ারে বসে ওসমান ভদ্রতা করে, 'আবার ওকে খাবার আনতে বললেন কেন? ঘরে পাউরুটি ছিলো।'

'ঘরে যা আছে তাই খাইবেন। ইলিশ মাছ খান তো? তালেবের মায় সর্ষা বাটা দিয়া ইলিশ মাছ রানছে।'

'খাই। ইলিশ আমার ভালো লাগে। ছোটবেলায় ঢাকায় এলে আব্বা রোজ ইলিশ মাছ আনতেন। গ্রামে থাকতেও পদ্মার ইলিশের নাম শুনতাম খুব।'

'ধলেশ্বরীর ইলিশ যদি খাইতেন তো বুঝতেন। ধলেশ্বরীর—।' মকবুল হোসেন হঠাৎ খেয়াল করে যে চোখজোড়া যতোটা পারে খুলে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওসমান। তার ঠোঁট আবার সেই পরিমাণ চাপা। মনে হয় ভয়ে কিংবা বিস্ময়ে তার ভ্রূজোড়া কাঁপছে। মকবুল হোসেনও ভয় পায়, 'কি হইলো? কি?'

ওসমানের মনোযোগে এদিকে ফেরাতে না পেরে মকবুল হোসেন বিছানা থেকে নেমে সিঁড়ির দরজার দিকে যায়। সিঁড়ির প্রথম কয়েকটি ধাপে ঘরের আলোর ময়লা আঁচল লোটানো। ধাপে ধাপে আলো আরো ময়লা হয়। অন্ধকার গাঢ় হতে হতে নিচের ধাপগুলোকে নিজের খাপের ভেতর গায়েব করে ফেলে। 'ভয় পাইছেন?' মকবুল হোসেন স্নেহতেলতেলে আওয়াজে তার ভয় তাড়াবার চেষ্টা করে, 'ভয়ের কি আছে? এ্যাঁ? আমি আছি না?'

'ভয় পাবো কেন?' ওসমান চটচটে আদর প্রত্যাখ্যান করে, 'আরে ভাই ভয় পাওয়ার কি হলো? এতো সহজে ঘাবড়াই না আমি, বুঝলেন?' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো। এর ক্ষতিপূরণ হিসাবে মকবুল হোসেনকে ধলেশ্বরী ও ইলিশের প্রসঙ্গ ফিরিয়ে দিতে চায়, 'ইলিশ তো জানি পদ্মারই ভালো।'

একটু আগে প্রকাশিত ওসমানের বিরক্তি মকবুল হোসেন গায়ে মাখে না। কেউ রাগ করলে বা বিরক্ত হলে তার প্রতিক্রিয়া দ্যাখানো মানে নতুন ঝামেলা তৈরি। এছাড়া ধলেশ্বরী তার বড়ো প্রিয় বিষয়। এ থেকে চট করে সরে আসা তার পক্ষে কষ্টকর। মকবুল হোসেন তাই ওসমান গনির শেষ বাক্যে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, 'সেই কথা আমি কইলে আপনে মানবেন কেন? একবার চলেন। আমাগো বাড়ি ধলেশ্বরীর উপরেই। আমাগো এলাকায় যে হাটে যান ধলেশ্বরীর ইলিশ উঠছে তো পদ্মার ইলিশ থাইকা দাম এট্টু বেশি থাকবোই।'

'সত্যি?' মাথা থেকে অবাঞ্ছিত সব ছবি মুছে ফেলার জন্য ওসমান তৎপর, 'কিরকম বেশি?'

'তার ঠিক আছে? আমাগো ছোটোবেলায় এক আনা ছয় পয়সা বেশি হইলেই অনেক বেশি।'

'বলেন কি?'

'তয়?' ওসমানের বানানো-বিস্ময়ে মকবুর হোসেন অভিভূত হয়, 'পদ্মার ইলিশ তিন আনা জোড়া তো ধলেশ্বরীরটা চাইর আনা, আঠারো পয়সা। আর মাছ পাওয়াও যাইতো! আমাগো হাটে বর্ষাকালে ইলিশের আমদানী হইছে এমন, কি কমু?—হাটের মধ্যে কুলায় নাই, জাইলারা হাই ইশকুলের ফিল্ডে বসছে চুপড়ি লইয়া।—' হঠাৎ বেশি কথা বলার লজ্জা বা ক্লান্তিতে মকবুল হোসেন একটু হাসে। এরপর লজ্জা কাটাবার জন্য সে চলে আসে বর্তমানের সমস্যায়, 'তাইতো চিন্তা করি, বাপদাদায় কি খাইছে, আর আমরা কি খাই! সংসার চালাইতে পারি না। ছেলেমেয়ে ল্যাখাপড়ার খরচ কেমন বাড়ছে, দ্যাখেন না? এক মাইয়ারে তো আল্লা আল্লা কইরা পার করছি, আরেক মাইয়ার বিয়া দিতে হইবো। বিয়াশাদীর খরচ—।'

'মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছেন না?' ওসমান বেশ সিরিয়াস। কোনোদিন কারো বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া দূরের কথা, কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজনের সঙ্গে সে

জীবনে কখনো জড়িত ছিলো না। এই প্রথম একটা সুযোগ পেয়েছে, এটা সে হারাতে চায় না, 'রানুর বিয়ের ব্যাপারে একটা কথা ছিলো।'

রানুর বিয়ের ব্যাপারে ওসমানের উৎসাহকে বেহায়াপনা ভেবে মকবুল হোসেন বিরক্ত হওয়ার বদলে বরং লজ্জা পায় এবং ছেলেটার বেহায়াপনা আড়াল করার উদ্যোগ নেয় সে নিজেই, 'রানুর মায়ে আমারে কয়দিন বলছে। আপনার ফাদার তো ইন্ডিয়ায় থাকে, না? বাবাজীগো বাড়ি ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোন জেলায়? পার্টিশনের আগে কইলকাতা গেছি কতোবার তার হিসাব নাই। গোয়ালন্দের জাহাজে উঠছি, সেই সময় ঐ জাহাজ—।' তার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা বন্ধ করে দেয় ওসমান, 'বাড়িওয়ালা আপনাকে কিছু বলেনি?'

'জী? আমাগো বাড়িওয়ালা?' মকবুল হোসেন হঠাৎ ভয় পায়।

'জী। রহমতউল্লা সায়েব রানুর জন্য একটা প্রস্তাব নিয়ে আসেনি?'

অপরাধবোধ নুয়ে-পড়া গরিবের মতো চোখমুখমাথা নিচের দিকে নুইয়ে মকবুল হোসেন কৈফিয়ৎ দেয়, 'মাইয়া যখন আছে তখন কতো প্রস্তাব আসবো। বাড়িঅলাও একটা লইয়া আসছে।' কথা বলতে বলতে সে সাহস সঞ্চয় করে, 'আমার মাইয়ারে আমি কৈ বিয়া দেই না দেই, সেইটা দেখুম আমি। বাড়িআলারে পরোয়া করি? আরে কতো বাড়িআলা দেখলাম। আমারে চাপ দেওয়াইয়া কাম করাইতে পারে এমন মানুষ—।'

তার সিংহপুরুষসুলভ সাহসের প্রতি ওসমান একেবারে উদাসীন, 'কেন? বাড়িওয়ালার প্রস্তাব খারাপ কি? ছেলেটার বাপ তো বেশ ভালো ব্যবসা করে, ছেলের নামে নবাবপুরে হার্ডওয়্যারের দোকান থাকা কি কম কথা? ঢাকায় পৈতৃক বাড়ি, আবার মার্কেট তৈরি করছে। আর কি চান?'

ভয়-পাওয়া ও সুবোধ ছাত্রের মতো মকবুল মিনমিন করে, 'না, আমরা মানে একটু ল্যাখাপড়ার কথা ভাবছিলাম। ছেলের যদি ল্যাখাপড়া তেমন না থাকে তো—।'

'রাখেন লেখাপড়া! টাকাপয়সা রোজগারের জন্যেই তো লোকে লেখাপড়া করে। একটু প্র্যাকটিক্যাল হতে চেষ্টা করেন।'

'না, ধরেন, মেয়েটা আমার আবার একটু ল্যাখাপড়ার ভক্ত। তারও একটা মতামত—।'

'আপনাকে বলি, মাইন্ড করবেন না, রানু লেখাপড়ায় ভালো করতে পারবে না। অঙ্কের মাথা একেবারে ডাল। প্রোপোজালটা রিফিউজ করবেন না।'

এই সময়ে ট্রেতে করে খাবার নিয়ে আসে রানু। গামলা ভর্তি ধোঁয়া-ওঠা ভাত, ইলিশ মাছের সর্ষে-বাটা পাতুড়ি, আলু ভর্তা এবং কুচি কুচি করে কাটা ঢেঁড়সের চচ্চড়ি। আপাতত এর কোনোটিতেই ওসমানের রুচি নাই। রানুর কপালে লাল টিপ। তার চুল এখন দুটো বেণী হয়ে সামনে এসে ঢেউ তুলে নেমে গেছে কোমরের দিকে। তার নাকে ঘামের বিন্দু নাই, সেখানে পাউডারের আভাস। ওসমান স্বচ্ছন্দে কয়েকবার তাকে দ্যাখে। কারফ্যুর ভেতর ওর এই সাজগোজ দেখতে আসবে কে? টেবিলের ওপর ট্রে ঠিক করে রাখতে রাখতে ওসমান বলে, 'তুমি যাও। আমার খেতে এখনো অনেক দেরি। সকালবেলা প্লেট বাটি সব পাঠিয়ে দেবো।'

বাপের সঙ্গে রানু নিচে চলে গেলে হঠাৎ-শ্রমের ক্লান্তিতে ওসমান বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলে। এইভাবে ৯/১০টা নিশ্বাস ফেললে বেশ সহজ বোধ করে। তার সমস্ত শরীরের ভার যেন পাম্প করে বার করে দেওয়া হলো। হয়তো এই কারণে তার বড্ডো খিদে পায়।

হাতটাতে না ধুয়েই গপগপ করে খেতে শুরু করলো। ভাতের গামলায় আলু ভর্তা, ঢেঁড়সের চচ্চড়ি, ডাল এক সঙ্গে মেখে যতোই খায় মনে হয় পেটের সবটা বোধহয় খালিই পড়ে রয়েছে। এতো যে খাচ্ছে, শরীরের অজস্র ফাঁক ফোকর তবু একটুও ভরে না। ইলিশ মাছের কাঁটাগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেললো। ওসমানের বুক পর্যন্ত ফাঁকা, —যতোই ঠাসো আর যতোই গাদো আবক্ষউদরের চাহিদা মেটে না। গ্লাস গ্লাস পানি খেয়েও শরীরের খাঁ খাঁ করা আর থামে না। খিদে ভোলবার আশায় ওসমান তখন ঘরের শূন্যতার দিকে দ্যাখে। কিন্তু ঘর তার পেটের মতোই শূন্য। গুলিবিদ্ধদের খাড়া কোনো সচল ও অচল মিছিল দেওয়ালের মাঝখানের শূন্যতাকে এতোটুকু গয়না পরিয়ে দেয় না। ওসমান এখন তাহলে করবেটা কি? কোনো উপায় না দেখে তোশকের নিচে অনেকদিন আগে লুকিয়ে রাখা একটা পর্নোগ্রাফির বই বার করে। যা তা মাল নয়, গুলিস্তানের সামনে থেকে ২৮ টাকায় কেনা। আর্ট পেপারের পাতায় পাতায় সায়েব-মেমসায়েবদের এ্যাকশনের ছবি। কিন্তু সেসব বারবার দেখেও শরীরের কোথাও কিছুমাত্র স্পন্দন বোধ করা যায় না। নানা ভঙ্গিতে সঙ্গমরত নর-নারীর দেহ কেবল বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ভট সমাবেশ ছাড়া অন্য কোনো দৃশ্য তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। তবে একটা ভালো লক্ষণ দ্যাখা যায়, তলপেটটা টনটন করতে থাকে। হবেই তো! যে পরিমাণ পানি খাওয়া হলো পেচ্ছাব না করে উপায় কি?

একটা কাজ পেয়ে খুশি হয়ে ওসমান দরজা খুলে ছাদে এলো। শীত যাই যাই করছে, ফাল্গুন মাস এসে পড়লো বলে! দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে করতে ওসমান নয়ন ভরে চারদিকের কুয়াশা-ঢাকা নির্জনতা দ্যাখে। পেচ্ছাব করা হয়ে গেলে রেলিঙে ঝুঁকে নিচে খোয়া-ওঠা রাস্তা দ্যাখে, কালো রাস্তার ওপর কালো রাত্রি। এই সময় কোন এক কবিতার লাইন মাথায় আস্তে আস্তে চুলকায়: কারফ্যু-দাগানো পথ, রাত্রিবেলা/ছাদের ওপরে থাকি আমি একেলা।—এটা কার লেখা? কার? কোথায় পড়েছে?—মনে পড়ার আগেই শোনা যায় কোথায় যেন গুলির শব্দ হচ্ছে। কারফ্যু ভাঙার অভিযোগে মিলিটারি কোথাও গুলি করছে। তাকেও তো গুলি করতে পারে। সে তো ঘরের বাইরে, আকাশে নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে? গুলি একবার তার বুকে লাগলে হয়, তখন এই ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে কোন শালা? আগেই প্রাকটিস করার জন্য ওসমান লাফিয়ে এই ইঞ্চি চারেক ওপরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় ধপ করে। শূন্যে থাকতে পারলে ভালো হয়। তার গুলিবিদ্ধ দেহ উড়তে উড়তে কারফ্যুচাপা শহরের বাড়িঘর, দোকানপাট, ডিআইটি, স্টেডিয়াম, কার্জন হল, গুলিস্তান, ইউনিভারসিটি, মেডিক্যাল কলেজের সামনে এলম গাছের সারি, মালিবাগের মোড়, কমলাপুর রেল স্টেশনের ফুল মার্কা ছাদ, এয়ারপোর্টের টাওয়ার, আজিমপুর গোরস্থান—এসবের ওপর দিয়ে দিব্যি উড়ে বেড়াবে। তার ওপরে কি?—ওপরে অন্যান্য গুলিবিদ্ধদের খাড়া মিছিল। এই আবু তালেব, আবু তালেবের হাতের সঙ্গে গুলি দিয়ে গাঁথা খিজিরের লাশ। আরে, আনোয়ার? আনোয়ারের নিচে আলতাফ, শওকত ভাই। কিন্তু ওসমানের জায়গাটা কোথায়? ঐ মিছিলে সে অনুপস্থিত কেন? মিছিলে তার এতো চেনা লোক, আকাশ জুড়ে এরা তার নিজের মুখটা সে কি-না সনাক্ত করতে পারে না। এতো মানুষের খাড়া সমাবেশে তার ঠাঁই হলো না। তার শূন্য ও ফাঁকা বুকে এই দুঃখ ঢুকলে একটু বল পেয়ে ওসমান নিচের দিকে দ্যাখে। পায়ের নিচে চুন সুরকি ঢাকা কালচে খয়েরি ছাদ। ফের সামনে তাকালে সব ফাঁকা। এই একটু-আগে-দ্যাখা জলজ্যান্ত গুলিবিদ্ধ মানুষের লম্বা

ও ঋজু প্রবাহ এভাবে মুছে যাওয়াটা ভালো কথা নয়। কিন্তু তার ভয় করে না। কিংবা করলেও তা চাপা পড়ে এই হঠাৎ-হারাবার হাহাকারের নিচে। ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে ফের উঠতে হয়, শেষবারের মতো পেচ্ছাবটা সেরেই নিই। কিন্তু পেচ্ছাব বেশি হয় না, কয়েক ফোঁটা পড়ার পর তলপেটও খালি। অন্নজলমুক্ত, মলমূত্রমুক্ত, রক্তমাংসমুক্ত, শুক্রধাতুমুক্ত ওসমান এখন অনায়াসে ঝুলে পড়তে পারে বুলেট বিদ্ধদের লম্বা ঝাঁকে। কিন্তু এবার আকাশ একেবারে ফাঁকা।

ঘরে এসে শুতে না শুতেই শোনা যায় গুলিবর্ষণের শব্দ। ওসমান ফের ছাদে যায়। এবার আকাশ জুড়ে লাশের মিছিল, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন মানুষের দল। কিন্তু এই সমাবেশে তার মুখ নাই। এবার আবার একটি কবিতা মনে পড়ে, এটা কি অন্য কবিতা? না ঐটারই পরের জোড়া-লাইন? বিড়বিড় করে সে আবৃত্তি করে : আকাশে কারফ্যু ভাঙে সবাই মিলে/ আমার শ্রীমুখ কৈ এই মিছিলে?—কার লেখা? কার? কিছুতেই মনে করতে না পারলে রাগ করে ওসমান ফের ঘরে ঢুকে বসে থাকে। ঐ কবিতার আরো সব লাইন তার একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না। হয়তো স্পষ্টই মনে পড়তো, কিন্তু তার আগেই অনেক দূরে কোথায় মিলিটারির গুলিবর্ষণ শোনা যায়, সে এক লাফে এসে দাঁড়ায় ছাদে।

ওসমান এই রকম ঘর-ছাদ, ছাদ-ঘর, ঘর-ছাদ ঘর করে ওদিকে কালো ডিমের খোসা ভেঙে বেরিয়ে আসে আকাশ মহারাজ। পাতলা কুয়াশার কাফনের নিচে রাস্তার শরীরের প্রায় সবটাই একটু একটু দ্যাখা যাচ্ছে। শাহ শাহেব বাড়ির মসজিদের আজান এই রাস্তার জনশূন্য চেহারা ন্যাংটা করে ফেললে সেদিকে তাকাতে ওসমানের লজ্জা হয়। খিজির থাকলে ওসমান নির্ঘাত ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তো। লম্বা লম্বা হাত পা নেড়ে খিজির অবিরাম কথা বলতে বলতে যেভাবে হাঁটে তাতে এই রাস্তার আব্রু দেওয়ার জন্য ও একাই একশো। খিজিরটা কোথায়? সারারাত ঘরে ফিরলো না কেন? তবে ওকে কোথায় যেন দেখলো? কোথায় দেখলো হাজার চিন্তা করেও ওসমান সেটা উদ্ধার করতে পারে না।

৩৭

সারাটা রাত খিজিরকে কাটাতে হয়েছে রহমতউল্লার বাড়িতে।

মওলানা ভাসানীর মিটিং থেকে বেরিয়ে মিছিলের লোকজন বর্ধমান হাউসের পাশে আগরতলা মামলার ১নম্বর জজসায়েবের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিলো, আরো অনেকের সঙ্গে খিজির আলি তখন ঐ জজসায়েবকে খুঁজছিলো হন্যে হয়ে। পাওয়া গেলে এই আগুনে ফেলেই শয়তানটাকে সাফ করে ফেলা যায়, ওর জন্যে আলাদা আগুন খরচ করতে হয় না। কিন্তু ব্যাটা কোথাও নাই। তাড়া খাওয়া নেড়ি কুত্তারা ল্যাজখানা পাছার মধ্যে গুঁজে কোনদিক দিয়ে যে সটকে পড়লো কেউ খেয়াল করেনি। আগুনের আঁচে খিজিরের মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে:

ইবলিসের গুটি খতম করনের লাইগা মানষে জান বাজি রাইখা কাম করতাছে, আর আমগো মহল্লার সর্দার ইবলিসটা কেমুন খাতির জমাইয়া খায় দায়, নিন্দা পাড়ে, এ্যারে মারে, অরে ধরে, আবার জুম্মনের মায়ের প্যাটের বাচ্চাটারে ভি খতম করনের ফন্দি করে!—সঙ্গে সঙ্গে খিজির রওয়ানা হয় নিজের মহল্লার দিকে।

কিন্তু দেরি হয়ে যায়। নিমতলী পার হতে না হতে সব মানুষের সঙ্গে তাকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে হয়। শোনা গেলো, কারফ্যু ফের জারি হয়েছে, ১৫মিনিট পর রাস্তায় কাউকে দ্যাখামাত্র গুলি করা হবে। লক্ষীবাজার পৌঁছুতে রাস্তা সুমসাম। তবু ওসমানের ঘরের দিকে না গিয়ে খিজির ঢুকে পড়ে রহমতউল্লার গলিতে। আর্মির একটা লরি চলে গেলো ওর সামনে দিয়ে, ঐ সময়টা সে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলো মহাজনের বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে। লরি চরে গেলে উঠলো রহমতউল্লার বাড়ির রকে। কিন্তু একা একা সে মহাজনের কি করতে পারে? এমন সময় আস্তে করে ঘরের জানলা খুলে মুখ বাড়ায় আলাউদ্দিন মিয়া। খিজিরের উত্তেজনা খুব বাড়ে, মহাজনকে খতম করার পরিকল্পনা কার্যকর করার উৎসাহ পায়। মহল্লা এখন নিশ্চয়ই আলাউদ্দিন মিয়ার নিয়ন্ত্রণে। তার হাতে ছাত্র আছে, কর্মী আছে, তার কথা শোনার জন্যে লোকজন এখন প্রস্তুত।

আলাউদ্দিন মিয়া জিগ্যেস করে, 'খিজির আইছস? রাস্তায় মিলিটারি দেখলি?'

'না, তামাম মহল্লার মইদ্যে নাই।' সেনাবাহিনীর অনুপস্থিতি আলাউদ্দিন মিয়াকে মহাজন-নিধন-অভিযানে সাহস জোগাবে বলে খিজির এই মিথ্যা বলে।

'তাইলে এক কাম কর।'

'কি? মানুষজন ডাকুম?' কাজ করার জন্যেই তো খিজির এসেছে, 'ডাকুম?'

'ডাক্তার লইয়া আয়। মামুর হাল বহুত খারাপ!'

তা মহাজনের হাল চরমভাবে খারাপ করার উদ্দেশ্যেই তো খিজির এসেছে। ডাক্তার ডেকে কি হবে? দরজা খুলে তাকে ভেতরে ডেকে নেয় আলাউদ্দিন মিয়া, ফিসফিস করে জানায় যে পায়খানা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় রহমতউল্লা মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। মামী ও সিতারার আর্তনাদ শুনে রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছে জুম্মনের মা। ৩ জনে ধরাধরি করে মহাজনকে ঘরে তোলে। জুম্মনের মা নিজেই ডেকে এনেছে আলাউদ্দিন মিয়াকে। মহাজনকে বিছানায় শুইয়ে ফুল স্পিডে ফ্যান চালানো হয়েছে, মাথার কাছে টেবিল ফ্যান চলছে, তবু তার কপালের ঘাম, ঘাড়ের ঘাম আর শুকায় না। 'মামী জানে না, সিতারা ভি বুঝবার পারে নাই, মামুর স্ট্রোক হইছে, ডান সাইডটা মনে লয় প্যারালাইসিস হইয়া গেছে। অহন ডাক্তার পাই কে? মেডিক্যাল, মিটফোর্ড, আমাগো ন্যাশনাল—ব্যাকটি হাসপাতালে ফোন করছি, কয় এ্যাম্বুলেন্স নাই, এ্যাম্বুলেন্স লইয়া গেছে মিলিটারি। অহন কি করি বাবা?'

আলাউদ্দিন মিয়ার এই উদ্বেগ খিজিরের মাথায় ঢোকে না। ইবলিসের এই পতনে তার এতো হায় হায় করার কি হলো?

'তুই যা বাবা। বজলুরে বিচারাইলাম তো অরে পাই না।'

'কারফ্যুর মইদ্যে ক্যাঠা যাইবো?' খিজিরের এই সরল বিবৃতিতে আলাউদ্দিন মিনতি করে, 'রুচিতার উপরে ডাক্তার ওদুদ বসে। যা না! বহুত বড়ো ডাক্তার।'

'চোখের ডাক্তার।'

'হউক! ব্লাড প্রেশারটা তো দেখবার পারবো। ডাইকা লইয়া আয়।'

'তার ঘর বন্ধ।'

'তাহলে বানিয়ানগর গিয়া সাইফুদ্দিনরে লইয়া আয়। আমগো পার্টির সাপোর্টার। যা না বাবা! মামুর হাল দেইখা সেতারা বেহুঁশের লাহান হইছে। যা বাবা!'

'কারফ্যুর মইদ্যে ডাক্তারে আইবো? গুলি খাইবো না?'

'মিলিটারি নাইক্কা। বড়ো রাস্তায় তরে একটা মিনিট ভি হাঁটতে হইবো না। গোবিন্দ দত্ত লেনের মইদ্যে দিয়ে বারাইয়া দুইটা কদম হাঁটলে কাঠের পুল লেন। তিনটা বাড়ি পার হইলে সাইফুদ্দিনের বাড়ি।' আলাউদ্দিন মিয়া খিজিরের শতবার-দ্যাখা বাড়ি চেনাতে চেষ্টা করে, তাতেও চিড়ে ভেজে না। 'ডাক্তার আইবো না।'

'আইবো। ডাক্তারের হাতে রেড-ক্রস মার্কা ব্যাগ দেখলে মিলিটারি কিছু কইবো না। অরা মানুষ না? মানুষের বালা মুসিবত বোঝে না?' ১০০ টাকার ১টা নোট খিজিরের হাতে তুলে দিয়ে সে বলে, 'যা। এই পাত্তিটা ডাক্তারের হাতে দিয়ে কইবি আলাউদ্দিন সাবের খুব বিপদ। আপনারে ডাকছে।'

মামীর বিলাপে সাড়া দিয়ে আলাউদ্দিন মামার ঘরে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই ঘরে আসে জুম্মনের মা। এইবার, এই সুযোগে খিজির একে নিয়ে সোজা কেটে পড়তে পারে। হাতে ১টা জিন্না মার্কা পাত্তি, তার এখন অভাব কি? জুম্মনের মা এসেই কাঁদতে শুরু করে, কিংবা কাঁদতে কাঁদতেই সে এসেছে, 'খবর পাইলা কে? আহারে! মনে হয় বাঁচাবো না! আল্লা! অহন আমাগো কি হইবো?'

'তর আবার কি হইবো? মহাজনে তরে মাগনা খাওয়ায়?'

জুম্মনের মায়ের দুঃখ উথলে ওঠে দ্বিগুণ বেগে, 'হায়রে আল্লা। এতো বাড়ো নামী মানুষটা বলে মইরা যায়, আর তুমি এইগুলি কি কও? তোমার দিল কি আল্লায় পাষাণ দিয়া বানাইছে?'

খিজির বানিয়ানগর গিয়েছিলো। ১০০ কেন হাজার টাকা দিলেও সাইফুদ্দিন ডাক্তার কারফ্যুর ভেতর বেরুতে পারবে না। খিজির তাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেনি। বরং নিজে থেকে ডাক্তারকে জানিয়েছে যে বড়ো রাস্তায় মিলিটারির গাড়ি অবিরাম টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তবে খিজির কাজ একটা করেছে, রহমতউল্লার বাড়ির পেছনে মেস থেকে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রকে ডেকে এনেছে। ১০০ টাকার নোটটা খিজিরের কোমরে গোঁজা, এটা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা আপাতত তার নাই।

হবু হোমিওপ্যাথকে না ডাকলেও চলতো। এর মধ্যে টেলিফোনে আলউদ্দিন মিয়া তার দলের বড়ো বড়ো নেতাদের দিয়ে তদবির করিয়ে হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স ও ডাক্তার এনে হাজির করেছে। ভোরবেলার দিকে রহমতউল্লার জ্ঞান ফিরে আসে, তবে ডানদিকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার অবশ। কথা বলার জন্য খুব চেষ্টা করছে, কিন্তু জড়ানো জিভের ধ্বনি গোঁ গোঁ করে, শব্দের আকার পায় না। এটুকু উদ্ধার করা যায় যে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার লাশটাই ফিরে আসবে। সিতারা ও সিতারার মা এ ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত। কারফ্যুর ভেতর রোগী নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করতে আলাউদ্দিন মিয়াও ভয় পায়।

রহমতউল্লার শোবার ঘরই পরিণত হলো হাসপাতালে। খাটের স্ট্যান্ড থেকে ঝোলে স্যালাইন, এ্যাম্বুলেন্স থেকে অক্সিজেন টেন্ট নামিয়ে তৈরি রাখা হলো রোগীর মাথার কাছে, যদি দরকার পড়ে। ইঞ্জেকশন দিয়ে রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে ডাক্তার চলে যায়, রাত তখন ২টার কম নয়। ঘরে মা-মেয়েতো রইলোই। মেঝেতে বসে রহমতউল্লার ডান পা ম্যাসেজ করার দায়িত্ব পেয়ে জুম্মনের মায়ের ফোঁপানি থামলো।

রহমতউল্লার বিছানার পাশে ইজি চেয়ারে বসে থাকে আলাউদ্দিন মিয়া। কিছুক্ষণ পর পর স্যালাইনের ফোঁটা গুণে দ্যাখার ভার তার ওপর অর্পিত। সায়েবের আদেশে খিজিরকে বসে থাকতে হয় ভেতরের বারান্দায়, সিঁড়ির নিচে। এখন সেখানে কোনো ঝি-চাকরানী থাকে না, হাত পা ছড়িয়ে বসে খিজির হাঁ করে এদের মওত-খেদানো এন্তেজাম দ্যাখে। আলাউদ্দিন মিয়া মাঝে মাঝে এসে সিগ্রেট ধরায়, তার দলের বড়ো বড়ো নেতাদের টেলিফোন করে আধঘণ্টার ভেতর সে এসব কাজ সম্পন্ন করেছে—এই খবরটা নানাভাবে খিজিরকে অবহিত করে। তার গলার স্বর বাড়াবাড়িরকম উঁচু, সিতারা ও সিতারার মায়ের কানে সব কথা তার পৌঁছে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর সে কথা বলে সিতারার সঙ্গে, সিতারা না চাইতেই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, 'আরে পাগলী! এতো বড়ো ডাক্তারে কইয়া গেলো, দুইটা দিন রেস্ট লইলেই মামু এক্কেরে আগের মানুষ হইয়া যাইবো। মামু তো টেনশনের মইদ্যে থাকে, ব্লাড প্রেশারটা খুব বাড়ছিলো, প্রেশার তো এখন নর্ম্যাল। ঠিক হইয়া যাইবো!' তার স্বর ক্রমে নিচু হয়ে আসে। খিজিরের ঘুম পায়। কোথায় যেন গুলি চলছে, গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দ্যাখে ইজি চেয়ারে শুয়ে আলাউদ্দিন মিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে, টুলে বসে বাপের বালিশের একপাশে মাথা রেখে ঘুমায় সিতারা। আর রহমতউল্লার ডান হাঁটুর ওপর জুম্মনের মায়ের মাথা উপুড় করে রাখা। মহাজনের গা থেকে লেপ সরে গেছে। লুঙি উঠে গেছে ডান উরু পর্যন্ত। তবে তার ঐ সাইডটা এখন অচল।

সকালবেলা কারফ্যু উঠিয়ে নেওয়ার খবর পেয়ে খিজির গেলো ওসমানের ঘরে। ওসমান নাই। সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো মকবুল হোসেন, হাতে বাজারের ব্যাগ। ওসমানের খবর জানতে চাইলে বলে, 'না রাত্রে তো ঘরেই ছিলো। এইতো মিনিট দুয়েক আগে দেখলাম কার সঙ্গে যেন বেরিয়ে গেলো।'

খিজিরের এদিকে খিদেও পেয়েছে। ন্যাশনাল হাসপাতালের পাশে গলির মাথায় ডালপুরি ভাজা হচ্ছে, লোকের ভিড়ে সেইখানে ঢোকা অসম্ভব। নিজামি রেস্টুরেন্টটা খোলা, কিন্তু রুটি-গোশত্ খেতে হলে পয়সা লাগে মেলা। হঠাৎ কোমরে গোঁজা ১০০ টাকার নোটের কথা মনে পড়লে মহা আনন্দে খিজির নিজামিতে ঢুকে পড়ে। কোনো চেয়ার খালি নাই। খিজির এদিক ওদিক তাকিয়ে চেয়ার খালি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় রাস্তা থেকে আসে স্লোগানের শব্দ। মিছিল আসছে জগন্নাথ কলেজ থেকে, রেস্টুরেন্টে চেয়ারের অপেক্ষায় না থেকে খিজির প্রায় লাফ দিয়ে রাস্তায় নামে। আলুবাজার পৌঁছতে পৌঁছতে ছোটো মিছিলটার শরীর বাড়ে। স্টেশন রোড থেকে আরেকটি মিছিল তাদের সঙ্গে যোগ দিলে মিছিল স্ফীতকায় হয়ে ওঠে এবং সবাই প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলে গুলিস্তানের দিকে। কিন্তু রেলগেটের ওপারে মিলিটারি ও ইপিআরের লরির ব্যারিকেড। লরির ওপর দাঁড়িয়ে হেলমেটধারীরা মেশিনগান তাক করে রেখেছে মিছিলের দিকে। মিছিল তবু এগিয়ে যাচ্ছিলো। নেতাগোছের কেউ এসে সবাইকে ফিরে যেতে বললে মিছিল স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে মিলিটারির লোকজন মাইকে বারবার কারফ্যু জারি করার কথা ঘোষণা করছে। হঠাৎ কয়েকটা গুলির আওয়াজ হলে মানুষ এলোমেলো ছুটতে শুরু করে।

ছুটতে ছুটতে খিজির চলে আসে নিজের মহল্লায়। বস্তিতে ঢুকতে ঢুকতে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে জুম্মনের মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব। মহাজন তো অচল হয়ে পড়লো, জুম্মনের মায়ের সঙ্গে বস্তির ঘরে থাকতে তাকে এখন বাধা দেবে কোন শালা? কিন্তু বস্তিতে এসে খবর পায় যে কারফ্যু বিরতির সময় জুম্মনের মা একবার এসেছিলো। 'আধাঘণ্টা ভি আছিলো না, বজলুর বৌ জানায়, 'মহাজনের বহুত বিমার। অর লগে আমরা ভি দেখবার গেছিলাম। জুম্মনের মায়ে মহাজনের হাতপাও মালিশ করে।'

খিজির ঘরে ঢুকতে জুম্মন কি যেন লুকাবার জন্য এদিক ওদিক তাকায়। খিজিরের সঙ্গে ঘরে ঢুকছিলো বজলুও, সে চোখ রাঙায়, 'তর হাতে কি?'

'কিছু না!'

'রঙবাজি করস?' বজলুর থাবার ঘায়ে জুম্মনের লুঙির কোচড় থেকে প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভার মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে। জিনিসগুলো তুলে বজলু খিজিরের হাতে দেয়, 'এইগুলি তর না খিজির? এইগুলি দিয়াই তো ঐ দিন আমারে খাম করলি, না?' তারপর জুম্মনকে বলে, 'তুই পাইলি কৈ?'

বজলুর বৌ বলে, 'অর মায়ে দিছে। নাইলে পাইবো কৈ?'

বজলু জুম্মনের ওপর রাগ করে, 'তর বাপের জিনিস? কামরুদ্দিন হালায় জিন্দেগিতে এইগুলি চোখে দেখছে? জোগানদারের পোলা, তুই এইগুলি হাতাস ক্যালায়?'

ভয়ে জুম্মনের ঠোঁট তিরতির করে কাঁপে। ভয়েও কাঁপতে পারে, রাগেও কাঁপতে পারে। খিজির জানে, রাগ হলে জুম্মনের মায়ের ঠোঁটজোড়া ঠিক এমনি করে কাঁপে। খিজির নরম করে বলে, 'ছ্যামরা, এইগুলি দিয়া তুই করবি কি?' জুম্মনের হাতে জিনিস ২টো তুলে দিতে দিতে বলে, 'ল। রাইখা দে। হারাইবি না। হারাইলে একখান চটকানা দিয়া তর বাপের কাছে পাঠাইয়া দিমু।' খিজিরের উদারতায় জুম্মন এবার ভয় পায়, প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভার সে রেখে দেয় তক্তপোষের নিচে। খিজির ফের ঘোষণা করে, 'কইলাম না, রাইখা দে!'

জোগানদারের পোলাকে এইসব যন্ত্র দেওয়া বজলু অনুমোদন করে না, 'দিয়া দিলি দোস্ত? তর কামে লাগবে না?

'লাগবো না? আবার লইয়া আহুম।'

সারাটা দিন কাটাতে হয় ওখানেই। রাস্তার মোড়ে মিলিটারির গাড়ি। এদিকে বস্তির কারো ঘরে চাল নাই। নতুন এক ভাড়াটে এসেছে, ফেরি করে তরকারি বেচে। তার ঝুড়িতে উদ্বৃত্ত সবজি ছিলো। সেগুলো সেদ্ধ করে তরকারিওয়ালা একা চুপচাপ খেয়ে নিয়েছে। খিজিরের ঘরে সবাই ধুমসে আড্ডা মারে। মহাজনের পক্ষাঘাত হওয়ায় কখনো আফসোস করে, আবার পরের মুহূর্তে তাকে গালাগালি করে। কিছুক্ষণ পর পর কারফ্যু নামক সরকারী আদেশটির সঙ্গে নানাভাবে শারীরিক সঙ্গম করার স্পৃহা জানায়। বজলুর বৌ কোত্থেকে ঝোলা ভর্তি কাঁঠালের বিচি বার করে, কবে কার বাড়ি থেকে সরিয়ে এনেছিলো কে জানে? সেই বিচি সেদ্ধ করে সবাই মিলে খাওয়া হলো। জুম্মনের গোগ্রাসে খাওয়া দেখে বজলুর বৌ আফসোস করে, 'ছ্যামরাটা এমুন ত্যারা! অর মায়ে কতো কইলো, "আমার লগে চল!' গেলো না। মাহাজনের বাড়ি গেলে প্যাট ভইরা ভাতটা তো খাইতে পারতি!'

কিছুক্ষণ পর পর বজলু কিংবা খিজির সরু গলির মাথায় গিয়ে উঁকি দিয়ে আসে, কখনো জুম্মনকে পাঠায়। না, মিলিটারির গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিড়িটা পর্যন্ত আনা অসম্ভব। ওদিকের গলি থেকে কে যেন বেরিয়েছিলো। মিলিটারির হাতে তার নাস্তানাবুদ হওয়ার বিবরণ শুনে সবাই হেসেই অস্থির। বজলুর বৌ পর্যন্ত একবার উঁকি দিয়ে এলো। এক বুড়ো ভদ্রলোককে মিলিটারি কিভাবে ব্যাঙ লাফাতে বাধ্য করছে তার বর্ণনা দিতে দিতে সে হেসে মাটিতে গড়ায়।

সন্ধ্যার পর ট্রাক সরে যাওয়ার শব্দ আসে। খিজির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সটকে পড়ে। এই সুযোগ। যে কোনো সময় ওরা ফের চলে আসতে পারে।

৩৮

'কাল সন্ধ্যে থেকে আনোয়ারদের বাড়িতে কোঅরনটিনে থেকে এই বেরুলাম। চলেন, তাড়াতাড়ি নাশতা টাশতা করে নিই। সারাদিন প্রভিশনস নিয়ে ঘরে ফিরবেন। আমি সোজা বাসায় যাবো। কারফ্যু রিল্যাক্স করেছে মাত্র তিন ঘণ্টার জন্যে।' ওসমানের ঘরে ঢুকে শওকত গতরাতে আনোয়ারদের বাড়িতে ওর বড়োভাইয়ের সঙ্গে হুইস্কি খাওয়ার গল্প ছাড়ে। তা কি করে হয়? চাদে দাঁড়িয়ে ওসমান তো সারারাত শওকত ভাইকে আকাশে উড়তে দেখলো। 'আপনি সারারাত উড়ে বেড়াচ্ছিলেন না?'

'তা ওড়াই বলতে পারেন। মোর দ্যান হাফ এ বট্‌ল অফ শিভাজ রিগ্যাল! ডিলাক্স হুইস্কি, ফিফটি ইয়ার্স ওল্ড। আনোয়ারের ভাই তিনটে পেগ মারতে না মারতেই ঘুমোতে গেলো, দেন ইট বিকেম অবলিগেটরি ফর মি টু ফিনিশ দ্য রেস্ট। শিওর, আই ফেল্ট লাইক ফ্লাইং!'

'আনোয়ারও তো আপনার সঙ্গে ছিলো?'

'আরে না! মওলানা ভাসানীর মিটিঙে আপনাদের কাউকে না পেয়ে গেলাম ওয়ারি। নো, হি ইজ স্টিল দেয়ার ইন রুরাল বেঙ্গল, ফাইটিং এ হার্ড ব্যাটল টু এলিমিনেট অল দ্য ক্লাস এনিমিজ! ওদের কোন আত্মীয় চিঠি লিখেছে, আনোয়ার নাকি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে মিসবিহেভ করছে। হিজ মাদার ওয়াজ অন দ্য ভার্জ অফ উইপিং।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে শওকত ভাই কথা বলা অব্যাহত রাখে, 'ওর মার সঙ্গে কথা বলছি, তো ওর ভাই এসে বলে, কারফ্যু ইমপোজ করেছে। ওদের ওখানেই থাকতে হলো। ওর ভাই আনোয়ারের ওপর মহা খাপ্পা, বলে এসব স্রেফ হঠকারিতা। বাঙালির জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার সময় এটা, এখন পাঞ্জাবিদের কোণঠাসা করো। এখন এইসব শ্রেণীশত্রু মারার নামে এ্যানার্কি তৈরি করলে বাঙালি মিডল ক্লাস সেটেল্ড হাতে পারবে?'

'আপনি কি বললেন?'

'আমি বললাম, তাহলে এতো মানুষ মরছে কি মিডল ক্লাসকে ফ্লারিশ করার জন্যে?—তাতে ভাইয়া খেপে গিয়ে শিভাজ রিগ্যালের বোতল নিয়ে এলো! দুটো তিনটে পেগ মেরে বোতলটা আনোয়ারের ঘরে আমার জিম্মায় রেখে চলে গেলো নিজের ঘরে।'

ভিড়ের মধ্যে হাঁটা বেশ মুশকিল। বেশির ভাগ লোকের হাতে বাজারের থলে। এর মধ্যে কয়েকটা রিকশা বেরিয়েছে, কিন্তু খালি রিকশা পাওয়া অসম্ভব।

পুলিশ ক্লাবের সামনে বাস থেকে লোক নামিয়ে দিচ্ছে। গুলিস্তানের ওদিকে মিলিটারি গুলি করছে, বাস আর যাবে না। নিজামি রেস্টুরেন্টের সামনে পানের দোকান থেকে শওকত ১০টা সিগার কিনলো, নিজামিতে ভিড় ঠেলে ঢুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ২ জনে তন্দুরের রুটি ও ডাল-গোশ্‌ত খেয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছে, এমন শোনা যায় বাইরে মিছিল চলছে। 'শামসুজ্জোহার রক্ত'—'বৃথা যেতে দেবো না', 'জেলের তালা ভাঙবো'—'শেখ মুজিবকে আনবো',—স্লোগান দিতে দিতে মিছিল ছুটে যাচ্ছে নবাবপুরের দিকে।

'শওকত ভাই, চলেন মিছিলে যাই।'

ওসমানের আগ্রহে সায় দেওয়ার আগেই শওকত বলে, 'রেডিও শোনেন', রেডিওতে কারফ্যু বিরতির সময় কমিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করা হচ্ছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই ফের কারফ্যু জারি করা হবে শুনে লোকজন পাগলের মতো ছোটে। শওকত ৩ পাউণ্ড পাউরুটি কিনলো দেড়গুণ দামে, কলা কিনলো। ওসমান নিলো কয়েক প্যাকেট কিংস্টর্ক। দোকানপাট বন্ধ করার শব্দ পিঠে ধাক্কা দিয়ে মানুষের হাঁটার গতি অনেক বাড়িয়ে দেয়।

ওসমানদের সিঁড়ির গোড়ায় এসে শওকত বলে, 'ওসমান, আজ আমাকে আপনার সঙ্গে থাকতে হবে। গ্যাণ্ডারিয়ার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে রাস্তায় আর্মি নেমে যাবে।'

'আসেন। এখন রিস্ক নেবেন না।'

'আপনি ঘরে যান। দেখি ঐ দোকানটা থেকে টেলিফোন করে আসি। আম্মা খুব চিন্তা করবে।'

কিছুক্ষণ পর শওকত ঢুকে বলে, 'আরে রাজশাহীতে জোহা ভাইকে মেরে ফেলেছে। আর্মি নাকি বেয়নেট খুঁচিয়ে মেরেছে!'

'কাকে মেরেছে বললেন?'

'জোহা ভাইকে চেনেন না, না? আমাদের গ্যাণ্ডারিয়া পাড়ার ছেলে। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির টিচার। খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলো! ছেলেবেলায় মিল ব্যারাকের মাঠে আমরা ক্রিকেট খেলতাম, জোহা ভাইও আমাদের সঙ্গে খেলতো। ফার্স্ট ক্লাস ব্যাটসম্যান। বাসায় টেলিফোন করেছিলাম, তো আম্মা বললো যে রাজশাহী থেকে আজ ভোরবেলা খবর এসেছে। এরকম লোক হয় না রে ভাই!'

শওকত হঠাৎ চুপ করে। ওসমানের বিছানায় শুয়ে সেনাবাহিনীর অফিসারের হাতে নিহত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্বন্ধে শওকত স্মৃতিচারণ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যায়।

ছাদে গিয়ে রেলিঙের ফাঁকে চোখ রেখে ওসমান দ্যাখে লোকজন ও যানবাহনশূন্য বিধবা রাস্তা শুয়ে রয়েছে ভোঁতা চেহারা করে। আকাশে রোদ চড়ে, রোদ নামতেও থাকে। দুপুরের পর ১জন বুড়ো লোককে দ্যাখা যায়, লোকটির হাতে হট-ওয়াটার ব্যাগ। আর্মির এক জওয়ান লোকটাকে কি হুকুম করলে বেচারা রাস্তায় বসে হাতজোড়া মাটিতে ঠেকায়। আর,

ওসমান ভালো করে দেখে চিনতে পারে, এ তো রিয়াজউদ্দিন। সৈন্যটি হঠাৎ খুব জোরে চ্যাঁচায়, 'মাদারচোত, বাহেনচোত, বাহার নিকলে কিউ?' তারপর গলা ফাটিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ দক্ষতার সঙ্গে কম্যাণ্ড করে, 'ফারওয়ার্ড! ইস্টার্ট!' এই আদেশ অনুসরণ না করায় রিয়াজউদ্দিন তার লুঙি ঢাকা পাছায় বুট-শোভিত পায়ের লাথি খায় এবং হট-ওয়াটার ব্যাগ ফেলে তিড়িংবিড়িং করে ব্যাঙ লাফানো শুরু করে।

এই দেখে সেনাবাহিনীর লোকদের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্যে ওসমান রেডি হয়। কিন্তু এখানে রেলিঙ একটু উঁচু, ওসমানের মাথাও রেলিঙের সম্পূর্ণ এপারে। নিচে ডাইভ দিতে হলে তাকে প্রথমে রেলিঙের ওপর উঠে দাঁড়াতে হবে। তাই সই। রেলিঙের ওপরদিকের ফোকরে হাত রেখে ডান পা ওঠাতে যাচ্ছে নিচের একটি ফোকরে, এমন সময় কার হাত তার পিঠে। পা নামিয়ে নিলে পেছন থেকে কে বলে,'কি করেন? দেখলে ব্যাটারা গুলি কইরা দিবো!'

'কে?'

রঞ্জুকে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওসমান তাকেও আহ্বান জানায়, 'এসো, দুজনে শালাদের ওপর লাফ দিয়ে পড়ি!' ওসমানের কপালে ও গলায় ঘাম গড়িয়ে পড়ছে, তার চোখ লাল এবং প্রসারিত। রঞ্জু তাড়াতাড়ি পেছনের দিকে হাঁটতে এবং একটু টার্ন নিয়ে ঢুকে পড়ে ওসমানের ঘরে। বিছানায় শওকত তখনো ঘুমাচ্ছে। ওসমানও রঞ্জুকে অনুসরণ করে। ছেলেটো বেশ ভয় পেয়েছে। রঞ্জুর ভয়-পাওয়া তাকে দারুণরকম একটা ধাক্কা দেয়, মাথার ভেতরটা নতুন করে ওলটাপালটা হয় : আহা! রাত্রিবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করতে করতে মানকচুর ঝাড়ে কালচে সবুজ আঁচল জড়ানো মোবারক মল্লিকের মাকে দেখে রঞ্জু বড়ো ভয় পেয়েছে। প্রায় ১২ বছর পাগল হয়ে থাকার পর বুড়ি মারা গেলো গত সপ্তাহে। তা সে এখানে আসবে কোত্থেকে? 'আম্মা! আম্মা!'—এরপর আর মনে ছিলো না। তার মাথায় পানি ঢালছিলো কে? আসগর চাচা? নাকি আব্বা নিজেই? কি জানি!– নাঃ! এরকম ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।—ওসমান জানে এসব ভয় টাইট করতে হয় কি করে! 'দাঁড়াও রঞ্জু!' বলে রঞ্জুর কাঁধে হাত দিয়ে তাকে সে তার বুকের কাছে টেনে আনে এবং তার শ্যামবর্ণের গালে ও বেগুনি ঠোঁটে চুমু খায়। ২/৩ টে চুমু খেলে তার উত্তেজনা শান্ত হতে থাকে, তার চোখজোড়া ঢুলে আসে। 'আব্বা!' রঞ্জুর এই ভয়ানক আর্তনাদে ওসমান আবার চাঙা হয়। নাঃ! ছেলেটির ভয় একটুও কাটেনি। এতো ভয় কিসের? বাঁ হাতে রঞ্জুর চুলের ঝুঁটি ধরে ওসমান ডান হাতে তার গালে ঠাস করে চড় লাগাতে শুরু করে। শওকত জেগে উঠে ধাক্কায় ওসমানকে সরিয়ে দেয়। ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে রঞ্জু বলে, 'আব্বা!'

ওসমানকে শওকত বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে, 'আপনার কি হলো? ফিলিং সিক?'

'আরে নাঃ! ছেলেটা মিছেমিছে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। এতো ভয় পাবার কি হলো?'

'সে জন্য হোয়াই শুড ইউ স্ল্যাপ হিম?'

'কি ব্যাপার? আপনার শরীর খারাপ?' নিচে থেকে এসেছে মকবুল হোসেন।

'না, ভালো আছি। রঞ্জু খামাখা ভয় পাচ্ছিলো, তাই একটু শাসন করে দিলাম।' চেয়ারে বসে মকবুল হোসেন পান চিবায়, রঞ্জুর খবর বোধ হয় ঠিক নয়, ওসমান তো ভালোই আছে। কোনো ঝামেলা না হলেই ভালো। লোকটা চেয়ারে পা তুলে আয়েস করে বসে। 'কারফ্যু হইয়া কাম নাই কাজ নাই ঘরের মদ্যে বইসা খাওদাও আর ঘুমাও।' তবে কোনো

বিষয়ে সে অসন্তুষ্ট, যেমন, 'খালি এই মিলিটারিগুলি রাস্তায় ভদ্দরলোকদের ধইরা বেইজ্জত করে, বুঝলেন? এইটা—।'

'রাখেন রাখেন! ছাদের রেলিং থেকে লাফ দিয়ে শালাদের শেষ করে ফেলতে পারি, জানেন? দেখতেই খোদার খাসি, শালাদের গায়ে জোর আছে নাকি? শালাদের সব হাম্বিতাম্বি দেশের আনআর্মড পিপলের ওপর। দ্যাখেন না, একটা ফ্লাইং কিক দিয়ে শালাদের কোথায় পাঠিয়ে দিই। দেখবেন? চলেন, ছাদে চলেন!'

শওকত তার হাত ধরে, 'আরে কি শুরু করলেন? বসেন না চুপচাপ!'

ওসমান বিছানায় বসে কিন্তু তার গলা আরো চড়ে, 'আরে, আপনিতো খালি বাখোয়াজি করেন। রাতভর মদ খেয়ে এসে বুলি ছাড়েন। সাহস থাকে তো চলেন—।'

শওকত বেশ ঘাবড়ে গেছে, 'আপনি বরং ঘুমিয়ে নিন। রাত্রে বোধহয় ভালো ঘুমাতে পারেননি? আবার সারাদিন আপনার বিছানা অকুপাই করে রাখলাম আমি। আপনি ঘুমান।'

মকবুল হোসেন রীতিমতো ভয় পেয়েছে। 'আমি বরং যাই।' উঠে দাঁড়িয়ে শওকতকে বলে, 'রাত্রে তো আপনারে থাকতেই হইবো। কারফ্যুর ভেতর যাইবেন ক্যামনে? ট্রাবল হইরে আমারে খবর দিয়েন। আমি দোতালায় থাকি। কবর দিতে হেসিটেড কইরেন না!'

ওসমান হঠাৎ বলে, 'শওকত ভায়ের থাকার দরকার কি? খিজির চলে এলে আপনি শোবেন কোথায়? ইউ বেটার গো!'

ওসমান সিদ্ধান্ত নেয় যে খিজির এলেই এই কারফ্যু-চাপা শহরের ঢাকনি উল্টিয়ে সে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে।

সন্ধ্যার পর পরই খিজির আসে। শওকত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, 'রাস্তায় আর্মি নেই? কারফ্যুর ভেতর তুমি এলে কি করে?'

ওসমানও খুব খুশি, 'তুমি সারাদিন ছিলো কোথায়? কাল রাত্রে তোমাকে কয়েকবার মিছিলে দেখলাম!'

'কি কন? মাহাজনের গ্যাড়াকলের মইদ্যে পইড়া তামামটা রাইত আটকা থাকলাম। মাহাজনের খবর তো জানেন? মনে লয় বাঁচবো না। শরীলের একটা সাইড খরচা হইয়া গেছে, দোসরা সাইডটা লইয়া—।'

রহমতউল্লার শারীরিক কুশলতায় ওসমানের আগ্রহ নাই। 'আজ সারাদিন ছিলে কোথায়?'

'তামামটা দিন আউজকা আমার ঘরের মইদ্যে! রাস্তার মোচড়টার মদ্যে মিলিটারির গাড়ি, বারাইবার পারি না। লগে বিড়ি উড়ি ভি নাই। বহুত ধান্দা কইরা ছুপায়া ছুপায়া সালামত মিয়ার বন্ধ দোকানের বগলে গিয়া খাড়াইছি তো দেহি ঐ লাল বাড়ির নয়া ভাড়াইটা সাবরে এক হামলায় মিলিটারি কান ধরাইয়া ওঠ-বস করায়। আমি আর নাই, এক্কেরে লোড় পাইড়া সিধা ঘরের মইদ্যে!' খিজির হি হি করে হাসে এবং হাসতে হাসতে ভদ্রলোকের হেনস্থা দ্যাখাবার জন্য নিজেই কান ধরে ওঠা বসা করে।—'বুঝলেন না? একটা সাব মানুষ! যহনই বারায়—, তহনই দেহি মাঞ্জা দিয়া বারাইতাছে, ক্যাপস্টান ফুঁকতাছে। হায় হায়, তারে ধইরা কানে হাত দিয়ে—।' হাসির দমকে খিজির গড়িয়ে পড়ে।

'আরে রাখো!' ওসমান রাগে উঠে দাঁড়ায়, 'মানুষের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, আর তুমি হাসো? ঐ শালা মিলিটারির কান দুটো ছিঁড়ে আনতে পারলো না?'

'আঃ! চ্যাতেন ক্যালায়? কারফ্যুর মইদ্যে আমি একলা একলা মিলিটারির বালটা ছিঁড়বার পারুম?'

কারফ্যুর ভেতর কি করতে পারে তাই দ্যাখার জন্য এবং দ্যাখাবার জন্য ওসমান ছাদে যায়। শওকত এই সুযোগে নিচু গলায় খিজিরের কাছে ওসমানের অসংলগ্ন কথাবার্তা ও তৎপরতার বিবরণ দেয়। রঞ্জুকে চড় মেরেছে সে কথাটাও জানায় তবে চুমু খাওয়ার ব্যাপারটা চেপে যায়। খিজির পাত্তাই দেয় না, 'এইগুলি কিছু না! কয়দিন বারাইবার পারে না, তাই আল্টুপাল্টু হইতাছে, বুঝলেন না?

রাস্তায় না নামলে হালায় মগজের মইদ্যে হাওয়া বাতাস খেলবার পারে না, তাই মাথাটা জাম হইয়া রইছে!' খিজির তো অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে কোনো রিকশা কয়েকদিন না চালালে চেনের ভেতর জং ধরে যায়, আবার রাস্তায় চাকা ঘোরালেই সব স্বচ্ছন্দ হয়ে আসে। এতে এতো ঘাবড়াবার কি হলো?—খিজিরের এখন ঘুম পাচ্ছে। হাই তুলতে তুলতে সে মেঝেতে বিছানা পাতে, শওকতকে পরামর্শ দেয়, 'খাইছেন? দোনোজন ঘুমাইয়া পড়েন। বাজে কয়টা?' কিন্তু সময় জানার আগেই সে উঠে বসে, কান খাড়া করে কি শোনে। শওকত উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, 'কি হলো?'

'দাঁড়ান!' খিজির এবার উঠে দাঁড়িয়ে ছাদে গেলে শওকত দূর থেকে জমাটবাঁধা আওয়াজ শুনতে পায়। আওয়াজ ক্রমেই জোরদার ও স্পষ্ট হচ্ছে।

পাশের বাড়ি থেকে কোনো প্রতিবেশীকে উদ্দেশ করে কে যেন চিৎকার করে, 'কোথায় যেন মিছিল বেরিয়েছে। শুনছেন?'

কোন বাড়ি থেকে জবাব আসে, 'গুলিস্তানের দিকে হতে পারে।'

ছাদে গিয়ে শওকত সেই অদৃশ্য ব্যক্তির ভুল সংশোধন করে, 'না। এটা আরো দূরের সাউণ্ড।'

ওসমান কিন্তু বুঝতে পারে যে রাস্তায় মিছিল চলছে। আকাশের মিছিলও বেরুবে। ডাঙা ও আকাশ জুড়ে এই আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

মিছিলের জায়গা সনাক্ত করার আগেই মানুষের সমবেত ধ্বনি খচিত হয় আগ্নেয়াস্ত্রের টকটকাটক শব্দে। কিছুক্ষণের জন্য মানুষের কথা চাপা পড়ে অস্ত্রের দাপটে। ওসমান, শওকত ও খিজির রেলিঙে ভর দিয়ে নিচের রাস্তা দ্যাখে। অন্ধকার নির্জন রাস্তা দূরের গোলাগুলির শব্দে কাঁপছে। দেখতে দেখতে গোলাগুলির আওয়াজ ছাপিয়ে বেজে ওঠে মানুষের শ্লোগান।

এবার কোনো প্রতিবেশী দোতলা থেকে উচ্চকণ্ঠে জানায়, 'নাখালপাড়ায় মিছিলে গুলি চলছে। আমার ছোটোভাই টেলিফোন করেছে, বিরাট প্রসেশন বেরিয়েছে।'

'মনে হচ্ছে মালীবাগের দিকে।' অন্যদিক থেকে একজন চিৎকার করে, 'মালিবাগে নাকি বিরাট প্রসেশন বেরিয়েছে। আর্মি র‍্যানডম গুলি করছে।'

দূরের গুলিবর্ষণ ও শ্লোগানের ঠোকাঠুকি ক্রমেই স্পষ্ট হয়। এবার এই বাড়ির নিচের তলার লোকজনের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। 'গওসল আজম স্যু ফ্যাক্টরির কর্মীরা উত্তেজিত কিংবা ভীত। ছাদ থেকে চিৎকার করে খিজির তাদের নির্দেশ ছাড়ে, 'তরা খাড়া। মমতাজ, ফালু, কাদিরা, লাটমিয়া,—ব্যাকটি রেডি হও। একলগে বারাইয়া পড়ুম।'

দোতলা থেকে মকবুল হোসেন চিৎকার করে করে ছাদের উদ্দেশে, 'আপনারা ঘরে ঢোকেন। ঘরে ঢোকেন। আর্মি আসলে যামনে খুশি গুলি চালাইবো!'

খিজির চিলেকোঠার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'ওসমান সাব, লন যাই! আপনেও চলেন!' তার শেষ বাক্যের লক্ষ্য শওকত। 'চলেন যাই। রাস্তায় বহুত মানুষ নামছে। অরা কয়জনরে আটকাইবো, কন? চলেন, যাই!'

ওসমান উত্তেজনায় কাঁপে, 'শওকত ভাই, চলেন। চলো চলো!'

কিন্তু এইসময় দূরের গুলিবর্ষণ মনে হয় চলে এসেছে একেবারে নিচের রাস্তায়। ওসমান তাই একটু অপেক্ষা করতে চায়। কিন্তু খিজিরের ধৈর্য নাই। ঘরের ভেতর দিয়ে ধ্যাবড়া পায়ের ধপধপ আওয়াজ তুলে খিজির সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামে। ওসমান পিছে পিছে যাচ্ছিলো, শওকত তার হাত চেপে ধরে, 'দাঁড়ান। পাগল হলেন?' ওসমান হাত ছাড়িয়ে নিতো, কিন্তু শওকতের হাত থেকে বেরিয়ে আসার মতো বল তার কবজিতে নাই।

ওসমানকে ফের ছাদেই যেতে হয়। শওকতের পাশে দাঁড়িয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে দেখলো মাত্র ৭জন লোকের সঙ্গে শ্লোগান দিতে দিতে নামলো খিজির আলি, 'সান্ধ্য আইন সান্ধ্য আইন'—'মানি না মানি না', 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো'—'দিকে দিকে 'আগুন জ্বালো', 'জেলের তালা ভাঙবো'—'শেখ মুজিবকে আনবো।' কয়েক মিনিটের ভেতর নানা দিক থেকে এইসব শ্লোগানের প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। মহল্লার গলি উপগলি শাখাগলি থেকে আরো সব লোক এসে ছুটছে খিজিরদের সঙ্গে। এতো লোক কোত্থেকে আসে? পাড়ায় কি এতো মানুষ আছে?—হ্যাঁ, এবার ওসমান ঠিক ধরতে পেরেছে। মহল্লার জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে ভিড়ে গেছে ১০০ বছর আগে সায়েবদের হাতে নিহত, সায়েবদের পোষা কুকুর নবাবদের হাতে নিহত মিরাটের সেপাই, বেরিলির সেপাই, লক্ষ্ণৌ-এর মানুষ, ঘোড়াঘাটের মানুষ, লালবাগের মানুষ। গা একটু ছমছম করলেও ওসমান সামলে নেয়। না, তার ভয় কি? এই এলাকার সবাই জানে, ভিক্টোরিয়া পার্কে পামগাছগুলোর সঙ্গে ফাঁসিতে লটকানো সেই সব মানুষ অমাবস্যায়, পূর্ণিমায়, প্রতিপদে, একাদশীতে—মধ্যরাত্রি হলেই মহল্লা জুড়ে টহল দেয়, শত্রুপক্ষের গুলিগালাজের আওয়াজ শুনে তাদের কণ্ঠনালীতে, জিভে ও টাকরায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে, মহল্লা মাত করে জীবিত মানুষের সঙ্গে তারা শ্লোগান দেয়, 'মানি না!' মানি না!' এর মধ্যে ২ দিকের বাড়িগুলোর উদ্দেশে ১টি তীক্ষ্ণ আহ্বান শোনা যায়, 'বিবিজানের সিনার মইদ্যে খোমাখান ফিট কইরা নিন্দ পাইড়েন না ভাইসাবেরা, মরদের বাচ্চা মরদ হইলে রাস্তায় নামেন!' লোকটি কে? এতো মানুষের মধ্যে তাকে চেনা যায় না। কিন্তু তাকে খুঁজতে খুঁজতে ওসমান দ্যাখে যে কলতাবাজারের কবন্ধটাও মিছিলে যোগ দিয়েছে। অমাবস্যার রাতে, পূর্ণিমার রাতে মুণ্ডুহীন এই সেপাই ছুটে বেড়ায় নবদ্বীপ বসাক লেন, নন্দলাল দত্ত লেন, নাসিরুদ্দিন সর্দার লেন ও পাঁচভাইঘাট লেন জুড়ে। খিজির তাকে বহুবার দেখেছে, বজলু দেখেছে, ফালু দেখেছে, মহাজনের বাড়ি থেকে ফেরার সময় তাকে দেখে ফিট হয়ে গিয়েছিলো জুম্মনের মা। আজ দেখরো ওসমান। এখন কিন্তু কেউ তাকে ভয় পাচ্ছে না। মুণ্ডু নাই বলে বেচারা শুধু হাত তুলে তুলে শ্লোগানে শামিল হচ্ছে। নাঃ। আর দেরি করা চলে না। ঘরে ঢুকে ওসমান জোর কদমে এগিয়ে চলে সিঁড়ির দরজার দিকে। শওকত হাত রাখে ওসমানের পিঠে, 'কোথায় যাচ্ছেন? কারফ্যু ভায়োলেট করলেই ফায়ার করবে।'

'করুক!'

'না।'—শওকত সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঠিক পেছনে টকাটক টকাটক গুলিবর্ষণ শুরু হলে শওকতের সঙ্গে ওসমানকেও বসে পড়তে হয় মেঝেতে।

গুলির শব্দ থামে, কিন্তু পা দুটোকে ওসমান কোনোভাব বাগে আনতে পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। পাজোড়ার অবস্থা তখন সাইকেলের চাকার মতো, চালাতে শুরু না করলে সমস্ত শরীরটা ধপাস করে পড়ে যাবে। পা ২টো তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সামলাবার জন্য ওসমান তাই ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করে। ১পা, ২পা, ৩পা, ৪পা, ৫পা, ফেলতে ফেলতে বাইরে ফের গুলিবর্ষণ শুরু হয় এবং ১০ম কি ১১শ পদক্ষেপে ওসমান রীতিমতো লাফাতে শুরু করে। শওকত ভয় পেয়ে নিজে পিঠ দিয়ে চেপে ধরে সিঁড়িতে নামবার দরজা। এইভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে সে ঘুরতে লাগলো। তবে জায়গা বড়ো কম বলে কখনো তক্তপোষের সঙ্গে তার পা লাগে, কখনো মাথা ঠুকে যায় দেওয়ালের সঙ্গে। লাফাতে লাফাতে ছাদে চলে গেলে সিঁড়ির দরজার ডিউটি ছেড়ে শওকতকেও ছুটতে হয় ছাদে। 'ওসমান।' এই ওসমান'—তাকে ধরার জন্যে শওকত তার পিছে পিছে ঘোরে। কিন্তু ওসমানের গতি নির্ণয় করা কঠিন। সে এই এখন ছাদের এ মাথায় তো মুহূর্তের ভেতর ছুটে যাচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। ওদিকে রাস্তার গুলিবর্ষণ ও আর্তনাদের মধ্যে ঝলসে ওঠে স্লোগানের ধ্বনি, 'মানি না, মানি না!' একেকটি ধ্বনির ধারালো ঘায়ে ওর পা দুটো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। পা এখন তার এতো হাল্কা যে সে যেভাবে খুশি, যতোটা খুশি লাফাতে পারে। শওকত চিৎকার করে, 'ওসমান! প্লিজ! ছাদে থাকবেন না। ফায়ারিং হচ্ছে!' তা ছাদে তো ওসমান সবসময় থাকছেও না। লাফাতে লাফাতে ঘর-ছাদ, ছাদ-ঘর করে বেড়াচ্ছে। কখনো লাফায় একেবারে সোজা হয়ে, মুষ্টিবদ্ধ হাত ছোঁড়ে ওপরদিকে। এটা ছাদেও হচ্ছে, ঘরেও হচ্ছে। ঘরেও তো ছাদ রয়েছে, তাই লাফিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছোঁড়ায় সময় ঘরে থাকলে তার হাত ঠুকে যাচ্ছে সিলিঙের সঙ্গে। রক্তাক্ত হাত আবার খোলা ছাদে জ্বলে ওঠে মশালের মতো। শওকত তার ছুটতে ছুটতে হাঁপায় আর হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকে, 'ওসমান! ওসমান!'

সারারাত্রি হয়তো এরকম চলতো। সিঁড়ির দিককার দরজায় করাঘাত শুনে শওকত দরজা খুলে দেয়। ভেতরে ঢোকে মকবুল হোসেন, রঞ্জু, দোতলার আরেকজন ভাড়াটে এবং ঐ ভাড়াটের ভাই বা ছেলে বা শালা। এমনকি সিঁড়ির নিচের দিকের একটি ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানু। লাফাতে লাফাতে ওসমান তখন চলে এসেছে ঘরের ভেতর। দোতলার ভাড়াটে বলে, 'ব্যাপার কি?'

মকবুল হোসেন দাঁড়ায় লম্ফমান ওসমানের নাগালের বাইরে, 'ওসমান সায়েব কি হইলো, এ্যাঁ?' লাফানো অব্যাহত রেখে ওসমান একটু হাসে। সে কিন্তু বুঝতে পাচ্ছে যে তার এই ব্যাপারটিতে এদের অনুমোদন নাই। কিন্তু নিজের পায়ের ওপর তার সমস্ত নিয়ন্ত্রণ শেষ। রঞ্জু সাহসের সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে আসে, 'নাচেন কেন? এ্যাঁ? নাচেন কেন?' রঞ্জু ঠাট্টা করলেও ওসমানের এই লাফানোকে নাচ বলা যায় বৈ কি! তার পা পড়ছে নিয়মিত বিরতি দিয়ে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে এর মধ্যে তাল ও লয়ও চিহ্নিত করা সম্ভব। দোতলার ভাড়াটের ছেলে কিংবা শালা কিংবা ভাই—সেই ছেলেটিও রঞ্জুর সাহসে উৎসাহিত হয়ে ওসমানের সামনে গেলে তার পায়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে যায় দেওয়াল ঘেঁষে। তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার বাবা কিংবা ভাই কিংবা ভগ্নিপতি। এবার রঞ্জু ও শওকত একসঙ্গে

২ দিক থেকে তার পা চেপে ধরার জন্য এগিয়ে আসে। ওসমান যখন খুব জোরে লাফিয়ে তক্তপোষের কাছাকাছি এসেছে, তক্তপোষে উঠে দাঁড়িয়ে শওকত তখন ডান হাত দিয়ে ধাক্কা দিলো তার কোমরে। সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জু ঘুষি লাগায় ওসমানের উড়ন্ত হাঁটুতে। ওসমানের পাজোড়া শিরশির করে: কতোকাল আগে রেললাইনের কাছে বাবলাবনে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলো, সে যেন নিজেই নিজের হাঁটুতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার পাশে ছিলো কে? দুর্গা? এই ঘটনা কি দুর্গার সিঁদুর-কৌটা চুরির আগের না পরের? ধপাস করে পড়ে যেতে যেতে ওসমান মনে করতে পারলো না। মুণ্ডুসমেত তার ধড় পড়েছে মেঝেতে, পাজোড়া তক্তপোষের ওপর। সবাই মিলে তাকে বিছানার ওপর ভালো করে শুইয়ে দেয়। এমনকি তার পায়ের তুলনায় মাথা নিরাপদ ভেবে মকবুল হোসেন পর্যন্ত ওসমানের মাথা বালিসে ঠিকঠাক করে বসিয়ে দেয়। দোতলা থেকে বালতি ভরে পানি এনে তার মাথায় ঢালতে ঢালতে দোতলার ভাড়াটে মত প্রকাশ করে, 'ডাক্তার দ্যাখাইতে হইবো।'

সবাই চলে গেলে শওকত তার পা টিপে দেয়। ওসমানের পায়ে বড্ডো সুড়সুড়ি লাগছে। কিন্তু উঠে বসার ক্ষমতা তার নাই, শুয়ে শুয়েই আস্তে আস্তে পা নাচায়। পায়ে পায়ে প্রায় নিঃশব্দ তালি বাজে, সমস্ত ঘর তার চারদিকে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে।

৩৯

'বাবা তোর পাওত পড়ি বাবা! মুখ দিয়ে অক্ত উঠ্যা মরবু বাপ!' নাদু পরামাণিকের কাকুতি মিনতির সঙ্গে আরো কেউ কেউ চেংটুকে অনুরোধ করছিলো, 'হামাগোরে দ্যাখা ঘটনা বাবা, এই গাছোত যাঁই একোটা কোপ মারছে মুখত তাঁই আর ভাতের একটা নলাও তুলব্যার পারে নাই গো! অক্তবমি করতে করতে সিটক্যা মরছে!'

কিন্তু বৈরাগীর ভিটায় আজ এতো মানুষ, ঝুড়ি ও ডালের জঙ্গল সাফ না করলে লোকজনের বসবার ঠাঁই হয় কি করে? মানুষও এসেছে বাপু! ভিড় দেখে মনে হয় এদিককার গোটিয়া, তালপোঁতা, পদুমশহর, চিথুলিয়া, উত্তরের চন্দনদহ, দরগতলা, কর্ণিবাড়ি, পশ্চিমের কড়িতলা, দরগতলা, কামালপুর, গোলাবাড়ি—কোনো গ্রামে পুরুষমানুষ আজ ঘরে নাই। দূরের চর এলাকার লোকও এসেছে। যমুনার গহীন ভেতর থেকে জেগে-ওঠা ডাঙার মানুষ এদিকে খুব একটা আসে না, আজ তারা এসেছে দল বেঁধে। এদের বেশির ভাগ লোক বৈরাগীর ভিটার পুরনো বাসিন্দার খবর জানে না। তাই কেউ হাতের দা, এমনকি কাস্তে বা কোদাল দিয়েও ডালপালায় কোপ মারে। একেকটা কোপে বটপ্রাসাদ প্রতিধ্বনি তোলে। প্রতিধ্বনি প্রথম প্রথম ছিলো গুরুগম্ভীর, সেই আওয়াজে মানুষের গা ছমছম করে ওঠে। ডালপালা ও ঝুড়ির সংখ্যা একটু কমতেই প্রতিধ্বনি থেকে গাম্ভীর্য ও দম্ভ ঝরে পড়ে, দেখতে দেখতে খটখট ও ঠকঠক ধ্বনি ছাড়া তার তেমন কিছুই থাকে না। এই শব্দসমূহ ঝরঝর করে ও পরে শিরশির করে ছড়িয়ে পড়ে পাতায় পাতায়, ডালপালায়, ফলের বোঁটায় এবং

শালিক-হরিয়ালের পাখনায় পাখনায়। কিছু ফল টুপটাপ করে নিচে পড়ে কিছু পাতা বোঁটা থেকে খসে শূন্যে ভাসে এবং কিছু পাতার বাঁধন শিথিল হয়ে আসে। পুরুষানুক্রমে এই গাছের কোলে-কাঁখে বড়ো-হওয়া শালিক-হরিয়াল অতিরিক্ত উত্তেজনায় ডাল ভাঙার ও কুড়ালের কোপের ধ্বনির পাশাপাশি উড়াল দেয় উত্তরের দিকে।

বৈরাগীর ভিটা উপচে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে চাষের মাঠে, একদিকে পুকুর পাড় পর্যন্ত। অনেকে একটু ভয় পায়, তারা ইচ্ছা করেই সরে বসেছে, কথা বলছে ফিসফিস করে। হাঁটু মুড়ে বসে সবাই সমাবেশের ঘনত্ব বাড়ায়। ভাঙাচোরা ও মাটির সঙ্গে প্রায় সমান-হয়ে-যাওয়া পুরনো ইটের বেদীর ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের কাগজ থেকে পাঠ করতে শুরু করে আলিবক্স। তার পড়া তেমন শুদ্ধ নয়। যমুনার ভিজে বাতাসের ঝাপটায়-ভারি জিভে চ বর্গের তালব্য ধ্বনিগুলো সে দন্তমূলীয় উচ্চারণ করে। এতে আনোয়ারের অনুমোদন নাই: কলেজে-পড়া ও পার্টি-করা ছেলেদের আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত। তার বাক্যও মাঝে মাঝে অশুদ্ধ, প্রধানত সাধু ভাষায় লেখা হলেও চলিত রীতির হঠাৎ-ব্যবহার কানে লাগে। তবে আলিবক্সের পড়া ও মাঝে মাঝে দর্শকদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কথা বলা শুনতে শুনতে আনোয়ারের অস্বস্তি কমে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো লাগতে শুরু করে। আলিবক্সের কথা খুব স্পষ্ট। তার একই কথার পুনরাবৃত্তি বাহুল্য মনে হয় না, তার ভঙ্গি জড়তামুক্ত। খয়বার গাজীর গোরুচুরির প্রসঙ্গে এলে তার পাঠ ধীরগতি হয়, 'ধারাবর্ষা চরের হোসেন আলী ফকিরকে প্রধান সহযোগী মোতায়েন করিয়া উহার নিযুক্ত মানুষ দ্বারা কৃষকচাষীদের ঘর হইতে গোরু-চুরির যে তৎপরতায় আপনি লিপ্ত, উহা এতদঅঞ্চলের মানুষের ত্রাস ও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। আপনার জ্ঞাতসারে ও আপনার হুকুমে আপনার বেতনভুক্ত শয়তান মোহাম্মদ হোসেন আলি ফকির তাহার বর্গাদার ও পত্তনি চাষীদের দ্বারা গরীব কৃষকদের গোরুচুরি করিয়া থাকে।' আলিবক্স মুখ তুলে খয়বার গাজীর দিকে তাকায় 'আপনি কি ইহা অস্বীকার করতে পারেন?'

খয়বার গাজীকে বসানো হয়েছে ১টা বেঞ্চে, তার পাশে জালালউদ্দিন। এদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে নাদু পরামাণিক। লিখিত অভিযোগসমূহ পড়তে পড়তে আলিবক্স বারবার খয়বারকে ঐ প্রশ্ন করছিলো। প্রথমবার সে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু সমাবেশের বিশাল অংশ তার 'না' শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'শালা কথা কস না! শালা কুত্তার বাচ্চা কথা কস না!' বলে গর্জন করে ওঠে এবং তারপর থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের এই আদেশটি সে মেনে চলেছে।

আলিবক্স পড়ে,'আপনার চুরি-করা গোরুর বাথান হইতে আপনার নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ করিতে না পারায় দরিদ্র চাষী শুকরা মণ্ডল ওরফে পচার বাপ আপনার নিয়োজিত মানুষের হাতে প্রাণ দিয়েছে। নানা অজুহাতে হুকুম দিয়া আপনি মানুষ হত্যা করেন, উহাদের সংখ্যা আমাদের জ্ঞাতসারে নয়জন।'

পচার বাপের ছেলে পচা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে কাঁদে তার কোলের ন্যাংটা ছেলেটা। পশ্চিমে খিয়ার অঞ্চলে ধান কাটার কাজ সেরে খাওয়া দাওয়ার পরও দেড় কুড়ি টাকা নিয়ে গতকাল সে বাড়ি ফিরেছে। হামলানো কান্নায় তার ক্রোধ বোঝা যায় না, আপাতত পিতৃশোকই তাকে সম্পূর্ণ দখল করে রেখেছে। তবে চিৎকার করে রাগ জানায়

নবেজউদ্দিন, 'মাকুচোষা শয়তানকে বিরিঞ্চি থ্যাকা নামাও! হামারই গোরু, পয়সা দিয়া লিয়া আসা লাগে হামাকই।'

দরগাতলার বাঁকা সাকিদার উঠে দাঁড়ায়, 'শালা খুনী! শয়ের উপরে মানুষ মারছে! কিসের বিচার করো তোমরা? এক কোপেত শালার কাল্লাখান আলগা কর্‍যা দ্যাও।'

হাতের কাগজ থেকে মুখ তোলে আলিবক্স, 'আমরা এ পর্যন্ত নয়জনের খবর পাইছি। আপনে আন্দাজ শয়ের কথা তোলেন কিসক?' খয়বার গাজীর হুকুমে বিভিন্ন সময় নিহত ৯ জন ব্যক্তির পরিচয় এবং তাদের কিভাবে হত্যা করা হয় আলিবক্স সেই বিবরণ পড়ে।

বাঁকা সাকিদার আরেকজনের কথা তোলে, 'ছাইহাটার আকালুর ব্যাটা শহরালির কথা বাদ দিলেন যে?'

'না' শহরালি নিহত হয় ছাইহাটার চেয়ারম্যান খবির মণ্ডলের হুকুমে। তার বিচার করবো ছাইহাটার মানুষ। কাল ছাইহাটাত গণ-আদালত বসবো।' সবাইকে এবার চুপ করতে বলে আলিবক্স পড়ে, 'নয়টি নরহত্যাসহ নানাবিধ অপরাধমূলক কার্যকলাপ দ্বারা মোহাম্মদ খয়বার হোসেন গাজী, ওরফে খয়বার গাজী এতদঅঞ্চলের মানুষের সমূহ বিপদ ও সর্বনাশ ঘটাইতেছে। অত্র আদালত তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়।' পাঠ স্থগিত রেখে যে সমাবেশের অনুমোদন চায়, 'খয়বার গাজীর মৃত্যুদণ্ড কি আপনারা অনুমোদন করেন?'

আকস্মিক নীরবতার সৃষ্টি হলো। আলিবক্সের মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে সবাই এদিক ওদিক দ্যাখে। খয়বার গাজীর দিকে কিন্তু কেউ তাকায় না। সিন্দুরিয়া চরের এক লোক হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, 'ধরো শালাক!'

'শালাক এখনি মারো!'

আবার সবাইকে শান্ত হতে বলে প্রস্তাবটিকে আলিবক্স রায়ে পরিণত করে এইভাবে, 'সর্বসম্মতিক্রমে এই গণ-আদালত মোহাম্মদ খয়বার হোসেন গাজীকে মৃত্যুদণ্ড দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।'

মানুষের বিপুল কোলাহলের মধ্যে খয়বার গাজীর মুখ আরো নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। হাতের কাগজ পড়েই চলেছে আলিবক্স। এখন আফসার গাজীর অপরাধের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

জমির আইনকানুন আফসার গাজী ভালো বোঝে। এসব ব্যাপারে তার কাছে কেউ এলে সে বিনা পয়সায় পরামর্শ দিয়ে থাকে। জমিজমা নিয়ে পারিবারিক সমস্যা দ্যাখা দিলে সমাধান করার জন্যে সে সবসময় প্রস্তুত। কিছুদিনের মধ্যে সমস্যাসঙ্কুল পরিবারের কোনো একটি পক্ষ মামলার কাঁটা থেকে মুক্ত হয়ে দ্যাখে যে তাদেরই কোনো টিপসই বা ছাপের কল্যাণে জমি চলে গেছে আফসার গাজীর দখলে। আবার বন্যা কি খরা কি এমনি কোনো অভাবের সময় এলে তার তৎপরতা দারুণ বেড়ে যায়। ২৫/৩০ টাকা ধার দিয়ে আফসার তখন লেগে গেলো জমি লিখে নেওয়ার কাজে। চন্দনদহ বাজারে চায়ের দোকানের মাটির বারান্দায় এক বুড়ো রাত্রি কাটায়, দিনের বেলা ভিক্ষা করে বাজারের প্রান্তে বটতলায় বসে। লোকটা দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্য খুব চেষ্টা করছে, কিন্তু উচ্ছ্বসিত মানুষের সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চায় বলে লোকটির সুযোগ মেলাই মুশকিল। শেষ পর্যন্ত পথচারীদের কাছ থেকে ভিক্ষা চাওয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ করে কাঁদতে শুরু করলে সবাই তার দিকে মনোযোগ দেয়। কি ব্যাপার?—না, গতবার বড়ো বানের সময় যখন বাঁধের ওপর জীবনযাপন করছে আফসার

গাজী তাকে ৩০টা টাকা দিয়ে সাদা কাগজে একটি টিপসই দিয়ে নেয়। সেই কাগজ পরে পরিণত হয় জমি বিক্রির দলিল। বন্যার পর তার সবেধন নীলমণি সেই ১ বিঘা জমিতে চাষবাস করতে শুরু করে আফসার গাজীর বর্গাদার। বুড়ো বাধা দিতে এলে আফসার গাজীর লোকজন তাকে এ্যায়সা মার মারে যে বেচারাকে চন্দনদহ বাজারে বটতলায় না বসে আর বাঁচার পথ থাকে না। এখন তার জমি ফেরত পাবার কোনো রাস্তা কি এরা বাতলাতে পারে না? তার এই জিজ্ঞাসার জবাব দেয় ১টি ছেলে, 'জমি সব ফেরত নিয়া ভাগ কর্‌য়া দেওয়া হবো সোগলির মধ্যে সমান ভাগ হবো!' ছেলেটি আলিবক্সের দলের কর্মী, ভূমিবন্টন সম্বন্ধে দলের নীতি ব্যাখ্যা করে, 'একোজনের, মানে একো পরিবারের নামে দশ বিঘা জমি রাইখা বাদ বাকি বরাদ্দ করা হবো গরিব চাষাগোরে মধ্যে!'

এই ঘোষণায় একটা হৈ চৈ পড়ে যায়।

'তা হবো ক্যামনে? জমির দলিল লাগবো না? পরচা লাগবো না?'

'জমি এখনি ভাগ করো। কিসের দলিল? শালাগোরে সব দলিল জাল!'

এবার আলিবক্সের দলের ঐ ছেলেটি ফের উঠে দাঁড়ায়, 'এতো মানুষ এক সাথে কথা কলে কাম হবো?' আলিবক্স তখন গাজী মোহাম্মদ আফসার আলী ওরফে আফসার গাজীর দণ্ড ঘোষণা করে। আফসার গাজীর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে গরিব. চাষীদের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এর ওপর তাকে যেভাবে হোক গ্রেফতার করে ৫০ ঘা বেত মারার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হলে একসঙ্গে অনেকে উঠে দাঁড়ায়। নিজ নিজ হাতে অন্তত ১০ ঘা করে বেত মারার জন্যে উদগ্রীব প্রায় ২৫/৩০ জন লোক। অনেকের গায়ে আফসার বা তার হুকুমবরদারদের মারের দাগ এখনো টনটন করে। তাকে কয়েক ঘা মারতে পারলে এই ব্যথার উপশম ঘটে। সবাই একই বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করলে আলিবক্স তাদের বসতে বলে, 'আরে আফসার গাজী আর রশিদ মিয়া তো এখন গরহাজির। দুই শয়তানোক যখন পাওয়া যাবো ত বিবেচনা কর্‌য়া দেখলেই হবো।

'রশিদ মিয়ার কি করলেন?'

আলিবক্স জানায় যে তারও শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তার অপরাধ ও শাস্তির বিবরণ পড়ার সুযোগ না দিয়ে একজন দাবী করে, 'অশিদ মিয়ার হোল আর বিচি ক্যাটা, ছেঁচ্যা নুন-মরিচ দিয়ে ভর্তা কর্‌য়া কুত্তাক খিলাও।' তার লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ সহযোগে এই খাদ্যবস্তু প্রস্তুতের প্রস্তাবে অনেকেই হাসে, তবে কেউ প্রতিবাদ করে না। কারণ নারী সহবাস হলো রশিদ মিয়ার সবচেয়ে প্রিয় অভ্যাস। নারী-ভোগের ব্যাপারে লোকটি শ্রেণীচ্যুত, চাষাভূষা বা কামলাপাটের বৌঝিদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব বরং বেশি। চন্দনদহ বাজারের পশ্চিমে এতো চমৎকার বেশ্যাপাড়া,—কতোকাল থেকেই এই এলাকার ভদ্রলোকদের উদ্বৃত্ত কাম মেটাবার জন্য সেটা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয়ে আসছে,—অথচ রশিদ মিয়া তার ধারে কাছেও যাবে না। অন্যান্য ঋতুতে দুপুর বেলা এবং ধান কাটার সময় চাষীরা পশ্চিমে খিয়ার অঞ্চলে গেলে সন্ধ্যার পর সে চাষাদের বাড়ির আশে পাশে ঘুরঘুর করে। একবার ১টি মেয়ের স্বামী হাতে দা নিয়ে তেড়ে এলে রশিদ মিয়া পালিয়ে এসেছিলো। কিন্তু ১সপ্তাহের মধ্যে মিয়া বাড়িতে চুরির তদন্তে এসে পুলিস ঐ লোকটিকে ধরে নিয়ে যায়। থানা পুলিস ও কোর্ট-কাছারি করতে করতে লোকটা ফতুর হলো এবং তারই আদেশে তার বৌ শেষ পর্যন্ত কাজ খুঁজতে যায় রশিদ মিয়ার বড়ি। কিন্তু রশিদ মিয়া তদ্দিনে তার প্রতি আসক্তি হারিয়ে

ফেলেছে। সুতরাং মেয়েটি তার স্বামীকে কোনো সাহায্য করতে পারলো না। ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা চলে গেলো যমুনার গভীরে ভেতরে কোনো চরে। তার ভিটার ওপর এখন রশিদ মিয়া ডিপ-টিউব ওয়েল বসিয়ে চমৎকার ইরি ধানের চাষ করছে।

আলিবক্স রশিদ মিয়ার জমি দখল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে প্রৌঢ় একজন চাষী উঠে দাঁড়ায়, তার আবেদন,'তার ডিপকল উঠায়া হামার ভিটাত আবার বাড়িঘর তুলবার চাই।'

কিন্তু রশিদ মিয়াও অনুপস্থিত। ধরতে পারলেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

চেংটু জিগ্যেস করে, 'যাই হাজির আছে তাকে তো ফাঁসি দেওয়া হবো?'

'হু! ফাঁসি না, মৃত্যুদণ্ড! যেমন কর‍্যা হোক মারা হবো।'

'কখন?'

এইবার খয়বার গাজী মুখ তুলে চেংটুর দিকে সরাসরি তাকাবার চেষ্টা করে। তার ধারণা চেংটুর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চাষার ছেলে একটু দমে যাবে। কিন্তু খয়বারের চোখ নিষ্প্রভ, সে ২টো দৃষ্টিবঞ্চিত হয়ে এদিক ওদিকে ঘুরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে নিচের দিকে। পান জরদার খয়েরি ঠোঁটজোড়া খুব কাঁপছে, কাঁপন থেকে মনে হয় না সেগুলো কোনো শব্দ বের করতে সক্ষম। তার পেছনে দাঁড়িয়ে নাদু বলে, 'ও মিয়া, কথা কন। চ্যাংড়াপ্যাংড়াক বুঝ দিয়া কথা কন।' জালালউদ্দীন মাস্টার একবার উঠে দাঁড়িয়ে ফের বসে পড়ে। খয়বার গাজীর শরীরের সবটাই এখন কাঁপছে। চেংটু এগিয়ে যায় আলিবক্সের দিকে, 'ভাইজান আসামীক ক্যামন কর‍্যা কোপ দেওয়া লাগবো কয়া দ্যান!'

বিকালবেলার আলো তার কুড়ালে ঠিকরে পড়ছে। চেংটুর শরীর একটু একটু কাঁপে, কিন্তু তার চোখ স্থির। আনোয়ারের দেহেও চঞ্চলতা, তার চোখ দুটো এখন একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে, পলক ফেলা কঠিন। খোলা চোখ দিয়ে সে বটবৃক্ষের আগাপাস্তালা দ্যাখার চেষ্টা করে। গাছের ওপর মনে হয় পাতলা কালি জমেছে, কোনো কোনো পাতার গুচ্ছে আরো ওপরকার আলো পড়ায় সেইসব জায়গা ঝকঝক করে। নিচে কোনো জায়গা খালি নাই। মানুষ, কেবলি মানুষ। মানুষের নীরব মুখগুলো ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে।

আলিবক্স বলে, 'চেংটু, আগায়া আসো!'

হঠাৎ হু হু কান্নার ধ্বনি এই ভয়াবহ নীরবতাকে ছিঁড়ে ফেলার আয়োজন করে। আনোয়ার চট করে তাকায় বটগাছের মাথার দিকে: শালার পুরনো বাসিন্দা কি নতুন কোনো উৎপাত শুরু করলো? না। কাঁদছে খয়বার গাজী। আর কাঁদে নাদু। কাঁদতে কাঁদতে নাদু হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে, 'হামার ব্যাটা হয়া তুই মানুষ খুন করবু?'

'এই মানুষটা কতোগুলো মানুষের জান কবচ করছে তার হিসাব রাখো? এই মানুষ কতোগুলা মানুষের রুজি নষ্ট করছে, কও তো?' ছেলের জবাব শুনে তার কান্না আরো উথলে ওঠে।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় জালালউদ্দিন, 'আমার একটা আরজি আছিলো।'

'তাড়াতাড়ি কন। বেলা যায়। আন্দারের মধ্যে কাম সারা কঠিন।' আলিবক্সের অনুমতি পেয়েও জালাল মাস্টার দাঁড়িয়ে কাঁপে।

আলিবক্স তাগাদা দেয়, 'তাড়াতাড়ি কন গো!'

জালাল মাস্টারের চোখ তখন আনোয়ারের দিকে। আনোয়ার একটু এগিয়ে আসে, 'বলেন। ভয় কি? বলেন না!'

আলিবক্স হঠাৎ ডাকে, 'চেংটু, রেডি হ।'

জালাল মাস্টারের ঠোঁট কাঁপে, 'হাজেরানে মজলিসের কাছে—।'

কে যেন সংশোধন করে, 'কন গণ-আদালত!'

'মহামান্য গণ-আদালতের নিকট মৌলভি মোহাম্মদ খয়বর গাজী সাহেব করুণা ভিক্ষা করেন।'

সমাবেশ জবাব দেয়, 'উগল্যান ধান্দার কথা থোন।'

'শালাক এটি কোপ দিয়া মারার পরে গোর আজাব আরম্ভ হবো। তখন বুঝবো মানুষের উপরে জুলুমের ঠেলা! আল্লার বিচার যখন আরম্ভ হবো।'

'আঃ! চুপ করেন।' আলিবক্সের এই নির্দেশে লোকজন থামলে জালালউদ্দিন ফের মুখ খোলে, 'আপনেরা তাক একটা সুযোগ দেন। তওবা করার সুযোগ দেন!'

'না। সুযোগ বহুত পাইছে।'

জালাল মাস্টার বলে, 'না, সেই কথা নয়। খায়বার গাজী সাহেবের একটি প্রার্থনা, কাল তিনি জুম্মার নামাজ আদায় করবার চান। তার এই অন্তিম বাসনা—।

'তার ইচ্ছা তাকই কবার দেন।' আলিবক্সের এই শর্ত আনোয়ার অনুমোদন করতে পারে না। 'বলুক না। তিনি না বলতে পারলে আর কেউ বললে ক্ষতি কি?'

জালালউদ্দিন এবার সাহস পায়, 'বাবারা, দোষত্রুটি নিয়াই মানুষ। তার পাপতাপের শাস্তিও তো তাঁই ভোগ করবো! মৃত্যুর আগেই তাঁই একবার জুম্মার নামাজ পড়বার চায়।' এই কথার পুনরাবৃত্তি করলে সবাই হঠাৎ চুপ করে এবং শেষ বিকালের ময়লা আলোতে গোটা বটগাছ জুড়ে শালিক হরিয়াল চ্যাঁচাতে থাকে। করমালি বলে, 'উগল্যান রসের কথা থোন!'

চেংটু ঘুরে দাঁড়ায় সমাবেশের দিকে মুখ করে 'এই মানুষের আবার নামাজ বন্দেগি কি? তামাম জেবন তাঁই মানষেক জ্বল্যা পুড়্যা মারছে। চুরি করছে! তার আবার নামাজের হাউস হয় কিসক?'

নাদু ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'এতো বড়ো নামী মানুষটা, তার একটা হাউস রাখবেন না বাবা?'

আলিবক্স প্রস্তাব করে, 'আদালতের নিকট আমি একটা আবেদন করি। আসামীরে মগরেবের নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হোক। বাদ মগরেব তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবো।'

সমাবেশ থেকে অনুমোদন পাওয়া যায়। একজন বলে, 'হাজার হোক, আল্লার নাম নিবার চায়। দ্যাও বাপু, মগরেবের নামাজ পড়ব্যার দ্যাও।'

'বাবারা, বুদ্ধি হওয়ার পর জুম্মার জামাত কোনোদিন বাদ দেই নাই। একবার কঠিন রোগ হলো, দুই মাস কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে, এই আনোয়ার বাবাজীর বাপ—।' খয়বার গাজী কান্নায় ভেঙে পড়ে, আনোয়ারের বাবার সেবা শুশ্রূষার বিবরণ স্পষ্ট বোঝা যায় না। আনোয়ার একটু অবাক হয়, খয়বার গাজী হঠাৎ এতোগুলো কথা বলে ফেললো কি করে? জুম্মার নামাজ পড়ার বাসনা কি তার মধ্যে এতোই শক্তি সঞ্চার করলো? তার চোখ এখনো নিচের দিকে। ফ্যাসফ্যাসে গলায় সে প্যানপ্যান করে, 'জেলহজ্জ্ব চাঁদের পয়লা জুম্মাটা পড়্যা যদি মরবার পারি তো—!'

সবাই এখন চুপ। আনোয়ার ভয় পায়, লোকটার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে না দিলে সমাবেশের ভেতর আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়া না হয়। 'শোনেন', আলিবক্সের কানের কাছে

মুখ নিয়ে আনোয়ার ফিসফিস করে, 'ব্যাপারটা কনসিডার করতে হয়। মানুষের সেন্টিমেন্ট আবার হার্ট না হয়!'

আলিবক্সের স্বরের মাত্রা কিন্তু স্বাভাবিক, 'আরে রাখেন। শালা টাইম চায়, বুঝলেন না? পাবলিক ঠিকই বোঝে, মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি আপনার চায়া কারো কম না, বুঝলেন?'

জালালউদ্দিন এবার হঠাৎ হাত ধরে ফেলে আলিবক্সের, 'বাবা, তুমি আমার ছাত্র না হলেও পুত্রতুল্য। তোমার আত্মীয়স্বজন ইষ্টিকুটুম্বের মধ্যে আমার ছাত্র নিশ্চয়ই আছে—।'

'মাস্টার সায়েব, আমার জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে আপনার ছাত্র থাকা সম্ভব নয়। বংশের মধ্যে ল্যাখাপড়া করছি খালি আমি একলাই।'

একটু দমে গেলেও জালালউদ্দিন হাল ছাড়ে না। 'একটা দিন দিব্যার পারেন না? নিজেগোরে মসজিদ, দাদাপরদাদারা বানায়া গেছে, একটা দিন খালি জুম্মার জামাত পড়বো!'

আলিবক্স জবাব না দিয়ে খয়বার গাজীর অপরাধের তালিকা লেখা লম্বা কাগজটা ভালো করে পরীক্ষা করে। দলের কর্মীরা কাগজটা খয়বারের পিঠে ঠেকিয়ে দেখে নিলো, একটু পর মৃতদেহের সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হবে। খয়বারের প্যানপ্যানানি পরিণত হলো হাউমাউ আর্তনাদে। জেলহজ্জ চাঁদের প্রথম জুম্মার নামাজ পড়ার আকুল পিপাসা তার মাথায় চড়ে; আল্লার নাম বাদ দিয়ে সে তার করাচি, ঢাকা ও বগুড়া শহরে বসবাসকারী ৩ ছেলে, মৃত কন্যা এবং বাপের বাড়িতে বেড়াতে-যাওয়া স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকে। এই আর্তনাদের মর্মোদ্ধার করা আনোয়ারের পক্ষে অসম্ভব। লোকটাকে নামাজ পড়ার সুযোগ দেওয়াটা বোধ হয় উচিত। কিন্তু আলিবক্স রাজি হতে চায় না, 'তার আসল মতলব কাইটা পড়া!'

আলিবক্সের কানে মুখ নিয়ে আনোয়ার ফিসফিস করে, 'মরার আগে একটা দিন কি এসে যায়? সরকারী আদালতেও তো দেয়!'

খয়বার গাজীর হাউমাউ কান্না নাদুকেও জোরে জোরে বিলাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে, 'এই গাঁওয়ের উপরে আল্লার গজব পড়বো বাবা!'

ওদিকে একটু দূরে গাবতলার দিকে কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে। বান্দু শেখ ও নবেজউদ্দিন তাই দেখে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে, বটবৃক্ষের পুরনো বাসিন্দা তার বাস্ত ভিটায় মানুষের সমাগম ও কোলাহলে ক্রুদ্ধ হয়ে কি শাস্তি দিতে আসছে? করমালিও ভয় পায়, 'সলক কিসের গো?' হাতের দায়ের ওপর তার আঙুলগুলো চেপে বসে। একটা হ্যাজাকের আলো কাছাকাছি চলে এলে পেছনে ২০/২৫ জনে একটা মিছিল স্পষ্ট হয়। মিছিল সামনে পৌঁছুবার আগেই শোনা যায়, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র'—'মানি না মানি না'; 'পদ্মা মেঘনা যমুনা'—'তোমার আমার ঠিকানা'; 'জেলের তালা ভাঙবো'—শেখ মুজিবকে আনবো'।

মিছিলের সামনে প্যান্ট-শার্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা কয়েকজন কলেজের ছাত্র। সমাবেশের মানুষ ওদের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। ওদের একজন আলিবক্সকে চেনে, 'আপনাদের মিটিং?'

'গণ-আদালত বসছে।'

'ভালো করছেন। পশ্চিমাদের দালালগুলারে শাস্তি দেন!'

চেংটু আলিবক্সের শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়, বড়ো দেরি হয়ে যাচ্ছে, খয়বার গাজীকে এক্ষুনি শেষ করে ফেলা দরকার।

কিন্তু হ্যাজাকওয়ালা মিছিল তখন সমাবেশে ঢুকে পড়েছে। এদের একজন বক্তৃতা শুরু করে, 'ভাইসব, স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহী মোনেম শাহীর শোষণে সোনার বাঙলা শ্মশানে পরিণত হয়েছে।' চেংটু বক্তার দিকে এগিয়ে যায়, 'এখন ইগল্যান থোন। হামাগোরে কাম হবা নাগছে।' কিন্তু সমবেত মানুষের কেউ কেউ বক্তৃতা শুনতে চায়, 'হোক না! ভাষণ হোক!'

উৎসাহিত যুবক তার বক্তৃতা অব্যাহত রাখে, 'বাঙালির প্রাণের দাবী, বাঁচার দাবী নিয়ে আন্দোলন করার অপরাধে বাঙলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান আজ পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের শিকার। বাঙালি আজ ঐক্যবদ্ধ, একমন, একচিত্ত—।'

আলিবক্স তাদের একজনকে ডেকে বলে, 'আমাদের আদালতের কাম হয়া যাক। আপনে না হয় পরে লেকচার দিয়েন।'

বক্তা যুবক থামতে পারে না। তার দলের লোকটি বলে, 'আমরা তো লেকচার দিতে আসিনি। চন্দনদহ বাজারে কাল আমাদের সভা, তাই ঘোষণা করতে এসেছি।'

এদের কেউ কেউ জালালউদ্দিনের ছাত্র। তার সঙ্গে কথাবার্তায় বোঝা যায় একজন পড়ে রাজশাহী ইউনিভারসিটিতে। আর একজন বগুড়া আজিজুল হক কলেজের ছাত্র। আর বক্তৃতা করছে যে ছেলেটি সে হলো দরগাতলার সরকারদের ছেলে, বরাবর ঢাকাতেই মানুষ, ঢাকা ইউনিভারসিটির নিমনেতা গোছের ছাত্র। জালালউদ্দিন তার ভাষণে অভিভূত, 'বোঝাই যায়, ভাষার উপর ছেলের দখল খুব!'

কিন্তু অধৈর্য হয়ে ওঠে চেংটু, 'কথা তো মেলা কলেন! আপনাগোরে মিটিঙে কাল যাওয়া হবো। এখন আমাগোরে কাম করবার দ্যান তো!'

চেংটুর হাতে কুড়াল এবং চোখের স্থির মণি দেখে বক্তা ও তার সহকর্মীরা থামে। তাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত সদাসপ্রতিভ অভিব্যক্তি দিয়ে এই ভড়কে-যাওয়া সামলানো দায়। আগামীকাল বিকেল ৩টায় চন্দনদহ বাজারে তাদের জনসভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে তারা পা দেয় হয় গ্রামের রাস্তায়। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের শ্লোগান এসে প্রতিধ্বনিত হয় বটগাছের পাতায় এবং ডালে। ওরা যাবার পর বোঝা গেলো যে সমাবেশের লোকও একটু কমে গেছে। আরো কিছুক্ষণ পর বোঝা যায় যে কয়েকজনের ছোট্টো একটি দল সমাবেশ থেকে বেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গাজী বাড়ির দিকে। কারা? আনোয়ার পা উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করছে, ৫/৬ জন লোকের ছায়া ছায়া গতি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না। 'কারা?'

করমালি বলে, 'না, হামাগোরে মানুষ!'

'কোথায় যাচ্ছে?'

কেউ জবাব দেয় না।

হঠাৎ করে উত্তরদিকের আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠে। কি হলো? আগুন?

হ্যাঁ, আগুনের শিখা গোলাপি রজনীগন্ধার মতো দুলে উঠলো। কি হলো?

চেংটু শান্ত গলায় জানায়, 'গাজীবাড়ির খানকা ঘর পোড়া।'

'এ্যাঁ?' আনোয়ার চমকে ওঠে, খয়বার গাজীর বৈঠকখানার দালানে আগুন লাগালো কে?

দেখতে দেখতে আগুনের শরীর থেকে কোমলতা লুপ্ত হয়, চওড়া ও লম্বা শিখায় আগুন আকাশভুক হবার উদ্যোগ নেয়।

'আল্লা গো!' বলে প্রাণঘাতী একটি চিৎকার করে খয়বার গাজী মাটিতে পড়ে যায়। আনোয়ার চমকে ওঠে, চেংটু এরকম হঠাৎ করে কুড়ালের বাড়ি মেরে লোকটাকে কি শেষ করে ফেলল?

না, তাকে কেউ স্পর্শ করেনি। গৃহদাহের দৃশ্য তার এই আকস্মিক শোকাধিক্যের কারণ। মুহূর্তের মধ্যে করমালি ও পচা তাকে ধরাধরি করে তোলে। করমালির পায়ে পোড়ার ঘা, তার পক্ষে অতো বড়ো দেহ ধরে রাখা মুশকিল। তাই তার জায়গায় নেয় চেংটু, চেংটুর কুড়াল নিচে পড়ে রইলো। পচা ও চেংটু খয়বার গাজীকে নিয়ে ছুটতে শুরু করে উত্তরের অগ্নিকাণ্ডের দিকে। আনোয়ার হতচকিত হয়, 'কি হলো? চেংটু! কোথাও যাচ্ছো?' আলিবক্স কিছু না বলে ওদের অনুসরণ করে। করমালি তাদের সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়ায় আর চিৎকার করে, 'শালাক আজ হোসেন ফকিরের দশা করমু! আসো গো, সোগলি আসো! শালা মাকুচোষা ডাকাত শয়তানকে আজ আগুনের মদ্যে পোড়ানো হবো!'

আনোয়ার ছুটতে ছুটতে বলে, 'আলিবক্স, আলিবক্স!'

আলিবক্স ছুটতে ছুটতে পেছনে তাকায়, 'তাড়াতাড়ি আসেন।'

'আলিবক্স, গণ-আদালতের স্পিরিট থাকছে না। এটা ঠিক হচ্ছে না।'

আলিবক্স থুথু ফেলে, 'স্পিরিট তো নষ্ট হয়াই গেছে। জুম্মার নামাজ নিয়া কাউল পয়দা করলেন। তা শয়তানটারে বাঁচাবার পারলেন কৈ?'

আনোয়ার প্রাণপণে ছোটে, তার জমাট-বাঁধা মাথা টলোমলো: খয়বার গাজীকে সে বাঁচাবার চেষ্টা করবে কেন? তার অপরাধ তাতে কয়েকবার ফাঁসি দিলেও তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান হয় না। থানা পুলিশ, কোর্ট-কাছারি সব যখন প্রহসন তখন গণ-আদালত গঠন না করে আর পথ কি? এসব কি সে কারো চেয়ে কম বোঝে? খয়বারকে সে বাঁচাতে যাবে কেন? গাজীদের সঙ্গে আত্মীয়তার তার কি এসে যায়? এখানকার পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে সে তো সম্পর্কহীন, ২পুরুষ ধরে সম্পর্কহীন। তাহলে?—প্রকৃতপক্ষে দণ্ডিতের একটি বিশ্বাস, না বিশ্বাস নয়, একটি ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিয়ে সে গণ-আদালতের মর্যাদাময় চরিত্র গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলো। খয়বার গাজীকে জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে দিলে তাকে মেরে ফেলার জন্যে এতো মানুষের অনুমোদনের দরকার ছিলো না। তার সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে তাকে একটা পাগলা কুত্তায় পরিণত করে মারলে তার সঙ্গে সাধারণ হত্যার পার্থক্য কি? খয়বারকে শাস্তি দেওয়া দরকার। কাল আনোয়ার নিজে তাকে মারবে, দা দিয়ে হোক কুড়াল দিয়ে হোক—খয়বার গাজীর ঘাড়ে প্রথম ও চূড়ান্ত কোপটা দেবে আনোয়ার নিজে।

আলিবক্স চেংটুকে ধরে ফেলেছে, 'চেংটু, এটা কি করলি?'

চেংটু উদ্ধত চোখ নিচের দিকে নামে। খয়বার গাজী মাটিতে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে থাকে। আলিবক্স চেংটুর ডান হাত ধরে ঝাঁকায়, 'আদালতের সোগলির মতামত অসম্মান কর্যা আসামীকে নিয়া তুমি দৌড় মারছো কিসক?'

'তাক আগুনে দিয়া মারা দরকার। আপনেরা কি তাক মারবার দিবেন?'

'কোন শালা তাক রক্ষা করবার পারে? আদালত তার মৃত্যুদণ্ড সাব্যস্ত করছে। তার অপরাধ সোগলি একটা একটা কর্যা লেখ্যা তার পিঠোত লাগায়া দেওয়া হবো। তাইলে আর সব শয়তান শয়তানি বন্দ করবো। তুমি শালাক খালি খুন করবার চাও? খয়বারেক পুড়ায়া ম্যারা তুমি আরেক খয়বার হবার চাও?' এদিকে গাজীদের বৈঠকখানা জ্বলে যাওয়ার দপদপ

আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা যায় জালাল মাস্টারের চিৎকার, 'আরে, তামাম গাঁও পুড়্যা যাবো গো! পানি ঢালো, পানি ঢালো।'

'পুড়ুক!' করমালি প্রতিবাদ করে, 'শয়তানে গুনাগারি দিবো না?'

আরো কেউ কেউ হৈ হৈ করে ওঠে, 'শালার সব শ্যাষ হয়া যাক!'

জালাল মাস্টার সর্তক করে, 'আরে গাঁও দগ্ধ হয়া যাবো!'

'হামাগোরে আছে কি? শালারাই তো ব্যামাক নিয়া নিজেগোরে ঘরোত তুলছে!'

'আরে পরিবার আছে না? তোমাদের স্ত্রীপুত্রকন্যা আছে না?' জালাল মাস্টারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবার অনেকে তার কাছে আসে। খয়বারের আত্মীয়স্বজন কারো টিকি দ্যাখা যায় না, ভয়ে সবাই এদিক ওদিক গা ঢাকা দিয়েছে। জালালউদ্দিন তাই সমাবেশের লোকদের কিসব নির্দেশ দেয়। দেখতে দেখতে প্রচুর পরিমাণে মাটির কলসি বদনা বাটি চলে আসে। বাড়ির সামনে পুকুর থেকে পানি তুলে লোকজন খয়বার গাজীর বৈঠকখানা আগুন নেভাবার কাজে তৎপর হয়ে ওঠে।

৪০

আনোয়ারদের বাড়িতে লোকজন নাই বললেই চলে। গতকাল দুপুরে বড়োচাচা সপরিবাবে চলে গেছে পদুমশহর। সেখানে তার শালীর শ্বশুর-বাড়িতে রাত্রি কাটিয়ে চলে যাবে বগুড়া। বাড়ির পেছনদিক দিয়ে গেছে, মেয়েদের জন্য গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। মন্টুটা পর্যন্ত পালিয়েছে। এতোগুলো ঘর ফাঁকা। মাঝখানের মস্ত শোবার ঘরে খয়বার গাজী, ঘরের ২টো দরজায় আলিবক্সের দলের লোকজন। বারান্দায় বান্দু শেখ ও পচা। আনোয়ারের ঘরের ভেতর দিককার দরজা খোলা, দরজার পাশে বারান্দায় লোহার থামে সুতা বেঁধে জাল বোনে নবেজউদ্দিন। দেওয়ালে হেলান দিয়ে পোড়া পা মেঝেতে কোনোরকম রেখে কোঁকায় করমালি। করমালির গায়ে জ্বর। এই পোড়া পায়ের যে কি হবে! আনোয়ার তো ওষুধপত্রের কোনো ব্যবস্থাই করতে পারলো না।

দলের ১টি ছেলের সঙ্গে নিচুস্বরে কথা বলতে আলিবক্স বেরিয়ে আসছিলো, আনোয়ারের ঘরে ঢুকে বলে, 'আনোয়ার ভাই, আপনে গাজীর ঘরে যান। রাত্রে ঐ ঘরেতে থাকবেন।'

'আপনে?'

'আমার যাওয়া লাগবো।'

'কোথায়? এতো রাত্রে?'

আলিবক্স তাকে টেনে বারান্দার এক প্রান্তে নিয়ে যায়, 'ছাইহাটার খবর ভালো না।'

'কি?'

'এই চ্যাংড়া খবর নিয়া আসছে। আমাগোরে চ্যাংড়ো।'

আলিবক্সের দলের ছেলেটি খবর নিয়ে এসেছে যে সন্ধ্যা থেকে ছাইহাটায় খুব গোলমাল। কাল দুপুরে প্রাইমারি স্কুলের মাঠে গণ-আদালত বসবে, ছাইহাটার চেয়ারম্যানের বিচারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কিন্তু আজ বিকাল থেকে দলের ১টি ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের লোকজন খেপে গিয়ে চেয়ারম্যানের বাড়ি চড়াও হয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ওদিকে যে ছেলেরা আজ বৈরাগীর ভিটার সামনে দিয়ে মিছিল নিয়ে গেলো তারা প্রাইমারি স্কুলের মাঠ দখল করে স্কুলের দেওয়ালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙিয়ে দিয়েছে। তাদের দাবী এই যে আগামীকাল গণ-আদালত বসানো চলবে না, বসলে ওদের চন্দনদহের ঐতিহাসিক আলিবক্সদের পরবর্তী প্রোগ্রাম নষ্ট হতে পারে। আলিবক্স আজ ওখানে সব ঠিক করে ভোর হওয়ার আগেই ফিরে আসবে।

বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ নিচে উঠান, পাতলা কুয়াশা জড়ানো শীত সেখানে শিরশির করে। আগুনের ১টি বিন্দুকে উঠানে জ্বলতে দেখে আনোয়ার চমকে ওঠে, 'কে?'

মুখ থেকে বিড়ি নামিয়ে এগিয়ে আসে চেংটু। হঠাৎ চমকে ওঠায় আনোয়ার বিব্রত হয়, 'আলিবক্স, ভোরে আসতে পারবেন তো?'

'পারবো। না পারলেও অসুবিধা হবো না। দুইটার মধ্যেই বৈরাগী ভিটাত কাম শ্যাষ কর‍্যা আবার ছাইহাটা মুখে মেলা করা লাগবো।'

চেংটু বলে, 'ভাইজান না আসবার পারলে হামরা আছি না?'

খয়বার গাজী শুয়ে রয়েছে বড়োচাচাদের বিশাল সেকেলে পালঙে। গদিমোড়া ইজি চেয়ার বসতে বসতে আনোয়ার আড়চোখে তার দিকে তাকায়। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আয়ুব অধিকারী লোকটা কম্পমান চোখে তার চারপাশের জগৎ শেষবারের মতো অনুভব করে নিচ্ছে। জীবনে কতোগুলো খুনজখম করেছে, কতো মানুষের সর্বনাশ করেছে—তাই ভেবে কি সে অস্বস্তি বোধ করে? তার মাথায় কি কেয়ামতের ভয়? আখেরাতের ভাবনায় কি সে কাতর? নিজের বিশ্বাস কি সংস্কার অনুসারে নামাজ পড়ে মৃত্যুর আগে তওবা করতে পারলে লোকটা একটু শান্তি পায়। এই অনুতাপ মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাকে হয়তো ১টি মানুষে পরিণত করবে।

'বাবা! বাবা আনোয়ার!' খয়বারের ডাকে আনোয়ার ইজি চেয়ার থেকে উঠে তার কাছকাছি দাঁড়ায়', কিছু বলবেন?'

খয়বারের চোখের কোণ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে। আনোয়ার বলে, 'জায়নামাজ এনে দেবো? নামাজ পড়বেন?'

খয়বার ভাঙাচোরা গলায় বিড়বিড় করে 'বৈঠকখানার সবটাই পুড়ছে, না?' আনোয়ার জবাব দেওয়ার আগেই সে স্বগতোক্তি করে 'এতো দিনের বাড়ি! চাষাভূষার হাতে লুটপাঠ হলো। কতো জিনিসপাতি, বাসনকোসন, সোনা-দানা, কাপড়চোপড়! কাশ্মিরী শালই আছে বারো চোদ্দখান! বাপজানের আমলের চিনামাটির বাসন, দাদীর আমলের গয়নাপাতি!'

আনোয়ার অবাক হয়ে লোকটার বিলাপ শোনে।

'বৈঠকখানার পেছনে ধানের গোলা, ওটাতেও আগুন দিছে বাবা?'

'ধানের গোলা? আপনি যাদের গোরু চুরি করেছিলেন ধানের গোলা এখন তাদের দখলে।'

আনোয়ারের ঘৃণা হয়, সম্পত্তির লোভ লোকটার এতোটুকু কমেনি।

'তোমরা আমাক ধর্য়া আগুনের মধ্যে ফালায়া দিবার পারলা না? আমার দলিলপত্র হিসাব নিকাস সব থাকলো পুব দুয়ারি দালানের মধ্যে। আমার ছেলেরা সব চাকরি বাকরি করে, সয়সম্পত্তির হিসাব কিছু বোঝে না।' বলতে বলতে খয়বার কাঁদে, কাঁদতে, কাঁদতে ফের বলে, 'রোকেয়ার ব্যাটার নামে কিছু লেখ্যা দিবার পারলাম না। সৎ মায়ের সাথে থাকে, বাপ যতো ভালো মানুষ হোক, কদ্দিন তার ভালোমানুষি থাকবে?' মৃত কন্যার একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যতের ভাবনায় খয়বার গাজী উদ্বিগ্ন। তবে এর চেয়েও বড়ো উদ্বেগ তাকে অস্থির করে, 'কর্ণিবাড়ির বিলের ধারে সাড়ে সাত বিঘা জমি নিয়া মামলা করছে আকন্দেরা, উকিলের সাথে পরামর্শ করা হলো না। ঐ জমির দশা যে কি হয়?'

আনোয়ার ভাবে চেংটুর কুড়াল চেয়ে নিয়ে এক কোপে শালাকে শেষ করে দিই। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে সম্পত্তির জন্য ব্যাটার এরকম খাইখাই ভাব;—এর চিকিৎসা আর কি হতে পারে?

'বাবা, আনোয়ার, এক বদনা পানি দিবার কও তো। অজু কর্যা জায়নামাজে বসি। আল্লা! ও আল্লা!'

বারান্দায় বসে খয়বার গাজী অজু করে। জাল বোনা বন্ধ রেখে নবেজউদ্দিন এবার টুল, একবার গামছা এগিয়ে দেয়। ঘরের ভেতর খয়বার নামাজ পড়তে বসলে নবেজউদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকে তার পেছনে। বারান্দায় পায়ের যন্ত্রণায় গোঙায় করমালি। উঠান থেকে আলিবক্সের দলের ১টি ছেলে এগিয়ে আসে। ছাইহাটা থেকে খবর এসেছে, তাদের দলের নিখোঁজ ছেলেটির লাশ পাওয়া গেছে ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিসের পেছনে। গ্রামের লোক ঐ অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চেয়ারম্যান বোধহয় পালিয়ে গেছে, তার ভাইকে ধরা হয়েছে।

ঘরে রাকাতের পর রাকাত নামাজ পড়ে চলেছে খয়বার গাজী। এই করতে করতে সকাল হয়। আনোয়ারের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। চেংটু এসে খবর দেয়, আলিবক্সের ফিরতে দুপুর হতে পারে।

আনোয়ারের ঘুম মাথায় ওঠে, 'তাহলে এখানকার কাজ?'

'হামরা আছি কিসক? জুম্মার নামাজ বাদে কাম করা হবো?'

৮টা সাড়ে ৮টার দিকে ১টি ছেলে এসে জানায় যে আলিবক্স রওয়ানা হয়েছে। আনোয়ার এক গ্লাস পানি খাবার জন্যে পাশের ঘরে ঢুকেছে, এমন সময় একটু দূর থেকে সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি কানে আসে। তাহলে আলিবক্স কি মিছিল নিয়ে আসছে?

না। এ মিছিল আলিবক্সের নয়। 'তোমার আমার ঠিকানা'—'পদ্মা মেঘনা যমুনা'; 'তোমার নেতা আমার নেতা'—'শেখ মুজিব শেখ মুজিব'—এইসব শ্লোগান থেকে বোঝা যায় চন্দনদহের জনসভায় উদ্যোক্তারা গ্রাম প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। দেখতে দেখতে মিছিল বাড়ির সামনে এসে পড়ে এবং মিছিলের কয়েকজন ঢুকে পড়ে বাড়ির ভেতর। কেউ কেউ বলে, 'আসেন ভাই, আপনারা সবাই আসেন।'

'বাঙালির জাতীয় নেতা আজ কারাগারের অন্তরালে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে ঢাকার হাজার হাজার মানুষ আজ বুক পেতে দিচ্ছে বুলেটের সামনে। সামান্য গ্রাম্য কোন্দল নিয়ে আপনারা বাঙালির ঐক্য নষ্ট করবেন না!' ১ তরুণ নবেজউদ্দিনের হাত ধরে, 'আসেন ভাই।' হাত ছাড়িয়ে নিলে ছেলেটি ধরে বান্দু

শেখের হাত এবং তার হাতে গুঁজে দেয় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি আঁকা পোস্টার। বান্দু শেখ ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে চেংটু চটে যায়, 'আপনেরা কি আরম্ভ করছেন? হামাগোরে মানুষ নিয়া টানেন কিসক?'

'তোমাদের মানুষ আমাদের মানুষ কি ভাই? আমরা সবাই বাঙালি!'

চেংটু তার ডান হাতে কুড়াল নেয়, 'সোহাগের কথা থোন! হামরা বলে জানে মরি, শালা মাক্কুচোষা শয়তানগুলা হামাগোরে ছেঁচ্যা পিষ্যা শ্যাষ করলো—।'

মিছিলের আরো কয়েকটা ছেলে এবার হৈ হৈ করতে করতে ঘরে ঢুকলে আনোয়ার বাধা দেয়, 'ঘরের ভেতর ঢুকছেন কেন? বাইরে যান!'

'আপনার কথায়?' ১টি ছেলে ঘুরে দাঁড়ায়, 'এটা আমার খালার বাড়ি, জানেন? আপনারা বেআইনী দখলদার।'

'আমাদের সঙ্গে গোলমাল করবেন না। ভালোভাবে বলছি সবাই মিছিলে আসেন।' চশমাওয়ালা ছিপছিপে ছেলেটির জবাবে আনোয়ার জোরে ধমক দেয়, 'গোলমাল তো করছেন আপনারা। বেরিয়ে যান! আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের থ্রেট করার সাহস পান কোথায়?'

তার কথা শেষ হতে না হতে চেংটু এসে দাঁড়ায় তাকে আড়াল করে, 'আপনেরা যান। দুপুরবেলা হামাগোরে কাম সমাধা হলে আপনাগোরে সভাত যাওয়া হবো।'

চশমাওয়ালা রুখে দাঁড়ায়, 'আমাদের ভয় দ্যাখাও, না?' তার সঙ্গীরা চিৎকার করে, 'এতো বড়ো কথা! ভয় দ্যাখায়?'

সংঘর্ষের সম্ভাবনায় আনোয়ার চঞ্চল হয়ে ওঠে। আলিবক্স কি তাকে বিপদে ফেলে কেটে পড়লো? হঠাৎ দ্যাখে হাতের কুড়াল ওপরে তুলে চেংটু সবাইকে তাড়া করছে। চেংটুর সঙ্গে নবেজউদ্দিন হাতের দা ঘোরানো শুরু করে। মিছিলের ছেলেরা দৌড়ে বাইরে চলে যায়। চেংটু ও নবেজউদ্দিনের সঙ্গে আনোয়ারও বাইরে ছোটে। মিছিলের ছেলেরা রাস্তা ধরে চন্দনদেহের দিকে উধাও হলো। বাড়ির বাইরে কাঁঠালতলায় দাঁড়িয়ে নবেজউদ্দিন কাঁপে, 'বড়োমানষের ব্যাটাগোরে কওয়াই হলো, তোমাগোরে সভাত যাওয়া হবো! তা শালাগোরে প্যাগনা কতো!—'

এইভাবে কথাবার্তা চলছে, চেংটু হঠাৎ প্রায় দৌড়ে ভেতরের দিকে চলে যায়। আনোয়ার তার পেছনে।

ঘরে চেংটু একা। আনোয়ার বারান্দায় পা দিতেই চেংটু হাঁপায়, 'গাজী কোটে?'

'নাই।'

কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে উঠানে নেমে চেংটু দৌড়াতে শুরু করে কলাপাড়ের দিকে। 'পায়খানা গেছে বোধহয়!' কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ায় আনোয়ার।

কলতলা থেকে হলুদ বনের ভেতর দিয়ে গেলে বাড়ির শেষ সীমায় পায়খানা। পায়খানা খোলা দরজায় উঁকি দিয়ে চেংটু চিৎকার করে, 'বদনা আছে।'

'শুধু বদনাই আছে?'

'হুঁ! মানুষ নাই!'

পায়খানার পেছনে শটিবন। এরপর নিচু জায়গা, বর্ষার পানি নামলে এখানে মাগুর শিঙির ছড়াছড়ি, এখন বাঁশপাতার পাঁজা। এরপর উঁচু জায়গায় ঘন ও বড়ো বাঁশঝাড়।

খুঁজতে খুঁজতে সবাই বাঁশঝাড় পেরিয়ে দাঁড়ায় ফসলের মাঠে। আদিগন্ত মাঠ। মাঠের ওপার পদুমশহর গ্রাম লী লী করে। এতো তাড়াতাড়ি খয়বার গাজী এই মাঠ পার হবে কি করে?

আনোয়ার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপায়! সবাই মিলে বাড়ির ভেতর ও আশেপাশে খোঁজাখুঁজি চালায়। রান্নাঘরে সিলিঙে ঝোলানো পাটখড়ির বোঁচকা। সেখানে হাতড়াতে গেলে ডান হাতে বিছার কামড় খায় নবেজউদ্দিন। আলিবক্সের দলের ১টা ছেলে চুলার ভেতর পর্যন্ত খোঁচায়। আলিবক্স ফিরে এলে আরেক দফা অনুসন্ধান চললো। দলের কর্মীদের আলিবক্স চাপা ও কঠিন গলায় একটু বকে, 'নিজের ঘরের মধ্যে থাকবার পারলা না? মানষেক এতো বিশ্বাস করো কিসক?'

এই অবিশ্বাসী মানুষটি কি আনোয়ার? কাঁটা কাঁটা ঢোক গিলতে গিলতে আনোয়ার প্রস্তাব করে, 'পদুমশহর গেলে হয় না?'

আলিবক্স হাসে, 'পদুমশহর ইস্কুলের মাঠে ঐ মিছিলআলাগো সভা চলতিছে। বড়োলোকের গাঁও, সোগলি গাজীগোরে ইষ্টিকুটুম। ঐ গাঁয়ের মেলা মানুষ ঢাকাত থাকে, বগুড়াতে থাকে। ছেলেপেলে সব কলেজ ইউনিভারসিটিত পড়ে। চন্দনদহের মিটিং করে সব তারাই। ঐ গাঁওত আজ ঢোকাই যাবো না।'

বারান্দায় এক কোণে বসে লাল রঙের চোখ মেলে চেংটু দেখছিলো উঠানের কালো মাটি। করমালির বিরতিহীন গোঙানিতে বিরক্ত হয়, 'মাগীমানষের লাকান নালাস কিসক?' তারপর মাটির দিকে মুখ রেখেই সে বিড়বিড় করে, 'শালা তামাম আত ধর‍্যা নামাজ পড়ে, কতো বড়ো মুসল্লি!' পুরু ও ফাটা ঠোঁটে ছোট্টো ১টি হাসির টুকরাকে চেংটু চটকায়, 'ভাইজান, কওয়া যায় না, জুম্মার নামাজের ওকতো হলে আজান শুন্যা বৈরাগীর ভিটাত অ্যাসা খাড়া হবার পারে। মুসল্লি মানুষের জবান!—বরখেলাপ করবার পারে?'

আনোয়ার চুপচাপ শোনে। চটকানো তেতো হাসি গিলে ফেললে চেংটুর কথা আরো তেতো হয়ে ওঠে, 'বড়োনোকের মাথাত কতো ফন্দিই বারায়!' আলিবক্স ছাইহাটা যাবার প্রস্তুতি নেয়, 'আমরা যাই ভাইজান, যদি কোনো সোম্বাদ পান তো নবেজউদ্দিনকে পাঠায়া দিবেন!'

কিন্তু নবেজউদ্দিন থাকবে না। ছাইহাটার নামকরা সিঁধেল চোর জুলু ধরা পড়েছে, গণ-আদালতে তার বিচার হবে। জুলু চোর একবার নবেজউদ্দিনের ঘরে সিঁধ কেটে একটা কাঁথা আর সের ২চাল নিয়ে গিয়েছিলো, লোকটাকে সে নিজ হাতে ২টো চড় মারতে চায়। নবেজউদ্দিন আবার আনোয়ারকেও যেতে বলে। কিন্তু চেংটুর নির্বিকার নীরবতায় আনোয়ার ইতস্তত করে, 'এখানে করমালি একেবারে একা থাকবে। পায়ের যা অবস্থা!'

'তা আপনে কি করবেন?'

চেংটুর কথায় আনোয়ার বিরক্ত হবার সুযোগ পেয়ে একটু চাঙা হয়ে ওঠে, 'থাকা দরকার। ফোস্কা গলে গেলে বিপদ হবে!'

সবাই চলে গেলে হঠাৎ ঝপ করে সন্ধ্যা হয়ে যায়। করমালির পাশে দাঁড়িয়ে উঠানের ওপারে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা নোনা-ধরা দেওয়াল তার লোমভরা গতর নিয়ে যেন নড়াচড়া করে। সন্ধ্যার পর লণ্ঠন হাতে আনোয়ার বড়োচাচার ঘরে যায়, লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে খাটের নিচে উঁকি দেয়। খুনী, গোরু-চোর, আইয়ুব-মোনামের গুণ্ডাপাণ্ডাদের সেবাদাস খয়বার গাজী এখানে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নাই তো? নির্জনতার সুযোগে ব্যাটা আবার অতর্কিতে লাফিয়ে

পড়বে না তো আনোয়ারের ওপর? রাত বাড়ে। ভেতরের বারান্দা থেকে করমালিকে সাবধানে ঘরে এনে মেঝেতে তার শোবার বন্দোবস্ত করে আনোয়ার। করমালির একটানা গোঙানি একজন সঙ্গীর উপস্থিতিকে নিশ্চিত করলে আনোয়ার শুয়ে পড়ে।

৪১

রাস্তায় যখন নামে খিজিরের সঙ্গে ছিলো মোটে কয়েকজন, 'গওসল আজম স্যু ফ্যাক্টরি'র কর্মীরা। এই কয়েকজনের শ্লোগানের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তোলে মহল্লার সবগুলো গলি উপগলি জুড়ে। এখন এ-গলি ও-গলি থেকে মানুষ আসতে শুরু করেছে। নবদ্বীপ বসাক লেনের পেছনদিকের বস্তি দিয়ে টুটাফাটা কাঁথা, বেঢপ কোট ও রঙ-জ্বলা জামা গায়ে বেরিয়ে আসে ১০/১২ জন মানুষের ১টি দল। পাঁচভাইঘাট লেনের শামসুদ্দীনের রুটির কারখানার লোকজন বেরিয়ে এসেছে তন্দুরের ওম ছেড়ে। হৃষিকেশ দাস রোডের গ্যারেজ থেকে আসছে রিকশাওয়ালার দল। ঠাকুরদাস লেনের ৫/৬ জনের ১টি নীরব মিছিল সরব হয়ে ওঠে কলুটোলার মানুষের মিছিলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। মানুষের সংখ্যা অনুমান করা মুশকিল। দরকারই বা কি? আকাশে চাঁদ নাই, নির্মেঘ আকাশে তারা আছে বটে, তবে তার আলো নামে কুয়াশা চুঁয়ে। এর সঙ্গে মেশে ল্যাম্পোস্টগুলোর হলুদ আলো। কালচে হলুদ আলোর নিচে মানুষের সারি ক্রমে দীর্ঘ হয়, খিজিরের গা এককেবার ছমছম করে ওঠে, সে নিশ্চিত যে মহল্লার বহুকালের পুরনো বাসিন্দারা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তার ভয় করে না; জীন বলো মাহাকাল বলো—আজ সবাই মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। দ্যাখো, রহমতউল্লার চায়ের দোকানের মেসিয়াররা পর্যন্ত এসেছে, ঐ যে তার গ্যারেজের তোতামিয়া। তাদের সামনে উসকুখুসকু চুলওয়ালা ঐ লোকটা কে? আরে এ যে বজলু! শালার পেটে কি ১/২টো পাঁইট পড়েছে যে মাথাটা ঘুরে গেছে? নাঃ! কারফ্যুর মধ্যে কাম নাই, রুজি রোজাগার সব বন্ধ, শালার মাল টানার পথ কৈ? আর একটু এগিয়ে গেলে দ্যাখা যায় শ্যামাচরণ চৌধুরী লেনের মানুষ। ঈশ্বরদাস লেনের মানুষ আসে বাণী ভবনের কলেজ-ছাত্রদের সঙ্গে। মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের পাশের মুচিপাড়ার এতো ছেলে এসেছে! গলি-উপগলি শাখা-গলি থেকে এই যে ছলকে ছলকে মানুষ আসছে, এর ফলে সামনে পেছনে মিছিল কেবল বেড়েই চলে। এতে খিজির পড়ে মিছিলের মাঝামাঝি। সামনে যাওয়া দরকার। উত্তর থেকে গোলাগুলির শব্দ আসছে। ঐদিকে যাওয়া চাই। কারফ্যু ভেঙে শালার টুকরা টুকরা করে ফেলো কালো আকাশ। হঠাৎ ১মুহূর্তের জন্য চোখে পড়ে জুম্মনকে। হাত উঁচু করে জুম্মন শ্লোগান দিচ্ছে, তার পাশে আরো কয়েকটা পিচ্চি। সবগুলোই বস্তি এলাকার ছ্যামরা। এর মধ্যেও জুম্মনের হাতে স্ক্রু-ড্রাইভার দেখে খিজিরের হাসি পায়। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার সময় নাই। হাওয়ায় শোনা যায় মালীবাগ, কমলাপুর, শাজাহানপুর থেকে, নাখালপাড়া মনিপুরীপাড়া থেকে হাজার হাজার মানুষ কারফ্যু ভেঙে ছুটে যাচ্ছে

ক্যান্টনমেন্টের দিকে। ক্যান্টনমেন্টের চারদিকের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হবে আজ রাতে, বিশাল সমাবেশের সমবেত আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে মিলিটারির গুদাম গুদাম হাতিয়ার। কিংবা হাতিয়ার সব চলে আসবে মানুষের হাতে। খিজিরের হাত তো আজ খালি, তার স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার সে দিয়ে এসেছে জুম্মনের হাতে, ২/৪টা হাতিয়ার নিতে খিজিরের আজ কোনো ঝামেলা হবে না। চুতমারানি মিলিটারিকে আজ ভাসিয়ে দেবে পেচ্ছাবের ফেনার মতো।

খিজিরদের মিছিল এখন ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে। পার্কের গাছপালা তাদের স্লোগানের জবাবে জোরে জোরে মাথা নাড়ে। পামগাছের মাথা থেকে গলার ফাঁস খুলে খুলে নেমে আসছে কবেকার কোন সেপাইয়ের দল। মিছিলের সঙ্গে তারাও এখন মোড় নেবে ডানদিকে। এমন সময় নর্থব্রুক হল রোড থেকে বেরিয়ে আসে সশব্দ মিছিল। মিছিলের সামনে পাতলা খান লেনের স্কুটার গ্যারেজের ড্রাইভাররা। তাদের প্রত্যেকের হাতে একেকটি টিন, গ্যারেজের ছাদ খুলে নিয়ে এসেছে। টিনের ঢালওয়ালাদের সামনে রাখার জন্য খিজিরদের মিছিল ঘুরে যায় বাঁদিকে।

খিজির থাকতে চায় টিনের ঢালওয়ালাদের পাশে, যতোটা পারে তাড়াতাড়ি হাঁটছে। তার পায়ে যেন নতুন প্যাডেল ফিট করা, মনে হচ্ছে নতুন টায়ার-টিউব লাগানো বডি নিয়ে সে চলছে। মিছিলের লোকদের ওভারটেক করার জন্য ওকে হাঁটতে হয় এর পাশ দিয়ে, ওর পাশ দিয়ে। ওকে সাইড না দিয়ে কারো উপায় আছে? কিন্তু একেবারে সামনে এসে পৌঁছবার আগেই শাঁখারি বাজারের দিক থেকে চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু দিয়ে ১টা ট্রাক এসে দাঁড়ালো পুরনো স্টেট ব্যাঙ্ক বিল্ডিঙের গেটে। পেছনে আর ১টি ট্রাক। ২টোই মিলিটারি লরি। কালচে হলদে আলোয় মিলিটারিদের মুখ দ্যাখা যায় না, ঘন জলপাই রঙের হেলমেট তাদের মাথার ওপরকার অন্ধকারকে গাঢ় করে তুলেছে। মিছিল তখন শতগুণ জোরে ভরা গলায় প্রতিবাদ জানায়, 'মানি না!' 'মানি না!' এই আওয়াজ অন্ধকারকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করতে না করতে ট্রাক থেকে ছুটে আসে টরটরটরটর গুলিবর্ষণের শব্দ। টিনের ঢালে ঢালে শিলাবৃষ্টি বাজে, আগুনের শিলাবৃষ্টি: টং টং! টংটঙাটংটংটং! সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত হয় 'বাবা গো! মা গো!' 'আল্লাগো!' 'বাঁচাও!' 'পানি!' প্রভৃতি আর্তনাদ। গুলিবর্ষণ, মিছিলের শেষ প্রান্তের 'মানি না! 'মানি না!' স্লোগান ও এইসব আর্তনাদের সমবেত কোরাসে পিচের রাস্তা, কংক্রিটের ফুটপাথ এবং এই দুইয়ের মাঝখানে নালা একসঙ্গে কাঁপতে শুরু করে। পায়ের নিচে সব কাঁপে। খিজির জানে, এই সময় স্পিড কমাতে নাই। স্পিড কমালেই অনিবার্য পতন। ট্র্যাফিক সিগন্যালের পরোয়া করলেই এখন বিপদ! সিগন্যালের লাল তর্জনী এখন অবয়ব বদলে গুলির শব্দে পরিণত হয়ে তাকে রীতিমতো শাসায়। টকটকাটকটকটক! এখন কে শোনে কার কথা? খিজিরের সামনে ২জন লোক গুলিবিদ্ধ হয়ে গেছে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে। খিজির এগিয়েই যাচ্ছে, ডানদিকের রাস্তা ধরে, ফুটপাথ ঘেঁষে। ভিড় এখানে এখন পাতলা, তাড়াতাড়ি চলতে কোনো বাধা নাই। কিন্তু আরো এক ঝাঁক টকটকাটকটক ধ্বনির সঙ্গে চোখের সামনেকার কালচে হলুদ আলোর ভাগ মিলিয়ে যায়, অন্ধকার গাঢ়তর হয়। ব্যাপারটা কি হলো? কোন শালা খানকির বাচ্চা ট্রাক এসে ধাক্কা দিলো তার বুকে, বুকের বাঁদিকে ও পেটের ঠিক ওপরভাগে। শরীরের এই ২জায়গায় সলিড আগুন এসে বিঁধে গেলো, সামনে এখন কিছু দ্যাখা যাচ্ছে না। শালা ট্রাক-ড্রাইভারকেও দ্যাখা যায় না, খিজির

গালাগালি করার জন্য মুখ হাঁ করে, 'এই হালার চুতমারানি ডেরাইভার, তার মায়রে বাপ, তরে লাইসেন দিলো ক্যাঠায়? চোখ দুইখান খুইলা গাড়ি চালাইবার পারস না?'—কিন্তু মুখ দিয়ে ধ্বনি বেরোয় না, সটান সে পড়ে গেছে ফুটপাথ ঘেঁষে। অন্ধকার গাঢ়তর হয়, সারা মহল্লায় কি কারেন্ট চলে গেছে? কিন্তু যতোই কারেন্ট যাক, এখন কি তার এমনি শুয়ে থাকবার সময়? হায়রে, সবাই বুঝি পৌঁছে গেছে ক্যান্টনমেন্টের গেটে, আর সে হালায় খোমাখান ভ্যাটকাইয়া পইড়া থাকে ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে। কি হলো? তার বডির চেসিস কি ভেঙে গেলো? তার টায়ারে কি হাওয়া নাই? নতুন টায়ার কি ফেঁসে গেলো নাকি? আবার দ্যাখো, ঘাড়ে, বুকে ও পেট পানি গড়িয়ে পড়ছে! পানি ভি আরম্ভ হইলো! ম্যাঘ নাই, বাদলা নাই, পানি হয় ক্যামনে? মাথাটা তার পড়ে রয়েছে ড্রেনের মধ্যে, তাই কি উঠতে পাচ্ছে না? মাথাটা যদি কেউ একটু উঁচু করে দিতো? খিজির তো আর টের পাচ্ছে না যে কেবল আরেকটি বুলেট দিয়েই তার মাথাটা উঁচু করে রাখা সম্ভব!— থাক, তার আর দরকার হয় না। একটু কাত করতেই মাথা তার পাতা হয় ফুটপাথের ওপর, কিন্তু এই কাত হওয়ার ধকলটুকুতেই খিজির বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চোখের সামনে উল্টোদিকের সাদা দেওয়ালে লেখা লাল শ্লোগান ল্যাম্পোস্টের হলুদ আলোতে একটু একটু দোলে। ঐ দেওয়াল ঘেঁষে ফুটপাথে টিয়াপাখি দিয়ে মানুষের ভাগ্য গণনা করে ১বুড়ো, সেই লোকটি ১টি ছায়া হয়ে ১বার ওপরে ওঠে, ১বারে নামে। দেওয়ালের ভেতর কৃষ্ণচূড়া ডালের ঝাঁকড়া মাথায় শুয়েছিলো ল্যাম্পোস্টের আলো। দেখতে দেখতে তাও নিভে গেলো। এবার ঝাপশা আলো জ্বলে চোখের ভেতরকার কাঁলো মণিতে। সেই আলোতে দোলে রোকনপুর, লক্ষ্মীবাজার, শ্যামবাজার, বাঙলাবাজার, সদরঘাট, সূত্রাপুর, ফরাশগঞ্জ, এমনকি গ্যাণ্ডারিয়া ফরিদাবাদ পর্যন্ত। দোলানো ঘোরানো সেইসব মহল্লার রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, উপগলি-শাখাগলিতে খিজির প্যাডেল ঘোরায়। তার সামনে হেঁটে যাচ্ছে জুম্মনের মা। কিছুতেই তার নাগাল পাওয়া যায় না, ওভারটেক করা তো দূরের কথা! খাড়া না মাগী!—দ্যাখো তো পুরুষ্টু পেটটা নিয়ে এভাবে ছোটার কোন মানে আছে?—অমুন লোড় পাড়স, একখান উষ্টা খাইলে দুইটা জান খতম হইয়া যাইবো—হেই খবর রাখস? —কে শোনে কার কথা? এককেটা গলির ভেতর ঢোকে,—ডাস্টবিনে স্তূপের ওপর শুয়ে থাকে বিড়ালের মড়া,—পোয়াতি মানুষের এইসব দেখতে হয়না। ঐদিকে যাইস না! ঐ গলিতে গভীর রাতে বড়ো গ্যারেজে বসে বোতল টানতে টানতে জুয়া খেলে মহাজনদের পেয়ারের ড্রাইভারেরা। ঐদিকে যাইস না!—ঐ দিকে রহমতউল্লার গ্যারেজ, নয়া কিসিমের রিকশা ঠাহর কইরা মাহাজনে তরে হান্দাইয়া দিবো গ্যারেজের মইদ্যে!—কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এভাবে এতো ঘোরার পর খিজির ফের গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। এবার নিজের গতরটাকে বোধ করতে পারে সাঙ্ঘাতিক ব্যথায়। বুঝতে পারে তার গোটা শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে,—এতো রক্ত কোত্থেকে এলো? বন্ধ ও ক্লান্ত চোখের কম্পমান মণিতে গাঁথা হয় একটি সিঁড়ি, সিঁড়ির নিচে রক্তের ঢেউয়ে দোল খায় উলঙ্গ নারীদেহ। কার গতরখান বে? কোন খানকি আইয়া তার বগলে ঘুমায়? ক্যাঠায়?—রক্তের মধ্যে দোলে তার মায়ের কালোকিষ্টি গতরখান। মাগো! ও মা! সিনাটার মইদ্যে বহুত বিষ! কি কইলি? বেলা বহুত হইয়া গেছে, গাড়ি জমা দেওনের টাইম পার হইয়া গেছে? মাহাজনে চেতবো? আউজকা গাড়ি জমা দিমু ক্যালায়?—আউজকা ক্যান্টনমেন্ট যাইতে হইবো, জমা উমা নাইক্কা!—কিন্তু চাকা তো আর চলে না। গাড়ির

চেসিস ভেঙে ফেলেছে, এই গাড়িতে সে প্যাডেল ঘোরায় কিভাবে?—মহাজনের ওপর রাগ করে সে শ্যামবাজারে মাল তুলেছিলো অনেক বেশি করে!—মায়ে যে কি কয়!—নিজেই ইচ্ছা করে নারিন্দার পুলে ঠেলে তোলার সময় ভরা গাড়ির চেসিস ভেঙে ফেলেছে?—না মা! তাই কি হয়?—নাঃ! মা মাগীও কোথায় সরে যায়। চেসিস ভাঙা বডি আর ঠেলা যায় না!—হঠাৎ খুব বমির বেগ আসে খিজিরের। মুখ দিয়ে ছলকে ছলকে রক্ত পড়ছে। রাস্তায় গলানো পিচ ঢালার মতো রক্ত পড়ে নাকের ওপর, রক্ত পড়ে ঠোঁটের কেশ বেয়ে, চিবুক বেয়ে। চোখজোড়া নিজে নিজেই খুলে যায়। ওপরে সবই কালো রঙে আঁকা। ল্যাম্পোস্ট থেকে বিদ্যুৎ বহন করে ছুটে চলে তারের ঝাঁক, সেগুলো সব এখন অদৃশ্য। অথচ চোখজোড়া তার হাট করে খোলা, পোড়োবাড়ির ভাঙা দরজার মতো সেগুলো বন্ধ করা যায় না। রক্ত ও বারুদের গন্ধে সে আপ্লুত হয়, তবে পলকের জন্যে মাত্র। রক্তের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে সব রঙ, সব গন্ধ এমনকি বাতাস পর্যন্ত তার আয়ত্তের বাইরে। খিজিরের মুখে অন্ধকার হয়ে পড়েছে পার্কের ভেতরকার রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়ানো গোলাচি গাছের প্রসারিত রোগা ডালের ছায়া। খিজিরের বাঁ হাত ছড়ানো ফুটপাথের ওপর। সেই হাতের নিচে ও ওপরে পাম গাছের ছায়া। কাছ থেকে ও দূরে থেকে আসা গুলিবর্ষণ, শ্লোগান ও আর্তনাদ তার কানের পর্দায় মিছেমিছি ধাক্কা দেয়। তার খুব ঘুম পায়, ভাঙা চেসিসওয়ালা বডিটার প্যাডেল ঘুরিয়ে কোনোমতে যদি গ্যারেজ পর্যন্ত পৌঁছা যেতো! কিন্তু ড্রেনের ময়লা পানিতে পড়ে থাকা পায়ে কোনো বল পাওয়া যায় না। পায়ের বুড়ো আঙুল একটুখানি কেঁপে স্থির হয়ে থাকে।

ভোর হতে না হতে ৩টে বড়ো মাছি খিজিরের হাঁ করা মুখের ওপর ভোঁ ভোঁ করে ওড়ে। কিছুক্ষণ পর তাদের নীল পাখায় গোলাপী আভা পড়ে তেরছা হয়ে।—এই দৃশ্য দেখেছিলো জুম্মন। ভিক্টোরিয়া পার্কের ভেতরে রেলিঙ ও মস্ত স্মৃতি-স্তম্ভের মাঝামাঝি জায়গায় পাতাবাহারের ১টি ঝোপের আড়ালে সে লুকিয়ে ছিলো। আশেপাশে কেউ ছিল না, খিজিরকে পাহারা দেওয়া দরকার। কিন্তু ভালো করে রোদ ওঠার আগেই মিলিটারির গাড়ি এসে দেখতে দেখতে সব লাশ তুলে নেয়। শেষ লাশটি ছিলো খিজিরের। জুম্মন কি করবে? তার হাতের স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার পড়ে গিয়েছিলো স্মৃতিস্তম্ভের সিঁড়ির নিচে। সেগুলো খুঁজে পেতে পেতে মিলিটারির লাশওয়ালা গাড়ি আজাদ সিনেমা পার হয়ে গেছে।

৪২

৩ দিন রহমতউল্লা অনেকটা সামলে উঠেছে। তার বেহুঁশ অবস্থা কেটে গেছে, ব্লাড-প্রেশার স্বাভাবিক, গতরাতে ঘুমও ভালো হয়েছে। তবে শরীরের ডান দিকটা তার একেবারে অবশ, যতদিন বাঁচে এটাকে এমনি করে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। আজ সকাল থেকে তার কথাবার্তা অর্থাৎ বিলাপ ও গালাগালি ফের শুরু হয়েছে। কিন্তু জিভ, ঠোঁট ও টাকরার ১টা সাইড অকেজো বলে বেশির ভাগ শব্দ পরিণত হয় ধ্বনিসর্বস্বতায়। মেয়েকে পাশে বসিয়ে

সে কাঁদে, বৌয়ের কান্না দেখে কাঁদে, আলাউদ্দিন মিয়ার হাত ধরে কাঁদে। তাঁর মৃত পুত্র আওলাদের নাম ধরেও কাঁদে। আবার জুম্মনের মাকে দেখেও মহাজন হাউমাউ করে কাঁদে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে তার বিলাপ মোটামুটি আন্দাজ করা যায়: এই বাড়ির খাইয়া পোলাটা মানুষ হয়েছে! ছ্যামরাটার কুনোদিন গোলামের লাহান দেহি নাই! আউজকা উই মরে গুলি খাইয়া, এ্যাঁ? আল্লার কাছে কি গুনা করছিলো, আল্লা মালিক, আল্লাই জানে!

'না, না, খিজির গুনা করবে কেন?' ওসমান সান্ত্বনা দেয়, 'মিলিটারি তো চারদিকে মানুষ মারছে, এর প্রোটেস্টে খিজির মিছিলে বেরিয়েছিলো!'

'আব্বার লগে এইগুলি কইয়া লাভ কি? আব্বা কি জানে?' সিতারার এই কথা শুনে ওসমান তখন তাকেই দ্যাখে। ওসমান অবশ্য দেখতে এসেছে রহতমউল্লাকে। সিতারা এখন দিনরাত কেবল রুগ্ন বাবার শুশ্রূষা করে, নইলো তার সঙ্গে এতাক্ষণ একই ঘরে বসে থাকার কথা ওসমান কি ভাবতেও পারে?

'তা ঠিক!' সিতারার কথায় ওসমান সায় দেয়, 'উনি তো কারেন্ট সিচুয়েশনটা জানেন না।'

আলাউদ্দিন মিয়া একটু বাইরে গিয়েছিলো। আধঘণ্টা পর ফিরে এসে কি ১টা ইঞ্জেকশন ঠিকমতো দেওয়া হলো কি—না জিগ্যেস করে। লোকটা বড়ো ব্যস্ত, ১বার বসে তো ২বার দাঁড়ায়। চারদিকে তার ঝামেলা! মহল্লার রিকশাওয়ালারা নতুন আবদার ধরেছে, খিজিরের লাশ ফেরত চাই! খিজিরের লাশ তো নিয়ে গেছে আর্মির গাড়ি, সে তো ওকে মেরে ফেলার পর পরই। এখন মানুষের নতুন সখ হয়েছে, তার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অতো সোজা? ক্যান্টমেন্টে গিয়ে বললাম আর লাশ ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিলো? এখন পাবলিককে বোঝায় কে? আলাউদ্দিন মিয়া অকারণে সিতারার ওপর দাপট হাঁকে, 'দ্যাখো না! শেখ সায়েবে বারাইয়া আহুক! শেখ সায়েবে আইলে এইগুলির হাউকাউ থামে!'

'মনে হয়।' বলেই ওসমানের ভুল ভাঙে। কারণ কাল রাত্রে খিজিরের ডাকে রাস্তার বেরিয়ে ওসমান দ্যাখে যে পথচারীদের হাতে হাতে মশাল জ্বলছে। খিজিরকে অবশ্য পাওয়া যায়নি। মরে গেছে বলেই সে হয়তো অদৃশ্য হতে শিখেছে। অন্যান্য লোকের সঙ্গে ওসমান সারাটা রাত ধরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলো। সব জায়গায় আগুন জ্বলছিলো। নবাবপুরে আগুন, নিমতলীতেও আগুন। ফায়ার ব্রিগেডের বড়ো গাড়ি থেকে মোটা মোটা পাইপ দিয়ে জলধারা পড়ে রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু আগুনের শিখা নিচে নামে না। দেখতে দেখতে এইসব জলধারা পরিণত হয় নদীতে। সদরঘাট থেকে জনসন রোড, নবাবপুর হয়ে নিমতলী পেরিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে স্যাভেজ রোড হয়ে বুড়িগঙ্গা ছুটে চলেছে শাহবাগ এ্যাভেন্যুতে। সেখান থেকে নদী ছোটে এয়ারপোর্টের দিকে। তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে যায়, নীলক্ষেতে, নিউমার্কেটের সামনে দিয়ে মীরপুর রোডে। নদীর ঢেউ এসে লাগে ধানমণ্ডির এ-রাস্তা সে-রাস্তায়। কিন্তু আগুনকে তা এতোটুকু দমাতে পারে না। ওসমান কি আর বলবে, বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, পানি বাড়ার সঙ্গে আগুনের শিখা আরো ওপরে ওঠে। ওসমান ঠিক টের পায় নদী এসেছে আগুনকে উস্কে দেবার জন্যে। আগুনকে কদমবুসি করতে করতে নদী এগিয়ে যায়। লোকজনের পা ডুবে যায় পানিতে, কিন্তু পানির একেকটি ঝাপটায় মশালের আগুন আরো পুরুষ্ট হয়ে ওঠে। ওসমানের কোমর পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিলো, ওখান থেকে কখন এসে বিছানায় শুয়েছিলো তার মনে নাই কিন্তু সকাল বেলা

তার কোমর পর্যন্ত লুঙি পানিতে ভিজে চপচপ করছিলো—এইসব ব্যাপার মনে হলে আলাউদ্দিনের বিবৃতির প্রতি সমর্থনটি ওসমান প্রত্যাহার করে নেয়, 'না! সারাটা শহর জুড়ে যেভাবে আগুন জ্বলছে, কারো সাধ্যি নেই যে এটা নেভাতে পারে!'

'খালি আগুন জ্বালাইলে হয় না ওসমান সাব, লিডারের মতো লিডার হইলে আগুন নিভাইবার ভি পারে, বুঝলেন?'

'কিন্তু কাল যে দেখলাম এতো বড়ো বুড়িগঙ্গা নদী, আগুনের পায় সে-ও তো কদমবুসি করে!'

সিতারা জিগ্যেস করে, 'বুড়িগঙ্গা কি করে বললেন?'

ওসমান উৎসাহ পায়, 'কাল, বুঝলেন আগুন নেভাবার কাজে মিলিটারি শেষ পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীকে ফিট করে দিলো রাস্তার সঙ্গে। বুড়িগঙ্গার ঢেউ লেগে আগুন তো আরো লকলক করে বাড়ে!'

সিতারা একটু একটু হাসে। আলাউদ্দিন উঠে পড়ে চেয়ার থেকে, 'আপনি কি কন এইগুলি?'

'হ্যাঁ। আমি দেখলাম তো, মিলিটারি সব ফায়ার ব্রিগেড দিয়েও আগুন নেভাতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত বুড়িগঙ্গার কোর্স চেঞ্জ করে নিয়ে এলো, তো নদীর ঢেউ লেগে আগুন খালি বেড়েই চলে।'

'আপনার ব্রেনের ইস্কুপ ব্যাকগুলি ঢিলা হইয়া গেছে। আপনে বাইরে আসেন ক্যান? যান, ঘরে গিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করেন। রাইতে ঘুম হয়? বলে কার ডাকে আলাউদ্দিন বাইরে যায়।

ওসমান বেশ জুত করে চেয়ারে পা উঠিয়ে বসে। সিতারার সঙ্গে কথা বলতে তার ভালো লাগছে। কিন্তু সিতারাও ভেতরে চলে গেলে তার একমাত্র শ্রোতা থাকে রহমতউল্লা।

'আলাউদ্দিন সায়েব বিশ্বাস করলেন না, কিন্তু আমি নিজে দেখলাম। মিলিটারির তো যন্ত্রপাতির অভাব নেই, কি সব মেশিন দিয়ে নদীর একটা সাইড ধরে প্রেশার দিয়ে পানি টেনে এনেছে। কিন্তু দেখলাম নদীর পানিতে আগুনের তেজ আরো বাড়ে।'

রহমতউল্লার জবাব এখন একেবারেই অস্পষ্ট। ওসমান আরো উৎসাহিত হয়ে তার বিবরণ দেওয়া অব্যাহত রাখে। এমন সময় ঘরে ঢোকে জুম্মনের মা, হাতে বালতি ও বদনা। তার পেছনে অয়েল-ক্লথ হাতে সিতারা। জুম্মনের মা বলে, 'অহন মাথা ধোয়াইতে হইবো। আপনে এট্টু বারান্দায় গিয়া বহেন!'

'না, না, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। তোমারা কাজ করো।' হঠাৎ করে ওসমানের মনে পড়ে, জুম্মনের মায়ের পেটের ভেতরকার প্রাণীটির খবর কি? হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে জিগ্যেস করে 'জুম্মনের মা, তোমার বাচ্চার খবর কি?

বদনার নল দিয়ে রহমতউল্লার মাথার পানি ঢালতে ঢালতে জুম্মনের মা বলে, 'জানেন না? পরশুদিন থাইকা অরে পাই না।'

তবে কি পেটের ভেতর থেকে তার সন্তানকে চুরি করা হলো? ওসমান ঢোক গিলে বলে, 'মানে?'

'কি জানি কৈ গেছে! জুম্মনের বাপে ভি বহুত বিচরাইতাছে! না, জুম্মনেরে পাওয়া যায় না!'

জুম্মনের জন্যে ওসমানের উদ্বেগ কম নয়, 'হঠাৎ কোথায় গেলো?'

'আল্লা মালুম। উদিনকা আপনাগো খিজির মিয়ার কি যন্ত্রপাতি লইয়া কৈ গেলো, আর দেহি না!'

খিজিরের আবার যন্ত্রপাতি কি? চট করে মনে পড়ে, 'ঐ স্ক্রু-ড্রাইভার প্লাস?'

'হ! কাউলকা দেহি ঐগুলি নাই। তামান দিন জুম্মনে ঘরে আহে নাই!' ওসমানের সন্দেহ হয়, খিজিরই বোধহয় জুম্মনকে নিয়ে কোথায় গেছে। তা এটা অবশ্য খিজিরের অন্যায়, মায়ের কাছ থেকে ছেলেকে এভাবে না বলে নেওয়াটা ঠিক নয়। খিজিরকে আজ কোথায় যেন দেখলো? না, মনে পড়ে না!—মনে করতে গিয়ে ওসমানের মাথা খুব ঘোরে এবং জুম্মনের মা, সিতারা ও রহমতউল্লার চেহারা ঝাপশা হয়ে আসে।

সারাটা দিন ঘরেই কাটলো, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও খিজিরের পাত্তা না পেয়ে ওসমান বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বালাবার জন্য সুইচ টিপলো।

কারেন্ট নাই। খিজিরই কি বিদ্যুৎ নিয়ে গায়েব হয়ে গেলো!

নিচে নামতে নামতে ওসমান দ্যাখে রঞ্জুদের ঘরের দরজা খোলা। হ্যারিকেন জ্বলছে, মানে এখানেও বিদ্যুৎ নাই। খিজির আবার এখানে ঘাপটি মেরে বসে নাই তো?—না। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে মকবুল হোসেন আমন্ত্রণ জানায়, 'আসেন আসেন। খবর জানেন তো?'

খিজিরের খবর জানতেই তো ওসমান এসেছে, 'কি? খিজির—।'

মকবুল হোসেন তাকে শেষ করতে দেয় না' 'আরে আজকের খবর জানেন না? শেখ সায়েব তো রিলিজড!'

'বলেন কি?' ওসমান এবার রাস্তায় মানুষের উল্লাস শুনতে পায়।

'হ্যাঁ। আমি প্রথমে ভাবলাম রিউমার। পরে রঞ্জু আইস্যা বলে—'

রঞ্জু নিজেই কথা বলে। শেখ মুজিবুর রহমানকে দ্যাখার জন্য রঞ্জু আজ একা একা অনেক ঘুরেছে। ধানমণ্ডিতে ৩২ নম্বরে গিয়েছিলো, শোনে যে মিছিল করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শহীদ মিনার। রানু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না, 'তুই দেখবি ক্যামনে? এতো মানুষের মধ্যে দেখতে পারলি?'

'পারবো না ক্যান? উনি শহীদ মিনারে উঠছেন, আমি উইঠা দাঁড়ালাম উল্টাদিকের একটা দেওয়ালের উপরে। কতো মানুষ গাছে উইঠা দেখছে!'

রানু আফসোস করে, 'আমি দেখতে পারলাম না।'

রঞ্জু আশ্বাস দেয়, 'কাল দেখতে পারো। কাল রেসকোর্সে শেখ সায়েবের মিটিং।'

'রেসকোর্স? মকবুল হোসেন অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে, 'রেসকোর্স, না পল্টন?'

'রেসকোর্সই হবে।' ওসমান সমর্থন করে রঞ্জকে, 'পল্টনে আগুন জ্বলছে। শাহবাগ এলাকায় আগুন নেভাবার জন্য আর্মির লোকজন রেসকোর্সের কাঠের রেলিং ডিঙিয়ে রাস্তায় নামছে। মিলিটারি নদীকে টেনে এনেছে। নদী আর আগুন নেভাবে কি? বরং নদীর পানির ঝাপটায় আগুন আরো বাড়ে।'

রঞ্জু বলে, 'কি বললেন? নদী?'

'হ্যাঁ। নদীর ওপর আগুন জ্বলছে। নদীর স্রোতে আগুন আরো ছড়িয়ে পড়ছে!'

মকবুল হোসেন উঠে দাঁড়ায়। তার বোবা মেয়েটা তেলনুন মাখানো মুড়ির গামলা নিয়ে আসে, সে-ও বাপের পাশে দাঁড়ায়।

রঞ্জু বেশ মজা করে বলে, 'আপনি বোধহয় নৌকায় বইসা দেখলেন?'

মকবুল হোসেন ছেলেকে থামায়, 'আঃ! রঞ্জু!' তার ভয় ওসমান আবার লাফালাফি শুরু না করে! তার সমস্ত তৎপরতা কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই ভালো হয়।

রানুর পাতলা ঠোঁট যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটু রেখা নাই, ঠোঁটজোড়া কি পাথরে পরিণত হলো? কিন্তু রানু কি রঞ্জু কি মকবুল হোসেন—কারো দিকে ওসমানের খেয়াল নাই। তার নিজের চোখে দ্যাখা আগুন ও নদীর ঘটনা সে বর্ণনা করে চলে।

বলতে গেলে আগুন ও পানির পটভূমিতে বিশাল জনসমাবেশ দ্যাখার আশায় ওসমান পরদিন গেলো রেসকোর্স। রেসকোর্সে দারুণ ভিড়। কয়েক লক্ষ মানুষ মিটিং শেষ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশাল মাঠ পেরিয়ে লোকজন কাঠের রেলিঙ ডিঙিয়ে রাস্তায় নামছে। সবাই কথা বলেছে, সবাই শ্লোগান দিচ্ছে, 'জেলের তালা ভেঙেছি'—'শেখ মুজিবকে এনেছি।' ঐ চলন্ত সমাবেশে ১টি ছোট্টো ঢেউয়ের মতো দুলতে দুলতে ওসমান সামনে এগোয়। কিন্তু নাঃ! আগুন কোথায়? এই রেসকোর্স পার হয়ে শাহবাগ এ্যাভেন্যুতে সেদিন ছিলো বুড়িগঙ্গার স্ফীত প্রবাহ, তার ওপর জ্বলছিলো আগুনের স্রোত। আজ কি আবার শুকনা ও নেভানো রাস্তা জেগে উঠলো? আগুন কোথায়? নদী কি শেষ পর্যন্ত আগুন নিভিয়ে ফের ফিরে গেছে নিজের খাতে? আগুনের খোঁজে গোটা মাঠ ঘুরে ওসমান এপাশে এসে রাস্তায় নামে। মাঝে মাঝে ছাত্রদের এককেটি দল, নাচতে নাচতে ইউনিভারসিটির দিকে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু আগুন কোথায়? এই কয়েকদিনে কারফ্যু দিয়েও আগুন নেভানো যায়নি, আজ এতো মানুষ বেরিয়ে এলে কি শালার আগুন একেবারে নিভে গেলো?

এদিকে রোদ পড়ে আসছে। উৎসবমুখর মানুষ ঘরে ফেরে। বুকটা ওসমানের ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। হতাশ হয়ে সে নুয়ে নুয়ে হাঁটছিলো। এমন সময় ঢাকা ক্লাবের দিক থেকে গোলমাল শোনা যায়। আহা! এবার আগুন লাগবে! আহারে! এবার যদি আগুন লাগে! কয়েক রাউন্ড গুলির আওয়াজের প্রায় সঙ্গে ছুটে যায় ১টা জিপ। ঢাকা ক্লাবের ভেতর থেকেই জিপটা বেরিয়েছে। কয়েকটা মানুষ পায়ে ও উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেছে। লাগাও! রাগে ও উৎসাহে ওসমান ঢাকা ক্লাবের দিকে দৌড়ায়। আহ! ভালো করে আগুন ধরাতে পারলে দালানটা চমৎকার জ্বলে উঠবে, তার আভায় লাল হয়ে উঠবে চলন্ত সমাবেশটি। ঢাকা ক্লাবের ভেতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে মানুষ! মূল দালানের বাইরে এক জায়গায় শূন্য মদের বোতল ও বিয়ারের কেন স্তূপ করে রাখা। লোকজন সেইসব তুলে নিয়ে ছুঁড়তে শুরু করে ভেতরের দিকে। ওসমানও ২টো বোতল ছুঁড়ে কি হবে? কিন্তু তার ইচ্ছা এখানে আগুন লাগানো হোক। তাই চৎকার করে ওঠে, 'আরে ভাই বোতল ছুঁড়ে কি হবে? আগুন লাগান, আগুন লাগান।'—উত্তেজনায় সে লাফায়, 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো ।'

ক্লাবের ভেতর থেকে কয়েকজন সাহসী পুরুষ বেরিয়ে এলে বেশ কয়েকজন বোতল নিক্ষেপকারী শ্লোগান দেয়, 'আগুন জ্বালো, 'আগুন জ্বালো!'

এর মধ্যে বাইরের কয়েকজন তরুণ ঢুকে পড়লে ঐসব সাহসী পুরুষদের কেউ কেউ তাদের দিকে এগিয়ে যায়, 'এসবের মানে কি? আমরা কি বাঙালি নই?'

ওসমানও ছেলেদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'আগুন জ্বালান, আগুন জ্বালান!' এরা সব কলেজ ইউনিভারসিটির ছাত্র, আগুন জ্বালাবার পরিচালনা তো এদেরই হাতে। একজন পকেটে হাত দিয়ে ফের খালি হাত বের করে আনলে ওসমান তাকে দেশলাই দেয়, 'আগুন জ্বালান!' তরুণ নিম-ছাত্রনেতা দেশলাই নিয়ে সিগ্রেট ধরায়, 'ধন্যবাদ।' তার সঙ্গী যুবকটি জুতমতো জায়গা বেছে নিয়ে উত্তেজিত বোতল নিক্ষেপকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা ঝাড়ে, 'ভাইসব, আপনারা এই জায়গা ছেড়ে দয়া করে চলে যান। আমাদের আন্দোলন এখন চূড়ান্ত সাফল্যের পথে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাত থেকে মুক্ত করে এনেছি। এই ক্লাব, এইসব দালান-কোঠা,—সব এখন আমাদের সম্পত্তি। বাঙালার সাড়ে সাত কোটি মানুষ এসবের মালিক। এসবের ক্ষতিসাধন করা মানে নিজেদের বাড়িতে আগুন লাগানো। গোলটেবিল বৈঠকের প্রাক্কালে এরকম উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের আন্দোলনের সাফল্যের পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করবে। ভাইসব—।'

তার কথায় এবং অন্যান্য তরুণ নেতাদের অনুরোধে লোকজন হাতে একেকটি হুইস্কি বা জিন বা ব্রান্ডির শূন্য বোতল কি বিয়ারের খালি টিন নিয়ে ঢাকা ক্লাব ছেড়ে চলে যান। ওসমান অবশ্য কোনো খালি বোতল নেয়নি।

ওদের বাড়ির সামনে রাস্তায় ছোটোখাটো জটলার সামনে কথা বলছে আলাউদ্দিন মিয়া। দেখে ওসমান বেশ খুশি, আলাউদ্দিন মিয়াকে বলে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু লোকটা কথা বলছে অন্য ১টি বিষয়ে। 'কি ব্যাপার? না, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের ওপর সে খুব চটা।—এদের আক্কেলটা দ্যাখো!' কিসব দাবী নিয়ে স্ট্রাইক করেছে, ১০ ঘণ্টা হয়ে গেলো কোথাও কারেন্ট নাই। আরে বাবা, এইভাবে ধর্মঘট করলে কষ্ট পায় কারা? তারা কি বাঙালি নয়? হাসপাতালে বাঙালি রোগীদের কতো কষ্ট! বাঙালির হাতেই তো পাওয়ার আসছে, নেতা বেরিয়ে এসেছে, তার কথা শোনো! এই যে ঢাকা ক্লাবের সামনে গোলমাল করতে গিয়েছিলো, এর কোন মানে হয়? ঢাকা ক্লাব কি পাঞ্জাবিরা পকেটে করে নিয়ে যেতে পারবে? বাঙালির সম্পদ নষ্ট হবে বাঙালির হাতে? —বক্তৃতা দিতে দিতে আলাউদ্দিন মিয়ার গলা শেষের দিকে ধরে আসে।

তার সাময়িক বিরতির সুযোগে ওসমান বলে, 'ঢাকা ক্লাবের ভেতর থেকে একটা জিপ বেরিয়ে পাবলিকের দিকে গুলি করে। মানুষ তাই একসাইটেড হয়ে গিয়েছিলো। আজ ওখানে আগুন ধরালে ঠিক হতো!'

'আরে, আপনে আবার রাস্তায় বারাইছেন?' আলাউদ্দিন মিয়ার ভারাক্রান্ত গলা এখন খরখরে হয়ে উঠে, 'ঘরে যান! মাথার নাই ঠিক-ঠিকানা, উনি অহন লেকচার দিবার আইছেন? যান!'

কার হাতে ১টা ট্রানজিস্টার বাজছে। মাঝে মাঝে বিশেষ ঘোষণা বলা হচ্ছে। আলাউদ্দিন মিয়া বলে, 'শোনেন, ভালো কইরা শোনেন।' রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ১টি বাণী বারবার প্রচার করা হচ্ছে। রেসকোর্সের লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে আজ এই শপথ নেওয়া হয়েছে যে শহীদদের রক্তে রঞ্জিত আন্দোলন

যেন উত্তেজনা সৃষ্টির দ্বারা লক্ষভ্রষ্ট না হয়। সব রকম প্ররোচনা ও উত্তেজনার মুখে তাঁর প্রাণপ্রিয় দেশবাসী যেন আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষা করেন।

৪৩

কাঁঠালতলায় অন্ধকার। রাস্তার ওপার মরিচ ও বেগুনের ছোটোখাটো খেত পেরিয়ে জোড়পুকুরের ওপরকার পাতলা কুয়াশা ওপারের ন্যাড়া মাঠকে ঝাপশা করে তুলেছে। একটু দূরে বৈরাগীর ভিটায় হ্যাজাক লণ্ঠনের সাদা আলো, কিন্তু সেই আলোর একটু ছটাও এখানে আসেনা। ঐ আলো এখান থেকে দ্যাখা যাচ্ছে বলে বরং এখানকার অন্ধকার আরো জমাট-বাঁধা। একই নিয়মে বৈরাগীর ভিটার হৈ চৈ এবং বক্তৃতায় এখানকার নীরবতা আরো ঘন হয়। বৈরাগীর ভিটায় মাইকে বক্তৃতা চলছে, আনোয়ার সব শুনতে পাচ্ছে, দীর্ঘ বক্তৃতা, গলাটা খুব চেনাচেনা: 'ভাইসব, অনেক সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে আমাদের আন্দোলন আজ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। বাঙলার জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙলার মানুষ আজ পশ্চিমাদের কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে। এই বিজয় সম্ভব হলো কেন?—এই বিজয়ের একমাত্র কারণ হলো বাঙালির জাতীয় ঐক্য। কিন্তু ভাইসব, ঐক্যের প্রয়োন কি শেষ?—না। পশ্চিম পাকিস্তানীদের ষড়যন্ত্র আজো চলছে। এই মুহূর্তে আমরা যদি নিজেদের মধ্যে হানাহানি করি, বাঙালি হয়ে বাঙালির বাড়ি জ্বালাই, এক হত্যা করে, ওর ফসল কেটে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করি তার সুযোগ নেবে কারা? বলুন কারা? যারা বারোশো মাইল দূর থেকে আমাদের সম্পদ শোষণের কর্মে লিপ্ত, যারা আমাদের সোনার বাঙলাকে আজ শ্মশানে পরিণত করেছে, যারা বাইশ বৎসর ধরে বাঙলাকে তাদের বাজার ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনা—।' শিক্ষিত লোকের ভরাট গলা। বোধহয় ঢাকা থেকে এসেছে, জেলার কোন নেতাও হতে পারে। মনোযোগী হলে লোকটাকে বোধহয় চেনা যায়, কিন্তু আনোয়ার বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। চোখের সামনে অন্ধকার হঠাৎ অন্ধকারতর একটি ছায়া তৈরি হলে আনোয়ার ভয়ে চিৎকার করে, 'কে?'

'ভাইজান একলা বস্যা আছেন?' নবেজউদ্দিন হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়ে।

'নবেজউদ্দিন? কোত্থেকে?'

'বৈরাগীর ভিটাত সভা হবা নাগছে। সভাত গেছিলাম।'

'সভা শেষ হয়ে গেলো?'

'এখনি?' নবেজউদ্দিন ডানদিকে মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেলে, 'সভা তামান আতই ব্যান চলে! আপনের মামুর ভাষণ চলতিছে, এইতো শোনাই যায়।'

'আমার মামু?'

'হুঁ, বগুড়া টাউন থ্যাকা আপনের মামু আসছে তো। সাক্ষাৎ হয় নাই?' মেজোমামার বক্তৃতা আনোয়ার আগে কখনো শোনেনি। তবে মেজোমামার এমনিতে কথা বলে চমৎকার।

তা মেজোমামা এসেছে, আনোয়ার কোন খবরই পেলো না। নবেজউদ্দিন আরো তথ্য দেয়, 'চন্দনদহ বাজারের সভা শ্যাষ করা এটি আসছে। আপনার চাচাও তো সাথে আসছে। তারা সোগলি যায়া গাজীগোরে পোড়া ঘরগুল্যান দেখ্যা আসলো। টাউনেত থ্যাকা, ঢাকাত থ্যাকা কতো ছাত্র আসছে। চন্দনদহের বাজারে মস্ত বড়ো সভা হলো। তা হামি কই ভাইজান, ঐ সভা হামাগোর বৈরাগীর ভিটার এই সভার লাকান জমে নাই। আত না হলে কি সভা জমে?'

'চন্দনদহের মিটিঙে আর কে কে ছিলো?'

'আফসার গাজী আছিলো, তাই সব বন্দোবস্ত কর‍্যা দিলো!'

'আফসার গাজী?' আনোয়ার প্রায় বিষম খায়, 'আফসার গাজী না পালিয়ে গেছে! ও ব্যাটা এসে জুটলো কোত্থেকে?

আনোয়ার ১বার উঠে দাঁড়ায়, ফের বসে, বিড়বিড় করে বলে, 'লোকটার সাহস একটু বেড়ে গেছে না?'

'কি যে কন ভাইজান!' পিছনে মানুষ থাকলে সাহস হবো না? আপনের মামু ধরেন জেলার এতোবড়ো নেতা, আফসার গাজী তার কোলে কোলে ঘোরে, তার সাথে ঢাকার ছাত্ররা আছে, বগুড়ার কলেজের ছাত্ররা আছে। ছাত্রগোরে খিলান দিলান করায় আফসার গাজী, বাজারের মধ্যে তার গুদামঘর খালি কর‍্যা দিছে, চাকর দিয়া পাকশাক করায়, খরচ করতিছে দুই হাতে, এখন তার গায়েত হাত তুলবো ক্যাডা?'

'আর ওর চাচা? খয়বার গাজী?'

নবেজউদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর পাল্টা জিগ্যেস করে, 'কিসক? খয়বার গাজীর খবর আপনে জানেন না?'

'ঐ শালা শুওরের বাচ্চার খবর আমি জানবো কোত্থেকে? এ্যাঁ?' এই কথাটি আনোয়ার বলে চিৎকার করে, 'আমি জানবো কেন? এ্যাঁ' আনোয়ারের হঠাৎ-উত্তেজনার তাপে নবেজউদ্দিন উঠে দাঁড়ায়, হাত ২টো তার স্বতঃস্ফূর্তভাবে জোড়া হয়ে যায়। নবেজ কথা বলে না। তার কালো শরীরের চাপে চারপাশের অন্ধকার একটু ফিকে হয়ে এলে নবেজের চেহারা সম্পূর্ণ আকার পায়। হঠাৎ উচ্চকণ্ঠ হয়ে পড়ায় আনোয়ারও বিব্রত হয়, তার মেজাজ এরকম হঠাৎ চড়া হলো কেন? গলা নামিয়ে এবার আনোয়ার বলে, 'খয়বার গাজীর খবর আমি জানবো কোত্থেকে? ব্যাটাকে কি কম খোঁজা হলো?' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নবেজউদ্দিন হাত কচলায়, কোনোরকমে সে মুখ খোলে, 'না ভাইজান, এমনি কল্যাম। হামরা মুখ্য মানুষ, হামাগোরে কথা কি ধরা লাগে? চেংটু উদিনক্যা কলো—।'

'চেংটুটা কোথায়? সেই যে আলিবক্সের সঙ্গে গেলো তার আর পাত্তা নেই। এরকম করলে কাজ হয়? তোমার সঙ্গে দ্যাখা হলো কোথায়?'

'কামেই গেছে, এক জায়গাত দ্যাখা হলো।' নবেজউদ্দিন সেই জায়াগার নাম গোপন রাখে। বলে, 'আপনার কথা চেংটু কয়, ভাইজান নরম দিলের মানুষ, সোজা মানুষ, খয়বারের শয়তানী আপনে বুঝব্যার পারেন নাই। নামাজের অছিলা কর‍্যা তাঁই পার পায়া গেলো। না হলে ঐ শালা বাঁচবার পারে? না তার ভাইসতা আজ সভার মধ্যে দেওয়ানগিরি করে?'

আনোয়ার জবাব দেয় না। নবেজউদ্দিন একটু পর উসখুস করে, বলে, 'ভাইজান, ঘরেত যান। নিওড় পড়তিছে, একটা অসুখ বাধাবেন!'

'শিশিরে ভিজলে আমার অসুখ হয় না।'

'কি যে কন! আপনেরা ঢাকার মানুষ, গাঁয়ের শীত, নিওড় সহ্য করার পারবেন?'

'ঢাকাতেও শিশির, শীত, রোদ বৃষ্টি আছে নবেজ। ঢাকার হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় ফুটপাতে রাত কাটায়।'

'আপনারা বড়োলোক। দালানের মধ্যে থাকেন!' নবেজউদ্দিন একটু সস্নেহ তাড়াও দেয়, 'ওঠেন ভাইজান, ঘরত যান।'

ঘরে শুয়ে হ্যারিকেনের আলোয় আনোয়ার ময়লা সাদা সিলিঙের কালচে সবুজ কড়িকাঠ দ্যাখে! বৈরাগীর ভিটায় মেজোমামা এখনো গলাবাজি করেই চলেছে। মেজোমামার সঙ্গে একবার দ্যাখা হলে ভালো হয়। বৈরাগীর ভিটায় একবার গেলে হতো। কিন্তু গণ-আদালত নিয়ে ওখানে যে ধরনের কথাবার্তা চলছে তাতে যাওয়াটা ঠিক নিরাপদ নয়। মেজোমামার ওপর রাগও হয়, লোকটা কি বোকা, না সুবিধাবাদী? গতবার জাতীয় পরিষদের ইলেকশনে যারা তার সঙ্গে বিট্রে করলো, তাদেরই ১জন মৌলিক গণতন্ত্রী পদ থেকে রিজাইন করে তার মিটিঙে প্রিজাইড করে, আর মেজোমামা কি-না তাদের মতো লোকদের নিয়ে এ গ্রাম সে—গ্রাম করে বেড়াচ্ছে? মেজোমামাকে একবার এসব কথা বললে হতো। মেজোমামাই রাজনীতিতে তার প্রথম আগ্রহ তৈরি করে। ছেলেবেলায় তার কাছ থেকে কতো কতো বই পেয়েছে। রাজনীতির সোজা সোজা বইগুলো সব মেজোমামার দেওয়া। ক্লাস নাইনে উঠে উপহার পেলো, 'জানবার কথা'র দশ খণ্ড। কলেজে পড়ার সময়ও বইগুলো তার যা কাজে এসেছে! তারপর 'লোকায়ত দর্শন', 'মার্কসবাদের অ আ ক খ'। সব মেজোমামার দেওয়া। ইউনিভারসিটিতে পড়ার সময়েই মেজোমামা নেতাগোছের লোক। ভাষা আন্দোলনের সময় কোন হলের ছাত্র সংসদের সাহিত্য সম্পাদক কিংবা কি যেন ছিলো। ক্লাস-ফাইভে-পড়া আনোয়ারের কাছে মেজোমামা তখন হিরো। রাজনীতির জন্যেই সি এস এস পরীক্ষা দিলো না। পরীক্ষা দিলে এতোদিন নির্ঘাৎ জয়েন্ট সেক্রেটারি। আব্বা কতোবার চাপ দিয়েছে 'বুলু, পরীক্ষাটা দে। নতুন দেশ, চাকরিতে ঢুকলেই লিফট!' তা দেশোদ্ধার করবে বলে মেজোমামা চাকরির মোহ ছাড়লো, এতো সাধের ঢাকা শহর,—তাও ছাড়লো। নিজের জেলা—শহর ওকালতি করে, বিরোধীদলের রাজনীতি করে মেজোমামা অবশ্য এখন চমৎকার পজিশন করে নিয়েছে। পার্টি পাওয়ারে এলে মন্ত্রিত্ব সুনিশ্চিত। অন্তত উপমন্ত্রী তো হবেই। কিন্তু মেজোমামার মন্ত্রিত্ব বা উপমন্ত্রিত্বের সম্ভাবনায় একটু বিরক্ত হলেও তার সঙ্গে দ্যাখা করবা ইচ্ছাটা আনোয়ারের কমে না। মনে হয় মিটিং শেষ করে মেজোমামা একবার এখানে আসবেই। এতোদূর এসে বড়োবুবুর শ্বশুরবাড়িটা ঘুরে যাবে না?—তাহলে বড়ো ভালো হয়। আনোয়ারকে বৈরাগীর ভিটায় যেতে হলো না, আবার মামার সঙ্গে দ্যাখাও হয়েও গেলো! এই সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতে তার বুকের বদলে পা নাচতে শুরু করে এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘণ্টা দুয়েক পর পাশের ঘরে কথাবার্তার আওয়াজে তার ঘুম ভাঙে। প্রথমে কেবল ধ্বনি, তারপর অন্ধকার। বড়োচাচার কথা শোনা যাচ্ছে, অন্ধাকারের কারণটা বোঝা যায়, বড়োচাচা বোধহয় হ্যারিকেনটা নিয়ে গেছে।

নিশ্চিত হয়ে আনোয়ার পাশ ফিরে শোয়। হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে ঢোকে মন্টু, 'ভাইজান, ঘুমাচ্ছেন?'

'তোমরা কখন এলে?'

'ঘণ্টাখানেক হবে। আব্বা আপনাকে ডাকতে নিষেধ করলো।

'বড়োচাচা এসেছেন? বড়োচাচী?'

'আম্মা আরো কয়েকটা দিন দেখে আসবে। আমরাই আসতে সাহস করি না। ইয়াসিন মামা আজ মিটিং করতে আসলো, আমরা তার জিপে আসলাম। গ্রামের কনডিশন তো এখন অনেক ভালো দেখতেছি। আম্মাকে পরশুদিন নিয়া আসবো।'

'বড়োচাচা শুয়ে পড়েছে?'

না, এখনো খাওয়াই হয়নি।—আপনের খুব দুর্ভোগ গেলো, না? আপনেও কাম পান নাই ঐ হুজ্জতের মধ্যে ঢুকছেন!'

'বড়োচাচা কি করছেন?'

'আব্বা গল্প করে জালাল ফুপার সঙ্গে। জালাল ফুপা চন্দনদহ বাজার থ্যাকা ইয়াসিন মামার সঙ্গেই আছে। জালাল ফুপা আপনের কথা খুব কয়! তা আপনে ওদের সঙ্গে থাইকা ভালোই করছেন। ফুপা কয়, আপনের হেলপ না পাইলে খয়বার চাচা নাকি বাঁচতোই না!'

'আমার হেলপ?' আনোয়ার রেগে ওঠে, 'আমি ঐ প্রফেশনাল মার্ডারারকে হেলপ করতে যাবো কোন দুঃখে? শুওরের বাচ্চা কতো মানুষকে খুন করেছে, কতো লোকের সর্বনাশ করেছে, জানো? আমি ওকে হেলপ করবো?'

'কি যে কন আনোয়ার ভাই!' হাজার হলেও মুরুব্বি তো!'

'আরে রাখো তোমার মুরুব্বি! একই গ্রামে থাকো, আর জানো না? মানুষের গোরুচুরির গ্যাঙের সঙ্গে ব্যাটা জড়িত, জানো না?'

আনোয়ার তুমি ঘুমাও নাই বাবা?' লণ্ঠনের আলোতে জালালউদ্দিন মাস্টারের দীর্ঘ শরীর ছায়ার মতো দোলে। আনোয়ার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়, 'চলেন, ঐ ঘরে চলেন। মন্টু বরং একটু ঘুমাক!'

পাশের ঘরে খেয়ে উঠে ইজি চেয়ারে বসে বড়োচাচা খিলাল করছে। আনোয়ারকে দেখে বলে, 'কয়েকদিন তোমার খুব কষ্ট হলো, না? জমিরের মাকে ভালো কর্‌্যা বল্যা গেছিলাম।'

বড়োচাচার সাময়িক নীরবতার সুযোগে জালাল মাস্টার তার আগেকার প্রসঙ্গ টেনে আনে, 'এই চ্যাংড়াক জিজ্ঞাসা কর্‌্যা দ্যাখেন।'

'কি?' আনোয়ার জানতে চাইলে জালালউদ্দিন বলে, 'চেংটুর উপরে আমরা যতো দোষারোপ করি, ছোঁড়া সেদিন বৈরাগীর ভিটা সাফ না করলে গাঁয়ের মধ্যে এরকম বৃহৎ সভা হবার পারে?'

জালালউদ্দিন বিস্তারিতভাবে জানায় যে চন্দনদহের মিটিং সেরে ইয়াসিন সায়েব চলেই যেতো, তার জিপ তো রেডিই ছিলো। বেঁকে বসলো এই জালালউদ্দিন। কেন?—না, তা হয় না। এই এলাকা, এই সমগ্র থানা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের গ্রামের লোক। সেই গ্রামে ১টা

মিটিং হতেই হবে। ইয়াসিন সায়েব হাসে, গোটিয়ায় মিটিং করার জায়গা কোথায়? 'আমি বৈরাগীর ভিটার কথা কই তা ইয়াসিন ভাই কয়, "আরে মাস্টার সায়েব, বটগাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে মানুষ ভাষণ শোনে? আর আমি ভাষণ দেবো মগডালে চড়ে?"—আবার আফসার গাজীও লম্ফ ঝম্প করে, "আরে না ঐ গ্রামে সভা করার জায়গা নেই।" তা আমি কই, একবার চলেন, গেলেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়। ছেলেপেলে বটগাছের অর্ধেক সাফ করছে না? চেংটু একলাই পরিষ্কার করছে বারো আনি ভাগ!'

বড়োচাচা হাই তোলে, 'চেংটুর কথা বাদ দেন! শালা খুনী, মানুষ খুন করার জন্য শালা লাফ পাড়ে।' প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করার জন্য বড়োচাচা আনোয়ারকে বলে, 'তোমার মামার সাথে দ্যাখা করলা না কেন? দরগাতলার সরকার বাড়িতে তার জেয়াফত, আসগর সরকার একরকম জোর কর্যাই নিয়া গেলো, কাল কর্ণিবাড়ি ইস্কুলের ফিল্ডে মিটিং আসরের বাদ। যদি যাও তো দ্যাখা হবে।' একটু থেমে ফের বলে, 'অবশ্য তুমি যদি সময় করতে পারো, তোমরা সব ব্যস্ত মানুষ!' বড়োচাচার এই শ্লেষটি আনোয়ার হজম করে। বড়োচাচা কিন্তু থামতে পারে না, 'তোমরা মরমুরুব্বি মানো না। তোমার মামা খুব আঘাত পাইছে।'

'কেন?'

'কেন তা তুমি নিজেই জানো। খয়বার গাজী নিজেই বগুড়া গিয়া তাকে সব বলছে।'

'খয়বার গাজী এখান থেকে পালিয়ে মেজোমামার সঙ্গে দ্যাখা করেছে? খয়বার গাজী আইয়ুব খানের পাঁড় দালাল, আর মেজোমামা জেল খেটে বের হলো সেদিন!—'

'তোমরা খালি পলিটিক্স দ্যাখো। আত্মীয়তা কুটুম্বিতা সব বাদ দিবা?'

'খয়বার গাজীর প্রাপ্য শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছিলো। লোকটা পালিয়ে না গেলে—।'

আনোয়ারের কথা শেষ না হতেই জালালউদ্দিন বলে,'না ভাইজান, শোনেন, আনোয়ারের জন্যেই খয়বার গাজীর প্রাণহানি হলো না। নামাজের বুদ্ধিটা না করলে।'

'নামাজের বুদ্ধি আমি করিনি। খয়বার গাজী যতো ক্রাইম করেছে, যতো লোক হত্যা করেছে, যতো মানুষের গোরু চুরিতে নেতৃত্ব দিয়েছে—।'

'সেই হিসাব করবে গভমেন্ট।' বড়োচাচা ধমক দেয়, 'তুমি পলিটিক্স করো আর এই সোজা কথাটা তোমার মাথায় ঢোকে না? ইলেকশনে উইন করো, গভমেন্ট ফর্ম করো, তারপর অপরাধীদের ধরে শাস্তি দাও। পশ্চিমাদের খেদাবার আগেই যদি নিজেদের আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগুষ্টি ধ্বংস করা শুরু করো তো ফায়দা লুটবে কারা?'—বোঝাই যায় এসব কথা মেজোমামার বক্তৃতার উদ্ধৃতি। উদ্ধৃতি প্রয়োগের পর বড়োচাচা নিজের মন্তব্য ঝাড়ে, 'তোমার বাপের ছেলেবেলার বন্ধু, খেলার সাথী, তার সাথে কি আচরণটা তুমি করলা, এ্যাঁ?'

'না না ভাইজান, ভুল বুঝবেন না। আনোয়ারকে রক্ষা করার জন্য জালালউদ্দিনের সমস্ত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয় আনোয়ার নিজেই, 'আব্বার বন্ধু, কিন্তু গ্রামের লোকদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কিরকম?'

'আমরাও তো গ্রামেরই লোক।'

'আপনি খালি খালি লোকটাকে সাপোর্ট করছেন বড়োচাচা। আপনার কোনো উপকারে আসে খয়বার গাজী? কয়েক বছর ধরে তো আপনার সঙ্গে গোলমাল করেই চলেছে।'

'লাভ লোকসান, উপকার অপকার দিয়া সব বিচার করি না বাবা!' জলচৌকিতে জায়নামাজ বিছায় বড়োচাচা, 'আত্মীয় তো! জ্ঞাতি না হলেও কুটুম্ব। আমাদের মধ্যে

বিয়াশাদি চলে আজ কয়েক পুরুষ ধর্‍্যা। আমার দাদা ভিন্ন মজহাবে গেছেন, বাবাও কড়া আহলে হাদিস ছিলেন, সম্পর্ক তো তাও নষ্ট হয়নি। আত্মীয়তা বন্ধ হয়নি। এখন উটকা মানুষের সাথে একজোট হয়্যা আত্মীয়স্বজনের বেইজ্জতি করা,—এসব কি ভালো কাজ?'

জায়নামাজ দাঁড়াতে দাঁড়াতে বড়োচাচা বলে, 'তোমার একটা চিঠি আছে। আমার জামার পকেটে দ্যাখো।'

৪৪

বিছানায় দেওয়াল ঘেঁষে ঘুমাচ্ছে মন্টু। ওর পাশে বসে আনোয়ার খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করে। ওসমানের হাতের লেখা বরাবরই খুব জড়ানো, কিন্তু এরকম দুর্বোধ্য তো কখনো ছিলো না। মনে হয় একটানে গোটা চিঠি লেখার চেষ্টা করেছে। হ্যারিকেনের সলতে উসকে দিয়ে ১টা ১টা করে অক্ষর ধরে ধরে অনেক কষ্টে আনোয়ার চিঠির পাঠোদ্ধার করে!

প্রিয় আনোয়ার,
তুমি মিছেমিছি গ্রামে গেলে। এখানে রাস্তায় রাস্তায় আগুন জ্বললো তুমি দেখতে পেলে না। বড়ো বড়ো দালান কোঠাও রেহাই পায়নি। আগুন নেভাতে মিলিটারি বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবাহ ঘোরাতে গিয়েছিলো, তাতে ফল হয়েছে বিপরীত! রাস্তায় রাস্তায় নদী, নদীর পানির ওপর ভর করে জ্বলতে থাকে আগুন। খবরের কাগজ পাও? কাগজে এর নাম দিয়েছে নদী ও আগুনের যুগলপ্রবাহ। সেদিন রেস কোর্সে শেখ মুজিবুর রহমানের মস্ত বড়ো মিটিং হলে এই যুগলস্রোতোধারা চাপা পড়েছে। আমি এত ঘাবড়াই না! আমি তো খিজিরকে চিনি। খিজিরদের horizontal মিছিল দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। কপালে থাকলে তুমি দেখতে পাবে। না পারো তো আমি কি করবো? একটা পদ্য আছে জানো? 'কেঁদে কেন মরো? আপনি ভাবিয়া দ্যাখো কার ঘর করো!' এই পদ্যেই জবাব আছে। ইতি।
ওসমান।

চিঠির বাক্য স্পষ্ট। কিন্তু ওসমান এসব কি লিখেছে? ও কি ঠাট্টা করার লোক? ওসমানকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে, ওর শরীর বোধ হয় খারাপ, কিন্তু আনোয়ার এখন গ্রাম ছেড়ে যায় কি করে? এতো কিছুর পরেও শয়তানদের ফণা নিচে নামে না। চেংটুর পরিষ্কার-করা বৈরাগীর ভিটায় এরা চুটিয়ে মিটিং করে অথচ চেংটুর ওপর রাগ এদের প্রতিদিন কেবল বেড়েই চলে। চেংটুকে নিয়ে ঢাকায় গেলে হতো। কিন্তু ও ঢাকায় যাবে কেন? ওসমানকে এর কথা লিখেছিলো, ওসমানের চিঠিতে কৈ তার কোনো উল্লেখ নাই তো! ওসমানের হলোটা কি? শরীর বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে। নোভালজিন ছাড়া ছেলেটা একটা দিনও স্বাভাবিক থাকতে পারে না। কতোবার বলা হয়েছে, এ্যাসিডিটির রোগীর এভাবে

এ্যানালজেসিক খাওয়ার পরিণতি সাঙ্ঘাতিক হতে পারে। পেটে হয়তো আলসার বাধিয়ে বসেছে; এই রোগের জন্যেও চিঠি এলোমেলো হতে পারে। রোগে কষ্টে ওসমানের পাশে থাকার মতো কেউ নাই। ওসমানের প্রতি কর্তব্যবোধ আনোয়ারের মাথায় ১টি কাঁটা বেঁধায়: ওর কাছে থাকার জন্যেই একবার ঢাকায় যাওয়া উচিত। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই খোঁচাটা চুলকানোর আরাম দেয়, ঢাকায় যাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে চোখ জড়িয়ে আসে। ঘুম ভালো করে চেপে আসতেই জিন্না এ্যাভিন্যুর ফুটপাথ ধরে আনোয়ার হাঁটতে শুরু করে। হ্যাঁ, আউটার স্টেডিয়ামের দেওয়াল ঘেঁষে ফুটপাথ ধরে তাড়াতাড়ি হাঁটছে। সঙ্গে চেংটু। আনোয়ার খুব খুশি, চেংটুকে নিয়ে সে নানান জায়গায় যাবে। সবাইকে বলবে, এরকম কর্মী কেউ চোখে দেখেছ? ঢাকায় বসে তোমরা বিপ্লবের অবজেকটিভ কন্ডিশন দেখতে পাও, কিন্তু বিপ্লবের হাতিয়ার দেখতে চাও তো চেংটুকে দ্যাখো! কিন্তু চেংটুর হাতে ১টা হাতিয়ার থাকায় আনোয়ার উসখুস করে। ছোকরা তার পাশে ছিলো, এখন চলে গেলো ঠিক পেছনে। সামনে ট্রাফিকের লাল সংকেত জ্বলে উঠেছে, আনোয়ার সামনে এগোতে পারে না। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে আড়চোখে চেংটুর দিকে তাকায়। চেংটুর দা হাত বদল করে। আনোয়ার দেওয়ালের দিকে আরেকটু সরে। দেওয়ালের ঘষাটায় তার ডান হাতে ব্যথা করছে। হাতের ব্যথায় আনোয়ারের ঘুম ভাঙে।

কোত্থেকে মেয়েলি গলায় কান্নার আওয়াজ আসে হঠাৎ করে মনে হয়, মন্টু কোথায়? মন্টু না থাকায় ঘুমের মধ্যে আনোয়ার চলে এসেছে দেওয়ালের দিকে। ডান হাত তার চাপা পড়েছে নিজের শরীর ও দেওয়ালের মাঝখানে। তখন স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ে। চেংটুকে সে ভয় পেলো কেন? চেংটুকে ভয় পাওয়ার গ্লানিতে আনোয়ার প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ শুয়ে থাকে। কিন্তু বাড়ির ভেতরের কান্নার আওয়াজ উথলে উথলে উঠছে। হঠাৎ ভয় হয় ঢাকা থেকে কোনো খারাপ খবর এলো না তো? আম্মার ব্লাড প্রেশার আজকাল খুব উঠানামা করে, যে কোনো সময় একটা স্ট্রোক হতে পারে। আনোয়ার প্রায় লাফিয়ে উঠে ভেজানো দরজা খুলে ভেতরের বারান্দায় দাঁড়ায়। উঠানের মাঝামাঝি গোল হয়ে বসে কাঁদছে কয়েকজন চাষী বৌ। না, তার মায়ের দুঃসংবাদে এদের ভেঙে পড়ার কথা নয়। আনোয়ার একটু আশ্বস্ত হলে জমিরের মা এসে তাড়া দেয়, 'ভাইজান, মুখ ধুয়া নেন। নাশতা ঠাণ্ডা হয়্যা গেলো।' উঠানে কারা? জমিরের মার কাছে জানা যায় এদের ১জন হলো চেংটুর মা, ১জন তার চাচী, ১জন তার ভাবী এবং আরেকজন চেংটুর স্বামী-পরিত্যক্তা বোন।

চন্দনদহ বাজার থেকে এদিকে আসার রাস্তায় গ্রামের শুরুতেই বুড়ো গাব গাছ। গাব গাছের পাশে ধান-কাটা জমিতে নামবার ঢালে আজ ভোরবেলা চেংটুর লাশ পাওয়া গেছে।

আনোয়ারদের বাড়ির বাইরে কাঁঠালতলায় ভিড়। পরিচিত ভঙ্গিতে হাটু ভেঙে মাটিতে বসে রয়েছে নাদু। তার সামনে হাতলওয়ালা চেয়ারে বড়োচাচা। নাদু মাঝে মাঝে মাটিতে হাতের চাপড় মারে এবং আল্লা ও নিহত চেংটুকে নানাভাবে আহ্বান করে। পোড়া পা টেনে টেনে ঘুরে বেড়ায় করমালি। উঁচু দাঁত দিতে তার নিচেকার পুরু ঠোঁট চেপে-ধরা। আনোয়ারকে দেখে তার দাঁতের চাপ শিথিল হয়, 'ভাইজান, এটা কেমন হলো?'

ধরা গলায় বান্দু শেখ বলে, 'কপাল।'

'ও চেংটু! চেংটু! হারামজাদা তোর নাফ-পাড়া কেটে গেলো? বেন্ন্যামানষের ব্যাটা, চাষাভূষার ব্যাটা, তুই যাস বড়োনোকের সাথে তাল দিব্যার?' বিলাপ করতে করতে নাদ

পরামাণিক মাথা রাখে বড়োচাচার পায়ে। বড়োচাচা তারা বিরলকেশ মাথায় আঙুল ছুঁয়ে ছলছল চোখে তাকায় সামনে।

আনোয়ারকে একটু আড়ালে ডাকে করমালি, 'ভাইজান! বোঝেন তো! আফসার গাজী কালও নাফ পাড়ছে, কয়, কোনো শালাক কিছুতেই ছাড়া হবো না। এখন বোঝেন!'

'আলিবক্স কোথায়?' আনোয়ার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আলিবক্স ঠিক বুঝতে পারবে এ সময় কি করা দরকার।

'তাই গেছে পুবে, চরের মধ্যে। নদীর ঐ পারে গোরুচোরেরা আবার দল পাকায়! এদিকে পাও দিলে তো এ্যারা আলিবক্স ভাইজানোক সাফ কর‍্যা দিবো।'

'লাশ কোথায়?'

'লাশ আছে গাবতলাত। পুলিস না আসলে বলে লাশ ধরা যাবো না।'

'আনোয়ার বলে, 'পুলিসে কেস দেওয়া দরকার।'

'পুলিস!' করমালির উঁচু দাঁতের চাপে কথাটি এমনভাবে বেরোয় যে মাথা নিচু করে আনোয়ারকে একটু সরে দাঁড়াতে হয়।

গাবগাছতলায় ভিড় আরো বেশি। শহরের ছাত্রকর্মীরা এসেছে মেলা, আজ কর্ণিবাড়ি স্কুলের মাঠে জনসভা, তারই প্রচার করে বেড়াচ্ছে। কাদের হাতে চেংটু মারা পড়লো, এ নিয়ে কারো স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা নাই, কিন্তু তার মৃতদেহ নিয়ে তারাই মিছিল করতে চায়। এই মৃতদেহ তারা পুলিসকে ছুঁতে দেবে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে করমালি এখানে এসে পড়েছে। আনোয়ারকে ডেকে বলে, 'ভাইজান, আপনে কন না কিসক? এতোগুলা শিক্ষিত মানুষ আসছে, চেংটুকে কারা মারবার পারে, কি সমাচার কয়া দেন না!'

কিন্তু প্রমাণ ছাড়া আনোয়ার আন্দাজে কথা বলে কিভাবে? এর ওপর চেংটুর বড়োভাই সোটকা পরামানিক তেড়ে আসে করমালির দিকে, 'হামার ভায়েক খায়াও তোরগোরে খিদা মেটে নাই? তোর কি? তোর পাওখানই পুড়ছে, পাও পুড়্যা তোর শালা এখন ভিক্ষা করার জুত হবো! তোরা বাপব্যাটা এখন একসাথে বাজারেত বস্যা থালি ধরলেই পয়সা!'

ছাত্রদের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তারাও এই মৃতদেহ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চায় না। এসব করা মানে আজকের মিটিঙের বারোটা বাজানো। তাদের কাছে চেংটুর বাবার করুণ বাসনাটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য জালালউদ্দিন তৎপর। চেংটুর মৃতদেহ বৈরাগীর ভিটার পুরনো বাসিন্দাকে আরো উত্যক্ত করে তুলতে পারে। তাড়াতাড়ি ছেলের দাফন হলে তার রুহের আরাম হয়, জীন এবং পুলিসের ঝামেলা থেকে জীবিত লোকজনও রেহাই পায়। আনোয়ারের বড়োচাচারও ইচ্ছা তাই। ২পুরুষের চাকর নাদু পরামাণিকের ইচ্ছাটা পূরণ করার জন্য বড়োচাচা বড়ো উদগ্রীব।

আনোয়ার তাকিয়ে থাকে চেংটুর মুখের দিকে। ঠোঁটজোড়া তার দারুণভাবে চেড়ে-ধরা। কানের নিচে ছুরির গভীর দাগ। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে চেংটুর মুখটাকে সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে দিয়েছে।

৪দিন পর আনোয়ার আরেকটা চিঠি পায়। শওকত ভাই ঠিকানা পেলো কোথায়? আনোয়ার ঠিক এতোটা ভাবেনি, ওসমানের অবস্থা যে রকম হয়েছে সে কল্পনাও করেনি। ওসমানকে প্রায়ই নাকি দ্যাখা যায় ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। স্টেডিয়ামের বারান্দায় ১দিন চিৎকার করে দৌড়াতে দ্যাখা গেছে। কাপড়চোপড় পরে খুব

নোংরা। কথাবার্তার ব্যালান্স নাই। আনোয়ারের কথা খুব বলে, আনোয়ারের বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে দ্যাখা করে ওর খবর নিয়েছে কয়েকবার। আনোয়ার কি কয়েকদিনের জন্যে ঢাকায় আসতে পারে? ওসমানকে দ্যাখাশোনা করা দরকার। কয়েকদিনের জন্যে বিপ্লব স্থগিত রেখেও আনোয়ার যেন একবার ঢাকায় আসে।—চিঠি পড়তে পড়তে আনোয়ার উদ্বিগ্ন হয়। আবার চিঠি পড়া শেষ হলে বুঝতে পারে যে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত আরো বেশি। ঢাকায় যাওয়া খুব দরকার। মাথার ভেতর তার নতুন হাওয়া খেলে এবং হাতপাগুলোর আড়ষ্টতা কাটে। শওকত ভাইয়ের ওপর এতোটা কৃতজ্ঞতা বোধ করে যে তার ছোট্টো শ্লেষটুকুও মিষ্টি লাগে।

গাবগাছতলায় পৌঁছবার আগে ঢেকুর উঠলে মুরগির কোর্মার স্বাদ বোঝা যায়। ভোরবেলা উঠে বড়োচাচী এর মধ্যে এতো আয়োজন করেছে। বড়োচাচী বাড়ি ফিরেছে পরশু সকালে, ২টো দিন গেছে বাড়ি ঝাড়পোঁছ করতে। আর আজ সকাল ৯টার বাসে আনোয়ার চলে যাবে শুনে সূর্য ওঠার আগে থেকেই রান্নাবান্নার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। অতো সকালে আনোয়ার ভাত খেতে পারে না বলে এক গাদা পরোটা ভাজে, রাত্রে জ্বাল-দেওয়া মুরগির কোর্মা রাঁধে, এর ওপর ডিম ভাজা। চাচী নিজে বসে থেকে পাতে ১টা ১টা পদ তুলে দেয় আর বলে, 'আবার কোনদিন আসো ঠিক আছে? খাও বাবা।'

'আমি তো বিশ পঁচিশ দিনের মধ্যে আবার আসছি চাচী!'

আনোয়ারের এই কথায় আমল না দিয়ে বড়োচাচী তার প্লেটে তরকারি ঢালে, বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার বাপ বছরে দুই বছরে তাও এক আধবার আসছে। ঐ বারান্দার উপরে বস্যা রোদ পোয়াছে আর কছে, "ভাবী, পাটিসাপটা করল্যা না?" আবার চরের মধ্যে থ্যাকা পাখি ম্যারা নিয়্যা আসছে, "ভাবী ভালো কর্যা রোস্ট করো তো!" —দেখতে দেখতে কতোদিন হয়্যা গেলো!' ঐ বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে বড়োচাচা চুপচাপ উঠান দ্যাখে।

এর মধ্যে এসে পড়ে জালালউদ্দিন, 'তাড়াতাড়ি করো। বাসের টাইম হলো।'

সেই থেকে জালালউদ্দিন বকবক করেই চলেছে। আনোয়ার বগুড়া নেমেই যেন তার মামার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে। ইয়াসিন সাহেবের এখন ঘন ঘন এলাকায় আসা উচিত। ফিল্ড এখন ভালো, এইসময় এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার।

গাবগাছতলায় পৌঁছবার পর জালালউদ্দিন চুপ করে। কি হলো? কোর্মার ঢেকুরের গন্ধ চাপা পড়ে মৃতদেহের আবছা গন্ধে। গাবতলায় জবুথবু হয়ে বসে রয়েছে নাদু পরামানিক। জালাল মাস্টার আস্তে আস্তে বলে, 'আহা! প্রত্যেক দিন এই জায়গায় অ্যাসা বস্যা থাকে! বার্ধক্যে পুত্রবিয়োগ!'

'ঢাকাত যাও?' নাদু পরামানিক উঠে দাঁড়ায়।

'হ্যাঁ। এখন বাসে যাবো বগুরা। কাল সকালে ঢাকার ট্রেন ধরবো।' আনোয়ার কৈফিয়ৎ দেয়, 'আমার এক বন্ধুর খুব অসুখ। একটু সেরে উঠলেই আমি ফিরবো।'

নাদু ওদের সঙ্গে হাঁটে। ১টা ময়লা চাদরে তার গা জড়ানো। একটু একটু বাতাসে রোগা শরীর কাঁপে। তার দাড়ি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় মুখের অভিব্যক্তি সংগঠিত হতে পারে না। আনোয়ার তাই বারবার দেখেও নাদুর চোখেমুখে শোক কি হতাশা সনাক্ত করতে পারে না।

চন্দনদহ বাজারের শুরুতে খয়বার গাজীর ধানকলের টিনের ছাদ সকালবেলার রোদে ঝকঝক করে। আজ হাটবার নয়, তবু এদিক ওদিক লোকজন দেখে জালালউদ্দিন অবাক হয়, 'এতো মানুষ?'

ধানকলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আফসার গাজী। তার সঙ্গে শহর থেকে আসা কয়েকজন ছাত্রকর্মী। আফসার এগিয়ে আসে আনোয়ারের দিকে, নাদুকে জানায়, 'কি গো, পরশুদিন বড়ো মিটিং হলো বাজারের মধ্যে, তোমার ব্যাটার নাম কর‍্যা প্রস্তাব পাস করলাম। তুমি আসলা না?' তারপর সে তাকায় জালালউদ্দিনের দিকে, 'আপনেও তো ভাষণ দিলেন। নাদুক কন নাই?'

জালালউদ্দিন অপরাধীর মতো হাসে।

'মাস্টার মানুষ! বারো বছর মাস্টারি করলে কি জানি হয়?' জালালউদ্দিনকে ঠাট্টা করার পর আফসার গাজী আফসোস করে চেংটুকে নিয়ে, 'চ্যাংড়া মানুষ! মাথা গরম কর‍্যা কোপ মারলো বৈরাগীর ভিটাত। আগুনের জীব বাপু! কোরান হাদিসে কি মিছা কথা কইছে? জিনের গাওত হাত পড়ছে!' নাদুকে সে সান্ত্বনা দেয়, 'মন খারাপ কর‍্যা কি করব্যা? জুম্মার ঘরত ভালো কর‍্যা শিরনি দিও। ট্যাকাপয়সা না হয় কিছু নিও।'

চেংটুর মৃত্যুর পেছনে জিনের সক্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধে জালালউদ্দিনও নিশ্চিত, মসজিদে শিরনি দেওয়ার জন্যে সে নিজেও কিছু চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব করে।

আফসার গাজীর প্রভাবে আনোয়ারের জায়গা হলো বাসে ড্রাইভারের সিটের পাশেই, বাসের ভেতরটা প্রায় ভরে গেছে, তবে বাস ছাড়তে এখনো অনেক দেরি, ছাদের ওপর লোক এখনো ওঠেনি। আনোয়ারের কাছে বিদায় নিয়ে আফসার গাজী একটু দূরে দাঁড়িয়ে জালালউদ্দিনের সঙ্গে গল্প করে।

'বাবা!' নাদু এগিয়ে আসে আনোয়ারের দিকে। আনোয়ার বাসে উঠতে গিয়েও ওঠে না, সেও একটু এগিয়ে যায় নাদুর কাছে।

'বাবা!' নাদু দুই সিলেব্‌লের শব্দের পুনরাবৃত্তি করে। তার ডান হাত হঠাৎ খুব কাঁপে। সেই হাত তার নোংরা চাদরের ভেতর ঢুকে পড়লে আনোয়ার ভয় পায় এবং সতর্ক হয়ে একটু সরে দাঁড়ায়। নাদুর হাত দিয়ে বের হয়ে আসে কালচে ন্যাকড়া জড়ানো পুটলি। নাদুর মুঠি এমন কাঁপছিলো যে আনোয়ার হাত বাড়িয়ে জিনিসটা না ধরলে ওটা পড়েই যেতো। পুটলি হাতে নিয়ে আনোয়ার জিগ্যেস করে, 'কি?'

নাদু কাঁচুমাচু মুখ করে তার দিকে তাকায়, 'চেংটুর মা বেনবেলা করছে। খায়ো বাবা!'

'কি?'

নাদুর চোখ এবার নিচের দিকে। অপরাধী স্ত্রীর পক্ষ থেকে সে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে, 'চেংটুর মাও কয়টা পিঠা করছিলো। তোমাক খাবার দিছে!'

আনোয়ারের নাকমুখ হঠাৎ নোনা পানিতে বন্ধ হবার উপক্রম হয়। কালচে নোংরা ন্যাকড়া কিংবা তার ভেতরকার পিঠার গন্ধ কিছুই পাওয়া যায় না। তার নীরবতায় ঘাবড়ে গিয়ে নাদু উসখুস করে, আপন মনে প্রলাপ বকে, চেংটু এই পিঠা খুব পছন্দ করছে।

হারামজাদা মাথাগরম আছিলো তো! দ্যাখো নাই কোটে কোটে ঘুরছে! একদিন বাড়িতে যায়া কয়, "ও মা, আলো-চাল কোটো তো! ভাপা পিঠা করো, আনোয়ার ভায়েক পিঠা খাওয়ামু!"—চেংটুর মা, বুঝলা না?—মেয়্যামানুষ, মনমেজাজ ভালো থাকে না। অভাবের সংসার বাপু, ঘরত ভাতের চাউলেরই অনটন, পিঠা আর বানাবার পারে না। হারামজাদা অর মায়ের কাছে খালি তোমার গপ্পো করছে বাবা! তুমি আজ ঢাকাত যাবা শুন্যা ফজরের আগে আত থাকতে উঠছে, পিঠা বানায় আর কান্দে! মেয়্যামানুষ তো! খালি কান্দে!' মেয়েমানুষের স্বভাবের বিবরণ দিতে গিয়ে নাদু পরামাণিকের গলা ধরে আসে' 'খায়ো বাব! মটোরের মদ্যে অনেকক্ষণ থাকবা, খিদা নাগবো! খায়ো!' নাদুর কথা বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে, মনে হয় বোবা যেন কথা বলার চেষ্টা করছে।

স্টার্ট দেওয়ার পরও বাস নড়ে না! নাদু এবার হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে বিশাল ডুমুর গাছের নিচে। তার পেছনে মতিলাল আগরওয়ালার পাটের গুড়ামের সামনে থেকে জালালউদ্দিন ও আফসার গাজী এগিয়ে এসে আনোয়ারের সঙ্গে কথা বলে চলে যায়। নাদুর বসে-পড়া শরীর দেখে আনোয়ার ভয় পায়, লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারবে তো? বাস চলতে থাকে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে। কাঁচা রাস্তায় স্পিড দেওয়া সম্ভব নয়। তবু দেখতে দেখতে নাদু পরামাণিক ও জালালউদ্দিন ও আফসার গাজী ও চন্দনদহ বাজার আড়ালে পড়ে যায়।

৪৫

তক্তপোষে খিজিরের প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভার। ২টোর ছোঁয়া বাঁচিয়ে শুয়ে পড়লে জুম্মনের মায়ের গা শিরশির করে। বড়ো শীত করে, স্যাঁতসেঁতে শীত; ঠাণ্ডা লোহার টুকরা যেন এগিয়ে আসছে তার তলপেটের দিকে। সারা শরীর কাঁপে, কিন্তু যন্ত্রগুলো ঠেলে ফেলে দেওয়ার মতো বল সে হারিয়ে ফেলেছে।—নাঃ! মহাজনের বাড়ি কাজে যাওয়াটা আজ ঠিক হয়নি। কিন্তু সিতারার পান-চিনি, আজ না গিয়ে পারে? আর শনিবারের ঘটনা, আজ ৫/৬ দিন হতে চললো, শরীর তবু সেরে ওঠে না কেন?

শনিবার কি? হ্যাঁ, শনিবারেই তো!—ঠাণ্ডায়, দুর্বলতায় এবং প্লাস ও স্ক্রু-ড্রাইভারের ধাতব হাজিরায় জুম্মনের মায়ের মাথার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে পড়ে, দিন তারিখ সব গুলিয়ে যায়। তাহলে কামরুদ্দিন এসেছিলো কবে? এসে খুব শাসিয়ে গেলো, 'তুই তাইলে থাক! তুই প্যাট খসাইবি না, তে আমার কি গরজ পড়ছে ঐ জাউরাটারে লইয়া তরে ঘরে তুলুম?' কিন্তু জুম্মনের মা কি করতে পারে? ঐ রাতে, হ্যাঁ শুক্রবার রাতে এসেছিলো খিজির। ঠিক এই তক্তপোষে বসে তার তলপেটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। সেই সাঁড়াশি-মার্কা আঙুলগুলোর চাপে জুম্মনের মায়ের ঘুম ভেঙে যায়। চিটচিটে অন্ধকারে মরা মানুষটাকে স্বপ্নে দ্যাখার ফলে ভয়ে পেটের ব্যথা ঠিক ততোটা ঠাহর করতে পারেনি। টের পেলো দুপুরবেলা,

মহাজনের বাড়িতে বাসন মাজতে মাজতে, উরুসন্ধিতে ভিজে ভিজে ঠেকেছিলো। বিবিসায়েবকে বলে তাড়াতাড়ি চলে আসে বস্তিতে। তক্তপোষে শুতে না শুতে মনে হয় পেটের বাসিন্দা আগুন হয়ে জ্বলে উঠছে। তাহলে রাত্রিবেলা হাড়ডি খিজির কি হাতের ঘষায় ঘষায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো? জুম্মনের মা কি নাপাক হয়ে ঘোরাঘুরি করেছে? রাত্রে একা ঘরে ফেরার সময় নন্দলাল দত্ত লেনের গলা-কাটা মাহাকাল কি তার দিকে নজর দিলো?—এতোসব ভাবনার সুযোগ পাওয়া যায় না। প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে জুম্মনের মা টের পায় যে ওসব কিছু না, হাড়ডি চোদাই মইরা অহন তার গুড়াটারে চেতাইয়া দিছে! —যে মানুষ এখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তার মস্তানিটা দ্যাখো! আগুনের পা দিয়ে জুম্মনের মায়ের পেটে সে অবিরাম লাথি মারতে শুরু করলে আর সহ্য হয় না। বজলুর বৌ ভাগ্যিস সেই সময় বস্তিতেই ছিলো, জুম্মনের মায়ের গোঙানি শুনে সে-ই সব ব্যবস্থা করে। সব কথা জুম্মনের মা খেয়াল করতে পারে না। চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসার মুহূর্তে সে ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছিলো, মনে হলো খিজিরের লম্বা শরীর গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। খিজিরকে ধরার জন্যে সে কি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো? ১বার মনে হলো রক্তাক্ত শরীর নিয়ে খিজির বোধহয় উঠে চেপে বসেছে তার তলপেটের ওপর। খিজিরের রক্তে তার কোমরের নিচে থেকে উরু, হাঁটু, পা—সব ভিজে যাচ্ছে। গাঢ় লাল রক্ত ফোয়ারার মতো উঠছে জুম্মনের মায়ের শরীর থেকে, সমস্ত ঘর কালচে লাল রঙে অন্ধকার হলো। তারপর আর কিছু দ্যাখা যায়নি। বজলুর বৌ এবং আরো কয়েকটি মেয়েলি গলার স্বর ভেসে আসে অনেক দূর থেকে। সেইসব কথা দেখতে দেখতে ঝাপশা ধ্বনি হয়ে উড়াল দেয় গলির ভেতর, গলি দিয়ে হারিয়ে যায় বড়ো রাস্তায়। এদিকে তার নিঃশব্দ ও অন্ধকার শরীর থেকে তরল আগুন বেরিয়ে যাচ্ছে, এতো আগুন বেরোবার জন্যে উরুসন্ধির পথ তার বড্ডো সরু, গতর পুড়ে যায়, গতর ছিঁড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর গনগনে জ্বলন্ত কয়লার তাল বেরিয়ে যাওয়ার স্পর্শ টের পায় এবং আগুনের শিখা তখন মাথা নোয়ায়। তারপর সব অন্ধকার। ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরলে মনে হয়েছিলো সারা জীবনে সে আর উঠতে পারবে না।

কিন্তু তারিয়ে তারিয়ে কতোদিন কষ্ট পাবে জুম্মনের মা? মহাজনের বাড়িতে উৎসব, বস্তির ঘরে শুয়ে বসে থাকা কি তার পোষায়? আবার ঐ বাড়িতে গেলে কাজকাম না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটাও যন্ত্রণা। আজ বিকাল হতে বিবিসায়েব নিজেই তাকে ছুটি দিলো। জুম্মনের মা কি এসব বোঝে না? কাজে কামে যতোই সচল হোক, শুভ-অনুষ্ঠানে অপয়া মেয়েমানুষ ঘরে থাকলেই কুফা। তা সে না হয় একটু দূরে বসে বসে দেখতো, তাতে সিতারার জীবনটা কি নষ্ট হয়ে যেতো? কতো লোক আজ মহাজনের বাড়িতে! বজলুর বৌ পর্যন্ত নিজের মহাজনের বাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে ঐ বাড়িতে ১বার এটা বাটে, ১বার ওটা এগিয়ে দেয়। আবার জুম্মনের মায়ের দিকে তাকিয়ে বিবিসায়েবের সঙ্গে কিসব ফুসুরফাসুর করে আল্লাই জানে। মাগী সেদিন এতো যত্ন-আত্তি করলো, ৫/৬ দিন যেতে না যেতে তার বিবিসায়েবের কাছে গিয়ে তার নামে কিসব গিবত করে!—জুম্মনের মায়ের মনে হয়, এই বজলুর বৌ-ই শয়তানি করে তার বাচ্চা নষ্ট করলো না তো? মাসখানেক হলো শাহ সায়েবের বাড়িতে মাগী ঠিকা কাজ করে, কামরুদ্দিনের টাকা খেয়ে শাহ সায়েবের দোয়া-পড়া তাবিজ হয়তো পুঁতে রেখেছে জুম্মনের মায়ের ঘরের সামনে। একবার উঠে দেখবে?-নাঃ! দাঁড়াবার মতো বল নাই বলে মাটি খুঁড়ে তাবিজ খোঁজার কাজ স্থগিত

রাখে।—এখন তাকে বিয়ে করতে কামরুদ্দিনের তো কোনো অসুবিধা হবে না। বিয়ের দিনই সে জিগ্যেস করবে, 'জুম্মনের বাপ, ঈমানে কওতো, আমার প্যাট খসাইবার লাইগা বজলুর বৌরে দিয়া তুমি আমার ঘরের বগলে তাবিজ পোঁতাইয়া রাখছিলা না?'

কিন্তু রাগ বা সংকল্প—তার মাথায় কিছুই দানা বাঁধে না। সব ছাপিয়ে ওঠে খিজিরের প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভার। শেষ বিকালবেলা দেখতে দেখতে গর্তে গড়ায়, বস্তির পাশের নর্দমা থেকে উঠে আসে সন্ধ্যাবেলা,—ভ্যাপসা ঘিনঘিনে অন্ধকার। জুম্মনের মায়ের শরীরের রুগ্ন হিম তাকে এতোটুকু ঝকঝকে করতে পারে না। সেই অন্ধকার বরং তক্তপোষের ওপরকার প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভারের দীর্ঘদিন ব্যবহারজনিত মসৃণতা মুছে ফেলে এবং আদিম কালের কোনো লোহার অস্ত্রের মতো সেগুলো হয়ে ওঠে খসখসে। খিজির কি ২ হাতে ২টে ধরে তার দিকে এগিয়ে আসবে? এগুলো নেওয়ার জন্যেই কি মৃত্যুর পরও আসাযাওয়া অব্যাহত রেখেছে? এসব দিয়ে তার তলপেটে সরাসরি খোঁচা দিয়ে জিগ্যেস করতে পারে, 'ফালাইয়া দিছস? ওস্তগরের দিয়া মারাইবার লালচে পোলাটারে দুনিয়াটা দ্যাখবার দিলি না?'—তার কথা স্পষ্ট নয়, গুলিবিদ্ধ শরীর থেকে আসা ঘড়ঘড় নিশ্বাসে ঘরের অন্ধকার আরো পাকে। হঠাৎ শোনা গেলো, 'বাত্তি জ্বালাও নাই?—হোক মরা মানুষের গলা, স্পষ্ট বাক্য শুনে জম্মনের মা বুকে বল পায়। এই ছোট্টো শক্তির সাহায্যে সে আরো শোনে, 'তোমার বলে কঠিন বিমারী? কি হইছে মা?'

জুম্মনের উপস্থিতি টের পেয়ে জুম্মনের মা জোরে জোরে নিশ্বাসে ফেলে। এই নিশ্বাস একটু নোনা বলে তার চোখ দিয়ে পানি গড়ায়। মনে পড়ে বেশ কয়েকদিন আগে এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে জুম্মন কোথায় চলে গিয়েছিলো। ৭/৮ দিন তার পাত্তা নাই। এখন বিকালবেলা ঘরে এসে তক্তপোষের ওপর যন্ত্রগুলো দেখেই তো তার বোঝা উচিত ছিলো যে জুম্মন ফিরে এসেছে। বুঝতে পারলো না কেন?

জুম্মন কুপি জ্বালালে কালচে লাল আলোয় ছেলের মুখ দেখে জুম্মনের মা জড়সড় হয়ে বসে। হয়তো এই ভাবটা সামলাবার জন্য ছেলেকে সে ধমকায়, 'ঐগুলি লইয়া কৈ গেছিলি হারামজাদা? চুরি কইরা ভাগছিলি কৈ?'

'চুরি করুম ক্যালায়? আমারে দিয়া গেছে।'

'তর বাপের সামান? ক্যাঠায় দিছে?'

'খিজিরে। একটা চেন ভি দিয়া গেছে। দেখবা? কি সোন্দর!'

পিচ্চি পোলাটার মুখে বয়স্ক মানুষের নাম উচ্চারণ জুম্মনের মায়ের কানে খরখর করে। 'কি কস?' বলতে বলতে জুম্মনের মা তার উদ্যত হাত গুটিয়ে নেয়। নাঃ! পোলার দোষ কি? খিজিরকে কিছু বলে ডাকতে সে তো ছেলেকে কখনো শেখায়নি। একবার ইচ্ছা হয় যে বলে, 'তারে তুই চাচামিয়া কইবার পারস না?' এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে খিজিরের স্থায়ী অনুপস্থিতি বড়ো প্রকট হয়ে ওঠে। লোকটার জন্যে একটু কাঁদার লোভে জুম্মনের মায়ের গলা, জিভ ও ঠোঁট আকুপাকু করে। মায়ের এইসব লোভলালসা সম্পর্কে উদাসীন জুম্মন ঘোষণা করে, 'আব্বায় না আবার বিয়া করতাছে।' মাকে তবু অন্যমনস্ক দেখে জুম্মন গলা চড়ায়, 'আব্বায় বিয়া করতাছে। ফুফু আমারে কইছে। কয় মাইয়া খুব সোন্দর। তোমার লাহান কালা পাতিলার তলা না। মাইয়ার বাপে মতিঝিলের কোন বিলাতি অফিসের পিওন। আব্বারে

চাকরি দিবো! আব্বায় ওস্তাগরি ছাইড়া দিবো। ঐ অফিসের সায়েবে আব্বারে থাকনের জায়গা ভি দিবো। ধানমণ্ডির মইদ্যে থাকে!'

'আমি ধানমণ্ডি উনমণ্ডি যাইবার পারুম না!' জুম্মনের মায়ের মুখ থেকে এই কথা বেরিয়ে পড়লে খিজির খিলখিল করে হাসে, 'তোমারে লইলে তো? আব্বায় থাকবো নয়া বৌ লইয়া। আমি আব্বার লগে থাকুম না!'

জুম্মনের মা হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। জুম্মন বুঝতে পারে না, কামরুদ্দিনের জন্যে ওর মায়ের এতোটা টান কেন? যে লোকের ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে এসেছে কতোদিন আগে, যে এখন তার কেউ নয়, তার ৩ নম্বর বিয়ের খবরে মা এতোটা ভেঙে পড়বে জানলে খবরটা না হয় সে চেপেই যেতো।

রাত বাড়ে। মায়ের কান্না আর থামে না। এদিকে জুম্মনের খিদে পেয়েছে। মহাজনের বাড়ি থেকে মায়ের নিয়ে আসা মিষ্টি ও ফিরনির সবটাই মেরে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সে হাই তোলে। মায়ের কান্নার বিরতি নাই। কাঁদতে কাঁদতে জুম্মনের মা বলে, 'তুই থাকবি আমার লগে।'

'না। আমারে লগে থাকতে কইছে ওসমান সাবে।' ওসমানের সঙ্গে থাকবার সংকল্প জানাতে জানাতে জুম্মনের চোখ থেকে ঘুম চলে যায়। এই মহাজন বলো আর আলাউদ্দিন মিয়া বলো,—এদের দেখলেই ভয় লাগে। খিজিরকে এরা ঘর থেকে বার করে দেয়নি? ওসমান সায়েবের ঘরেই খিজির এখনো রোজ আসে, ওসমান সায়েব তার সঙ্গে কতো কথাবার্তা বলে। খিজিরের স্ক্রু-ড্রাইভার আর প্লায়ার আর সাইকেলের চেনটা নিয়ে জুম্মন রেখে দেবে ওসমান সায়েবের ঘরে। খিজির তাহলে ঐসব রোজ দেখতে পাবে।

'আরে, ঐ সাবের না মাথা খারাপ হইছে! উই কি কয় না কয়—।' জুম্মনের মা ছেলেকে ধমক দেয় বটে, কিন্তু তার গা ছমছম করে। জুম্মন ঘুমিয়ে পড়লে তার ভয় আরো বাড়ে। জুম্মনের মুখ বড়ো শান্ত ও নিশ্চিন্ত। এই মুখে কার ছায়া? জুম্মনের জন্মের আগে খিজিরের সঙ্গে জুম্মনের মায়ের তো দ্যাখাই হয়নি। তবে?—ঘুমের মধ্যে এরকম একটানা নিশ্বাস নিতে শুনেছে সে কোথায়? জুম্মনের নিশ্বাসে ভর করে খিজির আলি কি তাকে শাসন করতে এসেছে? অপঘাতে মরলে মানুষের কতো কষ্ট হয়!—কাল পরশু বিবি সায়েবের কাছে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে শাহ সায়েবের মসজিদে শিরনি পাঠিয়ে দেবে। জুম্মনের একটানা নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে শুনতে জুম্মমের মায়ের চোখে নতুন পানির ঢল নামে। একটু ফোঁপাবার পর গলা খুলে কাঁদতে শুরু করে। কামরুদ্দিনের নতুন বিয়ে করার খবর খিজিরের জন্যে এভাবে হামলে কাঁদবার পথ খুলে দিয়েছে। কান্নায় এতোটুকু বিরতি না দিয়ে জুম্মনের মা ছেলেকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে।

৪৬

দেওয়ালের দিকে মুখ করে বিছানায় শুয়ে ছিলো ওসমান সায়েব। ঘরে আরো ৩জন। এদের সবাইকে জুম্মন চেনে। আনোয়ার সায়েবকে আগে দ্যাখেনি, কয়েকদিন থেকে দেখছে,

রোজই আসে, রাত্রে মাঝে মাঝে এখানেই থাকে। আলতাফ সায়েব প্রায়ই দ্যাখা যায় আলাউদ্দিন মিয়ার ওখানে। চুরুটওয়ালা সায়েবের নাম না জানলেও জুম্মন একে চেনে, এই সায়েব ইংরেজি কথা বেশি বলে, তার অর্ধেক কথা বোঝা যায় না। তা কোন ভদ্দরলোকটা স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে? ওসমান সায়েবের কথা বার্তা নিয়ে সবাই যে হাসাহাসি করে কেন জুম্মন বুঝতে পারে না। পাগল বলো আর মাথা-খারাপ বলো,—এই সায়েবের কথাবার্তা বরং জুম্মনের মাথায় ঢোকে, স্পষ্ট বোঝা যায় যে খিজিরের সঙ্গে বাইরে বেরোবার জন্য লোকটা উদগ্রীব। তা এই ১ ঘরের ভেতর কাঁহাতক বন্দি থাকা যায়?

তাকে দেখে ওসমান উঠে বসে, 'রাত্রে কোথায় ছিলি?'

চুরুট-সায়েব বলে, 'আমাদের একটু চা খাওয়াতে পারবি?'

চায়ের কেতলি নিয়ে জুম্মন তার হাতের স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার তক্তপোষের নিচে রেখে দেওয়ার জন্য উপুড় হতেই ওসমানের চোখজোড়া সেদিকে হঠাৎ স্থির হয়ে গেলো। চোখের লাল-খয়েরি রেখাগুলো কাঁপে, সে তাকায় ওপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট জোরে চিৎকার করে, 'সরো! টেবিলের ওপর ওভাবে ঝুলছো কেন? সরে যাও!'

গ্লাসে গরম পানিতে চামচ দিয়ে ওভালটিন ঢালছিলো আনোয়ার, চমকে উঠে গ্লাস সরিয়ে ফেললো। ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে শওকত হাসে, 'কি ব্যাপার? আপনিও এফেক্টেড হলেন?'

লজ্জা পেয়ে আনোয়ার মনোযোগ দিয়ে গ্লাসের ভেতর চামচ নাড়ে। ওসমান তখন বন্ধুদের কাছে প্রকৃত ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, 'বুঝলে না? জুম্মনের হাতে ওর ফেভারিট টুলস দেখে খিজির এসে পড়েছে। এতো লোক দেখে বোধহয় আড়ালে চলে গেলো।'

'চুপ করে ঘুমান!' শওকতের ধমকে ওসমান সুবোধ বালকের মতো দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়ে। জুম্মনের চোখজোড়া এখন ঐদিকে। খিজিরের ঝুলন্ত আবির্ভাবটি দ্যাখার জন্যে এ কয়েকদিন ধরে সে অনেক চেষ্টা করছে। তার ইচ্ছা, —খিজিরকে দ্যাখামাত্র তার হাতে প্লাস ও স্ক্রু-ড্রাইভার গুঁজে দেয়। আহা, এই ২টো পেলে মরার পর বেচারার রুহ্ শান্তি পায়। কিন্তু এই সায়েবদের হাউকাউ শুনে খিজির নিশ্চয়ই অনেকক্ষণের জন্য গায়েব হয়ে গেলো। জুম্মনের মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। এর ওপর চুরুট-সায়েব বলে, 'তোকে দেখলেই তোর বাবা এসে পড়ে।'

'বাবা না, সৎ বাবা।' আলতাফের এই সংশোধনী অগ্রাহ্য করে শওকত জানতে চায়, 'এনিওয়ে, ডাক্তার কি বলছে?'

চায়ের কেতলি হাতে জুম্মন বেরিয়ে যাচ্ছিলো, শওকত ডাকলো, 'তোর এই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে যা। এইসব দেখলে ওসমানের তোর বাপের কথা মনে পড়ে, বুঝলি না?'

কেতলি ও ঐসব নিয়ে জুম্মন বেরিয়ে গেলে আলতাফ বলে, 'হ্যাঁ আনোয়ার, তারপর?'

ওসমান যাতে শুনতে না পায় আনোয়ার তাই গলাটা নিচে নামায়, 'ডাক্তার বলে এক ধরনের শিজোফ্রেনিয়া। প্যারানয়েড শিজোফ্রেনিয়া।'

শওকত বাধা দেয়, 'আজকাল মাথার গোলমাল হলেই সাইকিয়াট্রিস্টদের ডায়াগনসিস হলো শিজোফ্রেনিয়া। সামথিং লাইক এ্যালার্জি ইন ফিজিক্যাল ডিজঅর্ডার।' সবাই হেসে ফেললে ওসমান উঠে বসে এবং খুশি খুশি চোখ করে ওদের হাসি সম্পূর্ণ অনুমোদন করে। আনোয়ারের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে ঢক ঢক করে ওভালটিন খেয়ে ফের শুয়ে পড়ে। শওকত তখন মনোযোগী হয় আনোয়ারের দিকে, 'ডাক্তার কি এ্যাডভাইস দিলো?'

'তিনটে ওষুধ দিয়েছে। সিডেটিভ তো চলবেই, স্টেমিটিল টুয়েন্টি ফাইভও কন্টিনিউ করতে হবে। আর একটা ওষুধ কয়েকদিন খাওয়ার পরে ফের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তবে প্রধান চিকিৎসা হলো সঙ্গ দেওয়া।'

'সঙ্গ দেবে কারা? খুব নিজেদের লোক?'

'হ্যাঁ, ঘনিষ্ট। মানে যাদের সঙ্গ, আই মিন-যারা—'

এগ্রিয়েবল টু হিম।' শওকত বলে, 'একা হলেই আনডিজায়রেবল এলিমেন্টস স্টার্ট হন্টিং হিম।'

আলতাফ বলে, 'এখানে নিজেদের লোক মানে তে আমরাই। ইন্ডিয়া থেকে ওর বাবাকে কি নিয়ে আসা সম্ভব? আমাদেরই এ্যাটেন্ড করতে হবে।'

আনোয়ার তো এটা ভালো করেই জানে। গতকাল ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরার পর আনোয়ার ওকে নিয়ে গিয়েছিলো ওয়ারিতে, ওদের বাড়িতে। বাড়ির প্রতিক্রিয়ার জন্য ও তৈরি হয়েই ছিলো। আম্মা একটু বিড়বিড় করতেই সে তার রিহার্সেল-দেওয়া বাক্য ঝাড়লো, 'আমার বন্ধু বিপদে পড়লে আমার বাড়িতে তাকে শেলটার দিতে পারবো না?' জবাবে আনোয়ারের মা বিপদগ্রস্ত মানুষের আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ও তার মৃত স্বামীর উদ্যোগী ভূমিকার বিবরণ দেয়, 'বিপদ আপদে মানুষকে সাহায্য করবো না কেন? পঞ্চাশ সালের রায়টে এই বাড়িতে আটটা হিন্দু ফ্যামিলি পুরো একমাস ছিলো, জানিস? তোরা তখন ছোটো, কতো ঝুঁকি নিয়ে আমরা তাদের থাকতে দিয়েছিলাম।'

'তো এখন একটিমাত্র লোকের ব্যাপারে আপনাদের এতো আপত্তি কেন?'

সুস্থ লোক হলে কথা ছিলো। একটা পাগলকে—।'

'একটা লোক একটু অন্যরকম হয়ে গেলেই তাকে পাগল বলে ফেলে দিতে হবে? আমাদের ছোটোচাচার মাথায় ডিফেক্ট দ্যাখা গেলে আপনারা তাকে দারুণ নেগলেক্ট করেছেন। কাজটা ভালো করেননি আম্মা।'

'এবার বাড়ি থেকে ঘুরে এসে তুই কি যা তা বলতে শুরু করেছিস।' আনোয়ারের মা কেঁদে ফেলে, 'জাহাঙ্গীরের জন্যে কি কম করা হয়েছে? তোর আব্বা ওর লেখাপড়ার সম্পূর্ণ ভার নেয়নি? তারপর মাথায় অসুখ হলো, একেবারে উন্মাদ মতো হয়ে গেলো তো তোর আব্বাই কতো কষ্ট করে বাড়ি নিয়ে গেলো।'

'চিকিৎসা করাননি কেন?'

'পাগলের চিকিৎসা কি তখন তেমন ছিলো?'

'কে বললো ছিলো না? কলকাতয় লুম্বিনী পার্ক ছিলো না? রাঁচিতে পাঠাতে পারতেন না?'

আনোয়ার কাউকে পরোয়া করে না। তার ঘরে তার বন্ধু থাকনে, সে পাগল কি স্বাভাবিক সেটা দ্যাখার অধিকার আছে একমাত্র তারই। ওসমানকে নিজের ঘরে রেখে সবাইকে একচোট নেওয়া যাবে ভেবে আনোয়ার বরং খুশি হয়েছিলো। হুইস্কি, শিল্প-সাহিত্য ও সমাজতন্ত্রের কনিস্যার ভাইয়ার প্রতিক্রিয়াটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে দ্যাখার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলো।

'তোমার বাসায় রাখা তো মুশকিল।' আলতাফ বলে, 'তোমার মা আছেন, ভাবী আছেন—।'

'আরে না! কোনো প্রবলেমই হতো না। আমাদের বাড়িতে এ্যাবনর্মাল লোকদের সহ্য করার ট্রাডিশন আছে।' ঠাট্টা করে বললেও আনোয়ারের গলায় প্রচ্ছন্ন গর্ব শিরশির করে ওঠে, 'আমার চাচা ফুল ফ্লেজেড পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।'

'এই জেনারেশনে এসে হয়েছো তুমি।' আলতাফ বললে সবাই হাসে।

'শোনো, প্রবলেম তৈরি করলো ওসমান নিজেই।'

'ওয়াইল্ড হয়ে গেলো?'

'না। খুব স্বাভাবিক মানুষের ভঙ্গিতে জেদ শুরু করলো। রাত সাড়ে বারোটার দিকে হঠাৎ তার খেয়াল হলো এই ঘরে বোধহয় খিজির এসে অপেক্ষা করছে। বলে, "চলো, আনোয়ার চলো। খিজির অপেক্ষা করছে। খিজির মাটিতে পা রাখতে পারে না, স্পেসে ঝোলে, বেচারা কতোক্ষণ ঝুলবে? চলো।" এমন জেদ করলো, শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো একাই। আমি কি করি? ওর পিছে বেরিয়ে রিকশা নিয়ে রাত একটায় এখানে এলাম।'

এরপর ওকে একা একা এখানে রাখে কি করে? জুম্মনটাকে এই ঘরে রাখা যায়। কিন্তু এইটুকু ছেলের ওপর ভরসা করা যায়? ছোকরা ভয় পায় না, কিন্তু ওসমানের সব কথা, সব দ্যাখা সে বিশ্বাস করে এবং নিজে সেগুলো দ্যাখার জন্যে উদগ্রীব।

'না, না, ওর ওপর ডিপেন্ড করবে, পাগল নাকি?' শওকত পরামর্শ দেয়, 'বরং হাসপাতালে যাও।'

'পাবনা? পাবনায় সিট পাওয়া কঠিন। নেক্সট টু ইমপসিবল!' আনোয়ার রাজি হয় না।

'তাহলে পিজিতে চেষ্টা করা যাক। পিজিতে সাইকট্রির ওয়ার্ড খুলেছে। মেডিক্যাল কলেজেও থাকতে পারে।'

শওকতের দ্বিতীয় প্রস্তাবও আনোয়ারের অনুমোদন পায় না। না, হাসপাতালে দিয়ে লাভ নাই। কেন?—অন্য সব রোগীদের সঙ্গে থেকে তার রোগ আরো জটিল হতে পারে। পাগলরা অবশ্য নিজেদের জগতেই মগ্ন থাকে, কিন্তু ওসমান যে ধরনের মানুষ, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে তার যেরকম আগ্রহ, তাতে ভয় হয় যে অন্য সহরোগীদের দ্যাখা হ্যালুসিনেশন নিজে দ্যাখার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। যদি দেখতে পারে তো তার নিজের উদ্ভট জগৎ আরো জটিল হবে এবং দেখতে ব্যর্থ হলে হতাশ হয়ে পড়বে।

যুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আনোয়ারের বাড়াবাড়িরকম আগ্রহে শওকত অবাক হয়। আলতাফ জানতে চায় 'বুঝলাম তো। কিন্তু ওর সঙ্গে থাকবে কে?'

'কেন? আমি যতোদিন পারি থাকি না! আমার তো আপাতত—।'

'তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে দোস্ত!' আলতাফ সত্যি সত্যি উদ্বিগ্ন হয়, 'এ্যাবনর্মাল লোকের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা থাকাটা ঠিক নয়।'

আনোয়ার তাহলে কি করবে? ওসমানকে হাসপাতালে পাঠালে আনোয়ারের করার থাকে কি? সে যে গ্রামের সমস্ত কাজ রেখে এখানে এসেছে সে তো ওসমানকে দ্যাখাশোনা করবে বলেই। ওসমানের শুশ্রূষা করা থেকে খারিজ হলে ঢাকায় থাকার পক্ষে তার আর যুক্তি থাকে?

শওকত ও আলতাফ চলে গেলে নিচে রেস্টুরেন্টে খেয়ে আনোয়ার ভাত ও মুরগির ঝোল নিয়ে আসে ওসমানের জন্য। সিঁড়ির গোড়ায় পা দিয়েই ওসমানের চিৎকার শোনা গেলো, প্রত্যেকটি ধাপ পেরোবার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার আরো স্পষ্ট হয়। নিজের ঘরে দরজার মুখে ধাক্কা খেয়ে আনোয়ার পড়েই যাচ্ছিলো। কোনোরকমে টাল সামলে উঠলে তার সামনে

দাঁড়ায় রঞ্জু। রঞ্জু ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। আনোয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চিৎকার করে ওঠে। তবে তার ভয়ও কাটে, 'দ্যাখেন তো! কি করতাছে, দ্যাখেন!'

ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওসমান। তার গায়ে গেঞ্জি, পরনে কিছু নাই। তার লিঙ্গ নেতিয়ে রয়েছে কালো ও স্যাঁতসেঁতে অণ্ডকোষের ওপর। আনোয়ার বিছানা থেকে চাদর টেনে তার কোমরে জড়িয়ে দিলে ওসমান নিজেই সেটা লুঙির মতো পরে নেয়। তারপর অভিযোগ করে, 'দ্যাখো তো, ব্যাটা রঞ্জুকে এ্যাটাক করতে আসে। আমি না ধরলে রঞ্জুর মাথায় লাথি মারতো!' ওসমানকে একরকম ঠেলে বিছানায় বসিয়ে দিলে আনোয়ারের চোখে পড়ে মেঝের এক কোণে। সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে ভাত, পুঁইশাক, আলু ও ইলিশ মাছের টুকরা। সেসবের দিকে আঙুল দেখিয়ে ওসমান বলে, 'দ্যাখো তো আনোয়ার! আমাদের বিলের জমির রাজভোগ ধানের চালের ভাত, কি সুন্দর জুঁইফুলের মতো সাদা! আম্মা নিজে রেঁধে দিলো, আমি নিয়ে এলাম, খিজিরকে বললাম, খাও, তুমিও খাও, আমিও খাই। ব্যাটা নিজেও খাবে না, আমাকেও খেতে দেবে না। আবার রঞ্জুর পিঠে লাথি মেরে ঘর থেকে বার করে দিতে চায়!'

রঞ্জুর ভয় একেবারে কেটে গেছে, সে বেশ মজা পাচ্ছে, তার চোখের কোণে চাপা হাসি চিকচিক করে।

আনোয়ার বলে, 'ভাত তুমি এনেছো?'

'জী। আমাকে ধরতে আসলে গামলাটা হাত থাইকা পইড়া গেলো।'

'তুমি এসব আনতে গেলে কেন? ওর অবস্থা তো জানো। কখন কি করে!'

আমার কি দোষ? ছোটোআপার ঢঙ!'

'তোমার ছোটো আপাও এসেছিলো?'

'মাথা খারাপ? পাগল আর কুত্তা আর তেলাপোকা—এই তিনটা জিনিসরে ছোটোআপা যমের মতো ডরায়। আমার পিছে পিছে দরজা পর্যন্ত আসছিলো। উনারে দেইখা আমার হাতে ট্রে দিয়া আপা এ্যাবাউট টার্ন।' খুব রসিয়ে রসিয়ে রঞ্জু ওসমানের আচরণের বিবরণ দেয়: তাকে দেখে ওসমান প্রথমে একটু হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো। এরপরই 'রঞ্জু, সাবধান! খিজির তোমাকে মারতে আসছে!' বলে চিৎকার করে লাফিয়ে মেঝেতে নামে এবং রঞ্জুকে জড়িয়ে ধরে। বিছানা থেকে ডাইভ দেওয়ার সময় তার লুঙি খুলে গিয়েছিলো, সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে রঞ্জু হাসে। ওর এইসব হাসি ও বর্ণনাকে পাত্তা না দিয়ে ওসমান দেওয়ালের দিকে মিনতি করে, 'খিজির, প্লীজ, রঞ্জুকে ধরো না। প্লীজ খিজির!'

৪৭

ওসমানের ঘুমের আয়োজন করতে গিয়ে রাত্রে আনোয়ারের ঘুম হয় না। ওসমান যতোক্ষণ জেগে থাকে ততোক্ষণ তার কথাবার্তা কি চ্যাঁচামেচি চলে; ইঞ্জেকশন দিয়ে, ট্যাবলেট খাইয়ে

তাকে ঘুম পাড়াতে হয়। তক্তপোষে ২ জনে কোনোভাবে থাকতে পারে বটে, কিন্তু ওসমান বড়ো ছড়িয়ে শোয়, আনোয়ার সারাটা রাত্রি প্রায় বসেই কাটায়। জুম্মনের আসার কোনো ঠিক নাই। পরশু একবার এসেছিলো, সারাটা দিন ওসমানের চ্যাঁচামেচি শুনলো খুব মনোযোগ দিয়ে, তারপর থেকে উধাও। সকালবেলা আনোয়ারের বড্ডো ঘুম পায়। ঘুমন্ত ওসমানের ঘরে তালা লাগিয়ে সে চলে যায় ওয়ারি। তখন সাড়ে ৭টা ৮টা হবে। ওদের বাড়ির বাইরে গেটের কাছে নালার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে রয়েছে করমালি।

'করমালি? তুমি?' আনোয়ার খুব অবাক হয়। সারারাতের ভোঁতা ধকলের পর এই বিস্ময় তাকে চাঙা করে তোলে।

'আসসালামালেকুম। কেমন আছেন ভাইজান?'

করমালির পায়ের ফোস্কাগুলো সব গলে গেছে, সেখানে এখন দগদগ করছে গোলাপি ঘা। করমালি নিশ্চয়ই পায়ের চিকিৎসা করতে এসেছে। আনোয়ারের ভালো লাগে। ওসমানকে সামলাতে সামলাতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েকদিন হলো শালার মার্শাল ল জারি হয়েছে। রাস্তায় বেরোলেই সেনাবাহিনীর অশিক্ষিত ও উদ্ধত জানোয়ারদের মুখ, ঘরে বসে এদের উদ্দেশে গালাগালি করা—আর ভালো লাগে না। অন্তত করমালিকে দেখে মনে হচ্ছে, এসব আর কাঁহাতক চলতে পারে? আনোয়ার গদগদ গলায় বলে, 'তুমি কখন এসেছো?'

করমালি ঢাকা পৌঁছেছে গতরাত্রে। রাত্রি কাটিয়েছে স্টেশনে। সকালবেলা বেরিয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘোরাঘুরি করে আনোয়ারদের বাড়ি খুঁজে পেয়েছে। ঠিকানা পেলো কোথায়?

'করমালি, সারারাত স্টেশনে ছিলে? খুব কষ্ট হয়েছে, না?'

কষ্ট হবে কেন? পাকা ঘর, মস্ত উঁচু ছাদ। শ'য়ে শ'য়ে লোক শুয়ে থাকে, ওরকম আরামের জায়গা করমালি চোখে দ্যাখেনি। এই বাড়িতে পৌঁছলে একটা কাজের লোক তাকে ধমক দিলে সে আনোয়ারের কথা বলে এবং গ্রামের পরিচয় দেয়। এরপর আনোয়ারের মা তার জন্যে নাশতা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছে।

'গ্রামের খবর কি? নাদু পরামাণিক কেমন আছে? নবেজউদ্দিন? বান্দু শেখ? করমালির বাপের শরীর কেমন?' একটা প্রশ্নের পিঠে আরেকটা প্রশ্ন করে আনোয়ার, করমালি জবাব দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

'জালাল মাস্টার সাহেবের খবর কি?'

'মাস্টার সায়েব ভাষণ দিয়া বেড়ায়। বৈরাগীর ভিটাত সপ্তায় সপ্তায় সভা হয়, জালাল মাস্টার আরম্ভ করলে আর কেউ ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পায় না।' শুনে আনোয়ার হাসে। লোকটা কথা বলার চান্স পেলে থামতে চায় না। আজকাল সব বক্তৃতা আবার মাইকে হয়, জালাল মাস্টারকে আটকায় কে?

'বৈরাগীর ভিটায় আজকাল খুব মিটিং হয়, না?'

প্রায়ই। আফসার গাজী এদিক ওদিক বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। মার্শাল ল হওয়ার পর প্রথম দিকে চুপচাপ ছিলো, এখন ফের নতুন করে দ্বিগুণ বেগে শুরু হয়েছে।

'আফসার গাজী বৈরাগীর ভিটায় আসে? মিটিং করে?'

'হ্যাঁ, বৈরাগীর ভিটা তো ধরতে গেলে তারই দখলে। তারই সভাত মাস্টার সায়েব লেকচার দেয়। আপনে পেপার পড়েন না? ঢাকার পেপারেও হামাগোরে ওটিকার সভার কথা ল্যাখে!'

থাক, এসব অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ এখন বরং থাক। এখন করমালির পায়ের চিকিৎসাই প্রধান মনোযোগ লাভের যোগ্য।

'করমালি, তোমাকে বোধহয় কিছুদিন থাকতে হবে। পায়ের যা অবস্থা মনে হয় সেরে উঠতে তোমার টাইম লাগবে।'

'পাও হামার এমনি ভালো হয়া যাবো ভাইজান! আগের চায়া কতো ভালো!'

তবে করমালি ঢাকায় এসেছে কেন? কিন্তু জিগ্যেস করতে আনোয়ারের বাধোবাধো ঠেকে।

'আপনার সাথে কথা আছে। আপনাক যাওয়া নাগবো।'

'কোথায়?'

'হামাগোরে ওটি। সোগলি আপনাক যাবার কছে?'

'কেন?'

করমালি এবার গ্রামের খবর জানায়। আফসার গাজী থানা পর্যায়ে বড়ো নেতা হতে চলেছে। মিটিঙে মিটিঙে তার চাচা খয়রার গাজীর নামে যা-তা বলে বেড়ায়, ওর চাচা হলো আইয়ুব খানের দালাল, বাঙালির শত্রু। দালাল চাচার আধপোড়া বাড়ি ঘর দখল করার জন্যে আফসার হন্যে হয়ে উঠেছে। এদিকে এইসব কথা বলে, আবার বৈরাগীর ভিটায় গণ-আদালত বসিয়ে যারা এদের বিচার দাবী করেছিলো নানাভাবে তাদের সর্বনাশ করার চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে সদাসর্বদা এক দঙ্গল কলেজের ছাত্র, তাদের খাওয়া দাওয়া সব তার বাড়িতে। গ্রামের লোক ভয়ে কাতর, এখন আনোয়ার গিয়ে যদি কিছু করতে পারে। 'আপনে যদি গাঁয়ের মানষের সাথে এ্যানো কথাবার্তা কন, সাথে সাথে থাকেন তো আফসার গাজী এতো সাহস পায় না। গরিব গরবা চাষাভূষা মানুষ, মুরুখ্যু মানুষ, বুঝলেন না? আপনে থাকলে হামরা হিরদয়ে বল পাই ভাইজান!'

'আলিবক্স কোথায়?'

'তাঁই তো হাজত খাটে। জেলই বুঝি হলো!'

'জেলে? কেন?'

'বগুড়া থ্যাকা মিলিটারি অ্যাসা তাস ধর্যা নিয়া গেছে। মানুষ খুন করার মামলা দিছে। হোসেন আলি ফকিরকে মারা হলো না? হামার নামেও মামলা দিছে। হামি পলায়া বেড়াই। এখন আর ভয় করি না ভাইজান!'

খুনের মামলার পলাতক আসামী তার ঘরে! আনোয়ারের সমস্ত শরীর দুলে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বাইরের যাবতীয় দৃশ্য, ধ্বনি ও গন্ধ উত্তপ্ত হয়ে ভাপ ছাড়ে: নাঃ, গ্রামে যাওয়াটা এখন অবশ্য কর্তব্য। এখানে থেকে তার লাভ কি? এইসব একঘেয়ে কালো পিচঢালা এবং এবড়োখেবড়ো খোয়া-ওঠা রাস্তা ও গলি, এইসব কালো থিকথিক-করা ড্রেন, ময়লা উপচে-পড়া ডাস্টবিন, রাস্তার ২পাশে উঁচু উঁচু দালান, এইসব ট্র্যাফিকজাম, রিকশা যেতে যেতে ট্রাকের গুঁতো খাওয়ার অবিরাম ভয়, তাদের বাড়ির মোটা মোটা দেওয়ালের ভেতর আম্মার অসুখী অসন্তুষ্ট ও লোভী চেহারা, এইসব পথে ঘাটে রেস্টুরেন্টে বাখোয়াজি, ওসমানের উৎপাত,—নাঃ, আর কতো? গ্রামে আফসার গাজী কি করতে পারে যদি আনোয়ার একবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়? আলিবক্সকে ধরে নিয়ে গেছে।—তার কর্মীরা আছে, তাদের নিয়ে আনোয়ার কি রুখে দাঁড়াতে পারে না? পারবে না কেন?

'যাবো! তোমার সঙ্গেই যাবো।'

'যাবেন?' করমালির চাষাড়ে গলা আবেগে আটকে আসে, 'যাবেন ভাইজান? হামি গাঁওত খুব বড়ো গলা কর্যা কয়া আসছি, আনোয়ার ভাইজান আসবো। কালই না হয় মেলা করি!'

যাত্রার দিন ধার্য করতে আনোয়ার ইতস্তত করে, 'না কাল নয়। তোমার চিকিৎসা চলুক। পা একটু সেরে না উঠলে কাজ করবে কি করে? আমারও একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার।'

আলতাফের বড়োভাই মেডিক্যাল কলেজের এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। আলতাফকে দিয়ে ধরা হলো তাকে। মেডিক্যাল কলেজের আউটডোর কয়েকদিন চিকিৎসার পর করমালির পায়ের ঘা গোলাপি থেকে খয়েরি হয়, তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে। এর মধ্যে আনোয়ারকে গ্রামে ফেরার জন্য তাগাদা দিতে শুরু করেছে। এতো তাড়াহুড়া করার আছেটা কি? গ্রামের চাষাভূষাদের এই ঘরমুখে স্বভাব আনোয়ার সহ্য করতে পারে না। এতো তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়ে তারা করবেটা কি? বৈশাখ পড়লো, করমালির বাড়িতে এখন খাবার কোথায়? অথচ দ্যাখো, রাতদিন বাড়ি বাড়ি করে অস্থির। এদিকে দিনকে দিন ওসমানের অসুখ বেড়েই যাচ্ছে। ডাক্তার ভরসা দিয়েছিলো, গরম পড়তে শুরু করলে একটু কমবে। কোথায়? ওসমান একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আনোয়ারকে অপেক্ষা করতেই হয়। করমালিকে একটা চাকরির সংস্থান করে দিতে পারলে সবদিক থেকে ভালো হতো। আনোয়ার অনেককে বলেও রেখেছে, বড়োভাইয়ের কোন বন্ধুর অফিসে একটা কাজ জুটে যেতে পারে। এই চাকরি পেলে ওর যাই—যাই ভাবটা কাটে। চাকরি না করে ওর উপায় কি? এই খোঁড়া পা দেখে ওকে জমি বর্গা দেবে কে? আবার ওসমানের ঘরে রাত্রে আজকাল করমালিই থাকে, ও থাকলে আনোয়ার বেশ নিশ্চিত। চাকরি পেলেও ও ওসমানের ঘরেই শোবে। আবার চাকরি পেলে খাওয়া দাওয়ার জন্য আনোয়ারের ওপরে নির্ভর করতে হবে না, এই গোঁয়ার গোবিন্দ মার্কা চাষা ছেলের অস্বস্তিটা তাহলে কাটে। আনোয়ার এসব বোঝে। সবচেয়ে বড় কথা, কয়েকদিন এখানে রেখে ওকে বেশ তৈরি করে নেওয়া যায়। শুধু সাহস থাকলে হয় না, সংগঠিত হতে হয়, রাজনীতি ভালো করে রপ্ত করা দরকার। একে দিয়ে তো ভোটের রাজনীতি করানো হচ্ছে না যে খালি হৈ হৈ করে বেড়ালেই চলবে। একে গড়ে তুলতে হবে, চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। আলিবক্সের সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু আলিবক্স এদের সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক চরিত্র অর্পণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। কিংবা আলিবক্স হয়তো চেষ্টাও করেনি। আনোয়ার করবে। করমালিকে ঢাকায় রেখে যদি সে যথার্থ রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে তাকে মানুষ করতে পারে তো একটা কাজের মতো কাজ হয়।

৪৮

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মকবুল হোসেনের ঘরের সামনে আনোয়ার ১টি জটলা দেখতে পায়। ভেতরে মকবুল হোসেনের স্ত্রীর একটানা কান্না। আবু তালেবের মৃত্যুর পর থেকে মহিলার কান্না অবশ্য প্রায়ই শোনা যায়, কিন্তু এরকম হাউমাউ কান্না অনেকদিনের জন্য স্থগিত ছিলো। রোগা ১টি লোক দরজায় দাঁড়িয়ে অনুপস্থিত কাউকে লক্ষ করে গালগালি করছে। এই লোকটা হলো মকবুল হোসেনের বোবা মেয়ের স্বামী, আনোয়ার একে চেনে না। আলাউদ্দিন মিয়াও আছে, আনোয়ারকে দেখে তার মেহেদি-রাঙানো আঙুলগুলো নাচাতে নাচাতে এগিয়ে আসে, 'আপনে আসছেন? দোস্তোরে রাইখা কই কই বিপ্লব কইরা বেড়ান? আপনের দোস্তো আমার বাড়ির ছাদে মানুষ খুন করে!'

'কি? কি হয়েছে?'

'আপনার দোস্তো মকবুল সাবের পোলার খুন করার এ্যাটেম্পট লইছিলো।'

'এ্যা? কাকে? কে খুন করলো?'

'রঞ্জুরে খুন করতে গেছিলো আপনাগো পাগলাটা! আপনারে কইয়া দিলাম, আপনে তো উনার গার্জিয়ান, আপনে ঘর দ্যাখেন। পাগল ছাগলরে বাড়িতে রাখতে পারুম না। আমার আর ভাড়াইটাগো সিকিউরিটির রেসপনসিবিলিটি তো আমার ঘাড়েই। আপনে ঘর দ্যাখেন!'

'আরে, হলোট কি বলবেন তো!'

'নিজেই গিয়া দ্যাখেন। আপনের দোস্তের ঘরে আরো মানুষ আছে। খালি আমার বাড়ি, নাইলে এতোক্ষণ দারোগা পুলিস মিলিটারি আইয়া পাগলা খুনীটারে আর আমান রাখতো না!'

'শোনেন, পাগলা হোক আর যাই হোক, আমার দোস্তো ভাড়া দিয়ে থাকে। বললেন আর ভাড়াটে উঠে গেলো, অতো সহজ নয়!'

আলাউদ্দিন মিয়া রাগে ও অপমানে এবং এর চেয়ে ও বেশি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। সামলে নিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'আরে যান যান! ইচ্ছা করলে অক্ষণ, এই মুহূর্তে উঠাইয়া দিবার পারি। ছাদের উপরে থাকবার দিছি, মানুষ খুন করবার চায়, তার হইয়া লেকচার দিবার লাগছে! ঐগুলি লেকচার আপনাগো পার্টির মইদ্যে কইরেন। আমার বাড়িতে খাড়াইয়া আমারে বেইজ্জত করে!' আলাউদ্দিন মিয়া উত্তেজনা ও রাগে রীতিমতো কাঁপে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাঁপে, এর মধ্যে আনোয়ার উঠে যায় ওসমানের ঘরে।

ঘরে করমালি, পারভেজ, দোতলার ১ভাড়াটে এবং জুম্মন। চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে ওসমান। জুম্মন ছাড়া বাকি ৩ জন একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে আনোয়ার শাসনের ভঙ্গিতে বলে 'একজন! একজন কথা বলেন।' পারভেজ তখন জানায় যে সকালে মকবুল হোসেন এসেছিলো ওসমানের কাছে বিদায় নিতে, সঙ্গে ছিলো পারভেজ।—বিদায়? বিদায় নেবে কেন?—মকবুল হোসেন তো এই বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, ভোরবেলা বেড়িয়েছিলো, চেনাজানা সবাইকে বলতে গিয়েছিলো, তা পারভেজের ওখানে গেলে সে আবার অন্য সব প্রতিবেশীদের বাড়ি যাবার সময় মকবুল হোসেনকে সঙ্গ দেয়। মকবুল সাহেব এখানে কতোদিন থাকলো, বেচারার বড়ো ছেলেটা মারা গেলো এখানে থাকতেই। আহা! তালেব কি ভালো ছেলেই ছিলো!

'হ্যাঁ, তা হলোটা কি?' আনোয়ারের অধৈর্য দেখে দোতলার ভাড়াটে কথকের ভূমিকা নেওয়ার উদ্যোগ নেয়, 'মকবুল সায়েবের ছোটো ছেলেটারে ওসমান সায়েব গলা টিপ্যা ধরছিলো। এক্কেরে তুইলা না ধইরা—।'

কিন্তু দোতলার এই ভাড়াটের ওপর ওসমান বিরক্ত, তাই পারভেজকেই জিগ্যেস করে, 'রঞ্জুকে ওসমান মারবে কেন?'

পারভেজ এবার তার কাহিনী বর্ণনার নিজস্ব ভঙ্গি অনুসরণ করে। মকবুল হোসেনের সঙ্গে তার ছেলেও ওসমানের ঘরে এসেছিলো। ওসমান ছিলো একা, করমালি গিয়েছিলো নিচে ওসমানের জন্য নাশতা কিনতে। ওসমানের তখন কথাবার্তা প্রায় স্বাভাবিক। মকবুল হোসেনকে বসবার জন্য সে চেয়ার এগিয়ে দেয়। তবে মকবুল হোসেনের এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত শুনে সে অবাক। মকবুল হোসেন তখন বাড়ি ছাড়ার কারণ জানায়। বিয়ে করে এই বাড়ির মালিক হয়েছে আলাউদ্দিন মিয়া। শ্বশুর তার পক্ষাঘাতে পড়ে আছে বলে যাবতীয় কাজকর্ম ও সম্পত্তি দ্যাখাশোনার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপরেই। লোকটা সংস্কারপন্থী, পুরনো ব্যবস্থা সে কিছু কিছু পাল্টাতে চায়। বাড়িভাড়ার ব্যাপারেও তাই। ভাড়া বাড়িয়েছে দেড়গুণ। এমন কি মকবুল হোসেন নিজেও এই ভাড়াবৃদ্ধি অনুমোদন করে। মার্শাল ল হওয়ায় খাজনা-ট্যাক্সের ব্যাপারে খুব খুব কড়াকড়ি চলছে, কোথাও ফাঁকি দেওয়ার জো নাই।

'আরে ভাই, ভাড়া বাড়াচ্ছে এ তো আমিও জানি! কয়েকদিন আগে ওসমানের ভাড়া দিলাম, এর ভাড়া তো ডবল করে দিয়েছে। আপনি আসল ব্যাপারটা বলেন না!'

আনোয়ারের ধৈর্যচ্যুতিতে পারভেজ বিব্রত হয়ে একটু সংক্ষেপ করার চেষ্টা করে। তবে সংক্ষিপ্ত হওয়া তার স্বভাবের বাইরে। সুতরাং তাকে জানাতে হয় যে কিছুক্ষণের মধ্যে ওসমান অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, মকবুল হোসেনের কথায় সে আদৌ কান দিচ্ছিলো কি-না সন্দেহ। সে তাকিয়েছিলো ছাদের দিকে। ছাদের রেলিঙে ভর দিয়ে রঞ্জু তখন পাড়াটাকে ভালো করে দেখে নিচ্ছে। রঞ্জুকে দেখতে দেখতে ওসমান বিড়বিড় করে,' 'আরে খিজির, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি আসছি। আমি নিজেই পারবো, তুমি যাও না! দ্যাখো না আমি একাই পারবো।' তো পারভেজ ওর স্বগতোক্তিকে আমল দেয় না, জীন পরি ভর করলে মানুষ কতো কি বলে, ওসমান তো বেশ কিছুদিন থেকে শূন্যের ভেতর কাকে যেন দেখতে পায়, এ আর নতুন কি হলো? 'আরে খিজির রাখো রাখো, মেরো না। ওটাকে আমার ওপর ছেড়ে দাও!' বলতে বলতে ওসমান ছাদে চলে যায়। করমালি ততোক্ষণে কাঁঠালপাতার ঠোঙা হাতে ফিরে এসেছে। ওর পেছনে পেছনে ঘরে ঢোকে জুম্মন। ওসমানের নাশতা দেবে বলে করমালি টেবিলে প্লেট রাখছে, পারভেজ জুম্মনকে বলছে, 'কি রে ব্যাটা, তোর খবর কি?' পারভেজের অনুরোধে মকবুল হোসেন ১টা কাগজে তার নতুন ঠিকানা লিখছে, এমন সময় ছাদ থেকে ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ আসে। কি হলো? না, রঞ্জুকে জাপটে ধরে ওসমান তার মুখে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে। ওসমান চিৎকার করে বলছিলো, 'রঞ্জু, এই শেষবার! ফাইন্যাল! বিদায়?' পারভেজ ও করমালি ছুটে যেতে সে রঞ্জুর ঠোঁট কামড়ে একটুখানি মাংস ছিঁড়ে নেয় এবং থু করে তাই ছুঁড়ে ফেলে রঞ্জুর মাথায়। তারপর রঞ্জুকে পাঁজাকোলা করে তুলে তাকে রেলিং ডিঙিয়ে নিচে ফেলে দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু রেলিং সেখানটায় উঁচু, বাঁদিকে নিতে পারলে ছুঁড়ে ফেলাটা সহজ হয় বলে রঞ্জুকে সে হিঁচড়ে টেনে নিচ্ছিলো বাঁদিকেই।

পারভেজ ও করমালি দৌড়ে গিয়ে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। দোতলার ভাড়াটেও তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে, মোটা লোকটা ওসমানরে বাঁ পায়ের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে চিলেকোঠার দরজায়।

এদিকে ওসমান ততোক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে ঐ উঁচু রেলিং পার করে রঞ্জুকে নিচে ফেলা অসম্ভব এবং করমালি ও পারভেজ রঞ্জুকে কিছুতেই বাঁদিকে টেনে নিতে দেবে না। তখন ওসমান করলো কি রঞ্জুর মাথাটা ঠুকতেই লাগলো রেলিঙের সঙ্গে। ২হাত দিয়ে রঞ্জুর মাথা জড়িয়ে ধরে ওসমান ঠকাস ঠকাস করে ঠোকে আর বলে, 'আর তোমার রক্ষা নেই। খিজিরের কাছে আমি প্রমিজবাউণ্ড, আমি ওকে কথা দিয়েছি! আজ সব চুকিয়ে দেবো।' রঞ্জুর মাথার পেছনদিক থেকে রক্ত পড়তে থাকে, পারভেজ ও করমালি সীমাহীন শক্তি প্রয়োগ করে ওসমানকে সরিয়ে দেয়। রঞ্জুর অজ্ঞান শরীর ধপাস করে পড়ে গেল ছাদের ওপর এবং তাই দেখে মকবুল হোসেনের অবস্থা হয় অধিক-শোকে-পাথর গোছের। ওসমান সেই সময় আকাশের দিকে চিৎকার করে ওঠে, 'ফিনিশ করে দিলাম। খিজির, দেখলে তো? এবার চলো!'

পারভেজ কিংবা করমালি কেউই এইসব কথার মানে বুঝতে পারেনি। আনোয়ার কি বলতে পারে?

কিন্তু আনোয়ারের উদ্বেগ এখন অন্য ব্যাপারে, 'রঞ্জুর অবস্থা এখন কেমন?'

'বেটার। খবর পেয়ে আলাউদ্দিন সায়েব এলেন। উনি আবার লোক পাঠিয়ে ডক্টর নিয়ে এলেন। ডক্টর শুনে পাঠিয়ে দিলো মিটফোর্ড। মাথায় চোট লেগেছে তো, হসপিটালে দু'চারদিন থাকতে হতে পারে।'

আনোয়ার এবার দ্যাখে ওসমানকে, 'এরও তো কপালে রক্ত, ঠোঁটেও রক্ত।' আলাউদ্দিন মিয়া এসে রাগের মাথায় মুখে একটা ঘুষি দিয়েছিলো, আবার রঞ্জুর বড়ো বোনের হাজব্যান্ড এসেছিলো, ওসমানের কপালে সে-ও একটা ব্লো লাগায়। তবে মনে হয় খুব চোট পায়নি।'

আনোয়ার একটু রাগ করে, 'এ বেচারা অসুস্থ লোক, একে এভাবে মারে? আপনারা কিছু বললেন না?'

'না, না, আলাউদ্দিন সাহেবের ওপর আপনে খালি খালি রাগ করছেন। রঞ্জু খুন হয়েছে বলে রিউমার রটে যাওয়ায় রাস্তায় মেলা লোকের ভিড় জমে গিয়েছিলো। উনি খবর পেলেন তো এসে সবাইকে হটিয়ে দিলেন। রঞ্জুর দুলাভাই খুব হৈ চৈ করছিলো কে পুলিসে খবর দেবে, মিলিটারি নিয়ে আসবে! উনি তো সব সামলাবেন। উনার কথা হলো কে, আমার ভাড়াটে, যা করার আমি করবো!'

'উনি কি ভাড়াটেদের প্রজা ভাবেন না কি?'

আনোয়ারের রাগ দেখে পারভেজ অবাক হয়, 'উনারে বেবি ট্যাকসি নিয়ে আমি আর মকবুল হোসেন সাহেব আর রঞ্জুর দুলাভাই মিটফোর্ড গেলাম। আবার ঐ ট্যাকসিতে রিটার্ন করলাম। আলাউদ্দিন সাহেব—।'

আলাউদ্দিন মিয়ার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে আনোয়ার প্রসঙ্গ পাল্টায়, 'তো ওসমান ঘুমিয়ে পড়লো কখন? ইঞ্জেকশন দিয়েছিলো কে, করমালি।'

'ঐ চ্যাংড়াক এই ঘর থ্যাকা সরাবার সাথে সাথে ওসমান ভাইজান বিছনাত শুইয়া পড়লো।' করমালি বলে, 'আজব কথা ভাইজান! এতো হৈ চৈ, তাক নিয়ে এতো টানা হ্যাঁচড়া, তার কপালত অক্ত, ঠোঁটেত অক্ত, শুইয়া তাঁই হাসে।'

'হাসলো?'

'হ্যাঁ! হা হা কর্‌য়া খুব হাসলো, হামি কি করমু দিশা পাই না, দেখি, হাসতে হাসতে ঘুমাইয়া পড়লো। এক ঘড়ির মধ্যে তার নাক ডাকা আরম্ভ হলো!'

'কোনোরকম গোলমাল করেনি? তোমাকে মারধোর করার চেষ্টা করেছিলো?'

'না ভাইজান! হাসতে হাসতে কিবা কথা কলো—।'

'কি বললো?'

'কথা কিছু বোঝা যায় না।'

ওসমানের পাশে বসে আনোয়ার শিউরে উঠলো। রঞ্জুকে ওসমান যদি সত্যি সত্যি মেরে ফেলতো! রঞ্জুর ওপর ওর এতো রাগ কেন? ডাক্তারের সঙ্গে পরবর্তী এ্যাপয়েন্টমেন্ট বোধহয় পরশু। আনোয়ার ডাক্তারকে এই ঘটনাটা কিভাবে বলবে?

করমালি বলে, 'নিন্দ পাড়ুক। আহারে, মানুষটা কতোদিন দুই চোখের পাতা এক করবার পারে নাই!'

বিকাল ৫টায় মকবুল হোসেন এই বাড়ি ছেড়ে, এই পাড়া ছেড়ে সপরিবারে রওয়ানা হলো জিন্দাবাহার সেকেন্ড লেনের দিকে। আলাউদ্দিন মিয়াকে এখানে অনেকেই খুব ধরেছিলো, বেচারাদের আর কটা দিন সময় দেওয়া হোক। কিন্তু ৪টের আগেই নতুন ভাড়াটের মালপত্র এসে গেছে। সব ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা হাঁ করে তাদের আসবাবপত্র দ্যাখে। এতো সব চেয়ার টেবিল খাট আলমারির মালিক এখানে বাস করতে এলো কোন দুঃখে? একটু ভালো এলাকায় বাড়িভাড়া নিশ্চয়ই আরো বেড়েছে, নবাগত লোকটিকে তাই হয়তো একটু নিচে নামতে হলো। ১বছরের মধ্যে আলাউদ্দিন মিয়া যদি আরেক প্রস্থ বাড়ায়?—এই ভয়কে এড়াবার জন্য সবাই নতুন ভাড়াটের ছেলেমেয়েদের চেহারা ও তাদের কথাবার্তার খুঁত ধরতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে মকবুল হোসেনকে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করলেও আলাউদ্দিন মিয়া তাদের নানাভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যেমন, মিটফোর্ড হাসপাতালে তার দাপট খাটিয়ে রঞ্জুর দ্রুত নিরাময়ের ব্যবস্থা করবে। দরকার হলে তার দলের কয়েকজন কর্মী পাঠিয়ে ডাক্তার নার্সদের তটস্থ করে রাখবে।

লটবহর নিয়ে ঠেলাগাড়ির সঙ্গে গেলো মকবুল হোসেন। ১টি রিকশায় রানু ও রানুর মা। আনোয়ার ছাদের রেলিঙে ঝুঁকে তাদের দেখলো। চোখ মুছতে মুছতে রানুর মা বারবার ওপর দিকে তাকাচ্ছিলো। রানুও তাকিয়েছিলো ১বার। দিন বড়ো হচ্ছে, বিকাল ৫টাতেও রানুর চুলে রোদ পড়েছে, কিন্তু তার মুখের ওপর বিকালবেলার ছায়া। রানুর মুখ ঝাপশা। আনোয়ার স্পষ্ট করে মেয়েটিকে দেখতে পারলো না।

ঘরের ভেতর এসে দ্যাখে করমালি কেতলি করে চা নিয়ে এসেছে। বিছানায় উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছে ওসমান, তার মুখ বালিশে গোঁজা। তার গেঞ্জিতে পিঠের বাঁদিক ঘেঁষে একটা ফুটো। আনোয়ারের মাথা দুলে ওঠেঃ রঞ্জুর দুলাভাই বা আলাউদ্দিন মিয়া যদি ওসমানের পিঠের এই জায়গাটায় একটা ড্যাগার বসিয়ে দিতো! রাগের মাথায় লোকে কি না করতে পারে? হঠাৎ মনে হয় শালা ঘুম যেন ড্যাগার হয়ে গাঁথা রয়েছে ওসমানের পিঠে, এই ঘুম থেকে তার আর পরিত্রাণ নাই।

৪৯

রাত্রে খাওয়াবে বলে ওসমানকে জাগাবার চেষ্টা করে ওরা হাল ছেড়ে দিলো। আনোয়ার ভয় পায়, ওসমান ঘুমের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেলো না তো?

করমালি অবশ্য ঘাবড়ায় না, 'খিদা পালে নিজেই চেতন পাবো। ভাত তো টেবিলের উপর থাকলোই, তাঁই চেতন পালে ভাত খাওয়াইয়া ওষুদপাতি দিয়া হামি শুতমু। আপনে যান ভাইজান কতোক্ষণ বস্যা থাকবেন?' কয়েকদিন থেকে রাত্রে অবশ্য করমালিই থাকে। কিন্তু আজ ওসমানের কপাল ব্যান্ডেজ, ঠোঁট ফুলে ঢোল। যে কাণ্ডটা করলো আজ, এরপর শুধু করমালির ভরসায় কি আনোয়ার বাড়ি যেতে পারে?

'আপনে যান!' করমালি ফের ভরসা দেয়, 'আত হলো। মনে হয় তামান আত তাই নিন্দ পাড়বো।'

'সারা রাত ঘুমাবে? তুমি বুঝলে কি করে?'

আনোয়ারের ছেলেমানুষি প্রশ্নে করমালি পরিণত চোখ করে হাসে। এই হাসিতে ভরসা আছে, প্রশ্রয়ও আছে।—আনোয়ার তার ওপর ওসমানের দায়িত্ব দিয়ে দিব্যি বাড়ি যেতে পারে। আনোয়ারের খুব ঘুম পাচ্ছে, শরীর দারুণ ক্লান্ত। করমালিটা ভাগ্যিস এসেছিলো! ও না থাকলে ওসমান তাকে লাশ নিয়ে বসে থাকার দশা করে ছাড়তো। করমালির ওপর কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে আনোয়ার তার চাকরির খবর দেয়। ভাইয়া গতকাল তাকে জানিয়েছে—ভাইয়ার বন্ধুর অফিসে চাকরি, আনোয়ার চাইছিলো একেবারে চূড়ান্ত নিয়োগ-পত্র নিয়ে করমালিকে জানাবে। কিন্তু উপচে-ওঠা কৃতজ্ঞতাবোধ সামলাতে না পেরে এখনি বলে ফেললো। করমালি পরশু কাজে যোগ দিতে পারবে। পরশু তো রবিবার, তাহলে তার পরদিন। কাজ এমন কিছু নয়। কেরানীদের ঘর থেকে সায়েবের ঘরে কাগজপত্র, ফাইল নিয়ে আসাযাওয়া করা। মতিঝিলের সেই অফিসে ঘর মোটে আড়াইটে, সুতরাং আসা-যাওয়ার পরিধিও কম। মাঝে মাঝে চা তৈরি করতে হবে। চা তৈরি করা শিখতে করমালির কতোক্ষণ আর লাগবে? একটু লেখাপড়া জানা থাকলে ভালো হতো। করমালি নাম দস্তখত করতে পারে না?—তাতে আপাতত কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, পরে আনোয়ার তাকে খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে। একবার কাজ শিখতে পারলে এ অফিস থেকে ও অফিস যাও, বেতন বাড়িয়ে নাও! মতিঝিলে সায়েব সুবো থেকে শুরু করে পিওন চাপরাশি পর্যন্ত এই নিয়মে চলে। ওখানে লোকে চাকরি নেয় মালপানি কামাবার উদ্দেশ্যে। যতো পারো, যেভাবে পারো, টাকা বানাও! করমালিও কিছুদিন পর বেশি বেতনে অন্য অফিসে যেতে পারবে। চাকরিই ওর জন্য ভালো। এই পা নিয়ে চাষবাসের কাজ করবে সে কি করে? আর ওকে জমি বর্গাই বা দেবে কে? আর এখন গ্রামে দেখলেই আফসার গাজীর লোক ওকে নির্ঘাত পুলিসে ধরিয়ে দেবে।

করমালি চুপচাপ শোনে আর উসখুস করে। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলে, 'কিন্তু ভাইজান, হামার তো বাড়িত যাওয়া নাগে!'

'বাড়ি? গ্রামে যাবে? কবে?'

'দুই চারদিনের মদ্যে গেলে ভালো হয়। অনেকদিন হয় বাড়িছাড়া—।'

'যাও। কাজে জয়েন করে সপ্তাহখানেক পর তিনচারদিনের ছুটি নিয়ে ঘুরে এসো। অফিসে বলো যে বাড়িতে সবাইকে বলে আসা হয়নি, বিছানাপত্র আনতে হবে।'

'বিছানা?'

'আচ্ছা, বিছানা না হয় আমি ব্যবস্থা করবো। এই ঘরেই থাকবে। মেঝেতে অসুবিধা হবে?'

'না ভাইজান, দালানের মদ্যে মেঝেও যা, চৌকিও তাই। কথা সেটা নয়। বাড়িতে গেলে হামি তো আর আসবার পারমু না!'

'মানে? তোমার চাকরি ঠিক করলাম যে!'

'ঢাকাত বস্যা চাকরি করলে হামাগোরে পোষাবো, কন?'

'বাড়ির জন্য মন খারাপ করে?' আনোয়ারের রাগ হয়, বাড়ির জন্যে এরকম স্যাঁতসেঁতে টান হলো এদের প্রধান রোগ, এই পিছুটান থাকলে এদের দিয়ে কি হবে?

'ফাঁপরের কথা কন? ফাঁপর তো এ্যানা নাগেই। তাই বল্যা ফাঁপরে অস্থির হলে হামাগোরে চলে? ধান কাটার সময় খিয়ার অঞ্চলে গেলে কয়টা মাস কোটে কোটে থাকি, তখন কি বাড়িঘরের উদ্দিশ থাকে?'

'তাহলে? তাহলে বাড়ি যাবে কেন?'

'গাঁওত যাওয়া নাগবো না ভাইজান? গাঁওত বলে ওদিক কেয়ামত হবা নাগছে গো! গাজীগোরে শরীলেত এ্যানা বাড়ি পড়ছে, বুঝলেন না? আবার শুনি ভোট নাকি হবো? সরকার পাট্টিও তারা, আবার অন্য পাট্টিও তারাই। ভোট হলে তামাম গাঁও খালি খচ্যা বেড়াবো। বৈরাগীর ভিটার বটগাছের ডাল ভাঙা হছে, পুরানা বাসিন্দা এখন তামাম গাঁওদের মদ্যে খালি নাফ পড়বা নাগছে!'

'তো তুমি এখন গিয়ে কি করবে? তোমাকে তো পুলিস ধরবে। বুঝতে পাচ্ছে না কেন?'

'আরো মেলা মানষের নামে তো মামলা করছে! সোগলির সাথে থাকলে বল পাওয়া যায়। ধরেন, হামরা চাষাভুষা মানুষ, একলা এই দালানের মদ্যে বস্যা থাকলে ক্যামকা ঠেকে! গাঁয়ের মদ্যে অরা কেয়ামত করে, বুড়া বাপটাকে ম্যারাই ফালালো নাকি?'

আনোয়ার চুপচাপ ওসমানের উপুড়–হওয়া ঘুমন্ত শরীরের ওঠানামা দ্যাখে। করমালি আস্তে আস্তে বলে,'ভাইজান, কোন্দ করলেন?'

ক্রুদ্ধ না হলেও বিরক্ত তো হয়েছেই। ভাইয়াকে এতো করে বলে এর চাকরির ব্যবস্থা করে দিলো, লোকটা পাত্তাই দিলো না। ছোটো অপমানবোধটা সে চেপে রাখতে পারলো না, 'না, রাগ করবো কেন? কয়েকটা মাস পরে আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম। গ্রামে তো আমারও কাজ আছে করমালি!'

করমালি ওসমানের মশারি টাঙায়। ঘরে মশা গুনগুন করছে, রাস্তায় রিকশার টুংটাং আওয়াজের স্পষ্টতায় রাত বাড়ে। করমালি বলে, 'এই ভাইজান ভালো না হলে আপনে যান কেমন কর‍্যা?'

আনোয়ার উঠে দাঁড়ায়, ১২টা থেকে কারফ্যু। এখন রওয়ানা হলে কারফ্যুর আগে আগে ওয়ারি পৌঁছতে পারবে।

'ঠিক আছে। তুমি যাও। কালকেই যেতে পারো। ওসমান সেরে উঠলে কিংবা হাসপাতালে ওর একটা ব্যবস্থা করে কয়েক মাস পার আমিও যাবো।'

দরজা টরজা ঠিতমতো বন্ধ করা এবং ওসমান জেগে উঠলে তাকে পথ্য ও ওষুধ দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আনোয়ার বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে ফের

করমালির দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, 'ইচ্ছা হলো আর এই অসুস্থ লোকটাকে ফেলে রেখে চলে গেলাম, তা তো হয় না করমালি। হুট করে চলে গেলে কোনো কাজ হয়?'

'না ভাইজান।' করমালি আনোয়ারের সঙ্গে একমত, হুট করা নিজের মানুষ ত্যাগ করা্য আপনে যাবেন ক্যামন কর্যা? দ্যাখেন না, গাঁ ছ্যাড়া এটি থাকতে হামার কেমন উটকা উটকা ঠেকে!'

পরদিন ওসমানের ঘুম ভাঙে সকাল ৮টা দিকে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে করমালি মেঝেতে গড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। রাত্রে মাঝে মাঝে তার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিলো, চমকে চমকে উঠে দেখছিলো ওসমানের দিকে। না, মিহি সুরে নাক ডাকছিলো ওসমানের। খুব ভোরে উঠে ছাদে মুখ ধুয়ে করমালি ফের বসেছিলো মেঝেতে। ওসমানের জাগরণের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে থাকতে তার ভয় হচ্ছিলো, মানুষটার সঙ্গে দ্যাখা না করেই তাকে বাড়ির দিকে রওয়ানা হতে না হয়! করমালি অবশ্য ইচ্ছা করলে আরো কয়েকটা দিন থেকে যেতে পারে। কিন্তু তাহলে এখানে চাকরি নেওয়ার জন্য আনোয়ার নতুন করে চাপ দেওয়ার সুযোগ পায়। এখন করমালি কি তাই পারে? বৈরাগীর ভিটার বাস্তুচ্যুত জীন গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সব তছনছ করে দিচ্ছে, এই সময় দালানের ভেতর সে বসে থাকে কোন আক্কেলে? আনোয়ারের কথা সে রাখে কিভাবে? আনোয়ার ভাইজান মানুষ খুব ভালো। মিয়ারা বলো, গাজীর বলো,—ভদ্রলোকদের মধ্যে এরকম মানুষ মেলে না গো! দ্যাখো না, কাল রাত্রে করমালি চলে যাবে শুনে কতো রাগ করলো, আবার বেরিয়ে রাস্তা থেকে ফের মশা তাড়াবার কয়েল এন জ্বালিয়ে দিয়ে গেলো, 'ওসমানের মশারি টাঙিয়ে দিলে, মশা তো তোমাকে একলা পেয়ে সব রক্ত খেয়ে ফেলবে।'—না বাপু, এরকম ভালোমানুষ পাওয়া যায় না। বন্ধুর রোগ নিয়ে তার মাথা এখন গরম, করমালির ছটফটানি সে বুঝবে কিভাবে?—সকালবেলা মেঝেতে বসে এইসব ভাবতে ভাবতে করমালির চোখ জড়িয়ে আসছিলো। কি, চেংটুর সঙ্গে সে হেঁটে চলেছে কোন নতুন চরের ভেতর দিয়ে। শীতকালের সর-পড়া যমুনায় বুদবুদ উঠছে। চেংটু বলছে, 'একটা খাপি জাল হলে পাঙাস ধরা গেলোনি রে!' যমুনার ভেতর থেকে বড়ো পাঙাস ঘাই মারে। ঘাই মারার শব্দে তন্দ্রা ছিঁড়ে গেলে করমালি দ্যাখে, ওসমান খুব শব্দ করে হাই তুলছে।

'চেতন পালেন, ভাইজন? খুব নিন্দ পাড়ছেন গো! ওঠেন, মুখ ধুয়া নাশতা করেন।'

জড়ানো গলায় ও ঘুমি-খাওয়া-ফোলা ঠোঁটে ওসমান কি বলে করমালি বুঝতে পারে না। 'কি কন, ভাইজান? খিদা নাগছে?'

আনোয়ার ঢুকে বলে, 'হ্যালো ওসমান! ঘুম ভাঙলো? এখন ফ্রেশ তো?' ওসমান বড়ো বড়ো চোখে তাকালে তার চোখের গাঢ় লাল ও খয়েরি রেখাগুলোর রঙ পানসে মনে হয়। এতোক্ষণ ঘুমিয়ে কি তার চোখের অস্থির রক্তচিহ্ন মুছে গেছে?—চমৎকার! আনোয়ারের বুক কাঁপে, ওসমান বোধহয় ভালো হয়ে গেলো! প্রচণ্ড আঘাত বা দুর্ঘটনার লুপ্তস্মৃতি ফিরে পাওয়ার কতো গল্প শোনা যায়। ওমসানের কি তাই হলো? কাঁপতে কাঁপতে আনোয়ার বলে, 'ওসমান ওঠো। মুখ ধুয়ে নাও। চলো আজ একটু বাইরে যাবো। রেক্সে যাবে?'

অদ্ভুত ভঙ্গি করে ওসমানে হাসে, 'চলেন। আপনার গায়ে বুলেট লেগেছে কোথায়?' আনোয়ার ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে। ওসমান কি তাকে চিনতেও পাচ্ছে না? তাহলে? সে কি ওসমানের অপরিচিত ব্যক্তিতে পরিণত হলো? করমালি চলে যাচ্ছে। আনোয়ার তো এখন থেকে এখানেই থাকবে। যার কাছে একবার অপরিচিত তার সঙ্গে কাটবে কিভাবে?

মুখ ধুয়ে এসে বিছানায় আসন পেতে বসে ওসমান বলে, 'চা খেয়ে চলেন।' করমালি নিচে হোটেল থেকে নানরুটি, কলেজির ভুনা তরকারি ও চা এনে দিলে আস্তে আস্তে সব খায়। তার ঠোঁটের ফোলাটা একটু কমেছে, তবে খেতে এখনো কষ্ট হচ্ছে।

এদিকে করমালির ট্রেন বেলা ১২টায়। আনোয়ার তাকে তাগাদা দেয়, 'করমালি তুমি যাও। গাড়িতে জায়গা না পেলে মুশকিল হবে।'

'তাহলে চলেন ভাই।' বলতে বলতে তক্তপোষ থেকে নেমে ওসমান স্যাণ্ডেল পায়ে দেয়। ছাদে পেচ্ছাব করে এসে জামা গায়ে দেয়, 'চলেন, আমি রেডি। খিজির তো আরো সকালে বেরুতে বলে গেছে। দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলেন!'

'বসো! কোথায় যাবে?' আনোয়ার ধমক দিলে ওসমান মিনমিন করে, 'রাগ করেন কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তো আমাকে ডাকলেন না কেন? চলেন। এখনো টাইম আছে।'

করমালি ফ্যালফ্যাল করে সব দ্যাখে। আনোয়ার পকেট থেকে টাকা বার করে তার হাতে দেয়, 'রাখো।'

'ট্যাকা দিলেন?' করমালি ইতস্তত করলে আনোয়ার বলে, 'ট্রেনের টিকেট করতে হবে। রাস্তায় খাওয়া দাওয়া—।'

'আর পাঁচটা ট্যাকা দিলে ভালো হলোনি ভাইজান। ঢাকা থ্যাকা যামু, বাড়িত ধরেন ছোল পোলগুল্যান আছে, বুড়া বাপ আছে। কিছু খরচ করার হাউস করছিলাম!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আনোয়ার ছোট্টো করে হাসে, 'এই অবস্থাতেও তোমার হাউস? তোমার গ্রামে নাকি কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে, এর মধ্যে তোমার হাউস আসে কোত্থেকে? আনোয়ারের এই বিরক্তির কোনো মানে করমালি বুঝতে পারে না। আফসার গাজী গ্রামে কেয়ামত শুরু করেছে বলে গ্রামবাসীরা কি সখ আহ্লাদ সব বিসর্জন দেবে? এর চেয়ে ভালো অবস্থা আবার ছিলো কবে?

'নাও।' আনোয়ার এবার ১০ টাকার ১টা নোট তার হাতে দিলে করমালি ৫টা টাকা ফেরত দেয়, 'পাঁচ ট্যাকা হলেই হবো। বাপজানের একখান তবন আর ভাইসতাগোরে গোঞ্জি নিমু। কয়টা কলা নিমু ভাইজান। চেংটুর বাপের হাতে কলা কয়টা দিলে বুড়ার ব্যাটা এ্যানা খুশি হবো। গাড়ির টিকেট তো করমু না, আর পাঁচ ট্যাকা হলেই হবো।'

'আরে নিয়ে যাও। ট্রেনের টিকেট করবে না কেন?'

'গাড়িত উঠি কতো, হামাগোরে টিকেট করা লাগে না ভাইজান।' করমালি এবার তোলে ওসমানের প্রসঙ্গ, 'ভাইজানের অসুখ মনে হয় বাড়তিছে। আজ দ্যাখেন আপনাকে চিনবার পারতিছে না?'

'অসুখ বাড়বে কেন? আঠারো ঘন্টা ঘুমিয়েছে, এখন একটু অন্যরকম তো লাগবেই। তুমি যাও। তোমার আবার কেনাকাটা আছে, ট্রেন ফেল করবে। যাও।'

'তো যাই ভাইজান! যায়া না হয় খবর দিমু।' করমালি দরজায় পৌছলে ওসমান দাঁড়ায় তার পেছনে, 'চলেন। তাড়াতাড়ি চলেন।'

সিঁড়ির ধাপে পা রেখে করমালি ফিরে তাকায় ওসমানের দিকে, 'আপনে শুয়্যা থাকেন ভাইজান। আল্লা বাঁচালে আনোয়ার ভায়ের সাথে হামাগোরে গাঁওত একবার আসেন।'

'আঃ! করমালি, ফের দাঁড়াচ্ছো কেন? ওসমানের অবস্থা বুঝতে পাচ্ছো না?' বলতে বলতে আনোয়ার দরাম করে দরজা বন্ধ করে দিলো। ওসমানের ঘাড়ে হাত রেখে তাকে

একরকম ঠেলে বসিয়ে দেয় তক্তপোষের ওপর। তারপর বন্ধ দরজায় ভেতরের দিকে কড়ায় তালা লাগাতে লাগাতে ওসমানের মিনতি শোনে, 'আমাকে বাইরে যেতে দিন না ভাই! খিজির ওয়েট করছে, জানেন তো মাটিতে ও পা ঠেকাতে পারে না। বেচারা কতক্ষণ ঝুলবে?'

ওসমানের পাশে বসলে আনোয়ারের চোখে পড়ে বিছানার প্রান্তে ৫ টাকার নোট, টাকাটা উড়ে যাচ্ছিলো, আনোয়ার ধরে ফেলে। হ্যাঁ, করমালির ঐ নোটটাই। করমালি কখন যে টাকাটা রেখে দিলো আনোয়ার বুঝতেই পারলো না। করমালির বিদায়ের মুহূর্তে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ এতোক্ষণ পর কর্কশ হয়ে বাজছে। আনোয়ার ছাদে গিয়ে রেলিঙে ঝুঁকে নিচের রাস্তা দ্যাখে। করমালিকে ডেকে এই টাকাটা দিতে পারলে ভালো হয়। সে না হয় সে নাদু পরামাণিকের হাতে টাকাটা তুলে দিতো।

রাস্তায় রিকশার সারি। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নতুন রিকশার লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের রিকশা এসে অপেক্ষা করছে লাইন ধরে। রিকশার লাইনের ওপার ল্যাম্পোস্টের নিচে পান বিড়ি সিগ্রেটের দোকান। এর একটু দূরে টিনের ডাস্টবিনের পাশে ঝগড়া করছে নেড়ি কুত্তা ও ধুমসি কুত্তা। আরেকটু দূরে রিকশায় উঠে হুড ঢেকে দিচ্ছে ১তরুণী। এইসবেরও সামনে ইলেকট্রিক তারের ঝাঁকের নিচে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে করমালি। আনোয়ার ডাকে, 'করমালি! ও করমালি!'

কিন্তু রাস্তায় স্কুটার, রিকশা, নারায়ণগঞ্জগামী বাস, পথচারী মানুষ এবং ঝগড়ায় মত্ত কুকুরদের সমবেত ধ্বনিতে তার স্বর চাপা পড়ে। করমালি ফিরেও তাকায় না, খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যাচ্ছে জনসন রোডের দিকে।

৫০

ওসমানের সঙ্গে আনোয়ারও সারাদিন বন্দী। তবে এভাবে থাকার কয়েকটি সুবিধাও সে আজ আবিষ্কার করলো। তাদের বাড়ির মতো সবসময় লোকজনের আসা যাওয়া নাই! তবে লোক দ্যাখার ইচ্ছা হলে ছাদে রেলিং ধরে দাঁড়ালেই হলো। বাসে, স্কুটারে, রিকশা, গাড়িতে এবং নিজনিজ পদযুগলে চলমান মানুষের বিরতিহীন প্রবাহ। সবই দ্যাখা যাচ্ছে, কিন্তু আনোয়ার আছে নিরাপদ দূরত্বে। তার ইচ্ছা না হলে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। আবার ঘরের মধ্যেও একা হয়ে রয়েছে, ওসমান তাকে চিনতে পাচ্ছে না বলে আনোয়ার পরিণত হয়েছে ১জন যে কোনো মানুষে। ওসমানও কি একা থাকার স্বস্তি উপভোগ করে?— মনে হয় না। সে তো সবসময় কারো না কারো সঙ্গে কথা বলেই চলেছে। তার পছন্দমতো লোক সে বেছে নেয়, কিংবা তার কপালগুণে পছন্দসই লোকজন তার চোখের সামনে আসে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে জটিল মাথা আরো জটিল করে তোলে। তার কথাবার্তা বেশির ভাগই অস্পষ্ট। উচ্চারণের ভঙ্গি থেকে মনে হয় আজ বোধহয় খুব কবিতা আবৃত্তি করছে,

কবিতার কোনো শব্দই বোঝা যায় না, তবে এটুকু ধরা যায় যে তার বেশির ভাগ শব্দই ২ সিলেবলের। মাথার জটিলতা ঝেড়ে ফেলার জন্যে কি ওসমান এই পথ ধরলো? একজন পাগলের পক্ষে কি শব্দ সাজানো সম্ভব?—এই নিয়ে আনোয়ার বেশ সমস্যায় পড়ে, কাল ওসমানকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে কথাটা তুলতে হবে।

বিকালবেলা আলতাফ ঘরে ঢোকে, তার মাথায় অন্য সমস্যা। 'কি দোস্ত? এখানে ঢোকাটাই তো মুশকিল! দরজার সামনেও রিকশার লাইন।'

'ঢুকতে তো তবু পারলে। বেরুনো প্রায় অসম্ভব। সকালে শুনলাম নতুন লাইসেন্স নেওয়ার জন্য রিকশার কিউ নাকি গ্যাণ্ডারিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।'

'সকালে ছিলো গ্যাণ্ডারিয়া পর্যন্ত? এতোক্ষণ তাহলে নারায়ণগঞ্জ।' আলতাফ ঠাট্টা করে, কিন্তু ঢাকায় রিকশা বৃদ্ধির সরকারী পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে তার হাসি মুছে যায়, 'এসব আসলে শয়তানি! বড়ো শহরে কখনো রিকশা থাকে? সিটিতে থাকবে অটোমোবাইলস! পাঞ্জাবিরা ঢাকাকে কিছুতেই সিটি ডিক্লেয়ার করবে না, বুঝলে? সিটি ঘোষণা করলেই এখনে চাকরিরত যাবতীয় লোককে সিটি এ্যালাউন্স দিতে হবে। শালাদের বুক টাটায়। ওদিকে বাঙলার কৃষকের রক্তে গড়ে তোলে করাচি। করাচি কমপ্লিট হলো তো ইসলামাবাদ!'

'ঢাকাকে সিটি বানালে বাঙলার কৃষকের লাভ কি?'

'তোমার তো লাভ হয়। তুমি সিটির অধিবাসী হতে পারো। তোমাদের কলেজের গভর্নিং বডিকে প্রেশার দিয়ে বাড়িভাড়া বাড়িয়ে নিতে পারো। এক্সট্রা পাওনাটা না হয় তোমাদের বিপ্লবের জন্যে চাঁদা দিলে।' কথাটা বলতে পেরে আলতাফ খুশি হয় এবং একটু চা খেতে চায়।

'দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি। আমার ভাতও খেতে হবে। দুপুরে কিছু খাইনি।'

রেস্টুরেন্টে খেয়ে এবং ওসমানের জন্যে প্লেটে খাবার ও সবার জন্যে কেতলিতে চা এনে আনোয়ার দ্যাখে যে ওসমান দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাদে, পাশে জুম্মন।

আলতাফকে একটু বিচলিত মনে হচ্ছে, 'একটু আগে এই ছোকরা এসেছে। ওসমান তো চিনতেই পাচ্ছিলো না। অথচ দ্যাখো এই ছোকরা এসে কি ইশারা করলো আর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো ছাদে। ওসমানের কথাবার্তা শুনে আমার কিন্তু ভয় করছে।'

ওসমানের দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ফুটে উঠছে। আজ সারাদিন তো ভালোই কাটলো। বিড়বিড় করে নানান লোকের সঙ্গে কথা বলা ও ২ সিলেবলের অস্পষ্ট ছড়া আবৃত্তির মধ্যেই তার তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিলো। কিন্তু এখন জুম্মনের পাশে তার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বিপদের সংকেত সেকেন্ডে সেকেন্ডে স্পষ্ট হচ্ছে।—'খিজির, আমি রেডি। জুম্মনও এসে পড়েছে। তুমি তোমার জিনিসপত্র নাও।' অদৃশ্য খিজিরকে ওসমান তার জিনিসপত্র দেওয়ার প্রস্তাব করতেই জুম্মন নিজের হাফ প্যান্টের পকেট থেকে স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার বার করে ওপরদিকে তুলে ধরে। ওসমান ধমক দেয়, 'আরে ওখানে ধরিস কেন? এদিকে।'

কিন্তু জুম্মন ওদিকে গেলেও খিজির সেসব স্পর্শ করে না। ওসমান বলে, 'আরে ও তো অনেক ওপরে, তুই ছুঁতে পারবি না। আমাকে দে।' জুম্মন বিনা দ্বিধায় যন্ত্রগুলো ওসমানের হাতে সমর্পণ করে। অদৃশ্য ও ঝুলন্ত খিজিরের হাতে ওগুলো অর্পণ করার উদ্দেশ্যে ওসমান

ওপরদিকে লাফ দিলো। খিজির নিশ্চয়ই আরো ওপরে আছে কিংবা এও হতে পারে যে দুষ্টুমি করে ওসমানের ছোঁয়ার বাইরে থাকার জন্য বারবার স্প্রিঙের মতো ওপরে উঠে যাচ্ছে।

'আরে খিজির! কি শুরু করলে? তোমার স্ক্রু-ড্রাইভার, তোমার প্লাস না প্লায়ার কি বলে, —এই নাও। একি?' কিন্তু খিজির তার আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়, ওসমানের লাফ দেওয়ার গতি ও তীব্রতা ক্রমে বাড়ে। হাইজাম্পে ওর অসাধারণ দক্ষতা দেখে আনোয়ার ও আলতাফ মুগ্ধ। তবে এই দক্ষতা আরেকটু বাড়লেই ছাদের রেলিং টপকে ওসমান নির্ঘাৎ নিচে পড়ে যাব। ওকে ধরার জন্য তাই ২ জনেই দৌড়াতে শুরু করে। কিন্তু ওসমান প্রতি পলকে জায়গা বদলাচ্ছে। তাছাড়া আরো মুশকিল আছে। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের অনুকরণে নিজের শরীরকে অক্ষ হিসাবে ব্যবহার করে ওসমান ঘোরে আহ্নিক গতিতে এবং এভাবে ঘুরতে ঘুরতে, বরং বলা যায় ঘুরপাক খেতে খেতে চক্রাকারে আবর্তিত হয় ছাদের অনেকটা জায়গা জুড়ে। এই শেষ তৎপরতাটিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের বার্ষিক গতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে পৃথিবী ও অন্যন্য গ্রহ ওসমানের মতো ওপরদিকে লাফায় কি-না তা আনোয়ার বা আলতাফের জানা নাই। এরা ২ জনেই তার পিছে ঘুরছে, তার ২টো উপগ্রহের মতো তার মাধ্যাকর্ষণ এলাকার মধ্যেই থাকছে, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পাচ্ছে না। খিজিরের প্রতি মিনতি জানাতে ওসমান কিসব বলছে, তার কথা মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ। তবে এর বেশির ভাগ উচ্চারণ ২ সিলেব্‌লের, এগুলো আদৌ কোনো শব্দ কি-না বোঝা যায় না।

ওসমানের দিকে ছুটছিলো জুম্মনও। আলতাফ হঠাৎ করে তার ঘাড়ে হাত দিয়ে তাকে থামায়, নিজেও থেমে হাঁপায়, 'তোকে আসতে বললো কে?'

'তোর ঐসব ইয়ে, মানে খিজিরের ঐ প্লায়ার আর স্ক্রু-ড্রাইভার দেখেই ওসমানের মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। তুই চলে যা না!' আনোয়ারও অভিযুক্ত করলো জুম্মনকেই, কিন্তু সে দৌড়ানো থামায়নি।

আলতাফ ফের নতুন উদ্যমে দৌড়াতে শুরু করে, ঐ অবস্থাতেই সে জুম্মনকে নির্দেশ দেয়, 'তুই যা না বাবা!'

'মগর আমার পেলাস? আমার ইসক্রু ড্রেরাইভার?' জুম্মনের এই দাবীর জবাব দেয় আনোয়ার, 'তুই তো দিয়েই দিলি! খিজিরকে দেওয়ার জন্য ওসমানকে দিলি না?'

কৈ, ঐ সাবে তো খিজিরের নাগাল পাইতাছে না!'

ওসমান এইবার অনেক ওপরে লাফ দিয়ে শূন্যের দিকে ছুঁড়ে দেয় স্ক্রু-ড্রাইভার ও প্লায়ার, 'নাও, খিজির। ধরো! তোমার জিনিস ধরে ফেলো!'

স্ক্রু-ড্রাইভার পড়ে যায় ছাদের এক কোণে। কিন্তু প্লায়ারটা ছাদের রেলিং ডিঙিয়ে পড়লো নিচে। অবশ্য খিজির মাঝপথে ওটা ধরে ফেলে তো আলাদা কথা। স্ক্রু-ড্রাইভারটা চট করে কুড়িয়ে নিয়ে চিলেকোঠার ভেতর দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো জুম্মন। রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে আলতাফ দেখলো রাস্তার ধারে ড্রেনে হাত ঢুকিয়ে জুম্মন প্লায়ারটি খুঁজছে। আলতাফ আরো কিছুক্ষণ দেখতো, কিন্তু ওসমান ধপাস করে বসে পড়েছে ছাদে, আনোয়ার তার কাঁধে হাত দিতে সুবোধ বালকের মতো সে উঠে দাঁড়ায়, 'চলেন। কোথায় যেতে হবে চলেন।'

বিছানায় বসে ওসমান একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বিড়বিড় করে তার দুই-সিলেব্‌ল-প্রধান শব্দের পদ্য আবৃত্তি করে চললো। তার চোখ নিচের দিকে, মনে হয় সে যেন নামাজে বসে

সুরা পড়ছে। আলতাফ আস্তে আস্তে আনোয়ারকে সাবধান করে দেয়, 'আনোয়ার, এর কন্ডিশন কিন্তু খুব খারাপ। হাসপাতালে দিয়ে দাও। একটা এ্যাকসিডেন্ট হলে—।'

'দূর! আজ সারাদিন তো ভালো ছিলো। এ্যাবসোলিউটলি নর্মাল। ঝুম্মনকে দেখে এই কাণ্ডটা করলো। সীজন চেঞ্জ হলে ইমপ্রুভ করবে।' আনোয়ার বললো বটে, কিন্তু মনে হয়, পাবনাতেই যদি শেষ পর্যন্ত পাঠাতে হয়! রোগীর সঙ্গে ওরা কি কাউকে থাকতে দেয়? না, তা দেবে কেন? তখন? আনোয়ার তখন কি করবে? এই যে এতোদিন পর কলেজ খুললো, মার্শাল ল হবার পরদিনই খুললো, এখন থেকেই আবার বন্ধের পাঁয়তারা চলছে। আবার শোনা যাচ্ছে কলেজ নাকি উঠে যাবে, কলেজের ফান্ড খুব খারাপ। তা উঠলেই কি আর থাকলেই কি, ঐ কলেজে সপ্তাহে ৬টা ক্লাস করা কি কোনো কাজ হলো? ওসমান হাসপাতালে গেলে আনোয়ার ঢাকা থাকবে আর কি করতে? করমালিকে কথা দেওয়া হয়েছে, গ্রামে যেতে হবে। আত্মীয়স্বজনের পুরুষানুক্রমিক শয়তানির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তাদের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া, আবার যাদের সঙ্গে কাজ করবে তাদের নিরঙ্কুশ আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েও অব্যাহত রাখা;—এসব ভাবলেই অবসাদে গা এলিয়ে পড়ে। এই অবসাদ কাটাবার জন্যে ঝাঁঝালো মেজাজে আলতাফকে জিগ্যেস করে, 'তোমার খবর কি? পলিটিক্যাল এ্যাকটিভিটিস?'

'ভালো। খুব ভালো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে।'

'তা তো পাবেই!' আনোয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে, 'মাঠ তো তৈরি করা হয়েছে। এই মাঠকে তোমরা পকেটে পোরার ব্যবস্থা করছো। মুভমেন্টের সময় যেসব লোক পিপলের টার্গেট ছিলো এখন তোমাদের ডানার নিচে এসে গ্রামকে তছনছ করে বেড়াচ্ছে!'

'ডানা থাকলেই ডানার নিচে মানুষ আসে আনোয়ার। ন্যাশনালিজমের ডাকে নানা ধরনের লোক তো আসবেই। আমাদের নেতা এখন সকলের নেতা। সবাই তাকিয়ে আছে বত্রিশ নম্বরের বাড়িটার দিকে।'

'কোন কাগজে পড়লাম, বত্রিশ নম্বর নাকি মার্শাল ল-র খবর পেয়ে বাক্স পেটরা সাজিয়ে ঘরের বারান্দায় বসে ছিলেন। আর্মি এলেই ওদের গাড়িতে উঠে পড়বেন।'

'ভয়ডর জিনিসটা তাঁর একটু কম। জীবনের অনেকগুলো বছর যাঁর জেলে কাটলো তাঁর আবার ভয় কিসের?'

'ভয়টা তো জেলের বাইরেই বেশি। বাইরের ঝড়-ঝাপ্টা তাঁর গায়ে লাগে না। মাঝে মাঝে বাইরে এসে ঝড়ে-পড়া আম কুড়াবেন।'

'ঝড়-ঝাপটা কি সব সময় ভালো? ঢাল নাই তলোয়ার নাই নিধিরাম সর্দার হয়ে লাভ কি?'

'ঢাল তলোয়ার ছাড়াই যা হলো তাতেই নেতা বেরিয়ে আসতে পারলেন। এখন তাঁর কাজ হলো নিধিরামদের হাতে ঢাল তলোয়ার যাতে উঠতে না পারে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই এ্যাসাইনমেন্ট তাঁকে দিলো কে?'

'যাঁকে মুক্ত করে আনার জন্যে মানুষ বুলেটের সামনে এগিয়ে যায় তাঁকে কেউ কোনো এ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে মাঠে নামাতে পারে না, বুঝলে?' আলতাফের গলা বেশ চড়ে গেছে, 'তোমাদের বাড়াবাড়ির জন্য মার্শাল ল হলো। কয়েকটা দিন দ্যাখো, আমাদের নেতা—।'

ওসমানের বিড়বিড় আবৃত্তি হঠাৎ বিকট উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠলো, এবার তার ধ্বনিসমূহ শব্দ বলে চেনা যায়, 'মার্শাল ল, ইয়েস মার্শাল ল, লিট্‌ল লিট্‌ল ক খ গ!' বারবার বললে এর অন্ত্যমিল স্পষ্ট হয়।

সারাদিন এই কথাগুলো আনোয়ার বুঝতে পারেনি, এখন সবগুলো ধ্বনি শব্দ হয়ে ওঠার পর সে ক্লান্ত বোধ করে, 'আঃ ওসমান, থামো।'

ওসমান ধরণা দেয় আলতাফের কাছে, 'আপনি একটু বলেন না! আপনারা আমাকে রিলিজ করে দিন। আমার কাজ আছে।'

'ওসমান, আমাকে চিনতে পাচ্ছো না?' ওসমানের মাথায় তার নিজের পরিচয় একেবারে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে আলতাফ হন্যে হয়ে ওঠে, 'আমি আলতাফ! মনে নেই? তোমার বন্ধু আলতাফ।'

ওসমান বিনীত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে, 'কি যে বলেন! আপনাকে চিনবো না কেন? আপনারা দুজনে তো একই র‍্যাঙ্কের অফিসার, না? কর্নেল? না ব্রিগেডিয়ার? না মেজর?'

আনোয়ার বলে, 'নাও আলতাফ, আর্মিতে এতো বড়ো দুজন বাঙালি অফিসার পেলে। এখন তোমরা খুশি তো?'

'আপনারা দরজাটা খুলে দিন না!' ওসমান এই অনুরোধ করে ফের বিড়বিড় করে আবৃত্তি করে, 'আগডুম বাগডুম ইন খোলা মাঠ, বন্ধ কপাট ইয়েস বন্ধ কপাট।'

'আঃ! থামো না ওসমান।'

আনোয়ারের নির্দেশ ওসমান মানে না, সে আবৃত্তি করেই চলে, 'দুইজন কর্নেল একখানা খাট, বন্ধ কপাট ইয়েস বন্ধ কপাট।'

৫১

'বন্ধ কপাট ইয়েস বন্ধ কপাট, আগডুম বাগডুম ইন খোলা মাঠ, ম্যান অফ দি কপাট ম্যান ইন দি কপাট, দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট, কর্নেলে জেনারেলে করলো লোপাট, কপাট বন্ধ হলে কপাটি জমাট, স্টেমিটিল সিডেটিভ ঝপাট ঝপাট, ম্যান ইন দি কপাট ইয়েস বন্ধ কপাট।'—দিনে দিনে ওসমানের ছড়া লম্বা হয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়ে। মাঝে মাঝে কয়েকটা লাইন তার ঝরে পড়ে, পরদিন সদ্যোজাত লাইনের সঙ্গে কোনোটা ফিরে আসে, কয়েকটি লুপ্ত হয় চিরকালের জন্যে। ওসমান প্রায় সবসময় এসব গুনগুন করে, কখনো কথা বাদ দিয়ে এমনি সব ভাজে, কখনো বেশ দরাজ গলায় আবৃত্তি করে, মাঝে মাঝে বিকট স্বরে চ্যাঁচায়। তবে চ্যাঁচানোটা কম, বিড়বিড় করে বলতেই সে ভালোবাসে। শুনতে শুনতে আনোয়ারের একরকম মুখস্থ হয়ে গেলো, এমনকি নিজেও সে ছড়াটির কোনো লাইন গুনগুন করছে। শওকত ভাই ১দিন এসব শুনে কাগজে লিখে রাখতে বললে, সাইকিয়াট্রিস্টকে দ্যাখালে ওসমানের চিকিৎসায় কাজে লাগতে পারে।

আজ বিকালবেলা ১টা ১ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর থেকে ওসমান একটু শান্ত। এমনকি রাত্রে মাছে ঝোল দিয়ে ভাত খেতে বসে খিজিরকে খাওয়াবার জন্য ভাতের লোকমা শূন্যে ছুঁড়লো না, বরং নিজেই চেটেপুটে খেয়ে হাত না ধুয়েই চুপচাপ বসে রইলো। আনোয়ার হাত ধুতে বললে সে স্বরচিত ছড়া খুব মিহিসুরে আবৃত্তি করতে লাগলো।

ওসমানের নিস্তেজ চেহারা দেখে আনোয়ার তার পাশে বসে, আস্তে আস্তে জিগ্যেস করে, 'ওসমান বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে? তোমার আব্বাকে টেলিগ্রাম করে দিই?' টেলিগ্রাম করেনি, তবে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা মুশকিল। ওসমানের পাসপোর্টও নাই, পাসপোর্ট পাওয়া খুব কঠিন। এর ওপর ওসমানকে পাসপোর্ট অফিসে হাজির করলে ওকে পাসপোর্ট তো দেবেই না বরং বাপ কোথায়, মা কোথায়—এসব ধরে একটা যা তা কাণ্ড করে বসবে। আনোয়ার তবু ফের জিগ্যেস করবে, 'ওসমান বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে?'

ওসমানের লালচে চোখে গাঢ় লাল প্রলেপ পড়ে, গাঢ় খয়েরি মণিজোড়া ২ ফোঁটা মধুর মতো তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মাত্র কয়েক পলকের জন্য। দেখতে দেখতে তরল মধুবিন্দু ফের জমাট বাঁধে এবং চোখের গাঢ় লাল রঙ হয় লালচে। জমাটবাঁধা মণিজোড়ায় এলোমেলো দৃষ্টি পুরু সর ফেলে। ওর চোখের এই রঙবদল দেখে আনোয়ারের মায়া হয়। 'ওসমান উঠে এবার শুয়ে পড়ো, কেমন?'

'কেন? বাড়ি যেতে বললেন যে?' ওসমান উঠে দাঁড়ায়, জানলা দিয়ে উঁকি দেয় ছাদে, ছাদের শূন্যতার উদ্দেশে বলে, 'খিজির, একটু দাঁড়াও। আমি আসছি।'

'কোথায় যাবে ওসমান?' আনোয়ারকেও উঠে দাঁড়াতে হয়, 'এখন ঘুমাও।'

'খিজির আমি রেডি।' বলে ওসমান মিষ্টি হেসে মাথা নোয়ায় আনোয়ারের দিকে, 'আচ্ছা আসি।' সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে সে অনুরোধ করে, 'ছিটকিনিটা খুলে দিন।'

ওসমানের অবধারিত বিস্ফোরণ ঠেকাবার জন্য আনোয়ার চট করে ঐ দরজার কাছে চলে যায় এবং ওসমানের প্রতি তার ব্যবহার বদলাতে বাধ্য হয়, 'ওসমান, গোলমাল করো না, বিছানায় শুয়ে পড়ো।'

এই ধমকেই ওসমান এই লোকটার ওপর তার স্বল্পস্থায়ী আস্থা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে এবং 'খিজির, একটু দাঁড়াও!' বলতে বলতে তার এঁটো হাতে ছিটকিনি খোলার উদ্যোগ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ারের ডান হাত চলে যায় দরজার ছিটকিনিতে। বাঁ হাত দিয়ে ওসমান আনোয়ারের ডান হাতের ওপর খুব জোরে ঘুষি মারে, এতোটাই জোরে যে তার বেগে আনোয়ারের হাতটা নিচে নেমে আসে। এই সুযোগে ওসমান ছিটকিনি খুলে ফেলে। কিন্তু আনোয়ার তার সমস্ত শরীর দিয়ে আটকে রেখেছে গোটা দরজা, তাই দরজা খুলতে পারে না। ওসমান তখন চিৎকার করে খিজিরের সাহায্য চায়, খিজির আরে এসো না, আমাকে দরজা খুলতে দিচ্ছে না তো!' ওসমান তার ২হাত দিয়ে আনোয়ারের ডান হাত চেপে ধরেছে, তার বাঁ হাতটা পড়েছে একটু বেকায়দায়, সেটা কোনো কাজে লাগনো যাচ্ছে না। আনোয়ার ভয় পায়, ওসমানের হাতে যে প্রবল বল টের পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু অস্বাভাবিক। রাত্রি বাজে ১০টা, বাইরে কারফ্যু, এই অন্ধকারে অপঘাতে মৃত খিজির কি ওসমানের ওপর সাঙ্ঘাতিক ভাবে ভর করলো? ১ জন মৃত ও ১ জন জীবিত মানুষের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে সে পারবে কেন? ভয়ে আনোয়ারের গলা শুকিয়ে আসে, আজ রাত্রে

এদের সঙ্গে আবার কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। জীবিত মানুষের গলা শোনাবার জন্যে নিজেই চিৎকার করে ওঠে, 'ওসমান, তুমি এ কি শুরু করলে? সরে যাও, এখান থেকে সরো!'

'জানলা দিয়ে ঢুকতে পারবে না? দাঁড়াও, ছাদের দরজা খুলে দিচ্ছি।' খিজিরকে এই নির্দেশ দিয়ে ওসমান তাকে ঘরে ঢোকবার জন্য ছাদের দিককার দরজা খোলার উদ্দেশ্যে এদিকের দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ার ওর ২টো হাতই ধরে ফেলে। তার হাতগুলো আনোয়ারের জোড়হাতের ভেতর নড়াচড়া করে। টানতে টানতে আনোয়ার তাকে বিছানার দিকে নেওয়ার চেষ্টা করে। টানা হ্যাঁচড়ার এই ব্যায়াম করার ফলে ব্যায়ামের নিয়ম অনুসারে আনোয়ারের শরীরে বল ফিরে আসে। তবে ওসমানের সঙ্গে পারা অতো সোজা নয়। ১ ধাক্কায় আনোয়ারকে সে প্রায় ঠেলে ফেলেই দিয়েছিলো। তবে এই ধাক্কাটা সামলাতে গিয়ে আনোয়ারের বেশ সুবিধাও হলো। তাকেও ১টা ধাক্কা দিতে হয়, অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত এই ধাক্কায় ওসমান ছিটকে পড়ে বিছানার ঠিক মাঝখানে। ওসমানের ওপর লাফিয়ে পড়ে ওর ২ বাহুর ওপর শক্তি প্রয়োগ করে আনোয়ার ওকে চিৎ করে শুইয়ে দিলো। ২ বাহুমূলে নিজের ২ হাত চেপে ধরে আনোয়ার ওয়ার্নিং দেয় 'ওসমান, বাড়াবাড়ি করো না। সোজা হাসপাতাল পাঠিয়ে দেবো। কতো ধানে কতো চাল এখানে বুঝতে পারো নি, না?'

'আপনি না বললেন আমি বাড়ি যেতে পারবো! আমাকে রিলিজ করে দেন না, বাড়ি যাই। আমি বাড়ি যাবো।'

'বাড়ি যাবো বললেই বাড়ি যাওয়া যায়?' ওসমানকে সম্পূর্ণ কবজা করতে আনোয়ার ওর মুখ ভ্যাংচায়, 'বাড়ি যাবো! বাইরে বেরুলেই বাড়ি?'

'রাস্তায় নামলেই বাড়ি যাওয়া যাবে। খিজির সব চেনে, বেরুলেই ও বাড়ি নিয়ে যাবে।' ওসমান ফের ওঠার চেষ্টা করছে। আনোয়ারের হাতে তালুতে ওসমানের বাহুমূলের পেশীর কাঁপনি বেশ ভালোভাবে টের পাওয়া যায়। ওসমান এবার ওর পা দিয়ে আনোয়ারকে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে শুরু করে। বুদ্ধি করে আনোয়ার তখন লাফ দিয়ে উঠে বসে ওসমানের পেটের ওপর, আবার তার ২ বাহুর ওপর থেকেও আনোয়ার হাত কিন্তু সরায়নি। তাকে একটু উপুড় হয়ে থাকতে হচ্ছে। এমনি উপুড় হয়ে রাত্রি কাটাতে হলে বিপদ। তার মুখে লাগছে ওসমানের ফোঁস ফোঁস নিশ্বাসের বাতাস, এতো গরম, যে আনোয়ারের কপাল, চিবুক ও নাকের ডগায় ঘাম জমে গেলো। আনোয়ার এখন কি করতে পারে? তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো না। কারণ ওসমান হঠাৎ করে খুব জোরে থুথু ছুঁড়ে দিলো আনোয়ারের মুখে। সদ্য ভাত খাওয়া মুখের লালা তার কপালে, চোখে, নাকে, ঠোঁটে, গালে ও চিবুকে। সারা গা ঘিনঘিন করে। আঠালো থুথু তার চোখের সামনে লম্বা পর্দার মতো ঝোলে। পর্দা জুড়ে বসে রাত জেগে পাড়াশোনা করে আনোয়ার। আই এ পরীক্ষার পড়া করতে হচ্ছে, আবুলের মা ঢোকে চায়ের ফ্লাস্ক হাতে। টেবিলে ফ্লাস্ক রেখে আবুলের মা বলে, 'আম্মায় কইছে, বেশি রাইত কইরেন না, শরীল খারাপ করবো।' আবুলের মায়ের ঘষা ঘষা কণ্ঠস্বরে তার ১৭ বছর বয়সের কান খসখস করে, শরীর হঠাৎ বলকাতে থাকে এবং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাজের মেয়েটিকে সে জড়িয়ে ধরে। আবুলের মা খুব চমকে গিয়েছিলো, 'আরে ছাড়েন, ছাড়েন! আঃ! কি করতাছেন? ছাড়েন!' তার এই আবেদন অগ্রাহ্য করে তাকে ঠেলে ঠেলে খাটের কাছে এনে এমনি করে শুইয়ে দিয়েছিলো। মেয়েমানুষ হলে কি হয়, তার বাহু ওসমানের বাহুর চেয়ে নরম নয়, বরং আরো রোগা, আরো কঠিন। কোনো ভাবে হ্যাঁচকা

টানে তাকে শুইয়ে আনোয়ার তার ওপর শোবার চেষ্টা করছে, এক সময় মেয়েটি তার মুখে থুথু ছুঁড়ে ফেললো। তারও ছিলো এমনি সদ্য-ভাত খাওয়া মুখের আঠালো থুথু, আনোয়ার লাফিয়ে নেমে দাঁড়িয়েছিলো মেঝেতে। ১০বছর আগেকার এই ঘটনায় সে এখন দারুণভাবে অপমানিত বোধ করছে। ওসমান কিন্তু থুথু ছোঁড়া অব্যাহত রেখেছে, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছে, 'শালা কর্নেলের বাচ্চা, কথা দিয়ে কথা রাখলি না!' এবার কিন্তু আনোয়ার ওসমানের পেট থেকে লাফিয়ে নামলো না। বরং আরেকটু চেপে বসে ওসমানের ডান গালে প্রথমে এবং পরে বাঁ গালে ঠাস ঠাস করে অন্তত ৭/৮টা চড় মারলো। নাকের ওপর লাগালো বেশ সলিড ওজনের ১টা ঘুষি। ওসমান এতেই নেতিয়ে পড়েছিলো, আনোয়ার তার ওপর টেবিল থেকে কড়া ডোজের ৩টে সিডেটিভ ট্যাবলেট জোর করে ঢুকিয়ে দিলো তার মুখের ভেতর। ওসমান অবশ্য ট্যাবলেটগুলো থুথুর মতো ছুঁড়ে দিতে চাইলেও পারলো না, সেগুলো আটকে রইলো তার ঠোঁট ও দাঁতের ফাঁকে।

ওসমান নিস্তেজ হয়ে পড়লে আনোয়ার বসে থাকে তক্তপোষের ধার ঘেঁষে। ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তার শরীর ভেঙে পড়ছে। একটু শোবার জন্য শরীর কাঙাল হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন শোওয়া মানে ঘুম। ঘুমিয়ে পড়াটা নিরাপদ নয়। ওসমান যদি উঠে পড়ে? উঠে যদি ছাদে চলে যায়? ছাদের দিকের দরজা ভেতর থেকে তালা লাগানো। সিঁড়ির দিকের দরজায় বাইরের ১টি কড়ায় তালা ঝুলছে। আনোয়ার উঠে সেই তালা খুলে লাগালো ভেতরদিকে শিকলের সঙ্গে। সিঁড়ির নিচে রাস্তার সঙ্গে যে দরজা সেখানে তালা আছে কি-না আনোয়ারের জানা নাই। দরকারটা কি? এই ঘরের তালা ওসমান যদি খুলতে যায় তাকে সামলানো হবে তখনি।

তবে আনোয়ারের বড়ডো ঘুম পাচ্ছে। চা খেলে হতো। টেবিলে আবুলের মায়ের রেখে -যাওয়া ফ্লাস্ক খুঁজতে গিয়ে সে চমকে ওঠে, আরে সে কি আজকের ঘটনা? সে কি এখানে? —নিচে থেকে চা খেয়ে এলে হয়। কিন্তু কারফ্যুর রাতে তার জন্যে দোকান খুলে রেখেছে কে? —ওসমানের ঘুমিয়ে পড়ার নিশ্বাসে আনোয়ারের চোখ আরো ঢুলে ঢুলে আসে। ওসমানের পাশে সরু জায়গাটায় শুতে শুতে ভাবে একটু গড়িয়ে নিলে ফ্রেশ লাগবে, রাত জাগতে তখন কষ্ট হবে না। কিন্তু এখন ক্লান্তি তো একটুও কাটে না, মনে হয় লম্বা রাস্তা ধরে সে হাঁটছে। এটা কোন রাস্তা? —তাই বলো! চন্দনদহ বাজার থেকে সে হেঁটে চলেছে নিজেদের গ্রামে। গাবতলায় গোরুর গাড়ির চাকায় ক্ষয়-হওয়া জায়গায় আনোয়ার হোঁচট খায়। এর ফলে সে চমকে ওঠে। কিন্তু ঘুম ভাঙে না, তন্দ্রার পাতলা একটি পরতে ভেসে উঠেই ডুবে যায় ঘুমের অনেক ভেতরে।

স্বপ্নে গ্রামের রাস্তায় পা হড়কে যাওয়ায় ঘুমের ভেতর চমকে উঠে ডান পায়ের অবস্থান পাল্টায় আনোয়ার। ঐ পায়ের ধাক্কায় জেগে ওঠে ওসমান। সঙ্গে সঙ্গে কপাল ও ঠোঁটের ব্যথা কনকন করে ওঠে। বলতে গেলে এই ব্যথাই তাকে অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে

ঠেলছিলো। ভালোভাবে জেগে ওঠবার পর ব্যথা কিন্তু ভোঁতা হয়ে আসে। মনে হয় তাকে জাগিয়ে তোলা ছাড়া তার কপাল ও ঠোঁটের ব্যথার আর কোনো ভূমিকা নাই। শরীর জুড়ে অবসাদ! অনেকক্ষণ ঘুমাবার পর এই অবসাদ থাকে। তবে এটা কাটানো এমন কিছু কঠিন নয়। গায়ে হাতে পায়ে বলসঞ্চারের জন্য চোখ বন্ধ করে ওসমান একাগ্রচিত্ত হলো। ফলে অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। ছাদের রেলিং টপকে ওসমান পড়ে যাচ্ছে নিচে। ঠোঁটে ও কপালে চোট লাগলো কি তখনি? তার পরনে হাওয়াই শার্ট, শার্টের পকেটে এম্ব্রয়ডারি-করা প্যাগোডা। আর কিছু স্পষ্ট নয়। ছাদ থেকে ঐ অতর্কিত পতনের পর সে চলে যায় অনেক নিচে, সেখানে কালো পানির অগাধ গভীর বিল। বিলের ওপরকার চেহারা ঝাপশা। গভীর পানির তলায় বিলের হিমকাদাময় আদুরে পেটের ভেতর সে সাঁতরাচ্ছিলো, তখন কে তাকে খুব জোরে ধাক্কা দেয়। কে সে? কবেকার নৌকাডুবির পর নৌকার ভাঙা গলুই গাঁথা ছিলো বিলের তলায়, তার সঙ্গে হয়তো তার মাথা ঠেকে গিয়েছিলো। অথবা বিলের প্রধান ব্যক্তিত্ব জনাব রাঘব বোয়াল, সিতার-ই-ইমতিয়াজ, হেলাল-ই-জুরাত কিংবা তার পারিষদ জনাব বাঘা শোল তমঘা-ই খিদমত ঘাই মেরেছিলো, সেই ঘায়ে তার কপাল টনটন করছে। এই ব্যথা একটু ভোঁতা হয়ে গেলেও এর সাহায্যেই বিলের ছলছল স্পন্দন চেনা যাচ্ছে। বিলের গভীর ঘন বুক থেকে কখন যেন সে উঠে এসেছে ডাঙার ওপর। বিলের কলি খুলে ওসমান ফুটে বেরিয়েছে, সমস্ত শরীর তার একেবারে টাটকা ও নতুন। চোখ মেললে দ্যাখে, সে শুয়ে রয়েছে এই ঘরে, এই বিছানার ওপর। মেঝেতে বসে চাষাভূষা চেহারার ১টি লোক তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো। এখন বুঝতে পাচ্ছে, ঐ লোকটাকেও ওরা বন্দি করে রেখেছিলো। বোকাসোকা গ্রাম্য মানুষটি দিব্যি ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে গেলো আরে ওসমানের কি-না এই বন্দিত্ব ঘোচার কোনো লক্ষণই নাই।

'আহেন, বারাইয়া আহেন। অ ওসমান সাব, আহের না!' জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকে খিজির। খিজিরকে দ্যাখামাত্র ওসমানের সবকিছু মনে পড়ে গেলো। এইতো তার পাশে শুয়ে রয়েছে ১সেন্ট্রি। এই পাহারাদার কে? একে চেনা চেনা মনে হয়। হ্যাঁ, এইবার চিনতে পারে, ব্যাটা মিলিটারির লোক। মেজর না কর্নেল? আরে দূর! অতো সোজা? ব্যাটম্যান কি জওয়ান টওয়ান কিছু হবে। পুলিস-কনস্টেবলও হতে পারে। তবে ভাবসাব দেখে মনে হয় ব্রিগেডিয়ার কি মেজর জেনারেল। হতেও পারে। এতো ক্ষমতাবান অফিসার না হলে ওসমানকে এভাবে আটকে রাখে? এর হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় কি? মিলিটারির লোক,—মানুষকে যতোভাবে পারো বন্দি করে রাখার যাবতীয় ফন্দি রপ্ত করাই এদের জীবনের পরম সাফল্য। লেখাপড়া জানে না, এমনকি যুদ্ধটাও ঠিকমতো করতে পারে না; অথচ দ্যাখো শালারা কি মৌজে থাকে! তো নিজের দেশের নিরীহ নিরস্ত্র মানুষকে বন্দি করার ফন্দিটুকু না জানলে কি এতো মৌজ মারতে পারে?

'ওসমান সাব বারাইয়া আহেন! দেরি হইয়া যায়, আহেন!'

খিজির বড়ো তাগাদা দিচ্ছে। বুঝতে পাচ্ছে না, এই জানোয়ারটির হাত থেকে বেরিয়ে আসা কতো কঠিন কাজ! এদের হলো ওয়ান-ট্র্যাক ব্রেন। খুলির ভেতর যা ঢোকানো হলো তাই সেট হয়ে গেলো চিরকালের জন্য। তাই নিয়ে দিনরাত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করবে। খাঁটি ও নির্ভেজাল শুওরের বাচ্চা। এদের মধ্যে আবার বড়ো বড়ো পজিশন নিয়ে যারা তারা হলো শুওরের বড়োভাই গণ্ডারের মতো। ১দিকে দৌড়াতে শুরু করলে আশেপাশে তাকায় না। গন্তব্যে

বলে আদৌ কিছু আছে? —ওসমান মাথা তুলে পাশের লোকটির হাত ও পা দ্যাখে, সেখানে নখ ও থাবা লুকিয়ে রেখে ব্যাটা গভীর ঘুমে অচেতন।

'ডরান ক্যালায়?' খিজির ফের তাগাদা দেয়, 'দুপুরবেলা দেখলেন না ঐ গেরাইম্যা চাষাটা কেমুন ফাল পাইড়া গেলো গিয়া! এই মিলিটারি হালায় কতো ডাক পাড়লো, কিছু করবার পারলো? আপনে খালি ঘরের মইদ্যে বইয়া মুঠঠি মারেন!'

খিজির কথা বলছে একা, কিন্তু এইসব বাক্যে কোরাসের আভাস। অনেক লোক থাকলে এই মেজর না কর্নেল না দারোগা না কনস্টেবল না মেজর জেনারেলকে ভয় পাবার কি আছে? তবু সাবধানের মার নাই, ওসমান ভালো করে ঘুমন্ত লোকটির মুখ পরীক্ষা করতে থাকে।

'আরে আহেন না! কতো মানু বারাইয়া আহে! আপনে দেহি দিন নাই, রাইত নাই, হোগাখান একবার উপ্তা কইরা একবার চৌকির লগে ঠেকাইয়া খালি খোয়াব দ্যাহেন! ওঠেন! গতরটা ঝাড়া দেন!'

কিন্তু বেরিয়ে যাবো বললেই বেরুনো যায়? এই ঘরের ২টো দরজাতেই তালা। তার ওপর পাশে ডিউটি দিচ্ছে শাঁসালো সেন্ট্রি। ওসমান খুব সাবধানে উঠে বসে। এই সামান্য নড়াচড়ায় সেন্ট্রি শালা ঘুমের মধ্যে সাড়া পায় এবং অস্ফুট স্বরে বলে, এই আবদুল, আমার ঘড়িটা—।' ওসমান এবার নিশ্চিত হলো: না ব্যাটা ঘুমিয়েছে! ঘুমাও, গভীরভাবে ঘুমাও! ঘুমের মধ্যেও তোমার ঘড়ির ভাবনা!

'কি হইলো? মরলেন নাকি? আহেন না?'

নাঃ! খিজিরের বিবেচনাবোধ কম। আরো খিজিরের কি? খিজিরের ঘর নাই, বাড়ি নাই, দরজা নাই, ছিটকিনি নাই, তালা নাই, টেবিল নাই, ঘড়ি নাই, ঘণ্টা নাই, মিনিট নাই। ইচ্ছা হলো আর সোজা বেরিয়ে পড়লো। আমি কি তাই পারি?

'আমরা যাই! আপনে মিলিটারি হালার তলায় উপ্তা হইয়া নিন্দ পাড়েন!'

তক্তপোষের সস্তা কাঠ ক্যাঁচক্যাঁচ করে। ঠাণ্ডা মেঝেতে পা পড়লে ওসমানের মাথা শিরশির করে ওঠে। না, ভয় কিসের? কর্নেল না মেজর না দারোগা না মেজর জেনারেল ব্যাটা কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুমায়। ঘরে আলো জ্বলছে, ওসমান আস্তে করে সুইচ টিপে অন্ধকার করে দিলো। বাইরের আলোয় মশারির আড়ালে লোকটির ঘুমন্ত মুখ ভারি দুঃখী দুঃখী মনে হয়। লোকটি কে? কেএ? ওসমানের করোটিতে ১টির পর ১টি ঢেউ খেলে।—লোকটি কে? কে?—ঢেউয়ের গতি ক্রমে দ্রুত হয়, তীব্র ও দ্রুতগতিতে ঢেউয়ের মাথার ফেনায় টুটাফাটা কয়েকটি ছবি চিকচিক করে ওঠে: কার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ওসমান রাস্তা পাড়ি দিচ্ছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই। রথখোলার মোড় মস্ত বড়ো–মার্কা ১টা গাড়ি লাল রঙের আভাস দিয়ে কোথায় হারালো। ঢেউ চলে যায় দূরের কোনো অদৃশ্য তটভূমিতে, কিছু দ্যাখা যায় না।—না, দ্যাখার জো নাই। দ্যাখার দরকার নাই! ওসমান সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'আসছি খিজির!' আলো না থাকলেও এই ঘরের সব কিছু তার জানা। টেবিলের ওপর এলোমেলো বইয়ের স্তূপ, প্লেট, বাটি, পানির গ্লাস, সিগ্রেটের প্যাকেট, দেশলাই। আলনায় ময়লা কাপড়, মেঝেতে লুঙি ও গেঞ্জি। ওসমানের বুক টনটন করে। এরকম হচ্ছে কেন?—আরে নাঃ! আসলে টনটন করছে তার তলপেট। ওদিকে ছাদের দরজায় তালা। ওসমান

বাধ্য হয়ে ঘরের ভেতরেই লুঙি তুলে পেচ্ছাব করতে শুরু করলো। পাইপ দিয়ে পানি ঢালার মতো নুনু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেচ্ছাব করে। টেবিলের বইপত্র ভিজে যায়, প্লেটে কুসুম-গরম হলুদাভ পানি জমে, আলনার কাপড় ভেজে এবং সব দিয়ে ধুয়ে যা থাকে তাই দিয়ে ভিজিয়ে দেয় উপুড়-হয়ে -শোয়া সেন্ট্রির নাদুসনুদুস পাছাখানি। এতেও তার ঘুম না ভাঙায় ওসমান বীরপুরুষের মতো বালিশের নিচে হাত দিয়ে বার করে নেয় চাবির গোছা।

সিঁড়ির দিকে দরজায় লাগানো তালা খুলতে তার ১ মিনিটও লাগে না। চাবির গোছাটি সে ছুঁড়ে ফেলে জানলা দিয়ে, খুব জোরে ছোঁড়ে, ছাদ পেরিয়ে, ছাদের রেলিং ডিঙিয়ে চাবির গুচ্ছ পড়ে যায় নিচে। সেন্ট্রি ব্যাটা চাবিটা না পেয়ে বেশ ধান্দায় পড়বে, এটা ছাড়া আর আর মানুষকে সে বন্দি করবে কিভাবে?

দরজা তো খোলা হলো! কিন্তু নিচে নেমে কি হবে? রাস্তায় হাজার হাজার রিকশা, রিকশার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে মিলিটারি। হাড্ডি খিজির বলে, 'কি হইলো?'

'রাস্তায় মিলিটারি।'

'মিলিটারির মায়েরে বাপ! রাস্তা অগো জমিন্দারি? চুতমারানিরা দালান ইমারত ব্যাকটি কবজা করছে। রাস্তা ভি দখল করবো?'

ওসমানের সামনে অন্ধকার খাদ। এই খাদের ভেতর নিচে নামবার সিঁড়ি। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে ওর কোনো অসুবিধা হয় না। 'আগডুম বাগডুম খোলা মাঠ ঘাট, ম্যান অফ দি কপাট, ম্যান ইন দি কপাট,—গুনগুন করে গাইতে গাইতে ওসমান নিচে নামে, কোনো ধাপে পা হড়কায় না। তবে সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে ধাক্কা খায় দরজার সঙ্গে। তাকে আটকাবার জন্যে দরজা নিজেই এগিয়ে এসেছে। ওপরের ছিটকিনি খুলে দরজায় ঠেলা দিলে কপাট দুটো একটু ফাঁক হলো। বাইরের আলো চিকন রেখার ওপর চড়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির প্রথম কয়েকটি ধাপ পর্যন্ত ময়লা হলুদ করে তোলে। দরজায় আরেকবার ধাক্কা দিয়ে ওসমান বুঝতে পারে আলোর রেখা আর চওড়া হবে না। দরজায় তালা লাগানো, কপাটজোড়ার ফাঁক ঐ কয়েক ইঞ্চির বেশি বাড়ানো যাবে না। তাহলে?—এখন কি তবে ফিরে যেতে হবে ঐ কামরায়? তক্তপোষে শুয়ে ঘুমাবার সম্ভাবনায় ওসমান হাই তোলে, শরীর এলিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু শোবে কোথায়? যেখানে শোবে একটু আগেই তো সেখানটায় পেচ্ছাব করে এলো। তাহলে?

'কি হইলো? নিচে আইয়া খাড়াইয়া থাহেন?'

'দরজা বন্ধ। তালা লাগানো। চাবি কার কাছে তুমি জানো?'

'চাবির গুলি মারেন। বাইর হন!'

'কোনদিক দিয়ে বেরুবো?'

'মুসিবত! আরে মিয়া আপনে আছেন ঘরের মইদ্যে, তালা ভি ঘরের মইদ্যে দরজার লগে! ক্যামনে বারাইবেন ঠিক পান না? হায়রে মরদ!'

'কপাট কপাট ইয়েস বন্ধ কপাট, আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম মাঠ' দোয়া পড়ার মতো বিড়বিড় করতে করতে ওসমান সমস্ত শক্তি দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলো। তারপর 'দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট, কর্নেলে জেনারেলে করলো লোপাট' বলে গুণে গুণে ৮ বার ধাক্কা দিলে দরজায় বিকট আওয়াজ হয়। কিন্তু দরজায় ফাঁক যেমন ছিলো তেমনি থাকে।

'আইলেন?'

'তালা ভাঙা যাচ্ছে না।'

'ভিতরে খাড়াইয়া ভি তালা ভাঙবার পারেন না। মরদ হইয়া পয়দা হইছিলেন তো? হিজড়াগো লগে লইয়া আমাগো কাম নাই। আমরা যাই গিয়া।' খিজির সত্যি সত্যি রওয়ানা হলে ওসমান একটু বিচলিত হয়। না, তাড়াতাড়ি করা দরকার। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠে ফের দৌড়ে নেমে দরজার গায়ে সে প্রবল বেগে লাথি লাগায়। এরকম ১বার ২বার ও ৩বার তার জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে তালার কড়া খুলে গেলো। কপাটজোড়া হাঁ হয়ে ভয়-পাওয়া কোনো ভিখারি এবং তার ছায়ার মতো একটু একটু কাঁপে।

৫২

ওসমানের এইসব তৎপরতা আনোয়ারের কানে নিশ্চয়ই ধাক্কা দিচ্ছিলো। কিন্তু সে তখন আমূল ঘুমে বিদ্ধ।

ওসমান উঠে গেলে তার ঘুম ভাঙেনি। বরং হাঁটুজোড়ার ভেতর ভাঁজ করে রাখা হাত ২টো ছড়িয়ে সে শুয়েছে আরাম করে। রোগা ও পুরনো তক্তপোষে চারকোনা মশারির ভেতর পাতলা কাঁথার নিচে মাঝারি সাইজের ফর্সা তনুখানি পরিপাটি করে বিছিয়ে ঘুমে ঘুমে আনোয়ার তলিয়ে গেছে অনেক ভেতরে। নিরিবিলি এই ঘর তার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে নিভৃত হয়। ওসমান সুইচ অফ করে যাওয়ার পর পাতলা অন্ধকার ১টি কাঁথা হয়ে তার চোখমুখ ঢেকে দিয়েছে। ওপরে এই অন্ধকার একটু পাতলা, কিন্তু তার চোখের ভেতরকার অন্ধকারকে এটা বেশ ঘন করে তোলে। অন্ধকার ক্রমে পুরুষ্টু হয়। অন্ধকারে পড়ে অন্ধকারের ছায়া এবং ছায়া-অন্ধকার ঘনিয়ে আসে বৈরাগী ভিটায়। চেংটুকে খুঁজতে গিয়ে সেখানে দ্যাখা মেলে জালাল মাস্টারের। বটগাছের পুরু শিকড়ে বসে জালালউদ্দিন বৈরাগীর ভিটার নতুন মহিমা কীর্তন করে, 'এতদঅঞ্চলের ব্যামাক মানুষ, আবালবৃদ্ধবণিতা এই বটবৃক্ষের তলা দিয়া যাতায়াত করে। হাটবাজার যাবার পথ এখন কতো সংক্ষিপ্ত হছে আন্দাজ করবার পারো? আগে দুপুরবেলাতেও এদিক আসতে মানুষ আতঙ্কিত হছে, আর এখন?' জালালউদ্দিন উৎসাহ ও উত্তেজনায় নড়েচড়ে বসে, 'এখন বিকাল হলে স্থানীয় চ্যাংড়া প্যাংড়া, যুবক ও তরুণদের বেড়াবার জায়গা হছে এটা। আবার ধরো ধর্মসভা কও, ওয়াজ মহফিল কও আর সভাসমিতি কও—এই কয়টা ইউনিয়নের মধ্যে এরকম জুতের জায়গা আর কোথায় পাবা? বগুড়া থ্যাকা, নেতৃবৃন্দ আসেন, এই বটবৃক্ষের তলায় গ্রামবাসী তেনাদের ভাষণ শোনে, বুঝলা না?—আনোয়ার বোঝে বৈ কি! কতো মানুষের সঙ্গে বসে সে নিজেও বক্তৃতা শুনছে, জাতীয় পর্যায়ের কোনো এক নেতার জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে শুনতে ঝিমায়। বাতাস বইলে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গত করে বাজতে-থাকা বটপাতার মর্মরধ্বনিতে তার বড়ো ঘুম পায়।

স্বপ্নের এই ঘুম আনোয়ারের সত্যিকারের ঘুমকে মস্ত বড়ো কড়াইতে ধিকি ধিকি তাপে জ্বাল হতে থাকা দুধের মতো আওটায়। তার গালের ভেতর টাকরায় জিভ লেগে আওয়াজ

হয়। আনোয়ার তারিয়ে তারিয়ে সুস্বাদু ঘুম পাড়ে। আওটানো ঘুমে সর পড়ে, ঘুমে ঘুমে সর পুরু হয়। বাইরের যাবতীয় শব্দ, গন্ধ ও রঙ সেই ঘরের ওপর আটকে থাকে, আনোয়ারকে ছুঁতেও পারে না।

৫৩

তার জোড়পায়ের লাথিতে তালা ভেঙে দরজা খুলে গেলে ওসমান রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলো চিৎপটাং হয়ে। ডান পায়ের পাতা তার ঢুকে যায় রাস্তার পাশে রাখা রিকশার স্পোকের ফাঁকে, তার পায়ের জায়গা সংকুলানের জন্য বেশ কয়েকটা স্পোককে ভেঙে যেতে হয়। বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচের দিকটা পড়ে টুকরা কাঁচের ওপর, ভাঙাচোরা খোয়াও ছিলো সেখানে, হাঁটুর নিচে তার থেতলে গেছে। ওসমানের মাথা পড়েছিলো নালার ঠিক কিনারে, লম্বা লম্বা চুলে নালার ময়লা থিকথিক করে। মাথার চাঁদি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিলো। তবে ওসমান বেশিক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকতে পারেনি, খিজিরের ধমকে লাফ দিয়ে উঠে দ্যাখে তার সামনে ও ওপরে, পাশে ও পেছনে ল্যাম্পোস্টের বাল্বের আলো ডিমের কুসুমের মতো ঘন। এর সঙ্গে মিশেছে হলুদ জ্যোৎস্না। এই মিশ্রিত আলো মলমের মতো ওসমানের গা জুড়িয়ে দেয়। তার সামনে খিজির। 'খিজির দাঁড়াও' বলে ওসমান পা বাড়ায়। সে চলছিলো রাস্তার ডান দিক দিয়ে কিন্তু এদিকে লাইসেন্স-প্রার্থী রিকশার সারি। তাকে তাই চলতে হয় রাস্তার মাঝখান দিয়ে। কিন্তু খিজিরের গতি বড়ো দ্রুত, ওসমান তাই পা চালায় একটু জোরে। কুয়াশার নিচে ল্যাম্পোস্টে ল্যাম্পোস্টে ঢুলঢুল বাল্বগুলো মানুষের পদার্পণে চমকে জ্বলে ওঠে। এইসব বাল্বের কম্পন ও হাল্কা কুয়াশার ধীরগতিতে রাত্রি গড়ায়। হাওয়ায় হাওয়ায় রাত্রির জমাট বাঁধা কালো শরীর রঙ বদলায়। আকাশ তাই এই কালো, এই কালচে নীল, এই গোলাপী কালো, এই গোলাপী নীল, আবার দেখতে দেখতে নীলচে-নীল। রাত্রিকালের শরীর একটু ভিজে, ওসমানের শীতশীত করছিলো। পায়ের গতি বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে শীতশীত ভাবটা কেটে যায়। ডানদিকে ও বাঁদিকে গলি-উপগলি সব ফাঁকা। কিন্তু রাস্তায় মানুষ না থাকলে কি হবে, আশেপাশের বাড়িঘরের মানুষের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে গলি-উপগলি ফেঁপে উঠে গোটা সুভাষ বোস এ্যাভেন্যুকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে জনসন রোডের মোহনায়। না, হাঁটার জন্যে ওসমানকে তেমন কোনো উদ্যম নিতে হয় না, রাস্তার স্রোতে তার পাজোড়া ঢেউয়ের মতো এগিয়ে চলেছে। মুশকিল এই খিজির আলিকে নিয়ে। লোকটা বারবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ওসমান একেকবারে হাঁক দেয়, 'খিজির! দূর থেকে জবাব আসে, 'আহেন!' একবার মনে হলো সে খুব কাছে চলে এসেছে, 'এট্টু জলদি করেন ওসমান সাব! পাও দুইখান মনে লয় ইসক্রু মাইরা রাস্তার লগে ফিট কইরা দিছেন!' তা ওসমান তো প্রায় দৌড়েই চলেছে, খিজিরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি সোজা কথা? খিজির চলে পানির মধ্যে মাছের মতো। দ্যাখো তো, এই লোকটির সঙ্গ নেওয়ার জন্য ছুটতে হয় ওসমানকে।

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের সামনে গোলাচি গাছের রোগা ১টি ডালের মোটা ছায়া পড়েছে ডাস্টবিনের ওপর। তার পাশে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শোয়া কুকুরটা তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে। তার ঘেউঘেউতে সাড়া দেয় কলতাবাজারের মাথায় যে পানির ট্যাঙ্ক সেখানকার ৩/৪টে কুকুর। মধ্যরাত্রে প্যাট্রোলপুলিসের সতর্ক বাঁশির জবাবে যেমন বাঁশি বাজায় দূরের পুলিস, এই এলাকার কুকুরগুলাও তেমনি ১টার পর ১টা ঘেউঘেউ করে চলেছে। হাঁটার গতি কমিয়ে ওসমান ধমক দেয়, 'চুপ কর! কুত্তার বাচ্চা!' খিজির কোথেকে হেসে ওঠে, 'আহেন ঐগুলি কিছু করবো না! ডাফরিন হোস্টেলের বাব্বুছুঁচোটি ঘরে ফিরছিলো ফুটপাথের ধার ঘেঁষে, ওসমানকে দেখে কিংবা তার পায়ের আওয়াজে সে চিঁচি করে ওঠে। সারি সারি রিকশার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো কালো-সাদা বিড়াল। সে একটু থমকে দাঁড়ালো, তারপর রাস্তা ক্রস করে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুলের গেটের সামনে। 'টাইনা আহেন!' ফের খিজিরের গলা। এইবার ওসমান তাকে একেবারে সামনা-সামনি পায়। খিজির ঝুলছে ইলেকট্রিক তারের সঙ্গে, তারে ঝুলতে ঝুলতে লোকটা আবার কোথায় চলে গেলো?

মাথার ওপর ইলেকট্রিক তারের ঝাঁক ছুটে চলে ল্যাম্পোস্ট ছুঁয়ে ছুঁয়ে। তারের ভেতরকার বিদ্যুতের চলাচল খিজির নিশ্চয়ই স্পর্শ করতে পাচ্ছে। স্পর্শ করা কি বলছো? লোহার রডের মতো আঙুলগুলো দিয়ে ইলেকট্রিক তার মুচড়ে বিদ্যুৎ সে নিংড়ে নিচ্ছে নিজের হাড্ডিসার শরীরে। না হলে ব্যাটা এরকম স্পিড পায় কোথেকে? ওসমান এবার খুব জোরে দৌড়াতে শুরু করে। তার আশা: ইলেকট্রিক তারের ঝাঁক ১বার না ১বার ছোঁ মেরে তাকে তুলে নেবে ঐ উঁচুতে, খিজিরের পাশে চলতে তখন আর তাকে কোনো বেগ পেতে হবে না।

ভিক্টোরিয়া পার্ক ঘিরে ২বার চক্কর দেওয়ার পর ওসমান গনি একেবারে আড়ালে পড়ে গেলো। তাহলে সে রাস্তা ধরলো কোনদিকের?—এখন থেকে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়। ওসমান কোথায় যেতে পারে?

নর্থব্রুক হল রোড ধরে শ্যামবাজার গেলে সামনে বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গা পার হতে পারলে তাকে ঠেকায় কে?

ট্যাকসি-স্ট্যান্ডের ভেতর দিয়ে চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু বাঁয়ে রেখে শাঁখারি পট্টি ক্রস করে চলে যেতে পারে ইসলামপুর। পাকুড়তলা, মিটফোর্ড, ইমামগঞ্জ পেরিয়ে চকবাজার। বাঁদিকে বড়ো কাটরার ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে সোয়ারি ঘাট। ওসমানের যেমন স্পিড তাতে মোগল আমলের বাড়ি-ঘর হুড়মুড় করে নদীতে টেনে ফেলে দিব্যি সাঁতরে সে চলে যেতে পারে নদীর ওপারে। ওপারে গ্রাম। ১টার পর ১টা গ্রাম যদি সে পেরিয়ে যায় তো তাকে ঠেকায় কে?

আবার ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে জনসন রোড হয়ে নবাবপুর ধরে দৌড়ালে পৌঁছে যাবে গুলিস্তান। গুলিস্তান এলাকায় যানবাহনের অভাব হবে না। ১টা বাসে চাপতে পারলে চলে যেতে পারে অনেকদূর।

আরেকটি রাস্তার কথা বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তরে পুরনো পানির ট্যাঙ্কের সামনে দিয়ে কলতাবাজার হয়ে ওসমান ছুটতে পারে দোলাই খালের দিকে।

খালে খিজিরের ছায়া দেখে তার সঙ্গলাভের উদ্দেশে পানিতে ডাইভ দেওয়াটা ওসমানের সমীচীন হবে না। ডাইভ দিতে গেলে ওসমান আহত হতে পারে। কারণ সেখানে পানির চিহ্নমাত্র নাই, খাল বুঁজে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। রহমতউল্লার মজুরেরা সেখানে ইট বিছায়, মেশিনে সুরকির সঙ্গে সিমেন্ট মেশায়, লম্বা লম্বা রডের ওপর ঐগুলো ঢেলে রাস্তা বানায়। দিনের বেলা হলে আলাউদ্দিন মিয়াকে সেখানে পাওয়া যেতো। কারফ্যু বলে রাত্রে কাজ বন্ধ। দিনের বেলা হলে আর কেউ না হোক, জুম্মনটা ওসমানের আশেপাশে ঘুরঘুর করতো। কারফ্যুর দাপটে ছোঁড়াটা এখন কমলাপুর স্টেশন কি স্টেডিয়ামের বারান্দায় পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। আবার এমনও হতে পারে সে ঘুমিয়েছিলো সদরঘাট টার্মিনালে। জাহাজ ভিড়বার সময় বাঁশির গম্ভীর আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেছে। জোড়াহাঁটুর মাঝখানে গুঁজে-রাখা প্লায়ার স্ক্রু-ড্রাইভার খুঁজে না পেয়ে জুম্মন এদিক-ওদিক দেখছে। আচ্ছা, খিজির কি তার প্লায়ার ও স্ক্রু-ড্রাইভারের জন্য জুম্মনকে রাস্তায় খুঁজে বেড়াচ্ছে? না, রাস্তায় লোক থাকবে কেন? রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও সরকারী গাড়ি থেকে মাইকে প্রচারিত বিধি অনুসারে কারফ্যু বলবৎ থাকাকালে রাস্তায় কাউকে দ্যাখামাত্র গুলি করা হবে।

এই প্রসঙ্গে কারফ্যু প্রয়োগকারী সংস্থার খাকি পোষাকধারী সশস্ত্র সদস্যদের কথা মনে করা যায়। ১টি মাত্র বুলেট খরচ করে ওসমানের গতি তারা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে পারে। তবে জানের ভয়ডর তাদের কম নয়। মানুষের বাধ্যতামূলক গৃহবাস সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে তারা মাথা গুঁজে দিয়েছে তাদের অস্ত্রসজ্জিত ছাউনির নিরাপদ গহ্বরে।

দোলাই খালের ওপর নির্মীয়মান রাস্তা ধরে ওসমান এতোক্ষণ হয়তো চলে গেছে বংশাল, নাজিরা বাজারের দিকে। বুঁজে-ফেলা দোলাই খালের বহুকাল-আগেকার দাঁড় টানার তালে তালে পা ফেলে সে বোধহয় ঢুকে পড়েছে এই খালের ধারের কোনো বস্তিতে। এমনও হতে পারে যে খিজিরের পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে ওসমান ঢুঁ মেরে চলেছে বস্তির ঘরে ঘরে। জুম্মনকে হয়তো খিজির সঙ্গে নিতে চায়। বস্তি এলাকায় টায়ার ও ন্যাকড়াপোড়া লোমশ ধোঁয়ার ভেতর ঝুলতে ঝুলতে খিজির জুম্মনকে খুঁজতেও তো পারে। তা খিজিরের পক্ষে সেটা এমন কিছু নয়। কিন্তু জলজ্যান্ত ১টা শরীর নিয়ে ওসমানের তো হাঁটা ছাড়া আর গতি নাই। গ্রহ-নক্ষত্রের ফোকাসে গোলাপি নীল, নীলচে নীল, গোলাপি সাদা এবং নীলচে সাদা আকাশের নিচে এবং পানিকাদা কফথুথু গুমুতের ওপর পা টানতে টানতে ওসমানের চেহারায় নতুন ধরনের দাগ পড়ছে। এখন খাকি বলো কালো বলো, সবুজ বলো সাদা বলো—কারো সাধ্যি নাই যে তাকে সেই ওসমান গনি বলে সনাক্ত করে।